বাবর
পিরিমকুল কাদিরভ

পিরিমকুল কাদিরভ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

ন্যাশনাল বুক এজেন্সির প্রথম মুদ্রণ:
জানুয়ারি, ২০০২

ISBN : 81-7626-102-5

প্রকাশক :
সলিল কুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
এস পি কমুনিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ
২৯৪/২/১ এ পি সি রোড
কলকাতা ৭০০ ০৯

প্রচ্ছদ :
শ্রী দেবব্রত ঘোষ

দাম : একশো টাকা

পিরিমকুল কাদিরভ (জন্ম ১৯২৮ সাল) — প্রখ্যাত উজবেক সোভিয়েত লেখক। 'তিনটি মূল', 'কালো আঁখি' প্রভৃতি উপন্যাস ও বড়গল্প 'উত্তররাধিকার'-এর রচয়িতা।

'বাবর' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাচ্যে সুপরিচিত গীতিকবি ও প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাট জাহিরুদ্দিন বাবরের জীবন ও কাব্যসম্ভার নিয়ে।

একই ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যে কবি ও শাসক এই দুই বিপরীতধর্মী গুণের মিলন কী করে সম্ভব তা এই উপন্যাসে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন পিরিমকুল কাদিরভ।

উপন্যাসটি পড়ে পাঠক বুঝবেন নিজের হৃদয়কে দ্বিধাবিভক্ত করতে গিয়ে কী প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়েছে বাবরকে আর শেষ পর্যন্ত তা কি দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে আসে তাঁর জীবনে।

উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই ঐতিহাসিক, একমাত্র ব্যতিক্রম — কৃষক তাহির, যে পরে বাবরের দেহরক্ষী হয় আর বাবরের চরম দুর্দশার দিনে ও তিনি যখন বিরাট ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক হন তখনও তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী। তাহিরের চোখ দিয়েই আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে মহান উজবেক কবি ও শাসকের প্রতিমূর্তি।

সূচী

অবরুদ্ধ ঝর্ণাধারা

কুভা*

১

৮৯৯ হিজরী সন**

গ্রীষ্মকাল। ফরগানার উত্তপ্ত আকাশে ঘন মেঘ পাক খাচ্ছে, সারাদিন চাপা গুমোট গরমের পর সন্ধ্যাবেলায় বৃষ্টি নামল মুষলধারে। লালমাটির পাহাড়গুলির মাঝ দিয়ে বয়ে চলা কুভাসাইয়ের জল শীঘ্রই স্ফীত আর লাল হয়ে উঠল। যেন রক্ত এসে মিশেছে জলধারার সঙ্গে।

নদীতীরের ঝুঁকে পড়া বেতসের একটি ঝোপের নীচে আশ্রয় নিয়েছে এক যুবক ও এক যুবতী অবাঞ্ছিত দৃষ্টি আড়াল করার জন্য।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস কর রাবিয়া,' স্বরে উদ্বেগ নিয়ে হিসহিস করে বলল যুবকটি, 'যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, কোন বিপদ তোমাকে ছুঁতে পারবে না।'

'খোদা তোমার মঙ্গল করুন তাহির... কেবল... হাজারে হাজারে শত্রু এসে হানা দিয়েছে আমাদের দেশে। ওদের কি থামান যাবে? কে ওদের থামাবে?... ঐ দেখ আবার আসছে ঘর ফেলে পালিয়ে আসা লোকের দল... দেখেছ সংখ্যায় ওরা কত। আহা কী দুর্ভাগ্য ওদের!...'

তাহির চোখ সরাল যুবতীর থেকে।

---

* ফরগানা ও আন্দিজানের মাঝখানের একটি প্রাচীন বসতি। বর্তমানে জেলাসদর।

** ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দ। হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনায় গমনের বছর থেকে হিজরী বর্ষ গণনা করা হয়।

কুভাসাইঁয়ের ওপার বরাবর জলাভূমি, নলখাগড়ার ঘন ঝোপ; নদীর ওপরের ধনুকের মত বাঁকা, লম্বা, কাঠের সেতুটা এখন বৃষ্টিধারার মধ্যে দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে। সেতুর ওপর দিয়ে পিঁপড়ের সারির মত চলেছে লোক, ঘোড়া, ভেড়া, ধীরে ধীরে চলেছে উঁচু করে মাল চাপানো ঘোড়াগাড়ি।

শত্রুসৈন্যদল সমরখন্দের শাসনকর্তার পরিচালনায় আক্রমণ করে মার্গিলান, সে দেশের লোকেরা যুদ্ধের দুর্দশার হাত থেকে নিজেদের ধনসম্পত্তি ও স্ত্রীকন্যাদের মান বাঁচানর জন্য পালাতে থাকে কুভা হয়ে আন্দিজান।

'আমাদেরও পালাতে হবে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাবিয়া। তারপর বলল, 'আমার বিয়ের যৌতুকভরা সিন্দুক মা লুকিয়ে রেখেছেন বিচালিঘরে... আর আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আজ সন্ধ্যাবেলায় মাহ্‌মুদ আমাকে নিয়ে চলে যাবে আন্দিজান দুর্গে।'

আন্দিজান দুর্গের অবস্থা জানত তাহির। মাহ্‌মুদ তার বোনকে নিয়ে যাবে আন্দিজান দুর্গে, তারপর কী হবে? সেখানকার স্বেচ্ছাচারী, সর্বশক্তিমান বেগরা কি কুমোরের সুন্দরী মেয়ের পক্ষে কম বিপজ্জনক?

'না,' তাহির গলা চড়িয়ে বলল, 'যদি আমার কথা চিন্তা কর, তো যেও না!...'

তাহিরের পরনের ঘরে তৈরি ডোরাকাটা কাপড়ের জামাটার কোমরবন্ধে ঝুলছে খঞ্জর। সে তাকিয়ে আছে যুবতীর মুখের দিকে, তার চোখের দিকে। যে চোখে সাধারণত থাকে ছেলেমানুষি একগুঁয়ে দৃষ্টি, আজ তা ভয়ে উদ্বেগে পূর্ণ।

'আমারও ইচ্ছে করছে না যেতে। কিন্তু কী করব? এখানে থাকলে যে বিপদ!..'

তাহিরের সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটে বেরিয়ে আসার সময় মেয়েটি বাবার কালো পশমের চেকমেন* মাথায় ঢাকা দিয়েছিল, এখন বৃষ্টিতে ভিজে সেটা হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড ভারী। সেটা এখন রাবিয়া চাপিয়ে নিল কাঁধে; তার কামিজের গলার কাছের বোতামটা খুলে গেছে, ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সাদা ত্রিকোণ— সে দিকে তাহিরের চোখ ঘুরল আপনা থেকেই। সবুজরংয়ের হাতকাটা পোশাকটা সতেরবছরের রাবিয়ার নমনীয়, ক্ষীণ কটিদেশ, আঁটসাঁট বক্ষদেশে চেপে বসেছে।

তাহির আর রাবিয়া একসঙ্গেই বড় হয়ে উঠেছে, বহুদিনের প্রতিবেশী তাদের দুই পরিবার, কিন্তু এই প্রথম যুবক অনুভব করল কী কোমল আর সুন্দর রাবিয়া, তার রাবিয়া। এমন সুন্দর মেয়ের দিকে লোভের হাত বাড়াবেই বিদেশী বেগ আর ভাড়াটে সিপাহীরা।

বসন্তকালে যখন তাদের বাগ্‌দান উৎসব করেন তাদের বাবা-মা তখনও রাবিয়াকে এত সুন্দর মনে হয়নি! রমজান শেষ হলেই তাদের বিয়ের উৎসব হবে। অল্প কয়েকদিন বাদেই তাদের মিলন হবে এই বিশ্বাসে তাদের মনে ছিল অপূর্ব এক প্রশান্তি

---

* মোটা পশমের চোগা।

আর সুখের পূর্বানুভূতি। কিন্তু ঘটনার মোড় ঘুরল অন্যদিকে: যুদ্ধের দমক এসে লাগল কুভার দরজাতেও।

তাহির হঠাৎ যুবতীকে টেনে নিল কাছে। চোগাটা মাটিতে পড়ে গেল, তাহির অনুভব করল রাবিয়ার সারা দেহ কাঁপছে, কাঁপছে তার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু।

'তুমি তো অমন ভীরু ছিলে না, রাবিয়া,' নিজের দুশ্চিন্তা কমাবার জন্য বলল তাহির, 'কী হয়েছে তোমার?'

'আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি, তাহিরজান! হে আল্লাহ্, এ বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর!'

'খারাপ স্বপ্ন?.. আমাকে নিয়ে? বল তো শুনি।'

'বলতে আমার জিভ সরছে না।'

'স্বপ্নে কী না দেখে মানুষ!.. বল আমায়!.. যা হয় হবে!..'

'একটা কালো ষাঁড় খঞ্জরের মত ধারাল শিংয়ে বিঁধছে তোমায়... না! না!' শিউরে উঠল সে। 'গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, ভাবলে!'

স্বপ্নে বিশ্বাস করত তাহির। এক অস্বস্তিকর অনুভূতিতে ভরে গেল তার মন, রাবিয়াকে ছেড়ে দিল হাতের বাঁধন থেকে।

'ভাল করে বুঝিয়ে বল দেখি... শিংয়ে বিঁধিয়ে ওপরে তুলেছে... আর রক্তও দেখেছ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,... ফিনকি দিয়ে রক্ত!'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তাহির।

'তা যদি হয় ভয়ের কিছু নেই। রক্তের স্বপ্ন দেখলে মঙ্গল হয়। বাবা তাই বলেন সব সময়।'

'আল্লাহ্ করুন তাই যেন হয়! তাহির, আমি... যদি তুমি আন্দিজান না যাও... আমি যাব না। যদি কিছু ঘটেই, এখানেই ঘটুক... একসঙ্গে...'

গাছের ডাল থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল, মাঝে মাঝে পড়ছিল মেয়েটির লম্বা চোখের পলকে। তাহিরের মনে হচ্ছে কাঁদছে রাবিয়া।

আমার জন্য ভেবো না, রাবিয়া। আমি এক সাধারণ কিসান। সূর্য উঠবে, আকাশে মেঘ কেটে যাবে, বলদজোড়া নিয়ে মাঠে যাব। গম তুলব। আমাকে কার প্রয়োজন? কে আমার শত্রু? আমার শত্রু সম্বন্ধে কোন মাথাব্যথা নেই। আমার... আমার মনে পড়েছে আন্দিজানের দুর্গে তোমার নিজের ফুফু আছে না! চলে যাও, তার কাছে যাও!'

'আন্দিজানে তোমারও তো আত্মীয় আছে!.. একসঙ্গেই গেলে হয় না?'

চিন্তায় পড়ল তাহির।

আছে আন্দিজানে ফজলুদ্দিনমামা। দরবারের স্থপতি। তাঁকে কুভাতেও সবাই

জানে: নদীর ওপরের এই কাঠের সেতুটা তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ীই তৈরি হয়েছে। মুল্লা ফজলুদ্দিনের সৃষ্ট নীল টালি আর কারুকার্যে অলঙ্কৃত আন্দিজানের দিওয়ানখানা শাসক উমরশেখের অত্যন্ত পছন্দ হয়, সেই থেকেই মামার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। উমরশেখ মামাকে উপহার দেন একটি দৌড়বাজ ঘোড়া ও থলিভর্তি মোহর্। এ সম্বন্ধে তাহির শুনেছে বিশ্বস্ত জনেরই কাছে, আরো শুনেছে সেই বিশ্বস্তসূত্রেই যে মামা দুর্গে থাকেন না, থাকেন শহরের বাইরে নিরালায় সুখে-স্বচ্ছন্দে।

যখন মুল্লা ফজলুদ্দিন কুভায় ছিলেন, তাহিরকে লেখাপড়া শেখাতেন তিনিই। এখন যদি ভাগ্নে এসে তাঁর কাছে আশ্রয় চায়... মামা অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাবা-মা কি বলবেন? তাহির তাঁদের একমাত্র ছেলে, তাকে যেতে দেবেন না— হয়ে গেল। আর কেন হঠাৎ তার আন্দিজান যাবার ইচ্ছে হল তার আসল কারণটা তাঁদের বলতে সংকোচ লাগে... 'আচ্ছা মাহ্‌মুদ যদি বাবাকে বলে, ইঙ্গিত দেয়, তবে কেমন হয়?'

'ঠিক আছে, রাবিয়া, আমরা একসঙ্গে আন্দিজান যাব। কিন্তু আমার আব্বাকে রাজি করান খুব কঠিন হবে... তোমার মাহ্মুদ বাড়িতে আছে?'

'কোথায় যেন বেরোচ্ছিল, ইফতারের আগে ফিরবে, কী দরকার?'

'ইফ্‌তারের পরে আমাদের বাড়িতে যেন আসে একবার, কথা বলা দরকার।'

'আচ্ছা বলব।'

রাবিয়া তাহিরের প্রশস্তবক্ষে মুখ লুকাল, প্রিয়জনকে আঁকড়ে ধরল, বলল, 'আল্লাহ্ আমাদের বিচ্ছেদ না ঘটান যেন!' বলেই পিছিয়ে গিয়ে ডালপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে গেল। নদীর তীরে পড়ে থাকা ফাঁকা তামার কলসিটার ওপর বৃষ্টি পড়ে আওয়াজ উঠছিল। সেটার দিকে তাকিয়ে রাবিয়ার মনে পড়ল সে যেন জল নেবে বলেই এসেছিল।

'জল ভরে নেওয়াই ভাল! তারপর বাড়ি যাব।'

প্রথামত বাগ্‌দত্ত-বাগ্‌দত্তার মিলন হত গোপনে। যখন রাবিয়া তীর থেকে বেশ দূরে চলে গেল তখনই কেবল তাহির বেরিয়ে এল গোপন জায়গা ছেড়ে।

হঠাৎই ওর মনে পড়ল রাবিয়ার স্বপ্নের কথা। বুকটা অজানা বিপদের আশঙ্কায় মোচড় দিয়ে উঠল।

২

রোজা পড়েছে এবছর গ্রীষ্মের সবচেয়ে গরম দিনগুলিতে। আহার ও পান করা সম্ভব কেবল রাত্রে, ভোর হওয়া পর্যন্ত, যতক্ষণ রাতের আকাশে তারারা জ্যোৎস্না বিলায়। আর সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত জলে মুখ কুলকুচা করা পর্যন্ত নিষেধ। ক্ষুধা এবং

বিশেষ করে তৃষ্ণা সংবরণ করা এই দীর্ঘ উত্তপ্ত দিনে অত্যন্ত কষ্টকর: অধৈর্য হয়ে সবাই অপেক্ষা করত কতক্ষণে গোধূলি নামবে, সন্ধ্যার আজানের সময় হবে।

শেষে কুভার মসজিদের মিনার থেকে আজান শোনা গেল। যুদ্ধের আশঙ্কা যতই থাক না' কেন, আহার-পান তো করতেই হয়। সন্ধ্যার আহারের সময় সবাই অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও সবকিছু অপ্রিয় কথা ভুলে যেত।

তাহিরও খেতে বসেছে তার বৃদ্ধ বাবা আর মার সঙ্গে। গরম রুটী, খরমুজের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সুস্বাদু রুটী আর টক-দুধ দেওয়া মাস্তাভাও* সুস্বাদু। আন্দিজানে যাবার ব্যাপারে কথা কিছুতেই আরম্ভ করতে পারছে না তাহির।

ফটকে ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। ফটকের কাছে শুয়ে থাকা বুড়ো কুকুরটা ঘড়ঘড়ে গলায় ডেকে উঠল।

'সাবধান!' নিচু গলায় সতর্ক করে দিলেন বাবা। 'জিজ্ঞেস কর কে।'

বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু আকাশের মেঘের ভিড় সন্ধ্যার অন্ধকারকে আরো ঘন করে তুলেছে। ফটকের একেবারে কাছে এগিয়ে গিয়ে তাহির জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?'

কুকুরটা আবার চেঁচাতে যাবে এমনি সময় ফটকের ওপাশ থেকে শোনা গেল:

'তাহির, তুই নাকি?.. খোল্, আমি রে, তোর মামা!'

'খুলছি, ফজলুদ্দিনমামা!' বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে তাহির বলল, 'মা, ফজলুদ্দিনমামা এসেছে।' বলে ফটকের হুড়কোয় লাগান শিকলটা খুলল তাড়াতাড়ি।

রাস্তায় বেরিয়ে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আত্মীয়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন উপযুক্ত সম্মান সহকারে এবং দীর্ঘসময় ধরে। তাহিরও রাস্তায় বেরিয়ে এল। তাদের বাড়ির অল্পদূরে দেখা যাচ্ছে একটা দুচাকার ঢাকা দেওয়া গাড়ি। একজন লোক গাড়িটায় জোতা ঘোড়ার লাগাম ধরে বসেছিল, ঘোড়ার জিন থেকে লাফিয়ে নামল সে।

'এ কার গাড়ি?'

লোকটা কোন উত্তর দিল না। উত্তর দিলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন, 'আমার, ভাগিনা আমার। জিনিসপত্র নিয়েই চলে এসেছি তোমাদের কাছে।'

'তাই নাকি?' বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না তাহির। মামা এসেছেন তা অবশ্যই আনন্দের কথা। কিন্তু কেমন করে তা হয়?.. সে ভেবেছিল আন্দিজান যাবে, এদিকে মামা নিজেই এসে পড়েছে, তাও জিনিসপত্র নিয়ে, তার মানে আন্দিজানের পথ তার কাছে বন্ধ। আর রাবিয়ার কি হবে?

'তাহির, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা মাল নামা,' মা চেঁচিয়ে বললেন। 'বৃষ্টির মধ্যে পথে মামার খুব ধকল গেছে।'

---

* ভাত, কিমা আর পিঁয়াজের সঙ্গে ঘি দিয়ে বানানো সুরুয়া। —সম্পাঃ

'আর বোলো না বোনটি, ধকল বললেও কম বলা হয়! গাড়ির চাকা কাদায় বসে যাচ্ছিল বারবার, টানাটানি করতে করতে বিরক্ত ধরে গেছে! ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি রাস্তায়—অগুনতি ঘরছাড়া লোক চলেছে!'

কোচোয়ানকে মাল নামাতে সাহায্য করতে লাগল তাহির। ঘোড়াটার গায়ে একটু হাত বুলাবে ভাবল, উষ্ণ কাদামাটিতে হাত ভরে গেল। কাদামাটি লেগেছে ঘোড়াটার প্রায় ঘাড় পর্যন্ত। বেচারী! কপালে জুটেছে বটে... কিন্তু কেন, কেন তারা কুভাতে এসেছে যখন সবাই বিপদ এড়াবার জন্য পালাচ্ছে আন্দিজান?.. কোচোয়ান তার হাতে ধরিয়ে দিল বড় একটা বস্তায় ভরা কি একটা ভারী জিনিস, তাহির সেটা মাটিতে নামিয়ে রাখার চেষ্টা করল।

'এই-এই, আস্তে, ওটা ভারি, দুজনেই ধর বরং,' বলল মামা।

বস্তার মধ্যে ছিল একটা মাঝারি কিন্তু প্রচণ্ড ভারী লোহার বাক্স। মুল্লা ফজলুদ্দিন এক সময় সেটা তৈরি করান কুভার কামারদের দিয়ে। জল ঢুকবে না তার ভেতরে, আগুনে পুড়বে না। এর ভেতরে তিনি তাঁর নকশাপত্র রাখতেন। আর হ্যাঁ, তাঁর কিছু শিল্পকলাচর্চার উৎকৃষ্ট নমুনা— কিছু ছবি! মুল্লা ফজলুদ্দিন পড়াশোনা করেছেন তিন বছর সমরখন্দে, চার বছর হীরাটে: সেখানে স্থাপত্যবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত প্রাণীকে সজীবভাবে ফুটিয়ে তোলার গোপন কৌশলও আয়ত্ত করেছেন। যুদ্ধের কাহিনীগুলি কেবলমাত্র অলঙ্করণে ভরিয়ে তোলা নয় বিভিন্ন ছবিও অলঙ্কৃত করে তোলা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে হীরাটে। আর বেহ্‌জাদের কলমে-তুলিতে ফুটিয়ে তোলা আলিশের নবাই আর হুসেন বাইকারার ছবি তাঁর যশ বাড়িয়েছে। সমরখন্দে আর ফরগানাতে তো আরো বেশি করেই নজরে পড়বে মানুষের মুখের ছবি আঁকা: জীবের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্— সর্বশক্তিমানের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা মারাত্মক। সেইজন্যই মুল্লা ফজলুদ্দিন নিজের ছবিগুলি লুকিয়ে রাখেন লোহার সিন্দুকে।

তাহির ওদিকে বস্তাটা একাই বয়ে এনেছে বাড়ির মধ্যে।

ভারি লাল চেকমেন আর ভিজে জুতোজোড়াটা দরজার কাছে ছেড়ে ফেললেন মুল্লা ফজলুদ্দিন। পায়ে গলিয়ে নিলেন চামড়ার আরেক জোড়া জুতো। জল এসে জমার জন্য ঢাকা দেওয়া গর্তের ধারে হাতমুখ ধুয়ে নিলেন। চেকমেনের নিচে জামাটাও ভিজে গিয়েছে বৃষ্টিতে, কিন্তু গ্রীষ্মের এই সন্ধ্যা বেশ উষ্ণ, যদিও আবহাওয়া ভিজে। মুল্লা ফজলুদ্দিন জামাটা আর বদলালেন না।

পথের ক্লান্তিতে তিনি এমন অবশ হয়ে পড়েছেন যে মাস্তাভা ছুঁলেন না, কেবল দু'টুকরো খরমুজ খেলেন আর কয়েক পেয়ালা চা নিঃশেষ করলেন। গাড়োয়ান ছোকরাটিকেই খাবার আমন্ত্রণ জানানো হল, সে ওদিকে টক-দুধ মেশানো মাস্তাভার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুবাটি মাস্তাভা উড়িয়ে দিল। তারপর বাইরে বেরিয়ে তার ঘোড়াগুলির কাছে গেল।

'তাহলে, মুল্লা ফজলুদ্দিন!' তাহিরের বাবা এবার নিজের লম্বা সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বেশ হল, আপনি এসে পড়েছেন, ভাল কথা। এমন দুর্দিনে আমাদের একসঙ্গেই থাকা উচিত!'

'এলাম তো, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত তাই না? সবাই এই হামলার ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে আর আমি নিজেই বিপদের মুখে মাথা বাড়িয়ে দিচ্ছি,' বিষণ্ণ চোখে তাহিরের দিকে তাকালেন মুল্লা ফজলুদ্দিন।

'এর কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে নিশ্চয়ই তাই না, মামা?' জিজ্ঞাসা করে তাহির।

'কারণ? কারণ একটাই রে, ভাগনে: যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় দালানকোঠা তৈরির কাজ থেমে যায়, কারিগরের প্রয়োজন হয় না আর...'

'কিন্তু আপনাকে তো খোদ বাদশা ওখানে কাজে লাগিয়েছিলেন?'

'বাদশা এখন আখসির কেল্লা মজবুত করার কাজে ব্যস্ত। শুনলাম তাশখন্দের খান মাহ্মুদ আমাদের দুশমন হয়ে দাঁড়িয়েছেন, আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েছেন। ওদিকে পূবদিকে কাশগরের বাদশা আবুবকর-দুগ্লাত সোজা এগিয়ে চলেছেন উজগেন্দের দিকে।'

তাহিরের বাবা আতঙ্কিত হয়ে জামার গলার কাছটা চেপে ধরল তিন আঙুলে।

'হায় আল্লাহ্! ওখানে কাশগরি থেকে, এখানে সমরখন্দ থেকে... তার মানে, তিন দিক থেকে শত্রু আক্রমণ করছে? এমনি আক্রমণ হ্যাঁ, মুল্লা ফলজুদ্দিন? শাহ্ সুলতানরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারছেন না কিছুতেই? তাছাড়া, এঁদের নিজেদের মধ্যে যে আত্মীয়তাও আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ তাই। আমাদের বাদশা উমরশেখ তাশখন্দের খানের জামাই হন। আর সমরখন্দের শাহ সুলতান আহ্মদ মির্জা, যিনি কোকন্দ লুট করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন, তিনি আমাদের শাহের নিজের ভাই। এছাড়া দু'ভাই আবার বেয়াই হতে চেয়েছিলেন: সমরখন্দের শাহের মেয়ে আর আমাদের বাদশাহের ছেলের বাগদান হয়ে আছে পাঁচবছর বয়স থেকেই। তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, শ্বশুর জামাইয়ের বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলে ধরেছে!'

'হায় খোদা! এই কি তাহলে রোজ-কেয়ামত? মুল্লা ফজলুদ্দিন, পৃথিবীর শেষ দিন এল নাকি?'

'জানি না!.. কেবল জানি যে ওরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে, আর এই যুদ্ধের ফলে দুর্ভোগ, দুর্দশা ভোগ করছে অন্যরা। এই আমাদের মত লোকেরা!...'

'এই তাহলে আমাদের ভাগ্যে ছিল...'

'হ্যাঁ, মন্দ ভাগ্য নিয়ে বাঁচা খুবই মুশকিল।' মুল্লা ফজলুদ্দিন যেন তাহিরের বাবার কথা শুনতে পাননি, নিজের মনে বলেই চললেন। 'কত আশা নিয়ে ফিরলাম হীরাট থেকে! আমার প্রিয় ফরগানাতে চমৎকার চমৎকার মাদ্রাসা তৈরির স্বপ্ন দেখেছি, ঠিক

যেমনটি আছে সমরখন্দে, হীরাটে... শাহ্‌, সুলতান... কেউ চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু উলুগবেগের মাদ্রাসা, নবাইয়ের 'খামসা' লোকের স্মৃতিতে থাকবে।'

একথা বলে ফেলে স্থপতি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন: একঝলক তাকিয়ে নিলেন দরজার দিকে। 'দরবারের লোকেদের মধ্যে থেকে মামার অভ্যেস, তাই চরের ভয়,' বুঝল তাহির।

'মামা, আপনি বলুন, বলুন এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই... আন্দিজানে আপনার থাকা হল না কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না মুল্লা ফজলুদ্দিন, চিন্তায় ডুবে গেলেন।

গতকাল সন্ধ্যায় নামাজের সময়ে, যখন মুল্লা ফজলুদ্দিন ছিলেন পাশের রাস্তায় তাঁর বন্ধু এক লিপিকরের বাড়িতে, তখন তাঁর নিজের বাড়ির দরজা ভেঙে কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি ভেতরে ঢোকে। কুকুরটা চীৎকার করতে করতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় কেটে ফেলে সেটাকে। ঐ ছেলেটির (যে আজ মামার ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে কুভাতে এসেছে) হাতপা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দেয়। তারপর আরম্ভ করে বাড়িময় খানাতল্লাশি। সিন্দুকটাও খুঁজে বার করে কুড়ুল দিয়ে তালা ভাঙতে আরম্ভ করেছিল।

এমন সময় মুল্লার প্রতিবেশীরা কুকুরটার মরণচীৎকার শুনতে পায়। ব্যাপার ভাল না বুঝে পাশের বাড়ির একজন লোক চুপিচুপি বেরিয়ে আসে রাস্তায়, দেখে গাছের ছায়ায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাতে চারটে ঘোড়ার লাগাম ধরা— লোকটির মুখ দেখা যায় না, কালো মুখোশে ঢাকা মুখ। আর ফজলুদ্দিনের বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে কিসে যেন আঘাত করার আওয়াজ, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। প্রতিবেশী ছুটে গেল লিপিকরের বাড়ি। সেখান থেকে তারপর ফজলুদ্দিন দৌড়লেন নিজের বাড়ির দিকে।

তিনি যখন এসে পৌঁছলেন ঠিক তখনই সেই লোকগুলো ভারী সিন্দুকটার তালা ভাঙতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত। বাড়ির মালিককে দেখে দু'জন তখুনি জানলা দিয়ে লাফ দিল, জানলার কাঠামোটা ভেঙে গেল, আর তৃতীয়জন দরজার দিকে দৌড় লাগাল।

'দাঁড়া, বদমাশ!' চীৎকার করে বললেন ফজলুদ্দিন, কিন্তু সেই ভালুকের মত বড়সড় চেহারা যুবকটি (এরও মুখ মুখোশে ঢাকা) কাঁধের এক ধাক্কায় বাড়ির মালিককে সরিয়ে দিয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। তারপর লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে এক মুহূর্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

খোলা সিন্দুকটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন মুল্লা ফজলুদ্দিন। কুলুঙ্গিতে রাখা জ্বলন্ত মোমবাতির মিটমিটে আলোয় দেখা যাচ্ছে যে সিন্দুকের জিনিসগুলোতে চোরেদের হাত পড়েছে: নকশাগুলো কোথাও কোথাও দুমড়ে মুচড়ে গেছে, বাদশাহের উপহার মোহরভরা থলিটি অবশ্যই উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু মোহর নিয়ে ফজলুদ্দিনের কোন

মাথাব্যথা নেই। গোপন খুপরিটার কি হল, যেখানে তাঁর আঁকা ছবিগুলো লুকান আছে? বুঝতে পেরে গেছে নাকি ওরা? হায় আল্লাহ্‌, খুলেছে নাকি? তাড়াতাড়ি করে কাগজপত্রের গোছা সিন্দুক থেকে বার করে আনলেন, চকচকে মসৃণ লোহার চৌকো টুকরোটা বাঁদিকে আস্তে করে সরিয়ে দিলেন, — সিন্দুকের তলদেশে আর একটা চাবির গর্ত দেখা গেল। চারদিকে চোখ চালিয়ে নিলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন: বাড়িতে কেউ নেই, উঠোনের প্রতিবেশীটি পরিচারকটির হাতপায়ের বাঁধন খুলছে। আলখাল্লার ভেতরে বুকের কাছে হাত গলিয়ে ফজলুদ্দিন ছোট্ট একটা চাবি বার করে আনলেন, চাবির গর্তে ঢোকালেন... আস্তে আস্তে ডালাটা তুলে ধরলেন— ওই তো তাঁর আঁকা ছবিগুলি খামে ভরা রয়েছে। কোন ছবিটার পর কোন ছবি তা তাঁর খুব ভাল করেই জানা।... বুড়ো মালী গাছে জল দিচ্ছে।... চিলমহরাম পাহাড়ে শিকার।... নিচে সুন্দরী এক মেয়ের ছবি, 'চঙ্গ'* বাজাচ্ছে মেয়েটি।... এ হল মির্জা উমরশেখের মেয়ে খানজাদা বেগম।

হীরাট থেকে ফিরে আসার পরে, আন্দিজানে মুল্লা ফজলুদ্দিনের কাজ আরম্ভ হয় উমরশেখের বাগানবাড়ি অলঙ্করণে। খানজাদা বেগম জানতে পারলেন প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁর দক্ষতার কথা এবং একদিন তাঁকে অনুরোধ করলেন নিজের প্রতিকৃতি এঁকে দেবার জন্য। সে অনুরোধ রাখতে হল গোপনে। বাবা মেয়ের এই খেয়াল জানতে পারলে বাধা দেবেন নিশ্চয়ই আর শিল্পীকেও এই সুন্দরী কর্ত্রীর খেয়াল মেটানোর জন্য ফল ভোগ করতে হবে।..

পরিচারকটির শেষ পর্যন্ত অল্প হুঁশ হয়েছে, ছাড়াছাড়াভাবে বলছে বাড়িতে এই হানা দেওয়ার ঘটনাটা। মুল্লা পরিচারকের কথা, প্রতিবেশির কথা আর নিজে চোখে যা দেখেছেন তা সব বিবেচনা করে বুঝলেন যে এই অপরিচিত লোকগুলো মোটেই সাধারণ চোর নয়। ওরা কারুর আদেশাধীন। কি খুঁজছিল ওরা এখানে? নকশাগুলো? সেগুলো তো নেয়নি, যদিও সেগুলো একেবারে ওপরেই ছিল। তার মানে, ছবিগুলো খুঁজছিল ওরা।... তার মানে ওদের পাঠাতে পারে সেই যে মুল্লা ফজলুদ্দিনের অঙ্কনপ্রতিভার কথা জানে। কোন অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে সে।

তাঁর মনে পড়ল বসন্তকালে একদিন আন্দিজানের প্রথমসারির একজন ধনী বেগ হাসান ইয়াকুব তাঁকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে এনে জাঁক করে বলল, 'হামাম তৈরি করতে চাই, সবার হামামের চেয়ে সেরা হয় যেন! সেই হামামে থাকবে গরমকালে গোসলের জন্য মর্মর বাঁধানো জলাধার...' তারপর গলা নিচু করে হাসান ইয়াকুব বলল, 'খুবসুরত বাঁদী কিনব বেশ কিছু: মোহরের কমতি হবে না আমার।... আর এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন যখন ঐ মেয়েরা স্নান করতে থাকবে

---

* এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। —সম্পাঃ

জলাধারগুলিতে আমি ছোট লুকান ঘুলঘুলি দিয়ে ওদের দেখতে থাকব, ঘুলঘুলিগুলো যেন সবার চোখের আড়ালে থাকে বুঝলেন?' বলে বেগ আত্মতৃপ্তি আর খুশির অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। 'আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি কাজ আরম্ভ করতে বলার জন্য। যত পারিশ্রমিক চাইবেন পাবেন!'

মুল্লা ফজলুদ্দিন স্থপতির পেশার পবিত্রতায় বিশ্বাস করতেন। বিরক্তিকর অনুভূতি গোপন করতে না পেরে এই 'অপবিত্র নির্মাণকার্যের' ভার নিতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

'অপবিত্রতার কি আছে?... হামাম তৈরি হবে আমার নিজের অর্থে!'

'অনেক মিস্ত্রী আছে হুজুর, যারা এমন ধরনের ঘুলঘুলি তৈরিতে হাত পাকিয়েছে, তাদের ধরুন বরং। আমাকে বাদশাহ্ হুকুম দিয়েছেন মাদ্রাসা তৈরি করতে। এখন আমি সেই নকশা তৈরির কাজে ব্যস্ত।... এবার আমায় যেতে দিন!...'

হাসান ইয়াকুব মুল্লা ফজলুদ্দিনের দিকে বাঁকা চাউনি হেনে বলল:

'ঠিক আছে!... কিন্তু যা আমি বলেছি তা যেন গোপন থাকে। নাহলে...'

'নিশ্চয়ই। আমাদের আলাপ এখানে আরম্ভ হয়েছিল, এখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আপনিও আমার ওপর নারাজ হবেন না হুজুর, বেশ ত?'

'নারাজ হবেন না...' তাও কি হয়! ঘাড়েগর্দানে হাসান ইয়াকুব এর বদলা নিলেন। এই বেগের হাত থেকে রেহাই পাবার দিন পনেরো পরে মুল্লা ফজলুদ্দিনের তাই মনে হয়েছিল, একদিন সন্ধ্যার আধোঅন্ধকারে তাঁর বাড়িতে এসে হাজির অন্য এক ধনী বেগ— আহ্মদ তনবাল। নির্জনে, কোন সাক্ষী না রেখে আহ্মদ তনবাল পকেট থেকে বার করে আনল এক থলি মোহর।

'এই মোহরের বদলে একটা ছবি এঁকে দিতে হবে আমায়।...'

'কিসের ছবি?'

আহ্মদ তনবালের বয়স ইতিমধ্যে পঁচিশ ছাড়িয়ে গিয়েছে, কিন্তু মুখে দাড়িগোঁফের কোন বালাই নেই এখনও। মাকুন্দ বেগ পাতলা ঠোঁট জোড়া মুল্লা ফজলুদ্দিনের কানের কাছে এনে ফিসফিস করে বলল:

'আমাদের বেগমের তসবীর চাই আমার!'

'কোন বেগমের?' সতর্ক প্রশ্ন ছুঁড়লেন মুল্লা ফজলুদ্দিন, 'খানজাদা বেগমের?'

'বাগানবাড়িতে বাদশাহের বারমহলের দেয়ালে নকশাকাজ করবার সময় আপনি তাকে প্রথম দেখেন তাই না?.. হ্যাঁ, খানজাদা বেগমকে? আপনার অনুপম প্রতিভার কথা বলতে বলতে তো উনি প্রেমাকুল হয়ে পড়েন...'

মুল্লা ফজলুদ্দিনের বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল, বুক ফেটে যাবে এখুনি। মাকুন্দটা টের পেয়ে গেছে নাকি?

'কে একথা বলেছে আপনাকে?... আমি স্থপতি... বাড়িঘরদোরের নকশা করতে পারি...'

'আমার কাছ থেকে লুকোবার দরকার নেই! শরীয়তের নিয়ম কে পালন করে বা না করে তা লক্ষ্য করার ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। জীবন্ত মানুষের তসবীর যারা করে তাদের দলে পড়ি না আমি। একথা কি সত্যি যে হীরাটে বাইসুনকুর মির্জার জন্য শাহানশাহ শাহরুখ যে প্রাসাদ তৈরি করেন, তা খুবসুরত যুবতীদের তসবীরে সাজানো? সত্যি?'

'সত্যি, কিন্তু... প্রত্যেক শহরে নিজস্ব বিধি প্রথা প্রচলিত। যদি খানজাদা বেগমের তসবীরের কথা আমাদের বাদশাহের কানে পৌঁছায় তাহলে কি হবে. সেকথা ভেবেছেন?'

'কারুর কানে যাবে না,' ফিসফিস করে বলল আহ্‌মদ তনবাল। 'কোন সাক্ষী নেই! বসুন তো দেখি! নিন মোহরগুলো, নিন!'

'তাড়াহুড়ো করবেন না হুজুর... কে আপনাকে বলল যে আমি মানুষের তসবীর আঁকতে পারি?'

'শুনেছি আমরা... লোকে জানে...'

'কার কাছে শুনেছেন? হাসান বেগের কাছে?..'

'হাসান ইয়াকুব সেকথা শুনেছেন এক মালীর কাছে..'

'তার মানে দু'জনে মিলে মতলব ভাঁজা হয়েছে,' ভাবলেন মনে মনে মুল্লা ফজলুদ্দিন। 'আমাকে হাতের পুতুল করতে চায়... এই মানুন্দ কোলাব্যাংটার জন্য বেগমের তসবীর আঁকব? মাথার গোলমাল হয়নি তো আমার এখনও!'

'হুজুর আহমদ বেগ, আপনার এই ভৃত্য যখন বাগানের নকশা আঁকে, তখন সেই নকশার এক কোণায় সাদাসিধে সেই মালীটিকেও এঁকে রাখতে পারে: স্থাপত্য শিল্পে বা পবিত্র কোরানের কোন নিষেধ নেই তাতে। কিন্তু খানজাদা বেগমের ছবি আঁকা? না, না, তা করার আমার কোন অধিকারও নেই আর ক্ষমতা বা সাহস কোনটাই নেই!'

'এক কথায়, আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করছেন? আমাকেও?!'

'দুঃখের কথা, অন্য কোন সম্ভাবনার কথা আর আসছে না। মাফ করবেন আমায়... আর মনে হয় এমন প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে আসাটাই এমন কি আপনার পক্ষেও বিপজ্জনক!'

'আমি অত ভয় করি না!' বলে রেগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আহ্মদ তনবাল, 'কিন্তু ভীরুদের কেউ কেউ তাদের এই ভীরুতার জন্য আফশোস করবে!'

সেই হুমকিটাই সত্যি হল এই অপরিচিত চারজন ব্যক্তির ডাকাতিতে।... নিরস্ত্র স্থপতির পক্ষে এমন বেগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে টিকে থাকা মুশকিল। শোনা যায় দুশ' জন গুণ্ডা রাখা আছে ওর। কিন্তু এসব জেনেশুনে চুপ করে থাকাও যায় না— একটা কিছু প্রতিকার না করলে ঐ বদ্ধপাগলটা হয়ত আরো কিছু নোংরাকাজ করে বসবে!

বিনিদ্র রজনী যাপনের পর সকালবেলায় মুল্লা ফজলুদ্দিন সেই ঘোড়াটায় জিন

চাপালেন যেটা তাঁকে উমরশেখ উপহার দিয়েছিলেন। ঘোড়ায় চেপে রওনা দিলেন আন্দিজানের নগররক্ষকের দপ্তরের দিকে। লম্বা, রোগা চেহারার নগররক্ষক স্থপতির কথা মন দিয়ে শুনছে না। কী করে আরো বেশি লোক এনে সৈন্যবাহিনীতে ঢোকানো যায়, শহরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরো মজবুত করা যায় উজুন হাসানের মাথা এখন সেই চিন্তায় ভর্তি। তাঁর দিকে ঝুঁকে থাকা স্থপতিকে ছাড়িয়ে ওপরে কোনদিকে যেন উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে অসতর্কভাবে বলে ফেললেন:

'মাফ করবেন, এখন এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় নয়।... মোহর খোয়া গেল দুঃখের ব্যাপার ঠিকই।... কিন্তু আপনার নকশাগুলো ছোঁয়নি, তার মানে এ হল শহরের বাইরের বনবাদাড় থেকে আসা চোরেদের কাজ। ওখানেই ওদের ডেরা। খোদার ইচ্ছায় ভালোয় ভালোয় যুদ্ধবিগ্রহ কেটে গেলে বনবাদাড়গুলোকে সাফ করে ফেলব চোর বাটপাড়দের তাড়িয়ে দিয়ে।... আর এখন, নিজেই দেখতে পাচ্ছেন, ওদিকে মন দেবার সময় নেই...' বলে দু'হাত ছড়িয়ে নিরুপায়তা বোঝাল নগররক্ষক।

মুল্লা ফজলুদ্দিন কাছে এগিয়ে এলেন, আবার কুর্ণিশ করলেন সসম্মানে:

'আমার সন্দেহ হয়, হুজুর,' নিচুস্বরে বললেন তিনি। তারপর সংক্ষেপে বললেন কেমন করে আহ্মদ তনবাল তাঁকে অনুরোধ-উপরোধ করেছিল মানুষের তসবীর আদায় করার জন্য, অথবা তসবীর এঁকে দেবার জন্য।

'তসবীর? কার তসবীর?' আগ্রহ হল নগররক্ষকের।

'হুম্... রূপকথার এক পরীর... আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, কার...'

'আপনার সিন্দুকে এমনি সব তসবীর ছিল বোধহয়? পরীর অথবা সত্যিকার মেয়েদের নাকি?... সেগুলো লুঠ হয়ে যায়নি তো?'

'এমন সব তসবীর আসবে কোথা থেকে হুজুর? আমাদের শাহ্ যে মাদ্রাসা তৈরির আদেশ দিয়েছেন তার নকশা আঁকার কাজে ব্যস্ত আছি আমি। চিত্রকলায় মন দেবার মত আমার সময়ও নেই আর প্রতিভাও নেই।... আর অবশ্যই ইচ্ছাও নেই হুজুর। সিন্দুকে ছিল শেষ না হওয়া কতকগুলো নকশা, হ্যাঁ ওগুলোই ছিল কেবল।'

'সেগুলো তো ঠিকঠাকই আছে?... তাই যদি হয় তাহলে মহামান্য আহ্মদ তনবালকে আপনি সন্দেহ করছেন কেন?'

পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল তারা কিছুক্ষণ, কেউ কোন কথা বলছে না।

'আমার বাড়িতে হানা দেওয়ার ঠিক কারণই আমি বলেছি হুজুর। এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে অনুরোধ জানাই আপনাকে!'

'আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে আহ্মদ তনবাল সুলতান বংশোদ্ভুত। আমাদের শাহের বড় বিবি ফতিমা সুলতান বেগম আহ্মদের আত্মীয়। এই তো ফতিমা বেগম ডেকে পাঠিয়েছেন বলে আজ ভোরবেলায় আহ্মদ তনবাল আমাদের রাজধানী আখসি রওনা হয়ে গেলেন।'

'মাকুন্দটা যদি আমার সিন্দুকের ছবিগুলো হাতে পেত হয়ত আখসিতে বাদশাহের হাতে আর নিজের বোন বড় বেগমের হাতে তুলে দিত সেগুলো,' এই চিন্তায় হাতপা ঠান্ডা হয়ে গেল ফজলুদ্দিনের। 'খালি আমার সর্বনাশ করার জন্যেই খানজাদা বেগমের ওই তসবীরের দরকার নাকি ওর?.. তাছাড়া কী? সুলতানের বংশোদ্ভূত। এখনও অবিবাহিত, এদিকে বিয়ের বয়স হয়েছে। 'শ্রদ্ধেয়' এই বেগটি বাদশাহের জামাই আর সুন্দরী বেগমের স্বামী হবার মতলব করেছে।'

মুল্লা ফজলুদ্দিনের মনে হল যেন সে মাকড়সার চটচটে জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। পালিয়ে যেতে হবে এই জাল থেকে, পালিয়ে যেতে হবে।

'হুজুর, আমাদের মেহেরবান বাদশাহ্ এখানে আন্দিজানে আমাকে আপনার হেফাজতে রেখেছেন যদি আপনি ঐ লুঠেরাদের সাজা না দেন, তাহলে আমাকে সোজাসুজি বাদশাহের কাছে নালিশ জানাতে হবে।'

'জনাব ফজলুদ্দিন, ভুলে যাবেন না যে আপনার আগেই বাদশাহের কাছে পৌঁছে যাবে আপনার প্রিয় সেই কথাগুলি যা আপনি প্রায়ই বলেন।'

'কী কথা, হুজুর?'

'কেউ কেউ... হুম্... এমনি ধরনের কথা বলতে ভালবাসে যেমন: রাজা-বাদশাহ্রা মানুষের মনে কোন ছাপ রেখে যায় না, রেখে যায় কবি, স্থপতি, শিল্পী।... কেউ কেউ বলে আর কেউ হয়ত শোনে... কবি, স্থপতিদের বন্ধুদের সঙ্গে আমাদেরও বন্ধুত্ব।'

আচ্ছা, তার মানে এখানে চারদিকে চরেরা কান পেতে আছে। কিন্তু ভয় পেয়েছি দেখালে খুব বিপদের হবে! তাই মুল্লা ফজলুদ্দিন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন:

'এ মিথ্যে অপবাদ! হুজুর, আমি এমন অনেক 'বন্ধু'কে জানি যারা আপনার নামেও অপবাদ দেয়! আপনি নিজেও সে কথা জানেন।... আন্দিজানে যত বাড়িই তৈরি করেছি আমি প্রতিটি বাড়ির ওপরেই ফুটিয়ে রেখেছি আমাদের শাহ মির্জা উমরশেখের নাম! দুর্গদ্বারের দিকে তাকিয়ে দেখুন আর একবার! বাগানবাড়ির প্রতিটি কক্ষে দেখুন! আমার নাম কি লেখা আছে কোথাও? তার মানে ইতিহাসে লেখা থাকবে আমার নাম নয়, লেখা থাকবে আমাদের বাদশাহের নাম— সেই নিয়েই আমার যত চিন্তা! ঠিক কি না? বলুন!'

উজুন হাসান দিশাহারাভাবে চুপ করে রইলেন।

'আর চোর-ডাকাতের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা না করে আমার নামে মিথ্যে অপবাদকে সমর্থন করছেন আপনি। হায় রে! আমি আপনার নামে নালিশ জানাব বাদশাহের কাছে!...'

এমন কথা বলা উচিত ছিল না। উজুন হাসান সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল।

'আমার নামে নালিশ করতে যাবেন?' মাথা উঁচু করে বলল। 'বেশ যান, নালিশ করুন! ভয় পাই না আমি আপনাকে। এই দুর্যোগের দিনে যখন তিনদিক থেকে শত্রু

আমাদের ওপর এসে চড়াও হয়েছে তখন বাদশাহের আর আমাদের দেশের প্রয়োজন জঙ্গী বেগদের, স্থপতির কোনই প্রয়োজন নেই এখন। আহ্‌মদ তনবাল আর আমি— এমন কয়েকজনকে ধরে রাখার জন্য আপনার মত জনদশেককেও তাড়িয়ে দেবেন বাদশা।'

'আখসিতে গিয়েই দেখা যাবে কাকে তাড়িয়ে দেন!' রাগে আত্মহারা হয়ে চীৎকার করে উঠলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন।

পিছন ঘুরে এমন ভাবে বেরিয়ে এলেন দপ্তর থেকে যেন তিনি এখুনি আখসি রওনা দেবেন। বাড়িতে অবশ্যই তাঁর রাগ জল হয়ে গেল: উজুন হাসানের কথা অপ্রিয় হলেও সত্য বটে। মির্জা উমরশেখ অবশ্যই একজন স্থপতির মান বাঁচাতে আসবেন না, পারবেন না (এমনি সময়ে!) বেগ আর তাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে যেতে। এরা হল আসল যোদ্ধা— সামরিক শিক্ষাহীন কৃষকদল নয় যাদের জোর জবরদস্তি করে তাড়িয়ে এনে সৈন্যদলে ঢোকান হয়। 'আর স্থপতির মত নিষ্কর্মাও নয়,' তিক্ত হাসি হাসলেন মুল্লা। তাহলে আহ্‌মদ তনবাল আজই পৌঁছে যাচ্ছে আখসিতে, প্রাসাদে, আর পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে উল্টোপাল্টা বকবক আরম্ভ করবে, বলবে যে মুল্লা ফজলুদ্দিন শাহজাদীর তসবীর এঁকেছে... তাদের পরিবারের বেইজ্জতি করেছে!

মুল্লা ফজলুদ্দিন পুরোপুরি বুঝতে পারলেন খানজাদা বেগমের অনুরোধ রাখতে গিয়ে নিজের কতখানি বিপদ ডেকে এনেছেন। তুলি-কলম হাতে তুলে নিয়ে অমন সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তাঁর কি সুখের অনুভূতিই না হয়েছিল তখন— কিন্তু সেই সৌন্দর্যের অধিকারিণীরও চরম বিপদ আসবে যদি এ ছবি অন্যের হাতে বা চোখে পড়ে।

কাঁপা কাঁপা হাতে মুল্লা ফজলুদ্দিন খানজাদার প্রতিকৃতিটি বার করলেন সিন্দুকের গোপন খোপ থেকে। ঐ হীন বেগগুলোর হাতে যেন কোন প্রমাণ না থাকে, নষ্ট করে ফেলতে হবে এ ছবিকে! আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে!

তুলি-কলমের সূক্ষ্ম টানে ফুটিয়ে তোলা ছবিটি। সেখান থেকে তাকিয়ে আছে অদ্ভুত একটি মেয়ে, যেন জীবন্ত একটি মেয়ে তাকিয়ে আছে, চুলার আগুনের আভায় তার দীর্ঘ আঁখিপল্লবগুলি যেন সামান্য নড়ছে, রক্তিম অধরে প্রশ্রয়ের মৃদু হাসি। খানজাদার মনমোহিনী সৌন্দর্য আবার স্থপতির হৃদয়কে যেন যাদুমন্ত্রে বশ করে ফেলল। 'ঐ মেয়েটির প্রেমে পড়েছি নাকি আমি?' ভাবলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন যুগপৎ সুখী ও বিস্মিত হয়ে। 'গরিব অভাগার শাহ্‌জাদীর প্রেমে পড়াটা হাস্যকর নয় কি? আর সেই অভাগা যদি পরে শিল্পী হয়ে ওঠে? না, না, আমি ভালবাসি আমার এই সৃষ্টিকে। এটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বেঁচে থাকলে এমনি আরো অনেক ছবি আঁকব!'

ছবিটা আগুনে ফেলার জন্য সামান্য ঝুঁকে পড়লেন। কিন্তু— ফেলা হল না। তাঁর মনে হল যেন আগুনের নিষ্ঠুর শিখা লেগে ছবিটার মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে উঠল। আগুনের কাছ থেকে লাফিয়ে পিছিয়ে গেলেন তিনি। জীবন্ত লোককে মেরে ফেলা, নিজের প্রিয়তমাকে আগুনে ফেলা কেমন করে সম্ভব?! তাঁর অন্তরের গভীর থেকে তিনি যেন শুনতে পেলেন ধমকানি আর হুমকি: 'কাপুরুষ তুই! ভীরু! তোর শত্রুরা তো এখনও তোর দরজায় ঘা দেয়নি এসে, আর তুই ইতোমধ্যেই এমন পাপ করতে উদ্যত হয়েছিস। নিজের কাছে মিথ্যা কথা বলার সাহস করিস না: এমনটি তুই জীবনে আর কখনও আঁকতে পারবিনা! এতে তুই কেবল বেগমের সৌন্দর্যই নয়, ফুটিয়ে তুলেছিস তাঁর কোমলতা, তাঁর অনবদ্য মাধুরী। এমন অনুপ্রাণিত সাফল্য দ্বিতীয়বার আসে না!.. যদি নিজেকে পুরুষমানুষ বলে মনে করিস তো একে বাঁচিয়ে রাখ্!'

মুল্লা ফজলুদ্দিন আবার সাবধানে লুকিয়ে রাখলেন ছবিটি সিন্দুকের গোপন খোপে। ভৃত্যকে কাছে ডাকলেন:

'জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘোড়ায় জিন দে দেরি না করে! এখান থেকে চলে যাব আমরা! আজই! এখুনি!'

এখন তিনি ভগিনীপতির বাড়িতে বসে, সেই সব ঘটনা বলবার সময় এমন কি আত্মীয়দের কাছেও গোপন করলেন যে তাঁর লোহার সিন্দুকে লুকান আছে খানজাদা বেগমের প্রতিকৃতি। কাউকেই জানাতে চান না তিনি এই গোপন কথা।

'হায় নসীব, নসীব!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তাহিরের বাবা। 'মুল্লা ফজলুদ্দিন, আপনিই আশাভরসা ছিলেন। আপনার যখন এমনি বদনসীব... বাদশাহ কি আপনাকে মদত দেবেন না?'

'যখন লড়াই শেষ হবে, আল্লাহের মর্জি হলে যদি আমরা বিজয়ী হই, তো তখন যাব বাদশাহের কাছে। আমার করুণ প্রার্থনায় যদি কান দেন তো ভাল আর যদি না দেন তো আবার চলে যাব হীরাটে! শুনেছি আলিশের নবাই এক চিকিৎসালয় নির্মাণের কথা ভাবছিলেন। আমাদের, স্থপতিদের কাছে এখন একটাই আশার আলো জ্বলছে সেখানে, যেখানে নবাই আছেন।'

'হীরাটই কেন? সারা দুনিয়ায় আপনার দাম দেবার জন্য শুধু হীরাটই আছে এমন নয়। ফরগানাতেও এমন লোক আছে যারা আপনার মূল্য বোঝে। আমরা কুভার বাসিন্দারা আজ পর্যন্ত সসম্মানে স্মরণ করি আপনাকে, ঐ পুলটা তৈরির জন্য।'

'কাল অথবা পরশু ঐ পুল পেরিয়ে চলে আসবে শত্রুর দল! যখন আমাদের মাথার ওপর নেমে আসা এই দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করি তখন মনে হয় জোর বর্ষা নেমে নদীতে বান ডাকুক— ভাসিয়ে নিয়ে যাক ঐ পুলটা! পুলটা যদি পুড়েও যায়

তাতে ওটার ওপর দিয়ে শত্রুরা এসে পড়তে না পারে তাহলে মনেপ্রাণে খুশি হব আমি!'

'সত্যিই তো,' এতক্ষণ চুপ করে শুনতে শুনতে তাহিরের মনে হল হঠাৎ, 'পুলটা কাঠের, তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিলেই হয়। শত্রুরা নদী পেরোতে পারে কেবলমাত্র ঐ পুল দিয়ে। পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যাবার মত অগভীর জল নেই কোথাও: আর চারদিকে কেবল জলাভূমি, নলখাগড়ার ঝোপ। যদি কাঠের পুলটা পুড়ে যায়...' হঠাৎ গরম বোধ হল তাহিরের— যেন আগুনের শিখার বেড়ের মধ্যে পুলটা ইতোমধ্যেই মড়মড় করছে। 'এই চালই লুকিয়ে রাখবে রাবিয়াকে!' বাবা আর মামার দিকে তাকাল তাহির। 'বলব নাকি ওদের? না! বাবা এমন ঝুঁকি নিতে চাইবেন না: আমি একমাত্র পুত্রসন্তান... মামা— বিদ্বান মানুষ, তাঁকে এসবের মধ্যে জড়ান উচিত নয়। অল্পবয়সী, বিশ্বাসী আর বেপরোয়া ছেলের দল তৈরি করতে হবে।'

আস্তে আস্তে উঠে তাহির উঠোনে বেরিয়ে গেল। তারপর ফটকের বাইরে।

এখনও জমে থাকা ভারী মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি তারা দেখা যাচ্ছে।, কোন বাড়িতে আলো দেখা যাচ্ছে না। চারদিক নিস্তব্ধ। এমনকি কুকুরের চীৎকারও শোনা যাচ্ছে না।

মাহ্‌মুদও ঐ সময়ই বেরিয়ে এল, যেন তারা দু'জনে ঠিক করেছিল যে এই সময়ে বাইরে বেরোবে। বোনকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কথা আরম্ভ হল।

'কেল্লায় থাকবে। আন্দিজানের কেল্লা বেশ মজবুত...'

'আরে এমন কিছু মজবুত নয়,' তার কথায় বাধা দিয়ে তাহির এখুনি মুল্লা ফলজুদ্দিনের কাছে যা সব শুনেছে তাড়াতাড়ি করে বলল সে সব কথা।

'হায় কপাল, বাঁচার কি কোন পথই নেই!'

'ওরে অনাথ, নিজেই নিজের জন্য প্রাণ দে, কেউ তোকে সাহায্য করবে না' এই প্রবচন তোর মনে আছে মাহ্‌মুদ'? চল তোদের উঠোনে গিয়ে ঢুকি। গোপনকথা গোপন রাখতে পারিস?' বলেই দুম করে বলে বসল, 'পুলটা জ্বালিয়ে দেব, শত্রুদের আটকাব এইভাবে, বুঝলি?'

তাহিরের কথায় মাহ্‌মুদের মনে প্রথমে সংশয় জাগল। পুলটা বিশাল, বৃষ্টির মধ্যে কাঠ জ্বলবে না। তা' ছাড়া পুলের ওপর পাহারাও আছে।

'ওই পাহারাদারগুলোকে দাঁড় করিয়েছে বেগরা। বেগদের পিছনে পিছনে ওরাও কেল্লায় গিয়ে ঢুকবে, দেখিস। কেউ আমাদের বাধা দিতে আসবে না— রাতের বেলায় জ্বালাব! তেল ঢেলে দেব, জ্বলে যাবে।'

'দাঁড়া, তাড়াহুড়ো করিস না। শুনেছি, আখসি থেকে আমাদের বাদশাহ্ আসছেন সৈন্যদল নিয়ে। তার মানে আমাদের নিজেদেরই প্রয়োজন হবে পুলটা!...'

'যদি তিনি সমরখন্দবাসীদের বাধা দেবার জন্য বেরিয়ে থাকতেন, তাহলে অনেক আগেই পৌঁছে যেতেন এখানে! কিন্তু তিনি কেল্লা ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন না... কেল্লাগুলোও সব হার মেনেছে, এই তো মার্গিলানও হার মানল। বলছি তো: নিজেই নিজের জন্য প্রাণ দে।'

'কী জানি: গাঁয়ের মোড়ল বলছিলেন, বাদশাহ্ আসছেন। 'আমাদের বাঁচাবার জন্য ছুটে আসছেন,' বলছিলেন।'

আমার বিশ্বাস হয় না!'

'আমার হয়!'

'আমার হয় না!'

আখ্সি

১

উঁচু টিলার ওপর নির্মিত আখসির কেল্লা রাতের অন্ধকারে কালো পাহাড়চূড়ার মত দেখাচ্ছে। টিলার পাদদেশে কাসানসাই এসে মিলেছে সির-দরিয়ার সঙ্গে— দূরে থেকেই শোনা যায় দুই পাহাড়ি খরস্রোতা নদীর ঢেউগুলি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে আর তীরে ধাক্কা দিয়ে ফাঁপা আওয়াজ তুলছে।

ফরগানার শাসক আর আখ্সি কেল্লার অধিপতি মির্জা উমরশেখ আজকের রাত কাটিয়েছেন হারেমে অষ্টাদশবর্ষীয়া কারাকুজ বেগমের শয়নকক্ষে।

রেশমী পর্দার আড়ালে পালঙ্ক আর পর্দার এপাশে একটাই মাত্র প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের ক্ষীণ আলো কাঁপছে যেন চারপাশের অন্ধকার দেখে সে ভয় পেয়েছে।

ভোর হবার অল্প আগে কেল্লার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল সানাইয়ের নিচু বিলাপসুরে। তারপর দুটি ঢাকের আওয়াজ যোগ দিল তার সঙ্গে। প্রতিটি মুসলমানকেই রোজা রাখতে হয়: বাদশাহ্ বা গোলাম প্রত্যেককেই শুনতে হয় এই সানাই আর ঢাকের আওয়াজ যা ঘোষণা করে যে সেহরীর সময় হয়েছে।

গ্রীষ্মের রাত দীর্ঘ নয়। ভোরের আগেই ঘুম থেকে ওঠা কষ্টকর। কিন্তু উপায় কি: সেহরী করতেই হবে।

কারাকুজ বেগম সাবধানে নেমে এল পালঙ্ক থেকে। উমরশেখ— নিদ্রাচ্ছন্ন, একটুও নড়লেন না, দু'পাশে দুটি বালিশ, শক্তিশালী হাত দুটি বেরিয়ে আছে রেশমী চাদরের নিচে থেকে।

শয়নকক্ষের দুটি ঘরের পরে এক অতি সুন্দর ও বিশাল ঘরে উমরশেখের জন্য অপেক্ষা করছে প্রচুর আহার্যে সাজান মেজ্। গতকাল ইফতারের পরে শাহ্ বলেছিলেন

আজকের সেহ্রীর সময়ে তাঁর তিন স্ত্রী এবং পুত্রকন্যারা সবাই যেন আসে। মির্জার প্রথমা স্ত্রী ফতিমা-সুলতান, দ্বিতীয় স্ত্রী কুতলুগ নিগর-খানুম, মির্জার সতেরোবছরবয়সী কন্যা খানজাদা বেগম এবং দশবছরবয়সী পুত্র জাহাঙ্গীর ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ না বাদশাহ্ নিজে আসবেন সেখানে, আহার্য মুখে না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আহার্যে হাত ছোঁয়াবে না।

ভোজনকক্ষ থেকে অন্দরমহলে শয়নকক্ষের দিকে যাবার নকশাকাটা দরজাটা খুলে গেল— বেরিয়ে এল তন্বী, সুন্দরী, অনতিদীর্ঘাকৃতি কারাকুজ বেগম। সসঙ্কোচে অভিবাদন জানাল জ্যেষ্ঠা দুই স্ত্রীকে, বলল বাহশাহ্র ঘুম ভাঙাতে সাহস হচ্ছে না তার।

কারাকুজ বেগমের যৌবন, দ্যুতিময় সৌন্দর্য আর লাজুকভাব ('লাজুকভাব? কে না জানে যে এই কচি মেয়েটিই এখন মির্জার প্রিয়তমা স্ত্রী?') মুহূর্তে ফতিমা-সুলতানের মিইয়ে যাওয়া ঈর্ষাবোধকে জাগিয়ে তুলল:

'আপনি আমাদের বাদশাহ্কে এমন গভীর ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন আর এখন সে ঘুম ভাঙাতে সাহস হচ্ছে না আপনার?'

কুতলুগ নিগর-খানুমের ভাল লাগল না এই খোঁচা দেওয়াটা। অমন করে বলার দরকার কী। তাও আবার ছেলেমেয়েদের সামনে?

'অমন করে বলবেন না ফতিমা-সুলতান, কারাকুজ বেগমের কোন দোষ নেই!' বলল সে।

খানজাদা বেগম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মা'র দিকে: 'সব দোষই কি তার আব্বাজানের?' বাবার আচার-ব্যবহার অত্যন্ত অদ্ভুত ঠিকই: যুদ্ধের বিপদাশঙ্কায় সবাই উৎকণ্ঠিত, আখসির দুয়ারে দুশমন হানা দিয়েছে, আর উনি কিনা স্বস্তিতে নিদ্রা যাচ্ছেন, একেবারেই... আর কত সময় কাটান হারেমে। কারাকুজ প্রায় তাঁর কন্যার সমবয়সী। ভাবলে লজ্জা হয়।

খানজাদা বুঝল বাবা যখন এখানে আসবেন সে তখন তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না।

'আমায় অনুমতি দিন ওয়ালেদা সাহেবা, আমি যাই... সেহ্রীর সময় হয়ে গেছে... আমি আমার সখীদের সঙ্গে...'

'যদি তোমাদের আব্বা জিজ্ঞাসা করেন খানজাদা বেগম কোথায়, কী উত্তর দেব আমরা? ওঁর মনে আঘাত দেওয়া হবে তাতে! অপেক্ষা কর মা, ব্যস্ত হয়ো না!'

পরিবেশিকা ভিতরে এসে নিচু হয়ে কুর্নিশ করে জানাল:

'আকাশের তারা মিলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। একটু বাদেই ভোর হবে। বাদশাহ্ কি সেহ্রী করবেন না তাহলে?'

সারাদিনে এক টুকরোও খাবার বা এক ফোঁটা জলও খাবেন না? গ্রীষ্মের এই দীর্ঘ

কষ্টকর দিনে স্বামীকে আহার্যপানীয় থেকে বঞ্চিত রাখা প্রকৃত পক্ষে নিজে আহার্যপানীয় থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর, কিন্তু স্ত্রীদের মধ্যে কোন্‌জন তাঁর ঘুম ভাঙাবে?

একমাত্র কারাকুজ বেগমই তা পারে। তার শয়নকক্ষেই রাত কাটিয়েছেন মির্জা, গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন তাঁর কাছে যাবার সেই দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সে। 'চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে নচ্ছার ছুঁড়িটা,' ভাবল ফতিমা-সুলতান। 'ভয় পাচ্ছে বেচারী,' ভাবল কুতলুগ নিগর-খানুম। পরিবেশিকা চোখে মিনতি ফুটিয়ে তাকাল কারাকুজ বেগমের দিকে, বলল...

'খোদা আপনাকে রুস্তমের মতই শক্তিশালী পুত্র দেবেন, বেগম সাহেবা!... আপনিই আমাদের আশা ভরসা।'

মুখের করুণভাবের পরিবর্তে দুশ্চিন্তার ভাব এল কারাকুজ বেগমের, ধীরে ধীরে পিছন ফিরে শয়নকক্ষে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

মির্জা উমরশেখ তখনও গভীর ঘুমে অচেতন। সোনার প্রদীপদানটা হাতে তুলে নিয়ে বেগম পর্দার আড়ালে গেলেন, দেয়ালের কুলুঙ্গীতে রাখলেন প্রদীপটা। প্রদীপের আলো সোজা এসে পড়েছে মির্জার মুখে। কিন্তু তাতেও তাঁর ঘুম ভাঙছে না— গতকাল সন্ধ্যায় উমরশেখ মাগজুন খান, তাতে অল্প আফিম মেশান হয়।

ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ফেলার ভয়ে কারাকুজ বেগম নরম স্বরে কিন্তু বেশ জোর দিয়ে বললেন:

'মালিক... হুজুর!.. জাগুন!'

পালঙ্কের কাছে নতজানু হয়ে বসল সে, কাঁপা কাঁপা কোমল হাত রাখল বাদশাহের চওড়া হাতের ওপর, উদ্বেগে দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। বিছানায় গোলাপের গন্ধ, কাল সন্ধ্যায় বিছানায় ছড়ান হয়েছে গোলাপের নির্যাস। এমন গভীর ঘুম দেখে কারাকুজ বেগম অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল স্বামীর মুখের দিকে। মুখ অল্প ফাঁক হয়ে আছে, পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে শান্তির ছোঁয়া। বদরাগী বাদশাহ্? না, না, সুন্দর, শক্তিমান পুরুষ, বয়স চল্লিশ ছোঁয়নি এখনও। তার স্বামী, তার মালিক, মহাবীর, তার ঘুমও মহাবীরের উপযুক্তই। প্রিয়তম। গতরাতের সুখানন্দের কথা মনে পড়ে তার সমস্ত নারীসত্তা লজ্জায় রাঙিয়ে উঠল। আর তখনি তার মনে হল প্রেম যেন কেমন... স্বল্পস্থায়ী একটা কিছু। শত্রুসেনা এগিয়ে আসছে এখন আখসির দিকে, কে জানে কাল তাঁদের কি হবে? কারাকুজ বেগমের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল— যেন মৃত্যু খুব কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে এমন এক পূর্বানুভূতি তাকে ছুঁয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে মির্জাকে চুম্বন করতে লাগল— চোখে, মুখে, হাতে।

কেঁপে উঠল উমরশেখ, ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল: কয়েক মুহূর্ত তন্দ্রাজড়িত চোখে রইল কারাকুজ বেগমের দিকে, যেন তাকে চিনতে চেষ্টা করছে।

কারাকুজ বেগমের বড় বড় চোখগুলি ভয়ে গোল হয়ে গেল: ঘুমন্ত স্বামীকে চুম্বন করেছে সে ঘুম ভাঙাবার জন্য! উনি সেটাকে অসম্মান বলে ভাববেন না তো?

'তুমি?' বলে আড়ামোড়া ভাঙলেন মির্জা, তারপর স্ত্রীর ভয়ের কারণ বুঝতে পেরে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কারাকুজ বেগম।

'মালিক সেহ্‌রীর সময় শেষ হতে চলল।'

'তোমার চুম্বন সব মিষ্টি খাবারের চেয়েও মিষ্টি। এদিকে এসো...'

'ওদিকে,' হাতের ইঙ্গিতে দরজার দিকে দেখিয়ে বলল কারাকুজ, 'সবাই আপনার অপেক্ষায় আছে।'

মির্জা উমরশেখ এবার পুরোপুরি জেগে উঠলেন। আজকের দায়দায়িত্বের কথা মনে পড়ল তাঁর। ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর, স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে কোন কথা না বলে নামলেন বিছানা থেকে।...

জরিবসান নরম বসার কম্বল বিছান ভোজনকক্ষে এসে ঢুকলেন তিনি প্রধান দরজা দিয়ে। সুন্দর পোশাক পরিহিত, গম্ভীর। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত। দামী দামী মুক্তাবসান উষ্ণীষ ও জরিবসান কোমরবন্ধেও তাঁকে আরো গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ দেখাচ্ছে। বরাবরের মতই সবাই কুর্নিশ জানাল, বরাবরের মত মেয়েরা চুপ করে রইল বাদশাহের আমন্ত্রণের প্রতীক্ষায়। কোন্ স্ত্রীকে কোন্ জায়গায় বসতে ডাকবেন উনি? এ হল দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।

তিনদিক থেকে শত্রু এগিয়ে আসছে ফরগানা উপত্যকার দিকে; আখসি কেল্লার অবরোধ হবার আশঙ্কা আছে। মির্জা উমরশেখ ঠিক করলেন তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে দেবার, প্রত্যেকের প্রতিই যথাযোগ্য মনোযোগ দেবার। প্রথম ও সবার চেয়ে দাম্ভিক স্ত্রী ফতিমা-সুলতান, তাকে মির্জা আহ্বান জানালেন নিজের পাশে বসতে। ফতিমার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, উমরশেখের ডানদিকে বসবে ভেবেছিল সে, কিন্তু মির্জা তাকে বাঁদিকে জায়গা দেখিয়ে দিলেন। আর নিজের ডানদিকে সবচেয়ে বেশী সম্মানের জায়গায় বসতে আমন্ত্রণ জানালেন কুতলুগ নিগর-খানুমকে। সেও অকারণে নয়: সিংহাসনের উত্তরাধিকারী জাহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবরের জন্মদাত্রী খানুম। রাগে চোখ কুঁচকে গেল ফতিমা-সুলতানের।

হরিণের মাংসের কাবাব, পাখীর মাংসভাজা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য উমরশেখের পরে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে কুতলুগ নিগরের দিকে তারপরই কেবলি ফতিমার পালা। টাটকা, নরম মাংস মুখের মধ্যে গলে যেতে থাকলেও ফতিমার বিস্বাদ লাগছিল— মনে হচ্ছিল যেন দ্বিতীয়বার গরম করে আনা হয়েছে।

সাদা হয়ে আসছে আকাশ। ভোরের আলো যত ফুটে উঠছে প্রদীপের আলোও ততই ম্লান হয়ে আসছে। আজানের সময় হয়ে গেছে। মসজিদের ইমাম মিনারের

ওপর উঠে বাদশাহের রন্ধনশালার তত্ত্বাবধানকারীর ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে: বাদশাহেরর সেহরী শেষ না হওয়া পর্যন্ত আজান আরম্ভ না করাই ভাল।

খাওয়া হয়ে গেলে চা পান আরম্ভ হল; চা পান করতে করতে মির্জা স্ত্রীদের বলতে পারতেন সরকারী কাজকর্ম কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে।

উমরশেখ বলতে আরম্ভ করার আগেই আজানধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। খানজাদা বেগম চা পান শেষ না করেই পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন তাড়াতাড়ি।

'শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলে-মিশে থাকা উচিত,' এই হল দানিশমন্দদের উপদেশ। ফতিমা-সুলতান, কুতলুগ নিগর-খানুম, কারাকুজ বেগম আর আমার সন্তানেরা, খানজাদা আর জাহাঙ্গীর,' নাম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করলেন মির্জা। 'আমরা প্রত্যেকে একই পরিবারের অঙ্গ। আমি চাই এই বিপদের দিনে তোমরা একে অন্যকে শ্রদ্ধা করবে, সাহায্য করবে। হাতের নির্দিষ্ট মূল্য আছে তার নিজের জায়গায়, চোখেরও মূল্য আছে নিজের জায়গায়, হাত বা চোখ যদি পরস্পরের কোন ক্ষতি করে তো সে ক্ষতি হবে সারা শরীরেরই আর তার ফলও ভোগ করতে হবে!'

সবাই বুঝল এই দুটি তীর কাদের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হল। ফতিমা-সুলতানের চোখ দুটি আরো সরু হয়ে গেল। কুতলুগ নিগর-খানুমের মাথায় তখুনি খেলে গেল একমাত্র পুত্র বাবরের কথা, যে আছে পিতামাতার থেকে দূরে— আন্দিজানে। মালিক তার নাম করলেন না কেন?

'মালিকের কথা মুক্তার চেয়ে মূল্যবান!' বলল সে। তারপর যোগ দিল, 'অনুমতি পেলে একটা প্রশ্ন করি...'

মাথা নাড়িয়ে অনুমতি দিলেন উমরশেখ।

'যুদ্ধের আশঙ্কা দেখছি বেশ ভয়ানক, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মির্জা বাবরের জন্য ভয় হচ্ছে, সে এখন আমাদের কাছে থাকলে কোন ভয় ছিল না...'

'আন্দিজানের কেল্লা মজবুত। আর মির্জা বাবর সেখানে থাকলে তা দুর্ভেদ্য। তার ওপর আমার অনেক আশা।'

খানুমের অনুরোধ রাখলেন না মির্জা। ফতিমা-সুলতান নিজের ছেলেকে কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। দেখুক শিয়ালী কে তাদের মধ্যে বেশি সুখী: তার ছেলে অন্তত মায়ের কাছে আছে, আর 'সিংহাসনের উত্তরাধিকারী...'

'মির্জা বাবরের মা মালিককে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে, উত্তরাধিকারী-পুত্রের উদ্দেশ্যে এত প্রশংসাবাক্য বলার জন্য।' বলে হঠাৎ কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল নিগর-খানুম। 'কিন্তু... এ কী করে হয়?.. এতটুকু ছেলে এখনও বারো বছর পূর্ণ হয়নি... লড়াইয়ের ময়দানে...'

'চিন্তা করার কোন কারণ নেই খানুম। মির্জা বাবরের কাছে রাখা হয়েছে আমাদের

সবচেয়ে ভালো বেগদের। ওর বয়স কম, যুদ্ধবিদ্যা ওর শেখা উচিত এখনই। যদি আমার মৃত্যু হয় আমার স্থান নেবে সিপাহসালার বাবর।'

বাদশাহের উনচল্লিশ বছর বয়স মাত্র। হঠাৎ তিনি মৃত্যুর কথা বললেন। হায়, এই যুদ্ধ! বিষণ্ণ হয়ে গেল মেয়েরা। একটু আগে বাবার সম্বন্ধে তার যেকথা মনে হয়েছিল তা ভুলে গিয়ে খানজাদা বেগম করুণ মায়াভরা চোখে তাকিয়ে রইল বাবার দিকে। উমরশেখ জোরে আর স্পষ্ট করে বলতে লাগলেন যাতে সবাই শুনতে পায় আর বুঝতে পারে:

'যদি যুদ্ধের ফলে বা অন্য কোন আকস্মিক ঘটনায় আমি এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে চলে যাই তবে তোমরা মির্জা বাবরের আদেশ মানবে আমার আদেশের মত করেই। মির্জা জাহাঙ্গীর! তুমি ঘুমোচ্ছ, নাকি?'

ছেলেটি চমকে উঠে সতর্ক হয়ে গেল, তারপর মুহূর্তে বুকে হাত রেখে বলল: 'শুনছি, মালিক!..'

'আমার এই কথাগুলো তুমিও মনে রাখবে! যদিও মির্জা বাবর তোমার থেকে মাত্র বছরদুয়েকের বড় কিন্তু যখন ও আমার জায়গায় আসবে তুমি হবে তার বিশ্বস্ত পুত্র।'

'যা আদেশ হয়, মালিক!'

সে পিতার কথার গোপন-গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বুঝতে পারল না, কিন্তু কথা শোনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। প্রথম দুই স্ত্রী ভয় পেয়ে গেছে— যে যার নিজের চিন্তাধারা অনুযায়ী। কারাকুজ বেগমের চোখে (স্বামীর মুখের থেকে দৃষ্টি সরাচ্ছিল না সে) চিকচিক করছে জল। তা দেখে উমরশেখের মনে পড়ল আজ ভোরবেলায় তাঁর যুবতী স্ত্রী তাঁকে চুম্বন করছিল, কিন্তু সেকথা মনে পড়ে কেমন যেন আনন্দ হল না তাঁর: 'চুম্বন করছিল— যেন মৃত স্বামীকে বিদায় জানাচ্ছিল,' মনে হল তাঁর। আর এখন তিনি যা বলছেন তাও যেন মনে হচ্ছে তাঁর অন্তিম নির্দেশ। উমরশেখের বুকের মধ্যে কেমন যেন ধকধক করে উঠল সতর্কবাণীর মত। 'এ আমার হল কী? মৃত্যুদূত এগিয়ে আসার খবর পেলাম নাকি? না, না!'

খানজাদা বেগম লক্ষ্য করল পিতার এই বিহ্বলভাব। সাহায্য প্রয়োজন ওঁর, তার সাহায্যের প্রয়োজন!

'মালিক, আপনার কন্যার ইচ্ছা খোদা যেন আপনাকে শেখ সাদীর দীর্ঘ জীবন দেন! একশত বছর বাঁচুন আপনি!'

'তোমার ইচ্ছা পূরণ হোক, মা!' মির্জা উমরশেখ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, যেন এই প্রথম বুঝলেন, কেমন বুদ্ধিমতী তাঁর মেয়ে, কেমন সুন্দরী হয়ে উঠেছে সে। 'নিজের হাতে তোর বিয়ে দিতে চাই আমি প্রথমে!'

এক সময় খানজাদার বিবাহের কথা উঠেছিল সমরখন্দের শাসকের পুত্র মির্জা

বাইসুনকুরের সঙ্গে। কিন্তু উমরশেখ এখনও সে প্রস্তাবে পাকাপাকি সম্মতি দেননি। আর এখন সমরখন্দের সঙ্গে যুদ্ধ লাগল পরিস্থিতি যদি কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অবশ্য বড় ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন তিনি এবং এভাবে যুদ্ধকে শান্তিতে পরিণত করবেন। খানজাদাও সেকথা বোঝে, তাই সেই সম্ভাবনায় সে আতঙ্কিত। তার স্বপ্ন কিন্তু অন্য। তাই সে আবার কথা ঘোরাল পুরান প্রসঙ্গে।

'যদি আমার ভাই বাবরকে আখসিতে ডেকে পাঠান সম্ভব না হয় তবে আমাকে আর আমার মাকে আন্দিজান যাবার অনুমতি দিন!' বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রস্তাব করল সে।

'তুই আমার ধনসম্পত্তির অমূল্য মুক্তা রে, মা। এই বিপদের দিনে তোকে আমি কাছছাড়া করতে চাই না!'

'তাহলে আমাকে একাই যেতে অনুমতি দিন মালিক!' আবার কুতলুগ নিগর-খানুম চনমন করে উঠল।

'আরের খানুম, ব্যস্ত হবার কি আছে? মার্গিলান থেকে দূতের অপেক্ষায় আছি আমি। যখনই যাওয়া সম্ভব হবে অনুমতি পাবে...'

চটপট নামাজ সেরে নিয়ে উঠে পড়লেন উমরশেখ, বেরিয়ে গেলেন হারেম থেকে। তখন মাথায় তাঁর কেবল যুদ্ধের চিন্তা।

হারেমে প্রবেশের অধিকার না থাকায় তাঁর দেহরক্ষীরা সারারাত বাইরেই অপেক্ষা করেছে। মালিকের চিন্তাধারায় ব্যাঘাত না ঘটাবার জন্য বা নিজেদের প্রতি মালিকের মনোযোগ আকর্ষণ না করার জন্য তারা নিঃশব্দে ও অলক্ষিতে মালিকের পিছু নিল।

২

ভোর হল। সূর্য ওঠার আগেই সিপাহসালার বেগরা আর দরবারের আমীর-ওমরাহেরা সবাই এসে জড় হয়েছে। চাপদাড়ি প্রধান উজীর বয়স ও পদমর্যাদা অনুযায়ী দামী জরির চাপকান এবং কোমরবন্ধ পরনে, সবার আগে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মির্জা তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে দূত এসে পৌঁছেছে।

'ইসফার থেকে হুজুর।'

আবার নতজানু হয়ে মুখ আড়াল করে কুর্নিশ করলেন।

'কী খবর?'

'গোলামের কসুর মাফ করবেন হুজুর...'

'হুম... তাহলে ইসফারাও দুশমনের কব্জায় এসে গেল!'

ভেতরে ভেতরে কেমন এক অস্বস্তিকর কাঁপুনি অনুভব করলেন উমরশেখ, জিজ্ঞাসা করলেন মার্গিলানের দূতের কথা।

'মার্গিলানের দূতের পথ চেয়ে আছি মালিক।'

মার্গিলানও কি হার স্বীকার করবে? তাহলে আন্দিজানেরও রক্ষা থাকবে না। দূত আসছে না কেন? শত্রুর ফাঁদে পড়ল নাকি? হয়ত মার্গিলানের বাসিন্দারাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

'আমাদের অন্য দূত পাঠাবার আদেশ হবে নাকি, মালিক?'

'তারপরে তাদের উত্তর নিয়ে ফিরে আসার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে? কত দিন অপেক্ষা করব?'

উজীর আবার কুর্ণিশ করল তারপর যেন মাফ চাইতে চাইতে পিছু হঠে গেল।

এবারে মির্জার কাছে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে গেল যে আখসির কেল্লার অবরোধ এড়ান সম্ভব নয়। ছয়মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার আদেশ দিলেন তিনি। কেল্লা উঁচু টিলার ওপর অবস্থিত হওয়ায় সেখানে জল বয়ে আনার কোন পথ ছিল না। সুঠামচেহারার, যে-কোন কাজেই চটপটে ত্রিশ বছর বয়সী কাসিমবেগকে মির্জা নির্দেশ দিলেন কেল্লার ভিতরে আরো একটি পাথরের জলাধার নির্মাণ করতে আর তারপর ভারির দল ডাকিয়ে জলাধারটি কানায় কানায় ভরে ফেলতে।

আমীর-ওমরাহেরা দেখলেন যে মালিকের মেজাজ খারাপ, তাই সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ পালন করতে আরম্ভ করে দিলেন। উমরশেখ নিজে ঘোড়ায় চড়ে অনুচরবৃন্দ নিয়ে কেল্লার বাইরে চলে গেলেন।

ঘোড়সওয়ার দলটি নদীর উঁচু পাড়ের ওপর নির্মিত পায়রার ঘরের দিকে চলল, নদীর খাড়া পাহাড়ের ওপর পায়রার ঘরের ঝুলন্ত বারান্দা। আখসি থেকে পাঠানো দূতেরা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, এবার ডাকপায়রাগুলিকে কাজে লাগাবেন ভাবলেন মির্জা।

মার্গিলান ও কোকন্দের পথজানা এই পায়রাগুলির ওপরই এখন সব আশা। তাদের ধরে, শান্ত করে তারপর ডানার ভিতর দিকে গোল করে পাকান চিঠিগুলো আটকে দেওয়া হল। মির্জা উমরশেখ নিজে হাতে পায়রাগুলিকে আকাশে উড়িয়ে দিতে ভালবাসতেন। আকাশী রংয়ের পায়রাটিকে সাবধানে হাতে তুলে নিলেন তিনি, তারপর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে পায়রার ঘরের ছাতে উঠলেন।

এখান থেকে চারপাশের এলাকাটা পরিষ্কার দেখা যায়। দূর পাহাড়ের ওপাশ থেকে সূর্য উঠে আসছে আস্তে আস্তে, তার রশ্মি পড়ে নিচে নদীর জল চিকচিক করছে। হালকা বাতাসের নরম স্পর্শ— মুখে যেন রেশমীকাপড় বুলিয়ে দিচ্ছে কেউ। মির্জা অনেকক্ষণ দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারলেন না সুদৃঢ় আখসি কেল্লা থেকে, কেল্লার নিচে প্রতিরক্ষার জন্য খোঁড়া গভীর পরিখাগুলি থেকে। 'ঐ পরিখাগুলো দুশমনদের লাশে ভরে উঠবে,' ভাবলেন তিনি।

কিন্তু তিনি বা তাঁর অনুচরদের কারুরই সন্দেহই হয়নি যে নদীর প্রবল জলধারা নদীর তীর ছুঁয়ে যেতে যেতে পাথর ক্ষয়ে গিয়ে পায়রার ঘরের ভিত একেবারেই ঝুরঝুরে করে দিয়েছে। পায়রাগুলি অনুভব করত এই বিপদের কথা। সুন্দর, পরিষ্কার খাঁচাগুলির মধ্যে তারা সারারাত ডানা ঝটপট করত আশঙ্কায়। এখন তারা পুষ্টিকর খাবার বা প্রচুর স্বচ্ছ জলের দিকে মন দিচ্ছে না, খাঁচার বেড়ি ঠুকরাচ্ছে উত্তেজিতভাবে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টায়। পায়রাগুলির তত্ত্বাবধানকারীরা আমীর-ওমরাহের প্রশ্নের উত্তরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানাল তাদের এমন অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ তারা জানে না। কেবল মির্জা উমরশেখের হাতে ধরা ঐ আকাশী রংয়ের পায়রাটাই স্বাভাবিক আছে।

উমরশেখ পায়রার ঘরের ছাতের একেবারে ধারে এগিয়ে গেলেন। এক মুহূর্ত পায়রার নরম ডানাটা ঠোঁটে চেপে ধরলেন, তারপর যেন পায়রাটি বুঝতে পারে এমনভাবে ফিসফিস করে বললেন, 'উড়ে যা আমার পাখিটি, মার্গিলান। ভাল খবর নিয়ে আয়...' পিছন দিকে গোটা শরীটা হেলিয়ে দিয়ে তাঁর ভরসার পাখিটিকে ওপরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, আপাতদৃষ্টিতে সামান্য এই ধাক্কাতেই পায়রার ঘরের কাঠের ছাত হেলে পড়ল আর মড়মড় করতে করতে নীচে ছুটে চলল, ক্ষয়ে যাওয়া ভিতটা সে পতন রুখতে পারল না। তীরের খানিকটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে জলধারায় মিশে গেল। পেছনের দেয়ালটা আর বসার দাঁড়গুলি ওপর থেকে নামতে লাগল। প্রথমে ধসছে আস্তে আস্তে, তারপর ক্রমশ জোরে, নামার পথে ধুলো উড়িয়ে উমরশেখের ভারীদেহও নিচের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চালের আড়াকাঠ, ভাঙা ইঁট পড়ার আওয়াজ, নদীর আওয়াজ সবকিছুর সঙ্গে মিলে গেল তাঁর মরিয়া চীৎকার আর সবার শেষে তিনি যা দেখলেন তা হল ধুলোর মেঘ ছাড়িয়ে পায়রাটির আকাশের দিকে উড়ে যাওয়া...

৩

তাঁর মৃতদেহ কেল্লার মধ্যে এনে স্নান করান হল, মুখমণ্ডল এমন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে যে চেনা যায় না, রেশমীচাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে মুখটা।

সেই বড় ঘরটিতে যেখানে তারা সবাই মিলে সেহরী করেছে ঘণ্টাদুয়েকও হয়নি, কুতলুগ নিগর-খানুমকে জড়িয়ে ধরে কারাকুজ বেগম অঝোরধারায় কাঁদছে।

'ও খানুম-আয়া, আমিই ওঁর মৃত্যুর কারণ হলাম! কেন, কেন আমি ওঁর ঘুম ভাঙাতে গেলাম?... হায়, হতভাগিনী আমিই ওঁর মৃত্যুর কারণ হলাম! আমিই!'

কুতলুগ নিগর-খানুমের মনে পড়ল আজ মির্জা ছেলের সঙ্গে কেমন অদ্ভুতভাবে কথাবার্তা বলছিলেন যেন, যেন তাদের সামনেই অন্তিম ইচ্ছাপত্র লিখছিলেন, মনে পড়ে তারও চোখ জলে ভরে গেল।

'আশ্চর্য নিজের মৃত্যুর কথা উনি বুঝলেন কী করে, এ্যাঁ? কেমন সব কথা বলছিলেন আজ!'

কারাকুজ গেম খানুমের হাত ছাড়িয়ে বসে দুলে দুলে ছোট ছোট হাতের মুঠি দিয়ে বুকে আঘাত করছে।

'আমার পেটের সন্তান জন্মানোর আগেই তার বাপকে হারালাম আমি, ও খানুম-আয়া,' করুণসুরে ফিসফিস করে বলল সে, 'উনি জানতে পারেন কেবল গতকাল সন্ধ্যাবেলায়, বললেন, 'ছেলে হয় যেন!..' ছেলে, ছেলে, ছেলে... তার বাপ এখন কোথায়? কোথায়?.. কেন, কেন আমি মালিকের ঘুম ভাঙালাম? আমি মরলেই তো বরং ভাল ছিল, ঐ খাড়া পাড় থেকে আমার পড়ে যাওয়াই তো উচিত ছিল!

'অমন করে বোলো না, বোন আমার!.. তোমার সন্তানের জন্যই তোমায় বাঁচতে হবে। আর খাড়া পাড়ের কথা বলছ? আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি খাড়া পাড়ের কাছে! আমাদের সবার সামনেই ভয়ঙ্কর খাড়া পাড়! হায় খোদা!'

স্বামীর এই মৃত্যু কেমন অদ্ভুত, রহস্যময় তাই না? মির্জা উমরশেখ সাহসী সিপাহসালার, জঙ্গী শাসক, কতবার খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে রণক্ষেত্রে ছুটোছুটি করে বেরিয়েছেন— তাতে তাঁর মৃত্যু হয়নি আর মৃত্যু হল কিনা নদীর পাড় ধসে পড়ে! এটা কি কেবলমাত্র আকস্মিক ঘটনা? এই ঘটনাটি দুর্ভাগ্যের লক্ষণ নয় কি? তাঁর বাপঠাকুর্দার প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্যটা তো খাড়া নদীতীরের কিনারে নির্মিত এক বাড়ির মতই? আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে দেশটা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে!... কুতলুগ নিগর-খানুমের কল্পনায় ভবিষ্যতের ছবিটা হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল। সারা শরীর কেঁপে উঠল তাঁর, কারণ তখুনি মনে হল একমাত্র ছেলে আদরের ধন বাবরের কথা। বাপের জীবন ভেসে গেল প্রচণ্ড জলস্রোতে। বাবরকেও কি নির্দয় ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নাকি?

'না, না, আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন!.. আমি চললাম বেগম,' কারাকুজের কাছে মাফ চাইলেন, 'আন্দিজানে দূত পাঠাব! আমাকে নিজেকেই ছেলের কাছে পাঠাতে হয়ে তার বাপের মৃত্যুর খবর!...'

মরহুম বাদশাহের দ্বিতীয় স্ত্রীর বিশ্বস্ত লোক কাসিমবেগ পৌঁছে দিতে পারবে দুঃখ আর আশঙ্কায় ভরা কুতলুগ নিগর-খানুমের চিঠি তার মা এসান দৌলত বেগমের হাতে, যিনি বাবরের সঙ্গে আন্দিজানের কাছে বাগানবাড়িতে থাকেন।

ঠিক সেই সময়, যখন কাসিমবেগ খানুমের চিঠিটা হাতে পেল, ঠিক তখনই ফতিমা-সুলতান কর্তৃক গোপনে প্রেরিত সুলতান আহ্মদ তাম্বাল ইতোমধ্যে সির-দরিয়ার সেতু অতিক্রম করেছে, দ্বিতীয় দূতের থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে। কারোর চোখে বিশেষ না পড়ার জন্য সে সঙ্গে নিয়েছে মাত্র একজন অনুচরকে, আর গতকাল আন্দিজান থেকে এসে পৌঁছেছে ষাটজন অশ্বারোহী সমেত। আজ ফতিমা-

সুলতান তাকে অনেক অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদি আহ্‌মদ তনবাল ফতিমার বিশ্বস্ত আমীর-ওমরাহদের মিলিত করতে পারে, তখ্‌ত থেকে মির্জা বাবরকে সরাতে পারে আর জাহাঙ্গীরকে তখ্‌তে বসাতে পারে, তাহলে... উমরশেখের দরবারে এত বছর ধরে সে দ্বিতীয় সারির আমীর হয়েই রয়ে গেল। হয়েছে— আর না! যদি জাহাঙ্গীর তখ্‌তে বসে তাহলে সুলতান আহ্‌মদ তনবাল হবে উজীরে আজম। আর বালক বাদশাহের উজীরে আজম হওয়া... নিজে শাসক হওয়ারই শামিল নয় কি? তখন... আর খানজাদা বেগমের তসবীরের পিছনে ছুটে বেড়াতে হবে না। খানজাদা বেগমকেই পাবে সে! এমন সুন্দরী মেয়ের মালিক হওয়ার চেয়ে সুখের আর কোন স্বপ্নই হতে পারে না আহ্‌মদ তনবালের কাছে।

পিছন ফিরে তাকাল সে, নিজের ফেলে আসা পথের দিকে। জনশূন্য সে পথ।

এর কয়েক ঘণ্টা পরে কেবল কাসিমবেগ রওনা দিল আখসি কেল্লা থেকে। মির্জা বাবরেরও সমর্থনকারী ছিল বেশ কিছু তাদের একজোট করে উত্তরাধিকারের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

আন্দিজান

১

আন্দিজানে এখনও সবকিছু শান্ত।

শহরের বাইরে উঁচু দেওয়ালঘেরা সুন্দর বাগানবাড়ির ফটকে সাধারণ প্রহরা বসান।

জোর 'যুদ্ধ' চলছে ঐ দেওয়ালের আড়ালে: বারোবছর বয়সী বাবর মির্জা মত্ত হয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিখছে। মাঠের ওপর দিয়ে জোর ছুটছে তার ঘোড়া, এবারে লাগাম ছেড়ে দিয়ে ধনুকের ছিলায় টান দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তীর ছুঁড়ল, ফাঁপা একটা আওয়াজ তুলে তীর গিয়ে বিঁধল চাঁদমারি হিসাবে ব্যবহৃত কাঠের তক্তাটায়।

একদল ঘোড়সওয়ার চিনারগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর যুদ্ধবিদ্যাচর্চার ওপর লক্ষ্য রাখছে। কালো ঘোড়ার ওপর বসে মজিদবেগ প্রথম এগিয়ে গেলেন চাঁদমারির দিকে। তিনি হলেন মির্জা বাবরের শিক্ষাগুরু। যখন বাবর নিজের জায়গায় ফিরে এলেন ওস্তাদ তাঁর দিকে ফিরে বললেন আবেগহীনভাবে:

'নিশানা ছিল ওপরদিকে,' তরুণ হতাশ হয়ে গেছে দেখে আবার বললেন, 'একটু ওপরদিকে ছিল কিন্তু তীরছোঁড়া অপূর্ব চমৎকার হয়েছে।'

কাঠের তক্তা থেকে তীরটা টেনে বার করে মজিদবেগ আঙুল দিয়ে মাপলেন কাঠের কতটা গভীরে তীরটা গিয়ে ঢুকেছিল, বাবরকে দেখালেন:

'আপনার হাতে বেশ শক্তি দেখছি, শাহজাদা! সিংহের থাবা! আমাদের শাহ্ আপনার নাম বাবর* অকারণে দেননি।'

মির্জা বাবরের সহচরেরা, অস্ত্রশস্ত্রবহনকারীরা আর খেলার সঙ্গীরা— সবাই তার সমবয়সী— এসে জড়ো হয়েছে চাঁদমারির কাছে। তারা জানত যে বাবরের বয়স এবং উচ্চতা অনুযায়ী তার ধনুক নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সবাই অবশ্য প্রশংসা করতে লাগল। বাবরও কিন্তু এসব কথা জানতেন:

'সিংহের থাবার জোর আমার আব্বার হাতে। নিজের চোখেই দেখেছি তাঁর তীর আমার তীরের চেয়ে দশগুণ বেশি শক্তিতে গিয়ে লাগে। তিনি একটা ঘুষি চালালে কোন শক্তিমান পুরুষই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।'

'আপনার হুকুমবরদার সেকথাই বলতে চাচ্ছে যে আপনার সিংহের মত শক্তি এই কারণেই যে আপনি ঠিক আপনার পিতার মতই!' সুকৌশলে কথার মোড় ঘোরালেন মজিদবেগ।

একটু মুচকি হাসল বাবর। কোন কথা না বলে চওড়া, হলুদের ছোঁয়ালাগা রোদেপোড়া কপাল আর ওপরের ঠোঁটের কাছ থেকে ঘাম মুছলেন।

'গরম বাড়ছে, শাহ্জাদা। রমজানের রোজার সময় শরীর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রাতের খাবার সময় আসার আগেই শক্তি ক্ষয় করে ফেললে চলবে না। ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া দরকার একটু। আপনার হুকুমবরদার এখন বিদায় নেবে আপনার কাছে— আন্দিজানের প্রতিরক্ষার প্রস্তুতির কাজ দেখা দরকার।...'

কিন্তু বিশ্রাম করতে ভাল লাগে না বাবরের। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটোছুটি, দুষ্টুমি করতে। যেই মজিদবেগ চলে গেলেন দুষ্টুমিতে তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল অমনি। ঘোড়া থামিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখে বাবর একজন সহচরকে কাছে ডাকল। যখন সহচরটি কাছে এল বাবর হাত বাড়িয়ে তার চাঁদকপালী বাদামী রংয়ের ঘোড়াটির পিঠের জিন পরীক্ষা করের দেখল— শক্ত করে বাঁধা আছে। তখন বাবর তাকে আদেশ দিলেন পঞ্চাশ পা দূরে চলে গিয়ে, ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে পেরিয়ে চলে যেতে।

বাবরের সহচর বন্ধুর দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিল ষোল বছর বয়সী নুয়ান কুকলদাস। সে আর বাবরের বোন এক মায়ের দুধ খেয়েই বড় হয়েছে। বাবর কী করতে যাচ্ছে তা আন্দাজ করে দুশ্চিন্তায় পড়ল সে:

'শাহজাদা, এখুনি আপনার এক অনুশীলনী শেষ হল। যথেষ্ট হয়নি কি? অন্যান্য কঠিন অনুশীলনী কালকের জন্য থাক না?'

'তাই হবে: কঠিন অনুশীলনী আগামী কালের জন্য থাক আর আজ সহজ

---

* 'বাবর' অর্থ সিংহ (আরবী)।

অনুশীলনীগুলি করা যাক!' হেসে উঠল বাবর। নিজের ঘোড়াটাকে দারুণ উত্তেজিত করে তুলল।

ঘোড়াটা কদমতালে ছুটতে লাগল, ধরে ফেলল বাবর সমানতালে চলতে থাকা অনুচরটিকে, পা ছাড়িয়ে নিল রেকাব থেকে, চাবুকটা দাঁতে কামড়ে ধরল আর যেই তার ধূসর ঘোড়াটা বাদামী ঘোড়ার পাশে এল অমনি হাত বাড়িয়ে বাদামী ঘোড়ার পিঠের জিনটা দুহাতে জাপটে ধরল, নিজের জিনটা থেকে লাফিয়ে উঠল।

অনুচরটির ঘোড়া ভয় পেয়ে এক লাফে পাশে সরে গেল। এক মুহূর্ত ঝুলে রইল বাবর, পাদুটো দারুণ জোরে ঠুকে গেল মাটিতে। কিন্তু জিনধরা হাতদুটো ধরেই রইল জিনটা (হাত তাঁর সত্যিই শক্তিশালী) জিন ধরে ঝুলেই রইল; অনুচরটি মুহূর্তে ছুটে এল ঘোড়া থামাল এক ঝটকায়। বাবরের পা মাটিতে অর্ধবৃত্ত এঁকে দিয়েছে; মাথা থেকে তার রেশমী উষ্ণীষ পড়ে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে, চাবুকটা তখনও দাঁতে ধরা! মুখটা কেবল ভীষণ মলিন দেখাচ্ছে। নুয়ান ঘোড়ায় চড়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে, ঘোড়া থেকে নামল লাফিয়ে, উষ্ণীষটি তুলে বাবরকে এগিয়ে দেবে ভাবল। কিন্তু বাবর ধুলোমাখা উষ্ণীষটির দিকে তাকালও না। চাবুকটা হাতে ধরল, সহচর ইতিমধ্যেই তাঁর ধূসর ঘোড়াটাকে ধরে এনেছে, কোন কথা না বলে চড়ে বসল।

ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে রাস্তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে গাছপালার মাঝখান দিয়ে ছুটিয়ে দিল।

বাগানের প্রান্ত যে পথটা চলে গেছে সাধারণত সে পথেই অশ্বারোহীরা যেত। কিন্তু বাবার গাছপালার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া পায়ে-চলা সরু পথ ধরে উড়ে চলল। ঘোড়া যখন জলবহা নালীগুলি লাফিয়ে পার হচ্ছিল তখন বাবরের মাথাটা খুবানিগাছের শক্ত ডালপালায় প্রায় আটকে যাচ্ছিল। কিন্তু বাবর ঝুঁকে পড়ে ঘোড়ার গলাটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সেসব পার হয়ে যাচ্ছিল। তার গায়ে ধাক্কা লেগে খুবানী খসে খসে পড়তে লাগল জলের মধ্যে।

'তুই ঘোড়াটাকে আরো শক্ত করে ধরলি না কেন রে বোকা!' ঘোড়া যে ধরেছিল সেই নোকরটিকে ধমক দিল নুয়ান। 'এখন আমাদের সবার ওপরেই রেগে গেছেন শাহজাদা! তোর জন্য আমাদের সবার কপালেই জুটবে, দেখিস!'

বাগানের মাঝে চমৎকার করে সাজান দরদালানের কাছে বাবরের ঘোড়া থামল।

ঘোড়াটাকে ধরবার জন্য একজন নোকর ছুটে এল, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর উষ্ণীষছাড়া মাথার দিকে। বাবর নিজের অজান্তেই লাল হয়ে উঠল। এখন নানী এসান দৌলত বেগম এমনি অবস্থায় তাকে দেখতে পাবেন, জানতে পারবেন কী হয়েছিল; ভৃত্য, সহচররা নিঃসন্দেহে শাস্তি পাবে কারণ ফরগানার বাদশাহ্ এই এসান দৌলত বেগমের ওপরেই দায়িত্ব দিয়েছেন বাবরকে চোখের মণির মতই আগলে

রাখতে আর সেইজন্যই দাসদাসীসমেত গোটা বাগানবাড়িটাই তাঁর আদেশাধীন করে দিয়েছেন।

বাবরের অনুগত ছেলেগুলি ও সহচররা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চলল দরদালানের দিকে। যখন বাবর বাড়ির ভিতর ঢুকল তখন তারা নামল ঘোড়া থেকে। নুয়ান কুকলদাস বাবরের উষ্ণীষ থেকে ধুলো ঝেড়ে হাতে করে নিয়ে যাচ্ছে সেটি। বাবর টুপি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে এল — এবার দিদিমা আর কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। তাঁর কাছে এগিয়ে আসা দলটির দিকে তাকিয়ে দেখল, যে নোকরটির হাত ছাড়িয়ে ঘোড়াটা লাফ দিয়েছিল সে বাবরের পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে গেল, কিন্তু বাবর তাকে তখুনি তুলে দাঁড় করিয়ে দিল, তারপর তাকাল নুয়ান কুকলদাসের দিকে। কী হাস্যকরভাবে সে উষ্ণীষটা ধরে আছে। — দু'হাতে সযতনে বইছে যেন এক দামী পাত্র। ভৃত্য-সহচরেরা ভাবছিল রাগে ফেটে পড়বে কিন্তু তার বদলে শুনতে পেল হাসি। মজা পেয়ে বাবর বাচ্চাদের মত সুরেলা গলায় হা-হা করে হাসছে মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে। নুয়ান কুকলদাসও এবার হাতেধরা উষ্ণীষটাকে অন্য চোখে দেখল, সেও হেসে উঠল। বুকের থেকে বোঝা নেমে গেল যেন তাদের। হাসতে লাগল বাকী সবাইও। হাসি থামিয়ে বাবর যার হাত থেকে ঘোড়া লাফিয়ে সরে গিয়েছিল সেই ছেলেটিকে বললেন :

'তোর কোন দোষ নেই ...'

ছেলেটি এমন উপহার পেয়ে সমানে কুর্নিশ করতে করতে পিছিয়ে গেল আস্তে আস্তে। বাবর এবার নুয়ানকে বললেন :

'নানী যেন কিছু না জানতে পারেন।'

'আমাদেরও তাই ইচ্ছা শাহজাদা,' খুশি হয়ে উঠল নুয়ান, বন্ধুদের দিকে চোখ টিপল।

সবাই তারা বয়সে তরুণ, সবাই বোঝে তরুণদের গোপন কথা কী বস্তু।

তাদের প্রায় সবার কাছেই লেখাপড়া করাটা অত্যন্ত অরুচিকর ব্যাপার ছিল।

বাবরের মনে পড়ে গলে আজ মুদার্‌রিস* পড়াতে আসবেন। তরুণ মির্জার মেজাজ আবার খারাপ হয়ে গেল।

২

এই বাগানবাড়ির ভিতরটা প্রাসাদের মতই—জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র, প্রচুর অলঙ্করণ আর দরজাতেও খোদাইকরা। এই বাড়িটির কেবল একটি ঘরই ভাল লাগত বাবরের। বাবর ঘুরে সেই ঘরটির দিকে চললেন যেখানে তাঁর প্রিয় গ্রন্থগুলি রাখা

* এখানে শরিয়তের শিক্ষক।

আছে যদিও ওদিকে মুদার্‌রিস তাঁর অপেক্ষায় আছেন। সোনাবাঁধান পাতাগুলি, মখমল আর চামড়ায় বাঁধাই এসবই মহান কবিদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ধরে রেখেছে বলে তার মনে হল। ফিরদৌসি, সাদী, নবাইয়ের শ'য়ে শ'য়ে বয়াৎ মুখস্থ বাবরের 'ফরহাদ-শিরীন' হাতে নিয়ে সে কল্পনার চোখে দেখতে থাকে দূর হীরাটে বাসবাসকারী আলিশেরকে। আন্দিজানের স্থপতি মুল্লা ফজলুদ্দিন, যিনি হীরাটে লেখাপড়া শিখেছেন, সোনার জলে কাজ করা, মর্মরপাথরের জলাধার সমেত এই বাগানবাড়ি নির্মাণের সময়ে মির আলিশেরের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কথা বলেছেন বাবরকে। হীরাট থেকে স্থাপতি নিয়ে এসেছিলেন নবাইয়ের প্রতিকৃতির একটি নকল, এটি সেই প্রখ্যাত বেহ্‌জাদ অঙ্কিত প্রসিদ্ধ প্রতিকৃতির নকল। মহান কবির প্রতি বাবরের প্রচণ্ড আগ্রহের কথা জানতে পেরে স্থপতি তাকে সেই ছবিটি উপহার দেন।

বিশালাকায় 'ফরহাদ-শিরীন' বইটির মধ্যে থেকে ছবিটি বার করল বাবর, শরীয়তের পাঠ যে খাতার মধ্যে লেখে তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

শরীয়তের পাঠ আরম্ভ হবার সময় হয়েছে।

বৃদ্ধ মুদার্‌রিস, তার ঘন ভ্রু, সাদা লম্বা দাড়ি দেহের মধ্যভাগে ছুঁয়েছে, পাঠকক্ষের মাঝখানে রেশমী গদীতে বসে আছেন। ফারসী ভাষায় ফিকাহের কানুন বুঝাতে আরম্ভ করলেন প্রথমে মুদাররিস। বাবর আরবী, ফারসী দুই-ই ভাল জানতেন, আইনকানুন সম্পর্কে তার আগ্রহ ছিল, কোরানের বেশ কিছু সুরা তার মুখস্থ ছিল, আবৃত্তি করতে ভালবাসত, কিন্তু এখন তার ভেতরে উদ্দামতা ফুটে বেরোবার চেষ্টা করছে, ফেটে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে প্রচন্ড শক্তি আর শিশুসুলভ চঞ্চলতা। অথচ চুপ করে বসে এই নীরস পাঠ শুনতে হবে তাকে। শোনার দরকারই বা কী — এমন ভাব দেখান যায় যে যেন শুনছে, আসলে ... ফরহাদের বীরত্ব সম্পর্কে বয়াৎ মনে করা যাক দেখি ...

পৌরুষ শিখতে চাও? শেখো তবে মরদের কাছে।

সতর্কভাবে, যাতে মুদার্‌রিস দেখতে না পান, বাবর খাতার ভিতর তেকে তসবীরটি বার করল। কালো, লম্বাঝুল চেকমেন পরে নবাই দাঁড়িয়ে আছেন সরু লাঠিটার ওপর সামান্য ভর দিয়ে, চোখের দৃষ্টিতে মায়াভরা। বাবর মনে মনে বললেন, 'হে আজীম আমীর, যদি আপনার সামনে দাঁড়াবার মত ভাগ্য হয় আমার... আর যদি ফরহাদের মত আমার পথে পড়া সমস্ত ড্রাগন আর ডাইনীদের জয় করতে পারি আমি... তাহলে কি আপনি আমাকে কাব্যের জগতে প্রবেশের পথ দেবেন?'

মুদার্‌রিস ধীরে ধীরে উঠে, অপ্রত্যাশিত দ্রুত এগিয়ে এলেন বাবরের দিকে। ছবিটি লুকিয়ে ফেলার সময় পেল না বাবর।

'ইনসানের তসবীর?' হুঙ্কার দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মুদার্‌রিস। 'সবক শেখার সময়ে? কুরান শরীফ আর হাদীসে মানা আছে।'

'মুদার্‌রিস সাহেব এই তসবীর... হীরাট থেকে আনা। দেখছেন, ইনি আজীব মীর আলিশের।'

মুদার্‌রিস নবাইয়ের শায়েরের কথা শুনেছেন, কিন্তু পড়েননি।

'ইনসানের তসবীর প্রচার, হায় শাহ্‌জাদা, এ যে শয়তানের উপযুক্ত ব্যবহার! দিন তো আমাকে ছবিটা, দিন দেখি!'

মুদার্‌রিস এমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যেন মনে হল ছবিটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলবেন এখুনি। বাবর বলল, 'না!' এমন জোর দিয়ে বলল যে শিক্ষকের ভয় হল ভাবী শাহ্‌কে রাগিয়ে দেবার। কিন্তু পাঠ বন্ধ করে তিনি এসান দৌলত বেগমকে নালিশ জানাতে গেলেন।

সদা মখমল পোশাকের খসখস আওয়াজ তুলে বছর পঞ্চান্ন বয়সের স্থূলকায়া এক মহিলা এসে ঢুকলেন পাঠকক্ষে। বাবর লাফিয়ে উঠে অভিবাদন জানাল নানীকে। এসান দৌলত বেগম সর্বনেশে ছবিটাকে হাতে তুলে নিলেন। সাগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগলেন সেটি।

'মির আলিশেরের মুখে দেখছি ফেরেশ্‌তার ভাব,' শিক্ষককে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন তিনি। তারপর পিছন ফিরে রেশমী রুমালের প্রান্ত দিয়ে মুখে ঢেকে বললেন: 'খোদাবন্দ মুদার্‌রিস, মুল্লাদের অনুমতিক্রমেই এই তসবীর আঁকা হয় হীরাটে।'

'মাফ করবেন মালকানী,' মুদার্‌রিস দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন মাটির দিকে চোখ নামিয়ে। 'ভাবী শাহ্‌কে জানাতে চাই যে পয়গম্বর মুহম্মদ, তাঁর পবিত্র নাম বেঁচে থাক, আমাদের দিয়েছেন খাঁটি ইসলাম ধর্ম, যা আছে কেবল মাভেরান্নহরে।'

এসান দৌলত বেগম বাবরের দিকে ফিরলেন :

'মুদার্‌রিস সাহেব অবশ্যই ঠিক কথা বলেছেন, ফিকাহ্‌ পাঠের সময়ে কোন ধরনের ছবি দেখাই শোভা পায় না। সময়ে খোদার ইচ্ছায় তুমি দেশশাসন করবে। ফিকাহ্‌ তোমার জানা উচিত আদ্যোপান্ত। আর ছবিটা... আমি নিজের কাছে রেখে দেব।'

বাবর কাকুতিমিনতি করে এক মুহূর্তেই ছবিটি আদায় করে নিল নানীর কাছ থেকে, আবার বইয়ের মধ্যে রেখে দিল সেটি।

'আমার স্বপ্নকল্পনা আপনার হাতে তুলে দিলাম,' এসান দৌলত বেগমের হাতে বইটি তুলে দিতে দিতে বলল বাবর।

নাতির কথা মনে ধরল নানীর।

'মির আলিশেরকে আন্দিজানে আমন্ত্রণ জানালে কেমন হয়?'

'তা কি সম্ভব?' বাবরের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'মির আলিশের সমরখন্দের আতিথ্য গ্রহণ করে সমরখন্দকে সম্মানিত করেছেন। আর ফরগানার সুনাম তামাম দুনিয়ায়। শুনেছি মির আলিশের শরীফ, ধার্মিক এক

কথায় একজন পাক ইনসান তিনি। যদি তিনি এখানে আসেন তো খুদাবন্দ মুদার্‌রিসও সে প্রমাণ পাবেন।'

মুদার্‌রিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবার। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেশ গম্ভীরভাবে বললেন তিনি, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই পূর্ণ হোক...'

৩

দ্বিপ্রহরে চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সবাই অধীর প্রতীক্ষায় আছে সন্ধ্যার। বিরাট বিরাট বাড়ির ধনী মালিকেরা এই সময়টা কাটায় ঠান্ডা ঘরে ঘুমিয়ে, এইভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণার হাত থেকে বাঁচে।

বাবরের ঘুম আসছে না কিছুতেই তার কাব্যিক চিন্তাধারা উত্তেজিত করে তুলেছে তাকে। একা ঘরে বসে কাগজকলম হাতে তুলে নিল সে। কবিতা লেখার চেষ্টা করল, কিন্তু অন্যদের লেখা কবিতা পংক্তিগুলি ছাড়া আর কিছু আসছে না মাথায়। তখন অন্য একটা খাতা খুলে ফরগানা উপত্যকার কথা যা জানে লিখতে আরম্ভ করল: 'এখানে আছে উঁচু পর্বতমালা আর অনেক শিকার। আখ্‌সি থেকে সামান্য দূরে মরুভূমি এলাকায় আমরা সাদা হরিণ দেখেছি। মার্গিলানের কাছাকাছিও আছে।' ফরগানা উপত্যকা কী অপরূপ! তার সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে পারলে কী ভালোই না হত! হীরাটে মির আলিশেরের কাছে লোকে তো কেবল কবিতা নিয়েই আসে না...

বাবর লেখায় এমন মগ্ন ছিল যে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল না। শুনতে পেল কেবল তখনই যখন অশ্বারোহী এসে থামল বাড়ির কাছে। কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধ বাড়ির কোন একটা ঘর থেকে নারীকণ্ঠে কান্নার সুর শোনা গেল। কেঁপে উঠে বাবর কাগজ থেকে মাথা তুলল। একী কী হল? যে মহলে এসান দৌলত বেগম থাকেন সেদিন থেকে আসছে কান্নার আওয়াজ। ক্রমশ বাড়ছে কান্নার আওয়াজ! বাবর তাড়াতাড়ি লাফাতে লাফাতে ছুটে চলল নানীর মহলের দিকে।

তাঁর শয়নকক্ষের দরজা খোলা হাট। প্রবীণ মহিলার মাথার আবরণ খসে পড়েছে। মেয়ে কুতলুগ নিগর-খানুমের চিঠিটা বারবার পড়ছেন আর নিজের অজান্তেই দলা পাকাচ্ছেন আবরণটাকে, চোখ জলে ভরে উঠেছে, লেখা কিছুই চোখে পড়ছে না।

যে সৈন্যটি আখসি থেকে মির্জা উমরশেখের মৃত্যুর খবর নিয়ে এসেছে, দাঁড়াবার আর শক্তি নেই তার, দেয়ালে হেলান দিয়েছে সে। একটুও না থেমে এতটা পথ এসেছে, প্রায় বিশ ক্রোশ পথ, ধুলোয় ঢেকে গেছে চোখের পাতা পর্যন্ত।

পিতার মৃত্যুর সংবাদ যেন গোলাপের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসা সাপের মতই,

বাবরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে ফোঁপাতে লাগল সে কাসিমবেগের দিকে তাকিয়ে। কাসিমবেগ শরীরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে এগিয়ে এল বাবরের দিকে নতজানু হয়ে বসল তাঁর সামনে। বুদ্ধ কণ্ঠস্বরে মিনতি:

'শাহ্‌জাদা! .. খোদা আপনাকে শক্তি দিন! এখন আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়! তিন দিক থেকে শত্রু আসছে।... আপনার জননী আদেশ দিয়েছেন... অবিলম্বে আপনাকে আন্দিজান যেতে আর বিশ্বস্ত বেগদের কেল্লায় ডেকে পাঠাতে! ...'

এসান দৌলত বেগম বুঝলেন এই বিপদের মুহূর্তে কর্তব্যকর্ম থেকে সরে থাকলে চলবে না, কাঁদবার সময় নেই এখন। কাসিমবেগকে বললেন:

'উঠুন ... আপনার বিশ্বস্ততার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। মির্জা বাবরের সঙ্গে যান। সবাইকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে, সবাইকে কেল্লায় যেতে হবে!'

বাবর যেন পাথর হয়ে গেছে। বিবাক্যব্যয়ে কোনরকমে পোশাক পরল, ঘোড়ায় উঠল। চারপাশে তাকাল একবার। এই ফুলফলেভরা গাছগুলি, এই জলভরা মর্মরপাথরে জলাধার এসবই তার পিতার তৈরী— এরাও যেন তাঁর শোকে কাতর— কোনদিনই তিনি আর আসবেন না এখানে। ঐ নাসপাতি গাছের চারাগুলি উমরশেখ নিজহাতে বসিয়েছিলেন; সেগুলি ইতোমধ্যেই ফলন্ত, কিছুদিনের মধ্যেই সে ফলগুলিতে পাক ধরবে; গাছগুলিকে যিনি বসালেন তিনি তাদের ফল কখনও চেখে দেখবেন না।

তাঁরা চলছেন পাথরবিছান রাস্তা দিয়ে, আবার বাবরের মনে হল তাঁর পিতার কথা: পাথর বিছান হয়েছে তাঁরই প্রচেষ্টায় তাঁরই আদেশে। আর দূরে দৃশ্যমান কেল্লাটাও তাঁর তৈরী। তিনি তো আর নেই। নেই, নেই! এবার সে পুরোপুরি বুঝল যে আর কখনও পিতাকে দেখতে পাবে না এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। হঠাৎ তার দুচোখ জলে ভরে গেল জল নেমে এল তার বুক ভেঙে দিয়ে আর একই সঙ্গে হালকা করে দিয়েও।

যখন কেল্লার কাছাকাছি পৌছল তারা (গভীর পরিখাগুলি, দেওয়াল উঁচু; এগার স্তর ধাপ যান্ত্রিক ভাবে গুনল বাবর), কেল্লার প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে এল পাঁচজন অশ্বারোহী। সবার সামনে ধূসর রংয়ের ঘোড়ায় চড়ে আসছে ছোট ছোট চোখ, মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখওয়ালা এক বেগ (বাবর জানত যে ইনি মায়ের দিক থেকে একজন আত্মীয়)। বাবরের কাছে এসে শেরিম তাগাই বাবরের মুখে শোকের ছাপ দেখে লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। চোখে জল বেরোল না, কিন্তু আর্তনাদ করে উঠল:

'বিশ্বাস হচ্ছিল না, কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না শাহ্‌জাদা! তার মানে একথা সত্যি যে আমাদের আর কোন আশাভরসা নেই।... হায় কী নিষ্ঠুর এই দুনিয়া!'

'কোথা থেকে শুনলেন?' জিজ্ঞাসা করল কাসিমবেগ।'এখবর এখনও গোপন থাকারই কথা।'

শেরিমবেগ জামার গলার কাছটা আঁকড়ে ধরে বলল:

'খোদা যে কীভাবে কী করেন তা সবারই অজানা।... আমার একটা ডাকপায়রা উড়তে উড়তে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল। 'কে ওকে নামাল?' এই ভেবে দেখব বলে ছাতে উঠলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে পায়রাটা উড়ে এস বসল আমার কাছে। ডানার নীচে তার এক টুকরো কাগজ সেটা নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়ে দেখি এই খবর লেখা। কে লিখেছে জানি না, হয়ত কোন ফেরেশ্‌তা।'

শেরিমবেগ বাবরের কাঁধে হাত রেখে মুখ কাছে এনে আস্তে করে বলল:

'মির্জা, কেল্লার ভিতরে যাবেন না, বিপদ আছে।'

কাসিমবেগও সেকথা শুনতে পেল। উমরশেখের জীবিতকালে শেরিমবেগ উঁচু পদমর্যাদার অধিকারী হতে পারেনি তাই মনখারাপ করে ঘুরত। এখন সবার আগে মির্জা বাবরকে সাহায্য করে তার বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করছে পদোন্নতির জন্য। সেকথা বুঝে কাসিমবেগ শান্তসুরে বললঃ

'শাহ্‌জাদা, বিপদের মুখোমুখি হবার আগেই ভয়ে কাতর হব না আমরা। তাড়াতাড়ি করে কেল্লায় ঢোকা উচিত আমাদের, যাতে বেগদের জড় করতে পারা যায়।'

মাটিতে দাঁড়িয়ে অশ্বারোহীর সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব বলে মনে করে শেরিমবেগ। ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠে সে নিষ্ঠুর সুরে বলল :

'আপনি এখনও জানেন না কী ঘটছে, খোদাবন্দ কাসিমবেগ। আপনাদের বিশ্বস্ত বেগরা দুশমনের হাতে তুলে দিয়েছে খজেন্ত! ইসফরা গেছে! মার্গিলানও!'

'মার্গিলান?' চীৎকার করে কেঁপে উঠল বাবর। 'কবে?'

এখুনি খবর এসেছে! দুশমন যেন শরতের মেঘের মত নেমে আসছে দুনিয়ার ওপর! কুভার দিকে এগিয়ে আসছে তারা। এবার আন্দিজানের পালা।... আপনার কি এই ইচ্ছা যে আপনাদের বিশ্বস্ত বেগেরা মির্জা বাবর-সমেত আন্দিজান কেল্লা দুশমনের হাতে তুলে দিক? না! যতক্ষণ আমি বেঁচে ...

শেরিমবেগ বাবরের কাছে এগিয়ে এসে তাঁর ঘোড়ার লাগামটা ধরল: 'আমি আপনার মামা হই, শাহ্‌জাদা, আমি আপনার অনুগত, আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে অনুমতি দিন!'

শেরিমবেগ কী বলছে বাবর কিছুই বুঝতে পারছিল না কিন্তু শোকার্ত প্রাণ বন্ধ কেল্লার হাঁফধরা পরিবেশ থেকে খোলামেলা জায়গায় যেতে চাচ্ছে। তাই বাবর কোন প্রতিবাদ করলেন না। কাসিমবেগ কিন্তু আবার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন:

'শাহ্‌জাদা, আপনাব মাতৃদেবী ওয়ালিদা সাহেবো কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য আদেশ দিয়েছেন।....'

'কুতলুগ নিগর-খানুম তো আর সিপাহসালার নন!' জেদীভাবে বাবরের ঘোড়াকে ঘোরাতে ঘোরাতে কাসিমবেগের কথার মাঝখানেই শেরিমবেগ বলল।

কাসিমবেগও কম জেদী নয়, সেও বাবরে কাছে এগিয়ে এসে বাবরের ঘোড়ার ঘাড়ে হাত রেখে বলল:

'আপনার ওয়ালিদা সাহেবা আমাদের মালিকা আজ বাদশাহের দাফন হয়ে যাবার পরেই আন্দিজান পৌঁছে যাবেন। আপনার নানীও কেল্লায় চলে আসতে চেয়েছেন। ওঁরা আপনাকে কি করে খুঁজে পাবেন?'

বাবর এবারে চেতনা ফিরে পেল খানিকটা। শেরিমবেগকে জিজ্ঞাসা করল:

'কোথায় যাব আমরা?'

শেরিমবেগ কানে কানে বলল:

'আলাতাউর দিকে। ওশ হয়ত বা উজগেন্দ।'

বাবর কাসিমবেগের কাছ থেকে গোপন করতে চাইল না এই পথের কথা নীচুসুরে তাকে বলল :

'ওশের কাছাকাছি কোথাও। ওয়ালিদা সাহেবাকে বলবেন।'

'প্রথমে আমি কেল্লার বেগদের সঙ্গে কথা বলে দেখব, শাহ্জাদা, ওরা কী ভাবছে।'

'আমার ওস্তাদ খাজা আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করাই উচিত হবে আপনার।'

'যে আজ্ঞা!'

কাসিমবেগ ঘোড়া ছোটাল কেল্লার দিকে।

৪

তাদের এই আলোচনা কেল্লাপ্রাচীরের খাঁজে চোখ রেখে লক্ষ্য করছিল মোটা গাঁট্টা-গোট্টা এক সিপাহী। যখন কাসিমবেগ দ্রুত রওনা হল কেল্লার ফটকের দিকে তখন নোকরটি ধীরেসুস্থে পাঁচিল থেকে নেমে তার মনিব আহ্মদ তনবালের কাছে চলল...

বিশাল খুবানীবাগানের মাঝে গম্বুজওয়ালা, টালিবসান এক হামাম। বাগানের মালিক ইয়াকুববেগ উত্তপ্ত গ্রীষ্মের দিনে এর একটি ঘরে বিশ্রাম করতেন। ঘরের ভিতরটা রাজপ্রাসাদের অতিথিশালার মত করে সাজান। সেই ঘরে সম্মানের আসনে এখন বসে আছেন আহ্মদ তনবাল।

বড় শুকনো কুমড়োর খোল থেকে বনগোলাপ আঁকা পেয়ালায় কুমিস* ঢেলে খেয়ে নিয়ে সে ঘোঁত ঘোঁত করল।

'আল্লাহ্ গুনাহ্ মা'ফ করবেন, আজকের রোজা ভঙ্গ করতে হল,' স্বাভাবিক সুরে বলল সে। 'পথে আসার সময় তেষ্টায় জিভ তালুতে ঠেকে গিয়েছিল একেবারে। আর একটু হলে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম ঘোড়া থেকে।'

---

* কুমিস — ঘোড়ার দুধে তৈরী এক ধরনের পানীয়।

'এখন কোন গুনাহ্ হবে না আপনার,' বলে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন ইয়াকুববেগ। 'যখন অতি প্রয়োজন তখন কোন দোষ হয় না।... আপনি একটা মস্ত কঠিন কাজ করতে যাচ্ছেন। যদি আপনি সফল হন আর মির্জা জাহাঙ্গীর তখ্‌তে বসেন তবে আপনি হবেন তার সবচেয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তি। উজীরে আজম, তাই না?'

আহমদ তনবাল ভেতরে ভেতরে সুখে গলে যাচ্ছিল নিজের এমনি ভবিষ্যতের কথা ভেবে। স্থূলকায় ইয়াকুববেগের মুখে মৃদু হাসি। মুখে সামনের দুটো দাঁত নেই—হাসিটা আরো হাস্যকর দেখাল। আর চোকে যেন জিজ্ঞাসা, 'তখন তুমি ভুলে যাবে নাকি যে এই ভয়ঙ্কর খেলায় আমিও হাত লাগিয়েছিলাম?'

সতর্ক হয়ে গেল আহমদ তনবাল।

'বেগ সাহেব, আপনি আমি দু'জনেই মোগল**। ফরগানা বারলাসদের*** প্রভুত্ব ঘুচিয়ে দেবার সময় এসেছে। এবার আমাদের পালা। আমাদের মোগল বেগদের মধ্যে আপনাকেই সবার বড় বলে মনে করি আমি। যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় উজীর হই আমি তো আপনি হবেন আমার একমাত্র বন্ধু ও উপেদেষ্টা।'

'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ হোক!' সন্তুষ্টভাবে বলে ইয়াকুববেগ নিজের ছোট করে ছাঁটা দাড়িতে হাত বুলাল।

আহমদ তনবাল পেয়ালাটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিল তারপর দরজার দিকে ফিরে কান পেতে শুনল।

নোকর ভিতরে ঢুকে কুর্ণিশ করল।

'বখশিশ দিন, মালিক, বখশিশ!' বলল সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। 'মির্জা বাবর কেল্লায় ঢোকেননি, অন্য দিকে চলে গেছেন।'

'শেরিমবেগের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

আহমদ তনবালের কাছে একটা খুশিরই খবর। চামড়ার থলি থেকে একটা মোহর বার করে দরজার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। গাঁট্টা-গোট্টা ভৃত্যটি মোহরটি চটপট তুলে নিয়ে চালান করে দিল জামার ভিতর। আবার কুর্ণিশ করে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর আহমদ তনবালের ইঙ্গিতে দরজাটা শক্ত করে বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আন্দিজানে পৌছে আহমদ তনবাল প্রথমেই এসে উঠেছে ইয়াকুববেগের কাছে। কিন্তু মির্জা উমরশেখের মৃত্যুসংবাদ প্রথম তাকেই দেয়নি, দিয়েছে শেরিমবেগকে। শেরিমবেগ ব্যস্তবাগীশ আর অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। একটু বোকাসোকা গোছের।

** মধ্য এশিয়ার তুর্কী ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী। বর্ণিত সময়ে তাশখন্দের আশপাশের এক বিশাল ভূখণ্ড তাদের অধীনে ছিল।

*** এক তুর্কী ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী। তৈমুর লং বারলাস ছিলেন। বাবরও।

আহ্‌মদ তনবাল নিজে আড়ালে থেকে পায়রা দিয়ে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিল তাতেই বিশ্বাস করে বসে রইল।

'আপনার উপদেশ অনুযায়ী ছকা মতলব দারুণ ফল দিয়েছে,' বাড়ির মালিকের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়ে বলল আহ্‌মদ তনবাল।

'হ্যাঁ, শেরিমবেগ এবার তার ভাইপোকে ভাল করেই 'বাঁচাবে বিপদের হাত থেকে'। বাবররে বিশ্বস্ত বেগ হবার জন্য প্রাণপাত করবে, আলাতাউয়ের ওপাশে নিয়ে যাবে তাকে, আল্লাহ্‌র দোয়া ...'

'এবার আমরা ... এবার... লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দেব বাবরের পালিয়ে যাবার কথা।... বিপদ দেখে পালিয়েছে। লোকেরা জানুক, এই বিপদের দিনে বাবর আন্দিজান ছেড়ে পালিয়েছেন। এরপরে... এরপরে মির্জা জাহাঙ্গীর তখ্‌তে বসবেন।'

ইয়াকুববেগ দাড়িতে হাত বুলিয়েই চলেছে।

'গুজব ছড়ানর সব থেকে উপযুক্ত জায়গা হল বাজার,' বলল সে। 'এ জন্য উপযুক্ত কয়েকজন ব্যাপারী আছে আমার, তারাই বলবে।'

'ঠিক, কিন্তু কেউ যেন না জানে যে গুজব ছড়াচ্ছি আমরা।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, আহ্‌মদ বেগ। আমরা গোপন কথা গোপন রাখতে জানি।...

আন্দিজানের লোকেরা এমনিতেই একটার পর একটা দুঃসংবাদের গুজবে অস্থির। শত্রুদের ক্রমশ এগিয়ে আসার সংবাদে সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত, আর যেখানে আশংকা সেখানেই গুজব। লোকে কানাকানি করছিল, 'বাদশাহ্‌ খাড়াপাড় থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন, আজ কালের মধ্যে শত্রু দখল করে নেবে শহর।' তারপর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, 'মির্জা বাবর কাপুরুষ, পালিয়েছেন, আমাদের ভাগ্যের হাতে ফেলে।' বেচাকেনা যখন খুব জমজমাট ঠিক সেই সময় একের পর এক বন্ধ হয়ে যেতে লাগল বাজারগুলির দোকানের সারিগুলি। কোথা থেকে আসছে খবর তা কেউ জানে না কিন্তু তারা শুনছে, অন্যদের বলছে, বলার সময় আরো কিছু ভয়ঙ্কর খুঁটিনাটি যোগ করছে। শেষ অবধি শোনা যেতে লাগল যে আখসি কেল্লার পতন হয়েছে, বাদশাহ্‌কে খাড়াপাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। গুপ্তচরেরা তাড়াতাড়ি নগরপালকে জানাতে চলল আজ নতুন কি কথা শুনেছে।

বেগরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। কাসিমবেগ বাদশাহের মৃত্যুর খবর আনতে তারা শত্রুভয়ে আরো ভীত হয়ে পড়ল। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনায় তারা যুদ্ধের কথা আর চিন্তা করতে পারছে না। উলটোপালটা গুজবে নগরপাল উজুন হাসানের মাথা ঘুরছে। বাজে গুজব কিন্তু কে বলতে পারে...

বেগরা সমবেত হতে লাগল কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না।

'আমাদের সুখের দিন শেষ হল এবার,' কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল নগরপাল। 'কেল্লার বাইরে দুশমন আর ভিতরে গোলমাল। কিছুই জানি না আমরা, কিছুর জন্য

প্রস্তুতও নই।... মির্জা বাবর যে কেল্লায় না ঢুকেই চলে গেলেন তা অমনি অমনি নয়।'

'আমাদেরও পালিয়ে যাবার দরকার নাকি?' ব্যঙ্গ করে বললেন মওলানা আবদুল্লা।

খাজা আবদুল্লার খ্যাতি ছিল তাঁর কালো চুল আর গভীর জ্ঞানের জন্য। আন্দিজানের বেগদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রভাবশালী পীর। মির্জা বাবর নিজেকে তার মুরশিদ বলে মনে করত, তাই উজুন হাসান কালো দাড়িওয়ালা খাজার কথা কোন অশিষ্ট উত্তর দিতে পারলেন না। চুপ করে গেলেন।

'মির্জা বাবর আন্দিজান থেকে বেশি দূরে চলে যাবার আগেই ফিরিয়ে আনতে হবে তাঁকে', বলল কাসিমবেগ।

'মির্জা বাবরকে আমি বেশ ভালই বুঝতে পারি,' সমবেত সবার দিকে চোখ ঘুরিয়ে বললেন খাজা আবদুল্লা। 'না, না, তিনি ভয়ে পালাননি, তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন আমাদের তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাবার জন্য। আর বাজারে গুজব ছড়ান হচ্ছে গোলমাল বাধাবার জন্য দাঙ্গাবাজরা গোলমাল বাধাতে চাচ্ছে। তাদের থেকেই বাজারের লোকেরা বাদশাহের মৃত্যুর খবর আমাদেরও আগে জেনেছে।'

ঠিক, ঠিক! দারুণ বিস্মিত হয়ে গেল উজুন হাসান, খাজা আবদুল্লা এখানে তাদের মধ্যে বসে মির্জা বাবরের চিন্তাধারা অনুমান করতে পারছেন। প্রকৃতই পয়গম্বর এই খাজা!

'আমাদের পীরের কাছে দেখছি সবই পরিষ্কার!' উজুন হাসানের স্বরে গভীর শ্রদ্ধা।'মওলানা যা বলেন আসুন আমরা তাই করি।'

'আমি বুঝতে পারি,' গলা নামিয়ে বললেন খাজা আবদুল্লা, 'সবাই একজোট হয়ে মির্জা বাবরের অধীন হবে, তবেই আমাদের রক্ষা— কারুর মাথা থেকে একটা চুলও খোয়া যাবে না।'

ঠিক কথা। কী দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলছেন খাজা আবদুল্লা। যাই হোক... ভয় লাগছে কেমন যেন... যদি শেষ পর্যন্ত খাজা আবদুল্লার কথাই ঠিক হয়ে দাঁড়ায়, মির্জা বাবর ফরগানার বাদশাহ্ হন তো নগরপালের আজকের দ্বিধাসংশয় তাকে কোথায় দাঁড় করাবে? নগরপালের অধীন লোকেরা মির্জাকে তার দ্বিধাসংশয়ের কথা জানালেই ব্যস নগরপালের পদ থেকে বিদায়? না, না, উজুন হাসান তোমার বেছে নেওয়া পথ থেকে সরে গেলে তোমার চলবে না।

'পীরসাহেব, আপনি দোয়া করেন তো, আমি নিজে মির্জা বাবরের কাছে যাই,' বলল উজুন হাসান। 'আমি সব বেগদের তরফ থেকে তাঁকে আমাদের আনুগত্য, জানাব এবং কেল্লায় আমন্ত্রণ জানাব।'

'আপনার অভিলাস প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আমি বলতে চাই যে যতক্ষণ আপনি

নগরপাল ততক্ষণ আপনার উচিত শহরে গোলমাল দূর করা, দাঙ্গাবাজদের ঘাঁটি খুঁজে বার করে তাদের বিনাশ করা, আন্দিজানে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া। এভাবেই মির্জা বাবরের অনুগ্রহ পাবেন আপনি।'

উজুন হাসানের মনের কথা সত্যি সত্যিই পড়ে ফেলেছেন পীরসাহেব।

গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যতাপে পৃথিবী-আকাশ দুই-ই জ্বলছে। ঘোড়ার খুরের আঘাতে যে ধুলো উড়ছে তা আগুনের শিখার মত এসে লাগছে অশ্বারোহীদের চোখে মুখে। একটুও হাওয়া নেই।

দরদর করে ঘামছেন বাবর, অসহ্য তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। গতকাল এমন সময় তিনি আন্দিজানে নদীর শীতল তীরে বসে আরাম করছিলেন। শ্যামল ছায়া ভরা বাগানবাড়ির বিশুদ্ধ বাতাস, স্বচ্ছ জল, হাওয়া-খেলানো বারান্দা, নিশ্চিন্ততা, ছেলেমানুষি—এ সবই অতীতের কথা, এই রাদে জ্বলা ধুলো ভরা পথে চলতে চলতে সেই দিনগুলির কথা মনে হচ্ছে যেন বহু বহু যুগ আগের কথা। যেন অকস্মাৎ এক ঘূর্ণিঝড় এসে কিশোরকে সুখের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নির্জীব একটা কাঠকুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে চলেছে দূরে কোথাও, ঠিক যেমনটি হয় ভয়ংকর কোন রূপকথায়। আর এই ধুলো উড়িয়ে আনছে এক ঘূর্ণিঝড়। এমনই এক ঘূর্ণিঝড় তার পিতাকেও নদীর খাড়া পাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে। আর তার পঞ্চাশজন সঙ্গীর ঘোলাটে ধূলি-ধূসর ছায়া — এও তাদের সবাইকে একই বিপদের মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে আসা সেই ঘূর্ণিঝড়েরই ছায়া।

খিদের মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে যেন এক অশুভ দৈত্য তাদের সবাইকে ঘোরাচ্ছে, সোজা পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে।

উজগেন্দের পথ ধরে নামাজগাহ পৌঁছালেন তাঁরা। তুষারাবৃত পর্বতরাশি দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টি দিয়ে বাবর শীতলতা অনুভব করলেন। ঘোড়াকে পায়ে জুতোর কাঁটা দিয়ে ঘা মারলেন। কষ্টে শুকনো ঠোঁটজোড়া নাড়িয়ে বললেন শেরিমবেগকে:

'জলদি! সবাই একটু জলদি চলুন!'

শেরিমবেগ পিছন দিকে তাকিয়ে বলল:

'দূত আসছে! একটু অপেক্ষা করা যাক?'

দূত বাবরের হাতে দিল খাজা আবদুল্লার লেখা চিঠি। বাবর গোল করে পাকান চিঠিটা হাতে নিয়ে রেশমী সুতোটা ছিঁড়ে খোলা চিঠিটা এগিয়ে দিলেন নুয়ান কুকলদাসের দিকে: 'পড়ুন।'

চিঠিতে লেখা আছে আন্দিজানের বেগদের আনুগত্যের কথা। আরো আছে — সতর্ক ইঙ্গিতের মাধ্যমে— শহরে নোংরা গুজব ছড়িয়েছে যে 'মির্জা বাবর পালিয়েছেন,' এইভাবে ষড়যন্ত্রকারীরা লোকের মনে তাঁর সম্বন্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।

'আমি ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকেই তো আপনাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম শাহজাদা।' বলে উঠল শেরিমবেগ বাবরকে। 'খুবই খারাপ অবস্থা! কেল্লাতেই ওরা ঘাঁটি গেড়েছে! ফিরে যাবেন না শাহজাদা। বেগরা যদি আপনারা অনুগতই হয় তো এখানে আসুক।'

'ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে,' হ্যাঁ এমন গুজব ছড়াবেই এক মুখ থেকে আর এক মুখে, শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে।

'না! পালিয়ে যাব না আমি!' ঘোড়া ফেরালেন বাবর।

'এ একটা ফাঁদ, শাহজাদা, বিশ্বাস করুন।'

'আমি নিজেই সব সিদ্ধান্ত নেব! ওদের দেখিয়ে দেব যে আমি ভীরু নই ফিরে চল সবাই! ফিরে চল আন্দিজান!'

'ঘোড়ার লাগামটা ঢিলে করে দিয়ে বাবর চাবুকের এক আঘাতে ঘোড়া ছোটালেন। প্রচন্ড গতিতে দৌড় লাগাল ঘোড়া, হাওয়া এসে ধাক্কা দিল বাবরের বুকে, তাতে ভারী আরাম লাগল তাঁর। যেন সেই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়টা পিছনে পড়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে পথে।

যখন তাঁরা কেল্লায় এসে ঢুকলেন সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। সন্ধ্যাবেলায় সাধারণত রাস্তায় খুব হৈচৈ, গোলমাল থাকে, কিন্তু আজ চারিদিক নিস্তব্ধ। দোকান পাট বন্ধ। চারদিক কেমন খাঁ-খাঁ। শহরবাসী ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে যে যার ডেরায় ঢুকেছে।

বাবর আগে আগে যাচ্ছিলেন। শেরিমবেগ বাবরের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁকে ঘিরে ফেলতে নির্দেশ দিল ইঙ্গিতে। নিজে মির্জার নাগাল ধরবার জন্য এগিয়ে চলল। আবার বাবরের মনে হল তিনি ঘূর্ণিঝড়ের কবলে বন্দী। চোখের সামনে আবার লোক, ঘোড়া ঘুরপাক খেতে লাগল— যেন ঘূর্ণিঝড়ের স্তম্ভে ঘুরতে থাকা খড়কুটোসব। আবার বাবর ঘোড়াকে আঘাত করে বেড় ভেঙে সবার আগে এগিয়ে গেলেন। শেরিমবেগ আবার চেষ্টা করল বাবরকে ধরে ফেলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে, যে দেখে দেখুক, কুদৃষ্টি থেকে সে বাঁচাবে ভাইপোকে। কিন্তু নুয়ান কুকলদাস তার ঘোড়ার লাগামটা ধরে বলল:

'যেতে দিন হুজুর, শাহজাদা আগে আগে চলুন। লোকে দেখুক সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে, স্বস্তি পাক তারা। ঐ যে ওরা, জানলার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বসে আছে, জানুক এ ষড়যন্ত্রকারীদের ছড়ান গুজব মিথ্যা।'

'আর যদি বিদ্রোহীরা কোন ফাঁকফোকর দিয়ে তীর ছোঁড়ে?'

'সাহস করবে না!... শাহজাদার তাই ইচ্ছে—আগে আগে যাওয়া। আল্লাহ্ দেখবেন ওঁকে।'

বাবরের নেতৃত্বে অশ্বারোহীদল এগিয়ে গেল দুর্গতোরণের দিকে। প্রধান ফটক খুলে গেল, খাজা আবদুল্লা, কাসিমবেগ, শাহি সিপাহসালাররা সবাই বেরিয়ে এল

বাবরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। ঘোড়া থেকে নেমে বাবর তাঁর শিক্ষককে অভিবাদন করলেন। তাঁর তরুণ প্রাণ ভেঙে যেতে লাগল, চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। খাজা আবদুল্লা তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন, একটু আদর, ভরসা দিতে হবে ছেলেটিকে। হ্যাঁ ছেলেই তো! আর অবশ্যই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী! বেগরা, নোকররা দেখছে খাজা আবদুল্লার চোখে জল, কিন্তু দ্রুত আত্মসংবরণ করলেন তিনি।

'আমাদের দুঃখের শেষ নেই, শাহজাদা,' নিজেকে সংযত করে বললেন তিনি, 'এখন আমাদের আশা ভরসা আপনিই!'

বেগদের মধ্যে একজন দুপা এগিয়ে এল। খাজা আবদুল্লার কথার মাঝখানে জোরে বলে উঠল :

'শাহজাদা, আমরা সব বেগরা আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত!'

বাবর যখন উত্তর দিলেন তখনও গলা কাঁপছে তাঁর, 'আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ!'

ঐ সময় যখন সবাই একসঙ্গে তোরণদ্বার দিয়ে ভেতরে আসছে ইয়াকুববেগও এসে যোগ দিল বেগদের দলে। বাবরের ফিরে আসার খবর পেয়েই ছুটে এসেছে যাতে তার ওপর কোন সন্দেহ না পড়ে তার জন্য।

আগে যখন আন্দিজানে রাজধানী ছিল, সিংহাসন ছিল শীতকালীন প্রাসাদে, সেটিই ছিল রাজধানীর প্রাণবিন্দু। কিন্তু রাজধানী যখন আখসিতে স্থানান্তরিত হল, মর্মর পাথরের সোপানশ্রেণী সোনার জলের নকশায় অলঙ্কৃত এই প্রসাদটি তার মহিমা হারায়। এখন বাবরের আগমন উপলক্ষে খাজা আবদুল্লার আদেশে সেই সোপানশ্রেণীর ওপর বিছান হয়েছে দামী গালিচা, যে উঁচু মঞ্চের ওপর আগে শোভা পেত সিংহাসন, সেটিও ঢেকে দেওয়া হয়েছে দামী তুর্কমেনী গালিচা দিয়ে, সভাকক্ষের চারদিকে পেতে দেওয়া হয়েছে নরম গদি।

বেগনীরংয়ের গালিচার ওপর দিয়ে যেতে যেতে কেশে উঠলেন বাবর: গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। নিঃশ্বাস ফেলারও সময় হল না— বাদশাহের দায়িত্ব হাতে তুলে নিলেন— মঞ্চের ওপর উঠে বসলেন।

সবাই বসলেন। খাজা আবদুল্লা মরহুম বাদশাহ্ মির্জা উমরশেখের উদ্দেশ্যে ফতেহা করলেন।

'হে আল্লাহ্, ওঁকে বেহশ্‌তে নিয়ে যান!' সমস্বরে বলে উঠল সব বেগরা। বাবরের দিকে ফেরান মুখগুলিতে ফুটে উঠেছে সমবেদনা আর বিষাদ।

'খুদাবন্দ হুকুমতের সুযোগ্য ব্যক্তিরা!' আরম্ভ করলেন খাজা আবদুল্লা। 'যুদ্ধের এই জরুরী পরিস্থিতি না হলে আমরা শোকপালন অনুষ্ঠান উপযুক্তভাবেই করতাম। আখসিতে তাঁর দাফন হয়েছে তাঁর খ্যাতি ও পদমর্যাদা অনুসারে অর্থাৎ সসম্মানে। কিন্তু যখন আন্দিজানের দুয়ারে শত্রু এসে পৌঁছেছে তখন আমাদের ওপর অনেক

দায়িত্ব। সর্বপ্রথম দায়িত্ব সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর হাতে অবিলম্বে রাজ্যভার তুলে দেওয়া, আমাদের নতুন বাদশাহের হাতে...'

ইয়াকুববেগ অন্য সবার আগেই সেকথার খেই ধরল:

'আপনি উপযুক্ত পন্থার কথাই বলেছেন পীরসাহেব। এখনি আমাদের মির্জা জাহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবরকে ফরগানার বিধিসঙ্গত বাদশাহ বলে ঘোষণা করা উচিত।'

বাবর তাড়াতাড়ি দেখে নিলেন ইয়াকুববেগকে। স্বরে কোমলতা ও আনুগত্য, উদ্বেগ, মুখেও তার ছাপ। এমনকি তার ফোকলা মুখের হাসিও তৃষ্ণায় কাতর তরুণের পছন্দ হল। সবাই জানে যে ইয়াকুববেগ মোগল বেগদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী। উদ্ধত বাবরের গোপন স্বপ্নগুলির মধ্যে একটি ছিল এমনি: কোন একদিন পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে সমস্ত বেগদের নেতৃত্ব করা আর সত্যিকারের ইমানদার, যোদ্ধা ও পুরুষমানুষের মতই বেগদের পরিচালনা করা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় করার জন্য। এখন—পিতা নেই, ধূর্ত ইয়াকুব তাঁর এই শোকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। মোগলের পরে বিভিন্ন বংশের অন্যান্য বেগরা একে একে বাবরকে ফরগানার শাসক বলে অভিহিত করলেন, তাঁর স্বপ্ন যেন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা পূর্ণচন্দ্রের মত ফুটে উঠল, আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল হৃদয়, ঘূর্ণিঝড়ের মত নেমে আসা বিপদ, শারীরিক যন্ত্রণা সব যেন কোন দূরে পড়ে রইল — হ্যাঁ, বাবর হবেন প্রতিপত্তিশালী শাসক, যাঁর হুকুম বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নেবে হাজার হাজার লোক।

নিজেকে সেনানায়ক বলে ভাবতে ভালবাসতেন তিনি। ঠিক তাঁর পূর্বপুরুষ আমির তৈমুরের* মত। বাবর তাঁর নিষ্ঠুরতার কথা শুনেছেন, তার পুনরাবৃত্তি তিনি আর মোটেই চান না: মানুষের স্মৃতিতে ক্ষত রেখে যাওয়া নয়, রাখতে হবে তাঁর যুদ্ধক্ষমতায় লোকের মনে বিস্ময়! পূর্বপুরুষের নিষ্ঠুরতা তাঁকে আকর্ষণ করত না, করত তাঁর চমৎকার যুদ্ধজয়। আকর্ষণ করত তাঁর প্রচন্ড শক্তি, নাম-প্রতিপত্তি, যা স্বেচ্ছাচারী বেগদের বুকে কাঁপন ধরাত।

ব্যস্তভাবে কুর্ণিশ করতে করতে এসে ঢুকল উজুন হাসান।

'শাহজাদা, আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসতে পারিনি বলে আপনার গোলামকে মাফ করবেন। সেই সব ষড়যন্ত্রকারীদের ধরায় ব্যস্ত ছিলাম যারা আন্দিজানে মিথ্যা, নোংরা গুজব ছড়াচ্ছে এই যে তাদের একজন মাথাকে ধরে এনেছি।'

শিউরে উঠলেন বাবর:

'মাথা? কে সে? নিয়ে আসুন তাকে!'

সবার দৃষ্টি ঘুরল দরজার দিকে। ইয়াকুববেগের মুখ রক্তহীন হয়ে গেল। আহমদ

* তৈমুর লং। বাবরের পিতা তৈমুর লংয়ের ষষ্ঠ বংশধর।

তনবাল ধরা পড়ল নাকি? তাহলে সব গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে! দিশেহারা চোখদুটো বোলাল চারদিকের দেওয়ালে। জানলা খুবই কম এখানে আর মোটাদেহ নিয়ে সে বসে আছে জানলা থেকে অনেক দূরে। নাঃ, পালিয়ে বাঁচা যাবে না এখান থেকে!

এমন সময় দরজার বাইরে ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমার হাত খুলে দিন, আমার কোনো দোষ নেই।'

'আল্লাহর অসীম কৃপা!' ইয়াকুববেগ মনে মনে খুশি হয়ে উঠল, 'আহমদ তনবালের গলার আওয়াজ নয় এটা!'

দু'জন অনুচর সাদা লম্বা পোশাক পরা স্থূল, দীর্ঘকায় এক ব্যক্তিকে ভিতরে নিয়ে এল।

'আরে ব্বাস, দরবেশ গোব্,' বিস্ময় ধ্বনি করে উঠল ইয়াকুববেগ, তার পরে আরো অনেক বেগও।

এই লোকটি হল আন্দিজানের সেচব্যবস্থার তদারককারী, নিজের চওড়া ঘাড়টা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ষাঁড়ের মত, তাই তার নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে 'গোব্' অর্থাৎ ষাঁড়। আর সর্বদা গরিবদের সাহায্য করার জন্য তাকে দরবেশ বলে ডাকা হত: 'আল্লাহ্ ওদের ওপর মেহেরবান,' বলত গোব্। যদিও নয়টি জলবহা নালী দিয়ে জল সরবরাহ করা হত আন্দিজান কেল্লায় কিন্তু গ্রীষ্মকালে বহুসংখ্যক বাগানে জল দেবার ফলে জলের অভাব হত। বেগার চেষ্টা করত জল নেবার সারি থেকে গরিবদের বিতাড়িত করার। কিন্তু দরবেশ গোব সাহস করে গরিবদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াত। 'তুমি বেগ, নিজের কাছে নিজে বেগ,' বলত গোব, 'কিন্তু খোদার কাছে সবাই সমান!' সাধারণ লোকেরা অবশ্যই তার কথায় সায় দিত। তাই বেগদের প্রচণ্ড রাগ তার ওপর। বিশেষত উজুন হাসান বহুদিন রাগ পুষে রেখেছিল তাব ওপর।

দরবেশ গোব্ পিছনদিকে হাত বাঁধা অবস্থায় নিচু হয়ে অভিবাদন করল প্রথমে বাবরকে, তারপর একটু দূরে বসা খাজা আবদুল্লাকে।

'ন্যায়বিচার করুন শাহজাদা! আত্মমর্যাদার সঙ্গে বলল সে। 'আমি ষড়যন্ত্রকারী নই, পীরসাহেব।... বাজারে একজন লোক বলল আমায় 'আখ্‌সিতে শাহ্ মাতাল অবস্থায় নদীর খাড়া পাড় থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন। আর মির্জা বাবর শত্রুর ভয়ে আলাতাউ পালিয়ে গেছেন।'

'এ অপবাদ!' বাবুদের মত জ্বলে উঠলেন বাবর।

'এটা যে রটনা পরে জানতে পারি। লোকটির কাছে যা শুনেছি কাউকে বলিনি আমি। দয়া করুন শাহজাদা!' দরবেশ গোব দু'তিন পা এগিয়ে গিয়ে নতজানু হল। 'আমি জানি, আমি জোর দিয়ে বলেছি যে এ রটনা। আপনার চোখেমুখে এমন আভিজাত্য ভীরুতার কোন ছাপ নেই আপনার মুখে। বাজারে যখন সবাই দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দিল, দোকানপাট বন্ধ করে দিতে লাগল, শপথ করে বলছি, কেমন

দিশাহারা হয়ে গেলাম। আমি গুজব ছড়াইনি, আমি কেবল একজন লোককে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি: শুনেছ যেসব কথা বলাবলি হচ্ছে। সে বলল — শুনেছে। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম— এ সব সত্যি নাকি, এমন সময়ই কোতোয়ালের চররা এসে ধরলে আমায়...'

'না, না, তুই মিথ্যা বলছিস। বলতে চাস, স্রেফ জিজ্ঞাসা করেছিলি। তুই গুজব ছড়াচ্ছিলি আর সেই কারণেই ধরা পড়েছিস!' বলে উঠল উজুন হাসান।

'কোরান শরীফ দিন আমায়, কোরান শরীফের কসম নিয়ে বলব আমি !'

'আরে অপরাধ করে আবার কোরান চায়?!' বাবরের দিকে বিরক্তিভরা মুখ ফিরিয়ে বলল ইয়াকুববেগ। 'শাহজাদা, এই হতভাগা যদি আপনার অনুগত হত, তবে যে লোকটির কাছে ঐ গুজব শুনেছে তাকে ধরে কোতোয়ালের হাতে তুলে দিত!'

এর উত্তরে দরবেশ কেবল বলল, 'হা খোদা।'

ইয়াকুববেগ আবার কোমল দৃষ্টিতে চাইল বাবরের দিকে, ফোকলা মুখে বাঁকা হাসি হেসে বলল:

'শাহজাদা, আপনার ওয়ালিদ সাহেব গোবকে ভেরীর সর্দার করেছিলেন, ও ভেরীর সর্দার হয়েছিল আপনার ওয়ালিদ সাহেবের মেহেরবানীতে, আবারও বলি... আর ও এখন গুজব ছড়াচ্ছে ... আমাদের মরহুম বাদশাহ, খুদা তাঁর জন্নাত নসীব করুন... মাতাল অবস্থায় পড়ে গেছেন নদীর পাড় থেকে! কি স্পর্ধা!'

'শিশুকে প্রতারণা করব না তো কাকে করব,' ভাবল ইয়াকুববেগ,

রাগে অপমানে বাবরের চোখে কেমন আগুন জ্বলে উঠল তা দেখে।

'ওই তো স্বীকার করে ফেলল যে যা শুনেছে তা অন্যকে বলেছে! আবার জিজ্ঞাসা করেছে, তার মানেই অন্যকে বলেছে। আসলে কোন তফাৎই নেই!' ছুঁড়ে দিল মজিদবেগ।

'জিভের জন্য ধরা পড়েছে—শাস্তি পাওয়াই উচিত!' আলি দোস্তবেগও অভিযোগকারীদের পক্ষ নিল।

কেন কে জানে কাসিমবেগের মনে পড়ল সেই অদ্ভুত পায়রাটির কথা যেটি বাবরের মামাকে বাদশাহের মৃত্যুর খবর এনে দিয়েছিল।

'মনে হয়, আরো তদন্তের প্রয়োজন, কী বলেন?' জিজ্ঞাসা করল কাসিমবেগ।

মজিদ প্রতিবাদ করল:

'দীর্ঘ তদন্তের সময় কোথায়? দুয়ারে শত্রু এসে পৌঁছেছে, পীর বললেন তো। আর রক্তাক্ত যুদ্ধের সময় যে আতঙ্ক ছড়ায়, শাসকের মর্যাদাহানি করে—সেও শত্রু। ওকে দয়া দেখান উচিত নয়!'

'অন্যরা যাতে ভয় পায় সে জন্য একে শহরের চত্বরে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দেওয়া উচিত। যাতে অন্যরা শিক্ষা পায়!' বলল উজুন হাসান।

'চত্বরে শাস্তি দেওয়া' মানে মাথা কেটে ফেলা।

গোবের মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখা দিল। হাঁটু গেড়ে বাবরের কাছে আরো এগিয়ে গেল সে, বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে এল তার!

'শাহ্‌জাদা, আমি অপরাধী নই! আমি অপরাধীদের শিকার হয়েছি! দয়া করুন আমায়! পাঁচটি বাচ্চা আমার! তাদের ভরসা কেড়ে নেবেন না শাহ্‌জাদা!' গোবের হাত পিছমোড়া ক'রে বাঁধা বলে চোখের জল অবাধে গড়িয়ে পড়ছে দাড়িতে।

বয়স্ক পুরুষমানুষের এমনি কান্না বাবরের রাগ নিভিয়ে দিল এক মুহূর্তে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তিনি তাকালেন খাজা আবদুল্লার দিকে। হঠাৎ তাঁর ভীষণ ইচ্ছে হল কেউ বলুক, 'বেচারাকে দয়া করুন!'

কিন্তু খাজা আবদুল্লা চুপ করে আছেন। বেগরা কিন্তু চুপ করে নেই।

'যার পাঁচ-পাঁচটি বাচ্চা, তার জবান সামলান উচিত ছিল!' নিষ্ঠুর হাসি হাসল ইয়াকুববেগ।

'আরে এ গোব একটা পাকা ষড়যন্ত্রকারী!' হাত নাড়িয়ে বলল উজুন হাসান। 'যে ওকে বলেছে যে বাদশাহ্‌ মাতাল ছিলেন এবং নিজের দোষেই মারা গেছেন তার মুখে একটা মেরে দিতে পারত... বা আমাদের হাতে তুলে দিতে পারত!'

দরবেশ গোবের মিনতি এই সব হুমকিতে ডুবে যাচ্ছিল।

'শাহ্‌জাদা, ন্যায়বিচার করুন! আপনার ওয়ালিদ সাহেবের বিশ্বস্ত লোক আমি! এই বেগদের জানেন না আপনি! ওরা আমার ওপর বদলা নিচ্ছে! বেগদের বিশ্বাস করবেন না, শাহ্‌জাদা! অন্যদের জিজ্ঞাসা করুন! সব ইমানদার লোক আমায় জানে!'

আলী দোস্তবেগ জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল:

'কী বেগরা বেইমান? শুনেছেন, বাদশাহ্‌, দেখছেন কেমন পাপীমন এই দরবেশের?'

ইয়াকুববেগ বাবরকে কুর্নিশ করে গুনগুন করে বলল:

'এই গোব্‌টা বেগদের বিরুদ্ধে নীচুতলার সব লোককে লাগানোর তালে আছে হুজুর।'

'অত্যন্ত নীচ মতলব ওর!' চীৎকার করে বলল উজুন হাসান। তারপর অনুচরদের বলল, 'হয়েছে! একে নিয়ে যাও এবার!'

প্রহরীরা ছুটে এসে গোব্‌কে মাটি থেকে টেনে তুলে ধাক্কা দিতে দিতে আর মারতে মারতে দরজার দিকে নিয়ে গেল। গোব্‌ তখনও চেঁচাচ্ছে:

'আমি অপরাধী নই! আমার বাচ্চাদের চোখের জল তোমাদের লাগবে, বেগ! আমার বেকসুর খুনই তোমাদের খতম করবে!'

এই অভিশাপ বাবরের হৃদয়ে বিঁধল তরোয়ালের খোঁচার মতই। হঠাৎ আবার তাঁর

মনে পড়ল সেই নিশ্চিন্ত সকালের কথা যখন তিনি তাঁর সমবয়স্কদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিলেন। এ সবই তো সত্যি! আলিশের নবাইয়ের ছবি দেখতে দেখতে মধুর স্বপ্নে ডুবে গিয়েছিলেন তিনি! মনে হচ্ছে যেন সেই থেকে কয়েক বছর পেরিয়ে গেছে... হ্যাঁ আজ সকালে, আজ দুপুরের আগে পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল রৌদ্রদীপ্ত আকাশের মতই পরিষ্কার। এই কালো মেঘগুলো যে কোথা থেকে এল? প্রতিটি রক্তপিপাসু বেগ দরবেশ গোবের মাথা কেটে ফেলার দাবি জানাচ্ছে, প্রত্যেকে তারা যেন এক একটা ঝোড়ো মেঘ, বাবরকে সূর্যকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। ঘূর্ণিঝড় নিষ্ঠুর ক্রুদ্ধ হাওয়া ও ঘূর্ণিঝড়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আর সেই ভয়ঙ্কর অনুভূতি, যেপ্রতিপত্তি ও সিংহাসন দরবেশ গোরে মত এমন লোকেদের রক্ত দাবি করে, তাঁর বুকে আঁচড় কাটতে লগল।

কানে আসতে লাগ চীৎকার: 'এই লোকটার মাথা কেটে ফেলা হোক!'

'মাথা কেটে ফেলা হোক! .... রাজনীতি দাবি করছে, রাজনীতি!'

বাবর কুয়াশার মধ্য দিয়ে তখনও যেন দেখতে পাচ্ছেন গোবের চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে সাদা দাড়িতে। এই লোকটি, জীবিত, এমনি চেহারা, পরিণত হবে মৃতদেহে? আর বাবরকে অনুমতি দিতে হবে তাকে মেরে ফেলার? কিন্তু কেন? কারণ বেগরা তাই চায় বলে?

আসলে, হয়ত বেগরাই তাঁকে, বাবরকে প্রতারণা করছে? হয়ত এমন ধরনের বেগরাই আখসিতে পিতাকে নদীর খাড়াপাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে? কাল অথবা পরশু বাবরের জীবনের ওপরও আঘাত হানবে?

'ওস্তাদ মহাশয়।' রুদ্ধকণ্ঠে খাজা আবদুল্লার উদ্দেশে বললেন বাবর।

খাজা আবদুল্লা ঝুঁকে পড়লেন বাবরের কাঁধের কাছে:

'শক্ত হতে হবে, শাহজাদা।'

'কী করব, বলে দিন!' ফিসফিসিয়ে বললেন বাবর।

'দণ্ড ঘোষণা করতে হবে। বেগরা দাবি করছে মৃত্যুদন্ড।'

'আর আপনি মওলানা?'

যখন আন্দিজানের আর গোটা ফরগানার ভাগ নিয়ে জুয়াখেলা হচ্ছে তখন কোন এক গোবকে নিয়ে মাথা ঘামালে চলে?

'শাহজাদা', খাজা আবদুল্লাও এবার ফিসফিসিয়ে বললেন, 'এই বিপদের মুহূর্তে বেগদের বিরোধিতা করা যায় না। আদেশ দিন ... মৃত্যুদন্ডের।'

পরের দিন কেল্লার প্রবেশপথের সামনে চত্বরে ঢাকঢোলের আওয়াজের মাঝে দরবেশ গোবের মাথা কাটা পড়ল।

আর সেইদিনই অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ তনবাল সবার অলক্ষ্যে আখসি রওনা দিল।

কুভা

১

মুল্লা ফজলুদ্দিন একদিনের জন্য আন্দিজান গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন প্রচন্ড দুশ্চিন্তা নিয়ে।

নতুন বাদশাহ্ বাবরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার ইচ্ছা নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সাহায্য পাবেন, তরুণ শাসকের কাছে একবার গিয়ে পড়তে পারলে হয়। স্থপতি জানতেন বাবরকে, শহরের বাইরে বাগানবাড়িটা তৈরি করার সময়ে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, জানেন সদ্য মুকুটধারী কিশোর বাদশাহর অসম্ভব ক্ষমতা কবিতা মনে রাখার আর কবিতা তিনি ভালোও বাসেন। ছবিও ভালবাসেন সেই জন্যই স্থপতি তাঁকে মহান নবাইয়ের প্রতিকৃতি উপহার দিয়েছিলেন। প্রতিদানে বাবর তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন জরির চাপকান। এবার তিনি বাবরকে বলবেন ভেবেছিলেন যে কী অত্যাচার তাঁর ওপর করেছে স্বেচ্ছাচারী বেগরা, বাবর অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন।...

কিন্তু বাবরের কাছে যেতে দেওয়া হল না স্থপতিকে।

উজুন হাসান আর ইয়াকুববেগ যেতে দিল না।

প্রথমজন মুল্লা ফজলুদ্দিনকে পাঠাল দ্বিতীয় জনের কাছে, ইয়াকুববেগের কাছে। সর্বাপেক্ষা ধনী ও চাটুবাক্য বলতে সক্ষম এই বেগটি প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অন্যান্যদের থেকে অনেক বেশি অর্থ দিয়েছে, আর সহচর, ভৃত্যও সে, দরকারের সময় লাগতে পারে ব'লে রেখেছিল অন্যদের চেয়ে বেশি সংখ্যায়। প্রতিবারেই সে বাবরের সামনে আনগত্য প্রদর্শন করত অন্যদের থেকে অনেক বেশি কৌশলে। এসবে কাজ হল। ইয়াকুববেগ হলেন উজীরে আজম, সব থেকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। সেই জন্যই ফজলুদ্দিন রাজ্যে স্থপতির কাজ বাবদ তরুণ মির্জার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুরোধ জানালে উত্তরে তাকে থামিয়ে দিয়ে ইয়াকুববেগ বলল:

'তরুণ বাদশাহের প্রয়োজন এখন যোদ্ধার, স্থপতি নয়। যত বেশি দক্ষ যোদ্ধা পাওয়া যায় ততই ভাল। যুদ্ধ শেষ হলে, আসবেন!'

মর্যাদাসহ মাথানীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা স্থপতির পাশ কাটিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় একটু ব্যাঙ্গ করেই বলল:

'ঐ যে ওখানে সিপাহী হবার জন্য নাম লেখান হচ্ছে। যান ওখানে, সিপাহী হবেন!'

'বেঁচে থাকলে সেই দিন দেখতে পাব যখন স্থপতিরও প্রয়োজন হবে!' বেগের পিছন পিছন বললেন মুল্লা ফজলুদ্দিন।

কেল্লার মধ্যে যেখানে ইয়াকুববেগ আর উজুন হাসান প্রতিপত্তি খাটাচ্ছে, সেখানে থাকা নিরাপদ নয়: মুল্লা ফজুলদ্দিন জানতে পেরেছেন কী ভাবে ও কেন গোবের মৃত্যু হল। সেইজন্যই তিনি কুভাতে বোনের বাড়ী ফিরে গেলেন।

ভাগিনা, বোন, ভগ্নীপতি সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে শত্রুসৈন্য এগিয়ে আসার অপেক্ষায়, যারা ইতিমধ্যেই কার্কিদোনে সংকেতের আলো জ্বালিয়েছে।

স্থপতি সিন্দুকটা আবার লুকিয়ে ফেলতে চাইলেন।

'গমরাখার গর্ত একটা ফাঁকা আছে তোমাদের?' বোন আর ভগ্নিপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

'আছে, বিচালি-ঘরে।'

'তাহির কোথায়?'

'মাহ্‌মুদের সঙ্গে কোথায় গেল যেন।... আমরা নিজেরাই পারব একাজ।'

লোহার সিন্দুকটা আবার বস্তায় ভরা হল, বহুদিন খালি পড়ে থাকা গর্তের গভীরে সেটাকে রাখা হল, গর্তের মুখ কাঠের তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল, তার ওপর ঘাসপাতা চাপা দেওয়া হল একগাদা।

২

রাতের বেলায় আবার কালো কালো মেঘ দেখা দিল আকাশে। ছাড়া ছাড়া, কিন্তু বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল—জোর বৃষ্টি নামার পূর্বলক্ষণ।

কুভা জনহীন, নিস্তব্ধ। সবাই বাড়িতে বসে, যদি মাঝে মধ্যে দু একটা কুকুরের ডাক না শোনা যেত তো মনে হতে পারত যে গোটা কুভা কোথায় যেন চলে গেছে।

কুভাসাইয়ের পুলও জনহীন, নিস্তব্ধ। দেখা গেল তাহির ঠিকই বলেছে প্রহরীরা পালিয়েছে।

ঠিক মাঝরাতে পুলের দিকে যাবার রাস্তায় কাদের যেন ছায়া দেখা গেল। ঐ আর একটা ছায়া ভেসে উঠল রাস্তার ওপর।

'কাঠ আর আগুন এনেছিস?' চাপাস্বরে কথা বলতে চেষ্টা করছে তাহির।

'এনেছি' খাটোচেহারার, বদনাকাঁধে লোকটিও ফিসফিস করে উত্তর দিল।

খাটোচেহারার লোকটির পোশাক থেকে তিলতেলের গন্ধ বেরোচ্ছে, তেলের ঘানিতে কাজ করে সে।

কপালে, গালে বৃষ্টির ফোঁটা অনুভব করে তাহির উপরদিকে তাকাল মেঘ ক্রমশ ঘন হচ্ছে, ভারী হচ্ছে: একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না।

'জোর বৃষ্টি নামবে। তাহলে আগুন জ্বলবে না,' ভাবল তাহির। পুলের কাঠ এর মধ্যেই বোধহয় স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে।'

উমুরজাক, আমি একটা কুড়ুল নিয়েছি, আরো কুড়ু্ল চাই, আর চাই দু' হাতলওয়ালা করাত। তুই ছুতোর, তোর এ সবই আছে।'

'করাতে কী হবে?'

'জিজ্ঞাসা করে সময় নষ্ট করিস না।... মাহ্মুদ তুইও ওর সঙ্গে যা তাড়াতাড়ি কর, ভাই।'

একটু পরেই সবকিছু তৈরি হয়ে গেল।'

এই যে পুল।

পুলের প্রহরী যে আন্দিজানে পালিয়ে গেছে সেকথা কেবল তাহিরই জানে না, জানে শত্রুপক্ষও, সেইজন্যই তাড়াতাড়ি করা দরকার হয়ত কাল সকালেই তারা পুল পেরিয়ে চলে আসবে।

পুলের কাছে বড় গাছটার নিচে সঙ্গীদের দাঁড় করিয়ে তাহির বলল:

'আমাদের ক্ষতি হবার আর কিছুই নেই ভাই, শত্রুবাহিনীর মুখে আমাদের ফেলে রেখে পালিয়েছে বেগরা আর সৈন্যরা। আবারও বলি 'নিজেই নিজের জন্য মর রে অনাথ!' কথায় বলে। আর যদি আমাদের ভাগ্য ভাল হয় তো আমরা আমাদের পরিবার পরিজনসমেত মস্ত বিপদের হাত থেকে বাঁচব। কুভাসাইয়ের মত নদীর ওপর আবার সাঁকো তৈরি করা খুব সহজ নয়। ... আর যদি কোন কারণে আমরা সফল না হই... তো মুখবন্ধ রাখতে হবে সবাইকেই, সে যাই ঘটুক না কেন।'

'শপথ নিলাম', দৃঢ়স্বরে বলল মাহ্মুদ। 'যদি আমাদের মধ্যে কেউ শত্রুর কাছে গোপন কথা ফাঁস করে দেয়, তো ... তো সে যেন নিজের মাকে ভোগ করে।'

এ হল মস্ত বড় অভিশাপ, সব থেকে ভীষণ লজ্জা।

'তাই হোক!'

'তাই হোক!

সবাই পুলের ওপর উঠল গিয়ে।

তাহিরের উদ্দেশ্য ছিল চল্লিশ-পঞ্চাশ পা গিয়ে পুলের মাঝখানে আগুন জ্বালাবে। যত দূরে তারা যাচ্ছে ততই অসহায় বোধ করছে তারা। দু'পাশের খোলা জলে পুলটা তত অন্ধকার দেখাচ্ছেনা। তাদের দেখতে পেতে পারে কেউ। অগ্রগামী শত্রুসৈন্যদলের কোন তীরন্দাজের পক্ষে তারা চমৎকার চাঁদমারি হতে পারে। এমন সময় আবার ছুতোরের হাতের করাত তাহিরের হাতের কুড়ুলে ধাক্কা লেগে এমন আওয়াজ তুলল যে ছেলেরা সবাই কেঁপে উঠল, থেমে গিয়ে কান খাড়া করে ব্যাঙের আওয়াজ শুনতে লাগল, খানিক অপেক্ষা করল। ভালকথা যে হাজার হাজার ব্যাঙ ডাক থামায়নি।

'আর দুরে যাবার দরকার নেই, তাহির কেমন?' ফিসফিস করে বলল মাহ্মুদ। 'যদি ও-দি-ক থেকে ওরা আসে তাহলে আমরা পালাব কেমন করে সেকথা ভেবেছিস?'

'একজনকে গোটা পুলটা পেরিয়ে যেতে হবে। উমুরজাক ঐদিকে গিয়ে পাহারা দিক।... ভয় পেও না তোমরা। ওরা এখান থেকে অনেক দূরে।'

আরো জোরে বৃষ্টি নামল। তাতে দূরে জ্বলতে থাকা আগুনগুলি সব নিভে গেল। শত্রুরা এবার তাদের আর দেখতে পাবে না।

পুলটি ছিল লম্বা, তিনটি ভিত্তিস্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। তাহির পুলের পার্শ্ববর্তী গরাদ পেরিয়ে নীচে ঝুঁকে দেখল: এই যে তাদের তীরের কাছে পুলের প্রথম ভিত্তিস্তম্ভ। এখানে সে উমুরজাক বাদে বাকী সবাইকে দাঁড় করাল। উমুরজাক আরো দূরে চলে গেল যেখানে দাঁড়িয়ে তার পাহারা দেবার কথা। তাহির লোকেদের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল তারা যেন কুড়ুলের সাহায্যে চটপট পুলের কাঠের ওপরে স্তরটা তুলে ফেলে আর তখুনি শুকনো কাঠের ওপর তেল ঢেলে দেয়। নিজে আগুন জ্বালাতে বসল বৃষ্টি থেকে শুকনো খড়কুটো আড়াল করে। কয়েক বার ব্যর্থ চেষ্টার পর চকমকি দিয়ে আগুন জ্বালাল আর তখুনি বিকট ধোঁয়ার গন্ধ নাকে এসে লাগল। তেলের ঘানিতে কাজ করা লোকটি খুবই চটপটে, একটা কাঠের টুকরো জ্বালিয়ে দিল। তাহির যে দড়ির ফেঁসোগুলো বইছিল এতক্ষর ধরে, তাতে আগুন লাগিয়ে দিল এবার।

পুলের ওপরের তক্তার আচ্ছাদনের ওপরে সামান্য একটু আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু হাওয়া বইল আর বৃষ্টির ফোঁটা নিভিয়ে দিল সে আগুন।

'তেলটা বড় বাজে, জ্বলছে না,' গজগজ করল মাহ্‌মুদ।

'বৃষ্টি হচ্ছে তো,' তেলের ঘানির লোকটি বলল। 'এটুকু যে পাওয়া গেছে তাই কপাল ভাল বুঝলি।'

'আস্তে,' ফিসফিস করে বলল তাহির, 'খড়কুটোটা জ্বলুক।'

তাহির তাড়াতাড়ি দুটি কোমরবন্ধকে কষে বাঁধল, তার একপ্রান্ত নিজের কোমরে বাঁধল আর অপর প্রান্ত বাঁধল পুলের গরাদে। তারপর গরাদ পেরিয়ে ঝুলে পড়ল, পা দিয়ে দিয়ে ভিত্তিস্তম্ভটা খুঁজে পেয়ে তার আড়কাঠের ওপর দাঁড়াল। এখন পর্যন্ত বৃষ্টির ছোঁয়া না লাগা কাঠটার ওপর শুকনো খড়কুটোর গাদা রাখল, তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু খড়কুটো খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে গেল, হাওয়ার দমকা এসে আগুনের ফুলকিগুলো উড়িয়ে নিয়ে ফেলল জলের মধ্যে।

ওপরে লাফিয়ে উঠে তাহির প্রচন্ড রাগে কুড়ুল তুলে নিয়ে গরাদ কাটতে লাগল।

'নে, নে জ্বলছিস না যখন! এই নে, নে!'

তেলের ঘানির লোকটিও কুড়ুল তুলে নিয়ে অন্য দিকে গরাদটা কোপাতে লাগল।

'আরে দাঁড়া, তাহির কী হবে এতে? চীৎকার করে উঠল মাহ্‌মুদ। 'কুড়ুলটা আমায় দে দেখি বরং। এই দেখ, এই তক্তাগুলো পেরেক দিয়ে আঁটা — আমরা ঐ তক্তগুলোকে উপড়ে উপড়ে ফেলে দেব।'

এটা একটা উপায় হতে পারে? অন্ধকারে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না কোথায় পেরেক, কিন্তু মাহ্মুদ হাতের ছোঁয়ায় সেগুলোকে খুঁজে পাচ্ছে। দু'জনে মিলে অবশেষে একটা বিরাট তক্তা খুলে ফেলল যেটা পুলের ওপর আড়াআড়িভাবে লাগান ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় তক্তাটা খুলে ফেলতে শক্তি কুলোল না আর।

'আয় ভাই, করাত দিয়ে কাটি।' বলল মাহ্মুদ।

আড়াআড়ি বসান কাঠটা করাত দিয়ে কাটতে লাগল।

'তাড়াহুড়ো করিস না!' বলল তাহির। 'একই কথা, আড়াআড়িভাবে পাঁচ-ছটা তক্তা খুলে ফেলে এমন কিছুই ক্ষতি করতে পারব না আমরা।'

'কেন? এমন একটা গর্ত করে ফেলব যে ঘোড়া বা বাড়ী যেতে পারবে না।'

'যে কোন ছুতোর ঝটপট তা মেরামত করে ফেলবে। তুই কি ভাবিস ওদের ছুতোর নেই নাকি?'

'আমরা একটা অর্থহীন কাজ করতে লেগেছি মনে হচ্ছে!' গোমড়ামুখে বলল তেলের ঘানির ছেলেটি।

মাহমুদ প্রচণ্ড রাগে বলল:

'তাহলে আর কি... এবার নীচের ভিত্তিস্তম্ভের আড়াকাঠ কেটে দিয়ে যাই!'

'ওগুলো গোটা গোটা গাছের গুঁড়ি, ঠাট্টা নাকি? বেঢপ মোটা। ওগুলোকে কাটা যাবে না!'

'কেটে ফেলব,' উত্তেজিত হয়ে উঠল তাহিরও।

দু'জোড়া করে ছেলেরা পালা করে করে করাত হাতে নিয়ে ভিত্তিস্তম্ভের আড়কাঠগুলি কাটতে লাগল। উষ্ণ বৃষ্টিধারা ফোঁটা ফোঁটা পড়েই চলেছে, কিন্তু জোরে নামছে না; কাজ করতে থাকা ছেলেগুলির ঘামের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বৃষ্টি— শেষে তাদের পোশাক ভিজে গেল একেবারে। ছেলেগুলি ভেবেছিল দু'তিন জায়গায় আড়কাঠ কেটে দেবে, যাতে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত না থাকে, কিন্তু তারা বুঝছিল না তাদের পরিকল্পনা যদি সফল হয় তো তারা সবাই এই গাছের গুঁড়ি আর তক্তাগুলোসমেত কুভাসাইয়ের জলে পড়বে হুড়মুড়িয়ে। কিন্তু পুল তাদের প্রত্যাশামত ভেঙে পড়ল না। আরো কিছু পেরেক, আড়কাঠ তাকে ধরে রেখেছে। তাহির আর মাহমুদ আবার কুড়ুল তুলে নিল। এক জায়গায় পুলটা হঠাৎ মড়মড় করে উঠল, একটু বেঁকে গেল, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল আগের মতই।

'হয়েছে!' বিধ্বস্ত মাহমুদ বলল, 'এ পুল ভাঙা আমাদের কর্ম নয়!'

'চুলোয় যাক!' বলল তাহির, তারপর আবার গরাদ কাটতে লাগল। এমন সময় উল্টো দিক থেকে উমুরজাক ছুটে এল :

'শেষ কর। অমন দুমদাম অওয়াজ কোরো না। মনে হচ্ছে শত্রুরা রওনা দিয়েছে এবার।'

'তুই দেখলি?'

'শুনলাম চীৎকার: 'ঘোড়ায় চড়!' 'সারি বাঁধ...' তার মানে, শীগগিরি এদিকে এসে পড়বে ওরা!'

'পালাবার জন্য ব্যস্ত হোস না করাত নে। কোন কিছু ফেলে রেখে যেও না এখানে!' আদেশের সুরে বলল তাহির, তারপর বাকী পড়ে থাকা খড়কুটোগুলো, কাঠের টুকরোটাকরা সব জলে ফেলে দিল।

পাঁচটি যুবক ব্যর্থতায় হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল। পুবদিকে আকাশ লাল হয়ে আসছে।

৩

সেহরীর পরে শত্রুসৈন্য এগোতে আরম্ভ করল। অগ্রগামী দলটি পুলের ওপর এসে উঠল যখন তখনও ভোরের কুয়াশা কাটেনি। জোরে বৃষ্টি হয়েছে কেবল এখানেই নয়, হয়েছে পাহাড়ে, তাই কুভাসাইয়ের জল অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে, প্রচন্ড দ্রুত গতিতে সে জলধারা ছুটে চলেছে। অগ্রগামী দলের অশ্বারোহীরা সহজেই পুল পেরিয়ে গেল, সংখ্যায় তারা অল্প, একজন একজন করে সারি বেঁধে যাচ্ছিল।

তার পরের সারিগুলো যাচ্ছিল গোটা পুলটা ভরে গায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। অনুচররা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল লুঠকরা মালপত্র উটেটানা গাড়িতে করে। অশ্বারোহী দল, গাড়ি, উটের দল — এসব কিছুকে যেন প্রত্যূষের ম্লান আলোয় ধোঁয়াটে মেঘের মত মনে হচ্ছে। যেন কালো ময়লা জলের প্রবাহ এসে ঢেকে দিয়েছে পুলকে।

সেই ভিত্তিস্তম্ভটা যেখানে কুভার যুবকরা কেটে রেখেছিল মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। এমন সময় আবার একটা ঘোড়ার পা আটকে গেল দুটি তক্তার মাঝে এক গর্তে। ঘোড়াটা পা ছাড়িয়ে নেবার জন্য টানাটানি চেঁচামেচি করতে লাগল। তার পিঠে চড়ে থাকা লোকটি আচমকা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল পুলের ওপর পিছন থেকে আসা ঘোড়াগুলির পায়ের নীচে। সামনে পুলের তক্তা ভাঙার মড়মড় আওয়াজ, পুলে পড়ে যাওয়া লোকটির প্রচন্ড আর্ত চীৎকার ঘোড়াগুলোকে ভয় পাইয়ে দিল। তারা পিছিয়ে আসতে লাগল, সারি ভেঙে সব একাকার হয়ে গেল।

ওদিকে পিছন দিক থেকে ক্রমশ ঠেলা আসছে তো আসছেই। এই ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলিতে পুলের ওপর চলাচল একেবারে থেমে গেল, তার ফলে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহন ও লোকের ভার সামলাতে পারল না পুল, হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল; ঘোড়া, লোকজন, গাড়ী গুঁড়ি তক্ত সব কিছু নদীর কবলে পড়ল, জলের উচ্চতা এদিকে উঠে এসেছে পুলের নীচের আড়কাঠ পর্যন্ত প্রায়।

যারা পুলের ওপর ছিল—পিছু হাঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু পিছন দিক থেকে তখন

চাপ আসছে। এখনও পুলভাঙার খবর না পেয়ে সিপাহসালার যাদের পাঠাচ্ছেন তার ক্রমশ এগোবার চেষ্টা করছে। ধাক্কাধাক্কিতে লোক পড়ে যাচ্ছে নদীতে— তাদের মরীয়া চীৎকার জানান দিচ্ছে নদীর নতুন বলির কথা। পুলের বেশ কয়েক জায়গায় গরাদ না থাকার ফলে নদীস্রোতে পড়ে যাচ্ছে বেশ কিছু লোক। বোঝাইকরা গাড়িগুলো একে অন্যের ওপর উঠে যাচ্ছে, পথ আটকে দিচ্ছে, তাদের পুলের গরাদে একেবারে ঘেঁসিয়ে দিচ্ছে ঠেলাঠেলি করে, গরাদের বাকী অংশগুলিও ভেঙে তারা ভারী আওয়াজ তুলে নিচে গিয়ে পড়ছে। কেউ কেউ চাবুক চালিয়ে পথ করে নিতে চাইল, কেউ কেউ আতঙ্ক বন্ধ করার জন্য তলোয়ার হাতে তুলে নিল, কিন্তু নদীতে ধসে পড়া লোকজনের সঙ্গে তাদেরও স্থান হল নদীতে।

যানবাহন লোকজনের জটটা আরো পাকিয়ে উঠল। আরো বেশি করে লোক মরতে লাগল।

সমরখন্দের বাদশাহের কাছে পুলের দুর্ঘটনার খবর পাঠানো হল। সুলতান আহ্মদ নিজের দেহরক্ষীদের মধ্য থেকে লোক পাঠালেন নদীতে পড়া লোকদের বাঁচবার জন্য। এ হল আর এক ভুল। লোকগুলি নলখাগড়ার ঝোপ পেরিয়ে নদীর পাড়ের আরো কাছে এগিয়ে গেল, আর ডুবে যেতে লাগল জলার মধ্যে। তাদেরই এখন বাঁচাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল— দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তুলে আনা হল কয়েকজনকে, আরও অনেক ডুবে গেল জলার মধ্যে।

আরো অনেকে জলাভূমির কবলে পড়ল যারা নদীতে পড়েও ভাল সাঁতার জানার ফলে স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে তীরের জলাভূমিতে পৌছায়, সেখানেও বিশ্বাসঘাতক আলগা মাটির কবলে পড়ে তারা নিস্তার পেল না। নদীস্রোত ও জলাভূমি রূপকথার ডাইনের মত গ্রাস করছিল লোক, ঘোড়া, উট সবকিছু। নদীতে পড়া লোকেদের চীৎকারের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছিল জলাভূমিতে মরতে বসা লোকেদের চীৎকার। পুলের ওপরও বেশ কিছু লোক পদদলিত হয়ে মরে পড়ে রইল।

সমরখন্দের সুলতান আহমদের সৈন্যবাহিনীর দু' তিন ঘন্টায় যা ক্ষতি হল যুদ্ধের একেবারে শুরু থেকে এ পর্যন্ত তেমনটি হয়নি।

এছাড়া এমন দুর্ঘটনার কারণও কেউ জানত না, তাই সবাই বলতে লাগিল যে আল্লাহ্ ফরগানাবাসীদের পক্ষে, শত্রুপক্ষকে শাস্তি দিয়েছেন তিনি।

৪

কুভাবাসীরা ছাতে, বারান্দায় উঠে দেখতে লাগল পুলের ওপর সৈন্যবাহিনী কেমন করে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে— সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মরছে লোকে। অনেক কুভাবাসী মনে মনে দোয়া করছিল যেন আল্লাহর গজবের শীঘ্র উপশম না

হয়। আবার কিছু লোক দুঃখ পাচ্ছিল: হায়, হায়! জোয়ান জোয়ান লোক ডুবে মরছে নদীতে, জলায়।

গতকাল সন্ধ্যায় তাহির মামাকে একটু ইঙ্গিতে জানিয়েছিল পুলে তাদের অভিযানের কথা,আর ভোরবেলায় বলেছে যে তাদের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। যখন মুল্লা ফজলুদ্দিন বাড়ির ছাত থেকে দেখলেন পুলের ওপর কী ঘটছে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে৷ তিনি ইঙ্গিতে তাহিরকে উঠানের এক কোণে ডেকে বললেন:

'বন্ধুদের গিয়ে বল এখুনি সবার লুকিয়ে পড়া দরকার।'

'কেন, মামা?'

'কাল তোরা পুলটার যেখানে আড়কাঠ কেটেছিস সেখানেই ভেঙে পড়ছে ওটা। তোরা যদি পুলটা জ্বালিয়ে দিতিস তাহলে ওদের এত ক্ষতি হত না, একটু সারিয়ে নিয়ে আবার এগোতে পারত। আর এমন ফাঁদে পড়ার পরে বুঝতে বাকী থাকবে না এ কার কাজ। পুল সারিয়ে এ পারে আসবে যখন তোদের সবাইকে কেটে ফেলবে! আমাদেরও সেই সঙ্গে!'

'কিন্তু ওরা এখনওতো ওই পারে?'

'চররা এপারে পৌঁছে গেছে দেখেছি আমি ... কথা বলে সময় নষ্ট করিস না, কাজে লাগ্! নলখাগড়ার বনে গিয়ে লুকিয়ে পড়। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি...'

মামার উপদেশ জানাল তাহির বন্ধুদের: 'দড়ি আর কাস্তে নিও সঙ্গে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বলবে কাঠ কাটতে যাচ্ছি। দু'তিন দিনের মত খাবার নিও সঙ্গে।

পাঁচজন যুবক যাতে কাবুর চোখে না পড়ে এমনিভাবে একে একে গ্রাম ছেড়ে গেল। নলখাগড়ার গভীর, অভেদ্যপ্রায় বনে গিয়ে মিলিত হল তারা।

শত্রুর চরেরা ইতিমধ্যে মোড়লকে খুঁজে বার করে তার সাহায্যে কুভার যত ছুতোরকে জড় করে পুলসারাইয়ের কাজে লাগাল। শত্রুসৈন্যরা ওপার থেকে গুঁড়ি তক্তা টেনে টেনে আনতে লাগল।

যারা পুলসারাইয়ের কাজে লাগল, তাদের মধ্যে তাহিরের বাবাও ছিল। সে জানে যে রাতের বেলায় ছেলে কোথায় যেন গিয়েছিল, ঠিক ভোরের আগেই প্রচন্ড ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরে আসে। একজন ছুতোর তাকে দেখাল করাতের দাগ। কিন্তু তাহিরের বাবা মুখে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল:

'এসম্বন্ধে একটা কথাও না! জানতে পারলে আজই কুভা জ্বালিয়ে দেবে। ঘাড়ে মাথা থাকবে না আর আমাদের!'

'ঠিক বলেছেন আপনি!'

দু'দিন ধরে পুলটা সারাবার সময় ছুতোরদের কেউই মুখ খুলল না।

শত্রুসৈন্য সতর্কভাবে পুল পেরিয়ে গেল, সবার শেষে গেলেন সুলতান আহমদ নিজের দেহরক্ষীদের নিয়ে, কুভাতে না থেকে এগিয়ে চললেন আরো।

মালবোঝাই গাড়ীগুলি, উট আর সৈন্য দলের কিছু অংশ ওপারে রয়ে গেল: বোঝা গেল গত দু'দিনে তাদের পরিকল্পনায় কিছু অদলবদল হয়েছে।

নলখাগড়ার বনে বসে শান্তি পাচ্ছে না তাহির: রাবিয়ার জন্য চিন্তা হচ্ছে। সে জানে রাবিয়ার বাবা-মা তাকে ভাল করেই লুকিয়ে রাখবে কিন্তু শয়তান জানে যখন শত্রুর চর ঘুরছে পায়ে পায়ে তখন কখন যে কী হবে। সেইসঙ্গে তৃতীয় দিনে তাদের খাবারদাবারও ফুরিয়ে গেল। বাড়িতে একবার ঘুরে আসা দরকার। সন্ধ্যাবেলায় তাহির এক বোঝা নলখাগড়া নিয়ে রওনা দিল। বাড়ির কাছে এসে দেখে ফটকে শিকলি লাগান, ফটকে এক ফাটল, যা কেবল তারই জানা, তার মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে শিকলটা খুলে ফেলল। উঠোনে আধাঅন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেল মুল্লা ফজলুদ্দিনকে, চালাঘরের ছাঁচতলার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি গাড়ির চাকাটা দেখছেন। কাঁধে নলখাগড়া বয়ে নিয়ে তাহিরকে আসতে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন তার দিকে, হাত তুলে বললেন:

'অভিনন্দন জানাই ভাগনে, শান্তিতে চুকে গেছে সব!'

'লড়াই থেমেছে?'

'আল্লাহ্‌র দোয়ায় থেমেছে।'

বোঝাটা ফেলে দিল তাহির। মামা তাহিরকে বুকে চেপে ধরে আবেগপ্লুত স্বরে ফিস ফিস করে বললেন :

'তোমাদের বীরত্ব বৃথা যায়নি, তাহিরজান! শুনছি সমরখন্দের বাদশাহ নিজেই শান্তির প্রস্তাব দিয়েছে। কুভাসাইয়ে এত সৈন্য হারিয়ে আক্কেল হয়েছে, বোধহয়। আল্লাহ্‌র গজবে পড়ার ভয় হয়েছে।....' ভাগনের বলিষ্ঠকাঁধে হাত বোলাতে বোলাতে বলতে লাগলেন, 'চমৎকার হয়েছে, অপূর্ব! এত এত অতি বুদ্ধিমান ধনী বেগরা শত্রুদের কিছু করতে পারল না আর তোমরা সাধারণ কয়েকটি ছেলে ওদের দারুণ ঠেকিয়েছ... কিসান, হুনরী, ছুতোর ... আর কে ...'

'কলু।'

'হ্যাঁ, কলু!' খুশিতে জোরে অট্টহাসি হেসে উঠলেন মামা, ভাগনেকে আলিঙ্গন মুক্ত করে দিয়ে প্রশংসাভরা চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'কিসান, হুনরীদের... এই তোদের মত লোকেরা নাকউঁচু বেগরা যাদের ডাকে কালো হাড় বলে এই 'কালো হাড়' না থাকলে কে আজ এই বিপদ থেকে বাঁচাত ওদের? কে?'

'আরে আমরা নিজেরাও বুঝতে পারিনি এমন চমৎকার হবে।... আর আপনি এসে পড়ায় খুব ভাল হয়েছে... আপনি না বললে আমার মাথায়ও আসত না...'

'খুব ব্যাপার ঘোরাতে জানিস দেখি, ভাগনে! আমাকেও সেই সঙ্গে আসমানে তুলে দিলি!'

মুল্লা ফজলুদ্দিন কথা বলেই চলেছেন দ্রুত উত্তেজিতভাবে, কখনও জোরে আবার কখনও গলা নামিয়ে, যেন এখনও কোন বিপদের ভয় রয়েই গেছে।

'মামা, কুভাতে ওরা আছে একনও?'

'আছে। সৈন্যদল যাচ্ছে এখনও, পাহারা ওঠায়নি। আন্দিজান থেকে চার ক্রোশ দূরে তাদের শাসক সন্ধি করেছে, এবার ফিরে গেছে তারা। তার রক্ষীদের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই নদীর অপর তীরে পৌঁছে গেছে আমি নিজচক্ষে দেখেছি। সুলতান তাদের সঙ্গে আছে কি নেই তা জানি না, বাকিরাও শীগগিরি পৌঁছে যাবে এখানে। এখনও সতর্ক থাকতে হবে তাহিরজান। শত্রু আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে পিছু হঠার সময়। বড়ির ভেতরে যা। লোকেদের সামনে বেরোবার দরকার নেই!'

নিজেদের গায়ের থেকে খড়কুটোগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল তাহির, পাশের বাড়িতে ছোট বাচ্চাকে ঘুমপাড়ানর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তখুনি তাহিরের মনে পড়ল রাবিয়ার কথা, বুকের মধ্যে ধকধক করে উঠল। ওর জন্য এখন মন কেমন করছে! সম্ভব হলে সে পাঁচিল পেরিয়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে ঢুকত। রাবিয়াকে বলতে যে যুদ্ধ থেমে গেছে। হয়ত ও এখনও জানে না সন্ধির কথা। ওর খুশিমুখ দেখতে পেত! না, না, ও এমন করবে না, বরাবরের মত রাবিয়ার সঙ্গে গোপনে, নির্জনে দেখা করবে।

তাহির বাড়ির ভিতর ঢুকে বাবামাকে সন্ধির জন্য অভিনন্দন জানানো মাত্রই শোনা গেল কুকুরের ডাক, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর ফটকে ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ। বিচালি ঘরে যাওয়া দরকার শীগগির!

খঞ্জরের হাতলটা চেপে ধরে বিদ্যুৎগতিতে সে বারান্দার মধ্যে দিয়ে এক মুহূর্তে গোপন জায়গায় পৌঁছে গেল, জায়গাটা শুকনো নলখাগড়ার বোঝায় ঢাকা।

দরজায় জোরে ধাক্কা চলতেই থাকল। খুলতেই হল দরজা। শিরস্ত্রাণ পরা একদল অশ্বারোহী সৈন্য, ঘোড়ার জিনের সঙ্গে ফিতে দিয়ে ধনুক বাঁধা, চওড়া সালোয়ার এসে পড়েছে উঁচু জুতোর ওপর, উঠোনে এসে ঢুকল। দু'জন বসেছিল একটা কালো ঘোড়ার ওপর । কোন কথা না বলে চারদিকে তাকাল যেন বাড়ির মালিককে দেখতেই পাচ্ছে না।

সৈন্যদলের ওপরওয়ালা শিরস্ত্রাণের সূক্ষ্ম শেষাগ্রে সবুজ কাপড়ে ছোট পতাকা লাগান, চালাঘরের ছাঁচতলার কাছে জিন না পরানো ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে দেখে কালোঘোড়ায় বসে থাকা দু'জনকে বলল:

'ঐ যে — তোর জন্য।'

ঝাঁকড়া গোঁফ, নিগ্রোর মত কালো চেহারার লোকটি লাফিয়ে মাটিতে নেমে ঘোড়ার দিকে ছুটে গেল। বাকীরা ওপরওয়ালার ইঙ্গিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। উঠোনে টেনে বার করতে লাগল নতুন নতুন যত চাদর, গালিচা, কতকগুলো পুঁটলি।

মুল্লা ফজলুদ্দিন বারান্দার থামে হেলান দিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দেখছিলেন কী ঘটছে। প্রথমটা উনি ভেবেছিল সৈন্যরা এসেছে তাহিরকে খুঁজতে। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরা অতি সাধারণ লুঠেরার দল। ঘৃণ্য, হীন। তাহিরের বাবামা দিশাহারা, স্তব্ধ। আর থাকতে না পেরে মুল্লা ফজলুদ্দিন বললেন:

'এই যে হাবিলদার সাহেব!' সর্দার তখনও উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। 'বিবেক নেই তোমাদের? আমাদের বাদশাহদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি হবার পর ইসলামের আইন অনুযায়ী এমন লুঠপাট করা অন্যায়!'

কালো ছেলেটি মুল্লা ফজলুদ্দিনের ঘোড়ায় জিন পরিয়ে তাড়াতাড়ি চড়ে বসে হেসে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ সন্ধি ...' তারপর আবার ব্যাঙ্গ করে বলল 'নিশ্চয়ই — আমাদের শান্তি আর উন্নতি হোক!'

অন্যজন জিনিসবোজাই একটা পোঁটলা খুলে রেশমী কাপড়ের একটা টুকরো বার করে সর্দারের হাতে তুলে দিল।

'আপনার ভাগ।'

সর্দার মুল্লা ফজলুদ্দিনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অলস ভঙ্গিতে কাপড়ের টুকরোটা জিনের পাশ বাঁধা থলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, তারপর অলসভাবে, আস্তে আস্তে বলল, তার উচ্চারণে বোঝা যায় যে সে সমরখন্দের লোক।

'আমাদের ষাটটা ঘোড়া মড়কে মরেছে। এমনি বিপদ! তুই ঘোড়ায় চড়ছিস আর আমার সৈন্য কি পায়ে হেঁটে যাবে সমরখন্দ তোর মতে? দু'জন সৈন্য একটা ঘোড়ায় বসেছিল দেখলি তো!'

'দেখেছি। নিন, যদি চান। কিন্তু ওই ঘোড়াটা গাড়ীটানার জন্য, ওর ওপরে জিন চাপানর জন্য নয়। যদি মনে করেন যে ঐ বীর সৈন্যকে ঘোড়াটা সমরখন্দ পৌঁছে দেবে তা নিন। কিন্তু মেয়েদের পুঁটলির মধ্যে হাটকাহাঁটকি করা? এ কি আপনার মত খানদানী লোকের উপযুক্ত কাজ?'

'আরে, আমাদের বিবিরা বলেছে ফরগানার রেশমের কাপড় উপহার আনতে। এত কষ্ট ঝামেলা করে এত দূরে এসেছি, এখন কি খালি হাতে ফেরা যায়? তোর মতে সেটা কি উপযুক্ত কাজ হবে?'

সর্দারটি ঘোড়ার রেকাবে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল একটু, ক্রুদ্ধ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। বিজয় ছাড়াই যুদ্ধ শেষ হওয়ায় সে অসন্তুষ্ট, আর বোঝা যাচ্ছে যে বড় রকম লাভের কথা ভেবে তারা এত রক্ত দিয়েছে আর যাত্রাপথের সব কষ্ট মুখ বুঁজে সহ্য করেছে তা তাদের ভাগ্যে জোটেনি। আন্দিজান আর আখসি অধরাই রয়ে গেল, কুভার পুলের ওপর ঐ ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধি হল। তাতে হল কী? সমরখন্দের শাসক পেলেন সোনা, রুপো, মণিমাণিক তেজীয়ান ঘোড়া, উট। এসবের ভাগ পেলেন তিনি

আর তাঁর ঘনিষ্ঠ বেগরা, উপদেষ্টারা, দরবারের কর্মচারী আর তাঁর দেহরক্ষীরা। আর এই হাবিলদারটির মত যোদ্ধারা পথে গ্রামগঞ্জে লুঠ করা সামান্য কিছু জিনিস ছাড়া ভাল কিছুই পেল না।

এই দলেরই পাঁচজন লুঠেরা রাবিয়াদের বাড়ীর উঠোনের গিয়ে ঢুকল। যে বিচালিঘরে তাহির লুকিয়েছিল তার দেওয়াল আর পাশের বাড়ীর বিচালি ঘরের দেওয়াল একই। ওদের বাড়ীতে কেমন গোলমাল আরম্ভ হল তা শোনা যাচ্ছে।

রাবিয়া মেয়েমহলে লুকিয়েছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই সে গোরু দুইতে বেরোল— সন্ধিচুক্তির কথা সেও জানতে পেরেছে বাছুরটাকে গোরুর কাছে এগিয়ে দিল যাতে গোরু দুধ দেয়। এইসব কাজে ব্যস্ত থাকায় যখন সৈন্যরা ছুটে এসে ভেতরে ঢুকেছে দেখতে পেল অনেক দেরী হয়ে গেছে তখন।

তার মা দৌড়ে এল গোয়ালের কাছে, 'হায় মরণ আমার। তুই এখনও এখানে!'

'কী হয়েছে, মাগো?

'দুশমন! দাঁড়া! উঠোনে বেরোস না!... ঐ ওপর উঠে ওপরের ঐ ছোট জানালাটা দিয়ে বিচালি ঘরে ঢুকে যা!'

গোয়ালঘরের দরজায় দু'জন সৈন্য দেখা দিল, ঘোড়া খুঁজছে তারা নিজেদের জন্য ছোটছোট চোখ তুর্কভাষী কিপচাকটির চোখে পড়ল একটি মেয়ের শরীর, ঝট করে বিচালিঘরে ঢুকে গেল।

'খুবসুরত মনে হচ্ছে!'

'ঘোড়া নেই,' হতাশ সুরে বলল তার সঙ্গী।

'খুবসুরত ছুকরীর দাম ঘোড়ার চেয়েও বেশি ... এই, দাঁড়া!' চীৎকার করে রাবিয়াকে বলল সে। 'ওকে সমরখন্দে নিয়ে গিয়ে ফজিলবেগকে বেচে দেব।'

মা ছুটে এসে নিজের দেহ আড়াল দিয়ে চেপে ধরল বিচালিঘরে যাবার পথটা।

'যদি তোমরা মুসলমান ধর্মাবলম্বী হও তো আমার মেয়েকে ছুঁয়ো না! যদি চাও, আমায় মার! আমার মেয়ের দিকে এগিও না! বাগদত্তা ও! এক অতি চমৎকার জোয়ান ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়ার কথা!'

খুদে চোখ লোকটি ক্ষেপে উঠল। 'মেয়েটি বাগদত্তা, বিয়ের যুগ্যি!' তার মতে এর জন্য বেশি দাম পাওয়া যাবে। এক ধাক্কা দিয়ে রাবিয়ার মাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল। পড়ে গিয়ে গোরুর ডাবায় মাথা ঠুকে জ্ঞান হারাল রবিয়ার মা। ছোটচোখ লোকটি বিচালি ঘরে গেল এবার। চটপটে রবিয়া ততক্ষণে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে উঠোনে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে পড়ল অন্য বদমাশের হাতে। প্রথম জনও সেদিকে ছুটে গেল। দু'জনে মিলে রাবিয়ার হাত মুচড়াতে লাগল। তৃতীয়জন ঘোড়ার জিন থেকে খুলে নিয়ে এল একটা লম্বা বস্তা, সেটাকে মেলে ধরে আছড়াআছড়ি করতে থাকা মেয়েটির দিকে এগোতে লাগল যেন লক্ষ স্থির করছে। রাবিয়া বুঝল

এবার তার মাথার ওপর বস্তা ছুঁড়ে দেবে, তাই সর্বশক্তি দিয়ে চীৎকার করতে লাগল সাহায্য পাবার আশায়।

তাহির দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে নিজের বাড়িতে লুঠপাট। কিন্তু রাবিয়ার চীৎকারে সে সব সতর্কতা ভুলে গেল! বিচালিঘর থেকে বেরিয়ে সে তাদের দুই বাড়ির মাঝের দেওয়ালের ওপর লাফিয়ে উঠল। পাঁচিলের ওপর থেকে সব দেখতে পেল কী ঘটছে: একজন সৈন্য রাবিয়ার পাগুলো চেপে ধরেছে দারুণ জোরে, আন্যজন তার হাতগুলো পিঠের দিকে পাকিয়ে শক্ত করে ধরে আছে আর তৃতীয়জন তার মাথার ওপর বস্তাটা তুলে ধরেছে। তাহির প্রচন্ড চীৎকার করে লাফ দিল। পাঁচজনের বিরুদ্ধে একজন— চতুর্থ জন ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে, আর পঞ্চম জন বর্শা হাতে নিয়ে ঘোড়ায় বসে আছে, সেকথা তাহির ভাবে নি তার মাথায় কেবল এক চিন্তা — বদমাশটাকে মেরে রাবিয়াকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কথা। ছুটতে ছুটতেই খাপ থেকে খঞ্জরটা খুলে নিল সে।

'এই, দাঁড়া! দাঁড়া বলছি!' বর্শা হাতে সৈন্যটা ঘোড়া ছোটাল।

দু'লাফে উঠোন পেরিয়ে গেল তাহির। রাবিয়াকে ধরে থাকা সৈন্যগুলির দিকে এগিয়ে গিয়ে ছোটচোখ সৈন্যটির পাঁজরায় খঞ্জরটা ঢুকিয়ে দিল একেবারে হাতল পর্যন্ত, তারপর ছাড়িয়ে নিল খঞ্জরটা। তারপর কাঁধে দারুণ আঘাত অনুভব করল, শুনল বর্শাটা কেমন করে তার জামাটা ছিঁড়ছে। টলে উঠে তাহির, যে লোকটিকে সে মেরেছিল তার ওপরই পড়ে গেল। পড়তে পড়তে সে শুনতে পেল রাবিয়ার উন্মত্ত চীৎকার:

'হায় তাহির-আগা!' কিন্তু মনে হল যে চীৎকারটা ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে।

রক্তমাখামাখি হয়ে সে সেখানেই পড়ে রইল। রাবিয়াকে হাতপা বেঁধে ওরা নিয়ে চলে গলে। ...

ওশ

১

ওশের প্রান্তে উঁচু পাহাড় আর সবুজ সমতলভূমির এই অপূর্ব মিলনস্থলে আজ কয়েকদিন হল প্রাণের সাড়া জেগেছে। আন্দিজান থেকে উটের পিঠে করে বয়ে আনা জাঁকজমকপূর্ণ ছাউনি ফেলা হয়েছে বারাতাগ পাহাড়ের নীচে, জান্নাত-আরিক নদীর ধার বরাবর। আকবুরাসাইয়ের তীর বরাবরও শতশত ছাউনি পড়েছে সবুজ মাঠের ওপর। পাহাড় থেকে তাড়িয়ে আনা চমৎকার দুম্বা-ভেড়াগুলোকে মারা হয়েছে। ভাল

শিককাবাব করার জন্য আঙটায় জ্বলছে পেস্তাকাঠের কয়লা, বড় বড় লোহার ডেকচিতে মাংস সিদ্ধ হচ্ছে।

বাবরের অপেক্ষায় আছে সবাই।

মির্জার অপেক্ষারত সরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে মুল্লা ফজলুদ্দিনও আছেন। আজই তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।

ধূর্তামি ক'রে উজীরে আজম হয়ে ইয়াকুববেগ মুল্লা ফজলুদ্দিনকে অনেক দিন ধরে যেতে দিচ্ছিলেন না বাবরের কাছে। জাহাঙ্গীরের পক্ষে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে ধরা পড়ে ইয়াকুববেগ— আহমদ তনবালই তাকে ধরিয়ে দেয়। শাস্তির ভয়ে ইয়াকুববেগ আন্দিজান ছেড়ে পালিয়েছে। কাসিমবেগের নেতৃত্বে সৈন্যরা তাকে তাড়া করে ফিরেছে দিনরাত, শেষে সির-দরিয়ার তীরে ধরে ফেলে মুখোমুখি তীর বিনিময়ে মেরে ফেলে। কাসিমবেগ হলেন উজীর, তাই মুল্লা ফজুলুদ্দিন মির্জলা বাবরের কাছে যাবার অনুমতি পেলেন।

বড় কোন নির্মাণকার্যের জন্য, সেই মাদ্রাসাগুলি যাদের মরহুম উমরশেখের নির্দেশে যে সব মাদ্রাসার নকশা তিনি তৈরি করেছিলেন সেগুলি নির্মাণের মত মালপত্র ফরগানাতে নেই বর্তমানে। এই অসফল যুদ্ধই সব গ্রাস করল, বললেন বাবর। মুল্লা ফজলুদ্দিনকে তিনি দায়িত্ব দিলেন ওশের সবচেয়ে উঁচু শৈলশিরায়, যেটি শহরকে যেন ঠেকো দিয়ে রেখেছে, বারান্দসমেত একটি ছোট হুজরা তৈরি করতে। সেখান থেকে গোটা এলাকাটা চমৎকার দেখা যেত তাহলে। অনেক মাস গেল, হুজরা বহুদিনই তৈরি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মির্জা বাবর এ পর্যন্ত ব্যস্ত থাকায় আজই প্রথম এখানে আসবেন ভেবেছেন। যদি তাঁর পছন্দ হয় হুজরাটা তবে মুল্লা ফজলুদ্দিনের আরো বড় বড় পরিকল্পনা কার্যকরী হবার পথ খুলে যাবে। আর যদি মনে না ধরে... ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন মুল্লা ফজলুদ্দিন। হুজরাটা মির্জা বাবরকে দেখান উচিত চমৎকার করে সাজান অবস্থায়।

আগে থাকতেই শাহি কারিন্দাদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্থপতি তাদের সঙ্গে নীচে গেলেন, নিজে বেছে নিলেন গালিচা ও বসবার আসনগুলি। এমন খাড়াই বেয়ে উঠতে অনভ্যস্ত নোকররা সেসব জিনিস পাহাড়ের ওপরে বয়ে আনতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। স্থূলকায় চোপদারটি (বইছে তো কেবল রুপোর এক সরুমুখ কাশগরী বদনা) প্রতি দশ কদম অন্তর বিশ্রাম করার জন্য থামছে। মুল্লা ফজলুদ্দিনের মায়া হল তার জন্য, তার কাছ থেকে বদনাটা নিয়ে তার হাত ধরে তাকে ওপরে নিয়ে গেলেন।

চোপদার বারান্দার সিঁড়ির ওপর রংচঙা গালিচা বিছিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুল্লা ফজলুদ্দিন সেটি তুলে নিতে বললেন, পাথরের ওপর ফুলের নকশার কাজ— যে-কোন গালিচা থেকে তা অনেক ভাল দেখাচ্ছে।

পাহাড়ের চূড়া থেকে ওশ শহর আর আশপাশটা দেখাচ্ছে যেন হাতের তালুর মধ্যে সবকিছু। চোপদার তখনও হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে নীচে তাকাল আর তখুনি লাফ দিয়ে উঠল :

'ঐ যে ওঁরা এসে গেছেন!'

মুল্লা ফজলুদ্দিনও বারান্দার কিনারে এসে নীচে তাকালেন।

বাবর সাদা ঘোড়ায় চড়ে বেক, অনুচরবৃন্দ ও ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের নিয়ে এগিয়ে আসছেন পাহাড়তলির দিকে। দ্বিতীয় দলের আগে আছে তিনটি ঘোড়া জোতা একটি বন্ধ গাড়ি। কে আছে ওতে? গোটা শোভাযাত্রাটা এসে থামল জান্নাত-আরিকের তীরে তরুণ মির্জার বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তৈরী করা ছাউনিগুলির সামনে। দামী রেশম, বনাত গালিচা ভরা, আসল রূপা দিয়ে তৈরি খুঁটির ওপর খাটান এই ছাউনিগুলি ভোজ উৎসব ও বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট, তাই মুল্লা ফজলুদ্দিন ভাবলেন আজ তরুণ মির্জা নিশ্চয়ই ঐ ছাউনিগুলোতে আনন্দ-উপভোগ করবেন, হুজরা দেখতে আসবেন কাল। কিন্তু এক ঘণ্টাও গেল না, দাড়িওয়ালা দেহরক্ষীপ্রধান চারজন সৈন্যকে নিয়ে ওপরে উঠে এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে।

'শাহ্ এখন আসবেন এখানে। পালকি কোথায়?'

দাসদের প্রধান যেন সাহায্যের আশায় ফিরল মুল্লা ফজলুদ্দিনের দিকে। মোটা তসরকাপড়ের নীল চোগার বুকের কাছটা এঁটে বুকের ওপর হাত জড় করে মুল্লা ফজলুদ্দিন দেহরক্ষীপ্রধানকে বললেন:

'মাফ করবেন হুজুর।'

'কী?'

'আমরা পরখ করে দেখেছি। এই চূড়ায় পালকি তোলা অসম্ভব। এমন কি ইঁটও তুলে আনা হয়েছে একটি একটি করে, সারি বেঁধে লোক দাঁড় করিয়ে। কিন্তু পালকির জন্য চাই চারজন বেহারা।'

দেহরক্ষীপ্রধান জায়গাটি ভাল করে লক্ষ্য ক'রে দেখলেন: তিনদিকে পাহাড়ের খাড়া পাথরের দেয়াল, একদিকে কেবল সরু পায়ে-চলা-পথ এঁকেবেঁকে উঠে গেছে— যা একজন মানুষের চলার পক্ষেই অনুপযুক্ত, আর চারজনের তো কথাই ওঠে না। নোকরদের প্রধানের দিকে ফিরে বলল:

'ঠিক আছে। কিন্তু প্রয়োজনের থেকে বেশি একজন লোকও যেন না থাকে।'

সরুপথটা এসে শেষ হয়েছে ঠিক বাড়িটির সামনে, যেখানে বড় বড় পাথরের আড়ালে দেখা যায় একটা ছোট সমান চত্বর। সেখানে মির্জার হাতমুখ ধোবার জল দেবার জন্য একজন লোক দাঁড় করাতে হবে।

'জনাব, আপনি এই পথ ভাল জানেন, যান বাদশাহকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসুন,' আদেশ দিল দেহরক্ষীপ্রধান।

দেহরক্ষীপ্রধানের অবশ্য নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল মির্জা বাবরের সঙ্গে আসার জন্য কিন্তু এমন খাড়াপাহাড়ে দু'বার ওঠা তার মত ভারী চেহারার লোকের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। তাই মুল্লা ফজলুদ্দিনের সঙ্গে দু'জন সৈন্য দিয়ে নিচে পাঠাল সে, আর নিজে মসৃণকরা একটা পাথরের ওপর বসে পড়ে প্রচণ্ড ঘামে ভিজে যাওয়া মোটা ঘাড়টা মুছতে লাগল।

মুল্লা ফজলুদ্দিন দিনে কয়েকবার বারাতাগ থেকে নামতেন আবার উঠতেন। হালকা, চেপেবসা উঁচু জুতোজোড়া খুব সাহায্য করে সিঁড়ির মাপের মত এক পাথর থেকে আর এক পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে। অভ্যস্ত দ্রুত গতিতে স্থপতি নীচে পৌঁছে গেলেন। এই সাক্ষাৎ তিনি কামনা করেছিলেন, কিন্তু ভয়ও হচ্ছে।

মির্জা বাবর তাঁর অনুচরবৃন্দ নিয়ে পাহাড়টিকে পুবদিকে থেকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন, তারপর দক্ষিণদিকে এসে ঘোড়া থামিয়ে নামলেন। প্রথম দলের পরে আসছে দ্বিতীয় দল — মহিলারা আসছেন বেগেদের থেকে দূরে দূরে। ধীরস্থির কালো ঘোড়ার ওপর সাদা পোশাকপরা বাবরের মা কুতলুগ নিগর-খানুম। একটি ছটফটে ঘোড়া যার কেশর বাদামীরংয়ের, তার ওপর সোনালীকাবাপরনে খানজাদা বেগম বসে আছে। মুল্লা ফজলুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারলেন। হালকাভাবে ঘোড়ার ওপর বসে থাকার ভঙ্গীটি ভারী মধুর, আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ; বুকের ধুকধুকানির গতি দ্রুত হল তাঁর, আগের উদ্বেগের সঙ্গে যোগ হল কি একটা নতুন, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের উদ্বেগ। উদ্বেগে অধীর হয়ে পড়লেন তিনি, যখন মির্জা বাবর ও তাঁর অনুচরদের দিকে এগিয়ে গেলেন সে উদ্বেগ চেপে রাখতে কম বেগ পেতে হল না তাঁকে। তাঁদের থেকে কয়েকপা দূরে থেকে কুর্নিশ করে, বুকের ওপর হাতজোড় করে, চোখ আড়াল করলেন।

মির্জা বাবরের বড় বোন খানজাদা বেগমের অসাধারণতায় বিস্মিত হয়েছেন মুল্লা ফজলুদ্দিন অনেক বারই। চারবছর আগে হীরাট থেকে ফিরে যখন আন্দিজানে উমরশেখের জন্য বাগানবাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করেন খানজাদা বেগমের তখন ষোলবছর বয়স পূর্ণ হয়। খানজাদা বেগম শাহ্ পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সেরা সুন্দরী। একবার মুল্লা ফজলুদ্দিন প্রচণ্ড অবাক হয়েছিলেন দেখে যে খানজাদা বেগ পুরুষের পোশাক পরে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে ভাইয়ের অনুচরবৃন্দদের সঙ্গে চৌগান* খেলতে লাগলেন। সে কি খেলা! কিছুদিন বাদে মুল্লা ফজলুদ্দিনকে আন্দিজান ডেকে পাঠান হয় প্রাসাদের দেওয়ালের কয়েক জায়গায় নতুন করে রঙ করার জন্য তখন তিনি সতেরবছর বয়সী খানজাদা বেগমকে দেখেন মেয়েদের সঙ্গে চাঙ্গা বাজাতে। সেই অস্থির চৌগান খেলোয়াড় চাঙ্গাতে কোমল, সূক্ষ্ম, কঠিন সুর তুলছে আর তাকে এমন কোমল ও সুন্দর দেখাচ্ছে যে সমুল্লা ফজলুদ্দিন সবকিছু ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

---

* ঘোড়ায় চড়ে বল খেলা।

আর একটি ঘটনাও তাঁর কম বিস্ময় উদ্রেক করেনি।... প্রাসাদের দেওয়ালে অলঙ্করণের খসড়া করছিলেন তিনি, এমন সময় খানজাদা বেগম এগিয়ে এসে সাগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগলেন তাঁর কাজ। উত্তেজনায় ফজলুদ্দিনের হাত থেকে বৃত্ত আঁকার যন্ত্রটা খসে পড়ল।

'চমৎকার নকশা এঁকেছেন আপনি, কিন্তু বোধহয় আপনার আঁকায় আমার নজর লেগে গেছে,' বলে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির সব দোষটা নিজের ঘাড়ে নিলেন।

মুল্লা ফজলুদ্দিন মাটি থেকে যন্ত্রটা কুড়িয়ে নিতে নিতে একটা লাগসই উত্তর বার করলেন, 'না বেগম ঠিক তার উল্টো: যে অলঙ্করণে আপনার দৃষ্টি পড়ে, তা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।'

'আমি শুনেছি, মওলানা, আপনি অঙ্কনশিল্পীও?

'স্থপতিকে অঙ্কনবিদ্যা জানতে হয় বেগম।'

'তাহলে, মওলানা, আমার তসবীর আঁকতে চেষ্টা করুন।'

কি অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব। মাওলানা তাড়াতাড়ি চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন যদিও প্রাসাদের এই অংশে তারা ছাড়া আর কেউ নেই, গলা নামিয়ে বলল :

'মনে প্রাণে খুশি হতাম ... কিন্তু...'

'ভয়ের কোন কারণ নেই, আমি কথা গোপন রাখতে জানি!'

'আর যদি এই তসবীর আঁকার জন্য... কেয়ামতের দিনে যখন আমার রুহু তলব করা হবে তখন... কোথায় আমি তা পাব যদি ইহলোকেই হারিয়ে ফেলি? ... আমি যে তা হারিয়ে ফেলছি, বেগম?

খানজাদা বেগম একথার গূঢ় অর্থ বুঝলেন, মোহিনী হাসি হেসে বললেন:

'আমার তসবীরের বদলে যদি আপনার রুহু দিতে হয় তাহলে আমাকে বলবেন, আমি আমারটা দেব এর বদলে!'

... যে ছবিটা তার সিন্দুকের নীচে পড়ে আছে, সেটি তিনি আঁকতে সাহস করেছিলেন সেই মনোমুগ্ধকর ছলাকলাপূর্ণ সুন্দর কথা শোনার পর।...

যুদ্ধের সময়ে গোলমালে আর যুদ্ধ পরবর্তী দিনগুলিতে খানজাদা বেগমের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে।

শেষে, গতবছরের শরৎকালে হঠাৎ খানজাদা বেগম নিজেই তাঁর কাছে বারাতাগে এসে উপস্থিত। বাবর অভিযানে বেরোবার সময় মাকে আর বড় বোনকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন ওশের নির্মাণকার্যের ওপর নজর রাখতে। তাই মেজনমাসে* খানজাদা বেগম ওশ শহরে এসে পৌঁছালেন। বারাতাগ ওশ শহরের প্রান্তে অবস্থিত।

মুল্লা ফজলুদ্দিন তখন কাজ করছিলেন তাঁর একমাত্র শাগরেদকে নিয়ে। প্রতিটি

* হিজরী সালের একটি মাস। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত।

ইট, প্রতিটি তক্তা, জলের প্রতিটি ঘড়া নীচে থেকে ওপরে তোলা হত অতি কষ্টে। মর্মরপাথরের টালি তৈরি করার জন্য মিস্ত্রী ছিল না। টালি কেনার মত সঙ্গতি ছিল না। এ সমস্ত কারণে ভীষণ অসুবিধায় পড়েছিলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন। কিন্তু এ সব অভাবের কথা একটি যুবতীকে বলবেন? যিনি মুক্তোবসান মাথার রেশমী টুপি থেকে আরম্ভ করে লাল, শুঁড়তোলা জুতোজোড়া পর্যন্ত সবকিছু মিলিয়ে কোমলতার প্রতিমূর্তি, সূক্ষ্ম, সম্পূর্ণ, দিব্য সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, তাকে বলবেন ইঁটের কথা? বিহ্বল স্থপতির জিভ সরেনি বলতে।

খানজাদা বেগম নিজেই নির্মীয়মান বাড়িটির নকশা দেখতে চাইলেন মুল্লা ফজলুদ্দিনের কাছে।

'গম্বুজটা ঢাকতে চাচ্ছেন মীনা করা টালি দিয়ে? যথেষ্ট আছে আপনার সে টালি?' নকশার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

মুল্লা ফজলুদ্দিনকে এবার বলতেই হল তাঁর প্রয়োজনের কথা। বাপরে! মেয়ে স্থপতিশিল্পেরও খবর রাখে! কত বই সে পড়েছে!

'মির্জা বাবর অভিযানে জয়লাভ করে ফিরে এসে আব্বা হুজুরের স্বপ্ন সার্থক করবেন,' দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বললেন খানজাদা বেগম। 'আমরা অনেক কিছু নির্মাণ করব আর তার পরিচালনা করবেন আপনি, মওলানা!'

তাঁর গলার মত এমন স্নেহময় স্বর আর কোনদিনও বাজেনি মুল্লা ফজলুদ্দিনের কানে। খানজাদা বেগম! এ এক সুখের প্রতিশ্রুতি,, শাহ পরিবারে এমন একজন আছেন যিনি স্থপতিশিল্পের অনেক কিছু জানেন, তাঁকে সম্মান করেন, বোঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু শুধু সেই কারণেই কি তাঁর মনে বেগমের প্রতি কৃতজ্ঞতার এমন সুখানুভূতি?

খানজাদা বেগম হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

স্থপতি ভালই জানতেন যে খাড়াপাহাড় বেয়ে ওঠার চেয়ে নামা কঠিন। তাই খানজাদা বেগম নামার সময় তিনিও সঙ্গে চললেন। যে সরু পিছল পাথুরে পথটাকে লোকে 'দোজখ পুল' বলত তার কাছে এসে মেয়েটির মসৃণ চামড়ার তলীওয়ালা জুতোটা পিছলিয়ে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে খানজাদা বেগম সামনে চলতে থাকা সহচরীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সহচরীও পিছলে গিয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল। দু'জনেই যেকোন মুহূর্তে ফসকে পড়ে যেতে পারত। মুল্লা ফজলুদ্দিন পাহাড়ী চিতার মত লাফিয়ে পড়লেন তাদের সামনে, দুটি মেয়েকেই ধরলেন। যুবতী সহচরীটি আতঙ্কে তাঁকে আঁকড়ে ধরল। হরিণীর মত ক্ষিপ্র ও কুশলী খানজাদা এক মুহূর্ত তাঁর কোমর জড়িয়ে থাকা পুরুষহস্তটির ওপর ভর দিলেন, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য এনে শান্তস্বরে বললেন 'ধন্যবাদ।' মুল্লা ফজলুদ্দিন অনুভব করলেন খানজাদা বেগমের উষ্ণ নিঃশ্বাস আর আতরের খুশবু। নাকি সে খুশবু আতরের নয়? সেই খুশবু নাকে যেতে তিনি ভুলে গেলেন কে মেয়েটি, কোন পরিবারের। খানজাদা

বেগম ... মেয়েটির ঠাণ্ডা হাতটা শক্ত করে ধরলেন তিনি আর সমান জায়গায় এঁকেবেঁকে যাওয়া পথটা অবধি এসে না পৌঁছান পর্যন্ত ছাড়লেন না হাতটা।

সে ছিল এক অপূর্ব, মায়ার স্বপ্ন, আর স্থায়ী হয়েছিল সে স্বপ্ন ... পায়েচলা পথটার অর্ধেকও না।

পরের দিন খানজাদা বেগম প্রেরিত দুই শক্তিশালী যুবক নির্মারকার্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ওপরে টেনে টেনে তুলতে লাগল। আরো এক সপ্তাহ পরে মীনা করা টালিবোঝাই উট এসে পৌঁছাল। প্রতিটি টালিতে মুল্লা ফজলুদ্দিন দেখতে পেলেন বেগমের প্রতিচ্ছবি। আর সন্ধ্যাগুলিতে যখন তিনি একা হয়ে যেতেন লোহার সিন্দুক থেকে ছবিটি বেরিয়ে আসত তখন।

এখন খানজাদা বেগম তার দিকে এগিয়ে আসছেন দেখে আবার উত্তেজনা অনুভব করলেন, আত্মপ্রকাশ না করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন তিনি।

২

... ঘোড়া থেকে নামলেন মির্জা বাবর; বেশ বড় হয়ে উঠেছেন তিনি, ইতোমধ্যে যুবকে পরিণত হয়েছেন। এমন কি মুল্লার মতে, হাঁটা চলাতেও এসেছে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ ছন্দ। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, তিন বছর হল তিনি তখ্‌তে বসেছেন, চিন্তাভাবনা মানুষের বয়স বাড়িয়ে দেয়। যে-কোন বয়সের মানুষ পুরুষত্ব অর্জন করে। কেবলমাত্র ক্ষীণদেহ আর কাঁধের উঁচু হাড় জানিয়ে দিচ্ছে যে বাবরের বয়স মাত্র পনেরো বছর।

পাহাড়ে ওঠার পক্ষে পনেরো বছর বয়স খুবই সুবিধাজনক। সবাইকে ছাড়িয়ে বাবর পাথরে পা রেখে রেখে সহজেই উঠে যাচ্ছেন, খুব খাড়া অংশগুলিতে একবার মায়ের দিকে একবার বোনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন উঠতে সাহায্য করার জন্য। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পাত্রমিত্রদের অধিকাংশই নিচে রয়ে গেলেন। পথটা সরু হুজরাটাতেও এত লোকের জায়গা হবে না। মির্জার সঙ্গে সঙ্গে উঠছেন তাঁর সব থেকে অন্তরঙ্গ ব্যক্তি উজীর কাসিমবেগ, তাঁর আড়ালে প্রাসাদে তাকে কাবচিন* বলে ডাকা হত। কাসিমবেগের চেহারা স্থূলকায়, তাই সে মাঝপথ পর্যন্ত উঠেই হাঁপাতে লাগল। বাবর একটু থামলেন। কাসিমবেগ ফিরে তাকিয়ে সবার শেষে মুল্লা ফজুলদ্দিনকে ওপরে উঠতে দেখলেন। তাঁকে বললেন :

'এখানে সিঁড়ি খুদিয়ে নেওয়ার কথা আপনার মাথায় এল না জনাব!'

মুল্লা ফজলুদ্দিন সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন :

'যদি বাদশাহের হুকুম হয়...'

---

* তুর্কি ভাষাভাষী এক গোষ্ঠী।

একটা সমান পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে বাবর মৃদু হাসলেন, তরুণসুলভ ভাঙা ভাঙা গলায় স্থপতিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন:

'আশ্চর্য! প্রাসাদের মত পাহাড়চূড়াতেও সিঁড়ি তৈরি করতে হবে নাকি?'

কাসিমবেগ ভদ্রতার সূক্ষ্ম রীতিনীতি না মেনে অভিযোগ জানালেন :

'হুজুর, আপনার হুকুমবরদারকে সিঁড়িও ঘাম থেকে বাঁচাতে পারবে না।'

কুতলুগ নিগর-খানুম হেসে উঠলেন :

'কাসিমবেগ সাহেব, এমন পাহাড়চূড়ায় শাহ্, নোকর সবাইকেই পায়ে হেঁটে উঠতে হবে।'

'এমন কি শাহিনীদেরও!' বোনের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করে বললেন বাবর।

এইভাবে হাসিঠাট্টার মধ্যেই তাঁরা এসে পৌছলেন হুজরাটার সামনের চত্বরে। নীল গম্বুজওয়ালা ছোট্ট হুজরা বসন্তের সূর্যকিরণে এমন ঝলক দিচ্ছে যে সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতায়, উজ্জ্বলতায় ভরে গেল বাবরের প্রাণ। এখান থেকে চমৎকার দেখতে পাওয়া যায় চারপাশের সৌন্দর্য। দূরের পাহাড়গুলি, বসন্তের পবন, আর বারান্দার গরাদ ও থামগুলিতে অলঙ্করণের কাজ চোখকে আনন্দ দেয়, গম্বুজের রঙীন জমকাল টালিতে আলোছায়ার খেলা এ সব কিছুই মন ভরে দেয়।...

কাসিমবেগ বাবর, তাঁর মা ও বোনের সঙ্গে বাড়ির দরজা পর্যন্ত গেল, নিজে প্রবেশপথের মর্মরপাথরের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইল। যেখানে অভিজাত মহিলারা রয়েছেন বাবরের অনুমতি ব্যতীত সে সেখানে ঢুকতে পারে না।

মুল্লা ফজলুদ্দিনও নীচে বারান্দার কাছে রয়ে গেলেন।

দরজায় কাঠের খোদাইয়ের ওপর সোনালী রংয়ের অলঙ্করণ। দেয়ালে আর কার্নিসের অলঙ্করণগুলি ভাল করে দেখলেন বাবর, তারপর দরজা খুললেন। প্রথমে মাকে ও বোনকে ঢুকতে দিয়ে তারপর নিজে ঢুকলেন।

ভিতরে অন্ধকার ছিল না কিন্তু 'মেরাপের' রেওয়াজ মোতাবেক একটি মোমবাতি জ্বলছিল সেখানে। জানলা দিয়ে এসে পড়া দিনের আলোয় প্রদীপের আলো প্রায় দেখাই যাচ্ছে না কিন্তু তার কাঁপা ফাঁপা আলো দেয়ালে সোনালী অলঙ্ককরণের ওপর পড়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

বাবর চমৎকৃত, উচ্ছ্বসিত। কুলুঙ্গীতে রাখা মোমবাতির আলোর চারপাশে লাল অলঙ্করণ দেখে বোনকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'এটা কি 'ইস্‌লিমে গুলখন'*?'

খানজাদা বেগম দুষ্টুহাসি হেসে বললেন, 'যদি একমত হতে না পারার জন্য মাফ করেন তো বলি।'

* আগুনের চিত্র। লোকের বিশ্বাস, মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করে।

বাবরও হাসলেন :

'করেছি, করেছি, বলুন!'

খানজাদা বেগম পিছন ফিরে প্রবেশপথের দরজার উপরে অলঙ্করণটি দেখালেন:

''ইস্‌লিমে গুলখন' ঐ যে। আপনি ওটিকে ফুলের অলঙ্করণ ভেবেছেন।'

'ইস্‌লিমে গুলখন' ... বলে যে অলঙ্করণটা দেখালেন খানজাদা বেগম তা সত্যি সত্যি আগুনের শিখার কথাই মনে করিয়ে দেয়। মানুষ যখন প্রবেশপথের কাছে আসে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে তার দুঃখদুর্দশাও আসে, বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চায়, কিন্তু ... তাদের থামায়, ভেতরে যেতে দেয় না রক্ষার আগুন।... কেন কে জানে বাবরের হঠাৎ মনে পড়ল প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী বরকনেকেও আগুনের চারদিকে ঘোরান হয়। এই সব বিষয়ে বোনের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন:

'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার ভুল হয়েছিল।'

'ভুল হওয়া স্বাভাবিক', এবার কুতলুগ নিগর-খানুম যোগ দিলেন কথায়, 'এখানে ফুলের অলঙ্করণ এমন উজ্জ্বল যে মনে হয় আগুন জ্বলছে!'

মায়ের কথা বাবরের আনন্দ বাড়িয়ে দিল আর যখন তাঁর ঘরগুলি থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার দিকে গেলেন, নীচে দাঁড়িয়ে থেকে মুল্লা ফজলুদ্দিন বাবরের মুখচোখে দেখে বুঝলেন মির্জা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। তখুনি শুনতে পেলেন তাঁর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর:

'হুজরটা বারাতাগের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যায় তাই না বেগ?'

ছেলেবেলা থেকেই বাবর ভালবাসেন বারাতাগ। সমতল উপত্যকার মাঝে এই উঁচু পাহাড়টা আল্লাহ্ তুলেছেন লোকের বিস্ময় জাগাবার জন্যই। সত্যিই যেন কি এক অলৌকিক শক্তি কোথা থেকে তুলে এখানে নিয়ে এসেছে কোন এক বিশাল পাহাড়ের এই অংশটি, বসিয়েছে এই সমতলে, যেন চারপাশে ভাল করে দৃষ্টি চালাবার জন্যই।

বাবর বাদশাহ্ হবার পর তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত এই নির্মাণকার্য ছোট হলেও বাবরের কাছে তা অতি প্রিয়, গভীর চিন্তাধারায় পূর্ণ, ভবিষ্যতের পূর্বলক্ষণ। তাঁর ভীষণ ইচ্ছা হতে লাগল যেন পাহাড়চূড়ায় এই বাড়িটি বহুদিন দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে তাঁর কথা বলে।

চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে বাবর স্থপতির দিকে তাকালেন :

'এখানে পাহাড়ে প্রচুর বৃষ্টি আর বরফ পড়ে। এমন জায়গায় বাড়িটি দীর্ঘদিন দাঁড়িয়ে থাকবে কী?'

কুতলুগ নিগর-খানুম ও খানজাদা বেগমও চোখে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। মুল্লা ফজলুদ্দিনের হাঁটুজোড়া বিশ্বাসঘাতকতা করে কাঁপতে লাগল। মাথা নীচু করে বুকে হাত রাখলেন তিনি।

'আল্লাহ্‌র যদি ইচ্ছা হয় তবে দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকবে।'

কাসিমবেগ তখুনি সে কথার খেই ধরল:

'হ্যাঁ, চল্লিশ — পঞ্চাশ বছর।'

কিন্তু মুল্লা ফজলুদ্দিনের চোখের দিকে তাকিয়ে তখুনি বুঝল তার মনে আঘাত দিয়েছে। মুল্লা ফজলুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু নিজের মুখের ওপর মধুর স্নেহপরশের মত কার যেন দৃষ্টি অনুভব করলেন। মাথা তুলে দেখলেন যে খানজাদা বেগম তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন যেন মুখের ওপর চাপা দেওয়া সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়টি ভেদ করে, সেই চাউনি যেন বলছে আত্মসংযম করতে। স্থপতি যেন আগুনে পড়লেন, জ্বলে উঠলেন (এবার তাঁর গোপনকথা ফাঁস হয়ে যাবে!) নীচু হয়ে কুর্ণিশ করলেন সেই দিকে উদ্দেশ্য করে যেদিকে বেগম দাঁড়িয়েছিলেন।

খানজাদা বেগম বাবরকে বললেন:

'শাহ্‌জাদা! সত্যিকারের একজন ওস্তাদ তৈরী করেছেন এই বাড়িটি, বহু পুরুষ ধরে লোকে এটি দেখতে পাবে! দেখুন, যেখানে যেখানে বরফ বা বৃষ্টি পড়তে পারে, সে জায়গাগুলো মাজা পাথরে ঢাকা আর এর ভিত্তি পাহাড়ের মধ্যে এত শক্ত মজবুত করে বসান হয়েছে যে সেটা পাহাড়েরই অংশ হয়ে গেছে। মুল্লা ফজলুদ্দিনের নির্মাণক্ষমতা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। হীরাট ও সমরখন্দের সেরা স্থপতির মতই ঠিক।'

মির্জা বাবর যেন আন্দাজ করতে না পারেন যে খানদানী শাসকবংশের কন্যার প্রতি প্রেমে জ্বলতে থাকা এই সাধারণ স্থপতির বুকের মধ্যে কী হচ্ছে! কিছুতেই না! এ অত্যন্ত বিপজ্জনক, হতাশাব্যঞ্জক! আল্লাহ্‌র দোয়া, মাথা নীচু করে কুর্ণিশ করতেই হয়।... খানজাদা বেগমের আন্তরিক কথার উত্তরে আবার তিনি মাথা নোয়ালেন। কিন্তু শুধু তো চোখের ঝিকিমিকি লুকানই নয়, কথাও বলতে হবে সাবধানে মনে রেখে যে ছুরির ধারাল ফলার ওপর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

'হুজুরে আলী, আপনাকে জানাতে চাই যে এই নির্মাণকার্যে লাগান হয়েছে ঠিক সেই ধরণেরই পাথর, তৈলস্ফটিক, সেই চমৎকার টালিই যা সমরখন্দে উলুগবেগের মাদ্রাসা তৈরী করতে লাগান হয়েছে। খোদার দোয়ায়,' সাবধানে বলে চললেন স্থপতি, 'মির্জা বাবরের মর্যদার উপযুক্ত এই হুজরাটা বহুযুগ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

একথাগুলি বাবরকে আরো উদ্দীপিত করে তুলল।

'খুদা করুন, তাই যেন হয়! হুজরাটার সৌন্দর্য সকল প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে।'

'প্রশংসার যোগ্য মুল্লা ফজলুদ্দিন!' হতবুদ্ধি কাসিমবেগ বলল।

বাবর শুধরে দিলেন :

'মাওলানা ফজলুদ্দিন!' তারপর ভৃত্যদের প্রধানের দিকে ফিরলেন সে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল মুখে হাতে জল দেবার লোকটির সঙ্গে। চীৎকার করে বাবর বললেন, 'মাওলানাকে খেলাত্ পরিয়ে দাও!'

ভৃত্যদের প্রধান ব্যস্ত হয়ে চাইল সঙ্গীর দিকে। কী হবে? খেলাতগুলি যে নিচে

ছাউনিতে রয়ে গেছে! কাসিমবেগ গোলমালটা বুঝতে পারল। নিজের কিংখাপের চাপকানের সোনার সুতোর কাজ করা গলার কাছে হাত দিয়ে বোতাম খুলতে লাগল: 'আদেশ করুন হুজুরে আলী!'

এই উদারতা উপযুক্ত বিবেচনা করে বাবর মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে অনুমতি জানালেন।

কাসিমবেগ মুল্লা ফজলুদ্দিনকে পরিয়ে দিল নিজের চাপকান।

'মাওলানাকে আমাদের পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া হোক সাজসজ্জাসমেত একটি ঘোড়া,' উদার হয়ে বললেন বাবর।

কয়েকজনের গলা একসঙ্গে শোনা গেল:

'খেলাত্ পাওয়া জন্য মুবারক জানাই, মাওলানা! মুবারক জানাই!'

অন্য সব অওয়াজ ভেদ করে মুল্লার কানে সর্বপ্রথমে বাজল খানজাদা বেগমের কণ্ঠস্বর। তাঁর দিকে তাকাবেন কি না ঠিক করতে না পেরে মাথা নীচু করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু তাহলেও নিজেকে সবার থেকে সুখী বলে মনে হল।

৩

সন্ধ্যাবেলায় বাবর বারাতাগের হুজরাতে একা রইলেন। কাসিমবেগ পাত্রমিত্রদের সংবাদ দিলেন যে 'বাবারের একপা বিশ্রাম নেবার জায়গা হবে ঐ হুজরাতে। হয়ত আজ গোটা রাতই তিনি ওখানে কাটাবেন।' দেহরক্ষীরা বিভিন্ন জায়গায় পাহারায় নিযুক্ত রইল, তারা চেষ্টা করতে লাগল বাবরের চোখে না পড়ার।

বাবর অনেকক্ষণ ধরে বারান্দার ওপর থেকে চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করলেন।

চারপাশ থেকেই বসন্ত নেমে আসছে ওশের ওপর। এখানকার বাতাস এমন পরিস্কার যে নীচে উপত্যকায় জ্বালা আগুনের ধোঁয়াও কালো মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে পাঁশুটে নীল। দূরের বরফঢাকা পাহাড়গুলি পর্যন্ত বিস্তৃত উপত্যকাটা যেন ঘন পান্নাসবুজের সমুদ্র। কোন্‌দিকে উজগেন্ন কোন্‌দিকে মার্গিলান, কোথায়—এখান থেকে অনেক দূরে—ইসফরা খজেন্ত, কাসান, আখসি, তা আন্দাজ করতে করতে বাবর ভাবলেন এখন ঐ সব শহরের বাগানগুলি ফুলে ভরে গেছে। চারপাশের পর্বতমালার মাঝে ফরগানা উপত্যকা বড় সুন্দর, রূপকথার স্বর্গের মত, উপত্যকা কুসুমিত হয়ে নির্যাস ছড়ায়। 'শান্তি আর স্বস্তি এলো তাহলে,' একটু গর্ব নিয়েই ভাবলেন তরুণ মির্জা। যুদ্ধ থেমেছে প্রায় দু'বছর হল, তিনি শেষপর্যন্ত সমরখন্দ শাসককে সন্ধি করতে বাধ্য করেছেন।

এমনি সব সময়ে বাবরের ইচ্ছা হত কাগজ কলম নিয়ে বসতে। নোকররা হুজরাটার ভিতরে রেকে গেছে ছাপায়াওলা নীচু একটা মেজ, তার সামনে নরম

আসনে বসলেন বাবর, খুললেন 'সত্য ঘটনা'* শিরনাম লেখা রোজনামচার একটি পাতা। শেষ যা লিখেছেন তা হল কানিবাদাম আর ইসফারায় তিনি যা দেখেছেন। পরিষ্কার অক্ষরে লিখতে লাগলেন 'ওশের প্রান্তে ... বারাতাগের চূড়ায় বারান্দাসমেত একটা ছোট হুজরা তৈরি করেছি আমি নয়শ বিরানব্বই হিজরী সনে**। হুজরাটি দাঁড়িয়ে আছে চমৎকার এক জায়গায়, সারা শহর আর শহরের আশপাশ বাড়িটির পায়ের তলায়...'

নিবিষ্টমনে লিখছিলেন বাবর। বেগনীরংয়ের রঙনফুল ও ঘণ্টাফুল ও ওশের লালপাথর যে তাঁকে বিস্মিত করেছে সেকথাও তিনি ভোলেননি।

এমন সময় দরজায় দেখা গেল কাসিমবেগকে।

'মাফ করবেন হুজুরে আলী, আপনার মহৎ কাজের সময় বিরক্ত করার জন্য। কিন্তু ... বুখারার সুলতান আলি-খানের কাছ থেকে জরুরী খবর এসেছে।'

কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে কলম নামিয়ে রেখে বাবর কাসিমবেগকে ইঙ্গিতে ভেতরে আসতে বললেন। তার হাত থেকে গোল করে পাকানো মোহরছাপ দেওয়া চিঠিটা নিলেন। চিঠি পড়ে মাথা তুললেন বাবর।

'সুলতান আলি-খান আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন সমরখন্দ অভিযানে যাবার জন্য,' আধা জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বললেন তিনি।

'সমরখন্দের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়েছে কিন্তু সুলতান আলি-খানের সঙ্গে সামরিক মিত্রতা আছে হুজুরে আলী। অভিযান এড়ান যাবে না বলে আমার ধারণা।'

'যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হবেন না উজীরে আজম। প্রথমে ওয়ালিদা সাহেবার অনুমতি পাওয়া দরকার।'

যেকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্তই বাবর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করে নেন না—এটা কাসিমবেগের ভাল লাগে না। কী জন্যে? জানা কথাই তো স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধবিগ্রহ পছন্দ করে না... অভিযান, লুঠপাট, লড়াই— এই হল বীর বেগদের যশ আনার উপায়, আর স্বেচ্ছাচারী, যুদ্ধবাজ বেগদের লাগাম টেনে রাখার এক প্রয়োজনীয় পথ। রুটিতে পেট ভরে না তাদের, ওদের কেবল তলোয়ার হাতে করতে দাও, সেগুলো বেশিদিন খাপেভরা থাকলে মরচে ধরে যেতে পারে।

বাবরের পিছন পিছন কাসিমবেগও কুতলুগ নিগর-খানুমের ছাউনিতে ঢুকলেন। মুখে অসন্তোষের ছাপ, কিন্তু ভাব দেখাচ্ছেন যেন তা খাড়া বারাতাগ পাহাড় থেকে নামার জন্য।

খানজাদা বেগমও ছিলেন মায়ের কাছে। ভৃত্যেরা বাবরের খাবার জায়গা করে

* পরবর্তীকালে 'বাবরনামা' নামে প্রসিদ্ধ।

** ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

দিল। সোনার থালায় করে শিককাবাব নিয়ে আসা হল। খাওয়া হল। কেউ কোন কথা বলছে না। কাবাবের পরে কুমিস পান করা হল। আবার সবাই চুপ। লম্বা গোঁফে লেগে থাকা সাদা কুমিসের ফোঁটাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কাসিমবেগ শেষ পর্যন্ত কথা আরম্ভ করল :

'মির্জা সুলতান আলি-খানের সঙ্গে আমাদের বাদশাহের সমঝোতা হয়েছে। গরমের সময় আমাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমরা তাঁকে। গরমকাল এসে পড়ল বলে।'

'খোদা আমাদের সুখে শান্তিতে থাকতে দিয়েছেন' বললেন কুতলুগ নিগর-খানুম, 'আমাদের অবশ্যই মূল্য দেওয়া উচিত সেই দানকে মহামান্য কাসিমবেগ।... সুলতান আলি খান নিজের ভাই মির্জা বাইসুনকুরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সমরখন্দের তখতের জন্য। আল্লাহ্‌র দোয়ায় আমাদের বাদশাহের নিজের তখ্‌ত আছে আন্দিজানে।'

কাসিমবেগ কোন কথা বলল না। খানজাদা বেগম বললেন:

'শাহ্‌জাদা, সমরখন্দের অভিযানে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে, তার বদলে আন্দিজানে নতুন নতুন প্রাসাদ, মাদ্রাসা তৈরি করলে হয় না? যদি আন্দিজান সৌন্দর্যে আর চাকচিক্যে সমরখন্দের সমান হয় তাহলে আপনার নামও ছড়িয়ে পড়বে মির্জা উলুগবেগের মত, এই হল আপনার ভগিনীর একমাত্র স্বপ্ন, আল্লাহ্‌ এ স্বপ্ন সার্থক করুন!'

বাবর মৃদু হাসলেন ঠাট্টার ছলে:

'আন্দিজানকে সমরখন্দের সমকক্ষ করে তুলতে গেলে প্রথমেই নিজের চোখে সমরখন্দ দেখে আসা প্রয়োজন নয় কী? সমরখন্দের সঙ্গে পরিচিত হব, তারপর ...আন্দিজানকে গড়ে তুলতে লাগা যাবে।'

বাবরের কথা কাসিমবেগকে আনন্দ দিল:

'দানিশমন্দের মত কথাই বলেছেন, হুজুরে আলী!'

'ছেলেবেলায় তুমি সমরখন্দ দেখনি নাকি?' কুতলুগ নিগর-খানুম একমত হতে পারলেন না ছেলের সঙ্গে।

হ্যাঁ দেখেছি... পাঁচবছর বয়সে, এখন তার কিছুই মনে নেই।'

খানজাদা বেগম কিছু মজা করার জন্য মনে করিয়ে দিলেন :

'আর গত বছর? আপনি সমরখন্দ অভিযানে গেলেন, দীর্ঘ সাতমাস আপনার অপেক্ষায় ছিলাম আমরা।'

ভ্রু কুঁচকে উঠল বাবরের:

'তা ঠিক, গতবছর অভিযানে গিয়েছিলাম আমরা। তিনমাস ধরে সমরখন্দের ধারেকাছে ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা। সুলতান আহমদও এক সময় আন্দিজান ঢুকতে পারেননি। আমার জন্যেও রাজধানীর শহরতোরণ বন্ধই রইল।'

বাবরের গলার স্বরে ফুটে উঠল অপমান, কেঁপে উঠল গলা : সবাই আবার অনুভব করল, কী ছেলেমানুষ এখনও তিনি! অভিযান তাঁকে আকৃষ্ট করত, হাতছানি দিত তাঁকে তৈমুর, উলুগবেগের মহান শহর। সমরখন্দের শাসক পরিবর্তন হয়েছে কয়েকবার: সুলতান আহ্‌মদের পর তাঁর ভাই সুলতান মাহ্‌মুদ, এখন তখ্‌তে আছেন সুলতান মাহ্‌মুদের ছেলে মির্জা বাইসুনকুর, সেও তৈমুরের বংশধর, সেও উচ্চাকাঙ্ক্ষী, রণলিপ্সু, বয়সে যুবক (বাবরের থেকে পাঁচ বছর বড় বয়সে)। পিতা যে তখ্‌ত দখল করেছিলেন, সে তখ্‌তের উত্তরাধিকারী হয়েছে, সে, তার মানে তার তখ্‌তে বসা আইনসঙ্গত। আন্দিজানের বেগরা কিন্তু তার হাজার দোষ দেখতে পেত, তার সম্বন্ধে কেবল খারাপ কথাই বলত আর বাবরের কানের কাছে কেবলই শোনাত একমাত্র তিনিই সমরখন্দের শাসক হবার উপযুক্ত। বাইসুনকুর জানত বাবরের মনোভাব, ভয় ছিল তার বাবরকে। তাই বাবর যাতে শহরে ঢুকতে না পারেন তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। ধূর্ত বাইসুনকুর বাবরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সমরখন্দের অতিথি হবার জন্য সৈন্যবাহিনী ছাড়া, কিন্তু বাবর সে ফাঁদে পা দেননি। এতে কেবল বিদ্বেষের আগুন জ্বলল বেশি করে, তাতে আরো ইন্ধন যোগাতে লাগল দুপক্ষের রণলিপ্সু বেগরা।

কুতলুগ নিগর-খানুমের ইচ্ছা নয় যে পনেরোবছর বয়সী বাবর অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ কলহে মাথা গলান, তাঁর ইচ্ছা তিনি যেন নিজরাজ্যে শান্তিতে রাজত্ব করেন।

তিনি বাবরের অপমানে কালো হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকালেন, তারপর যেন সে অপমান ভুলিয়ে দেবার জন্য স্নেহমাখা সুরে বললেন :

'বাবরজান, তোমার মা'র কথা বিশ্বাস কর, এই নশ্বর দুনিয়া নিয়ে তোমার মন খারাপ করা শোভা পায় না ...' ছেলেবেলায় তাঁকে যে নামে ডাকতেন সেই নামে আবার ডেকে মা যেন তাকে এক মুহূর্তের জন্য সেই মুক্ত দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিলেন যখন তিনি অভিযান, সিংহাসন কোন কিছুর কথাই ভাবতেন না। কিন্তু বাবরজান অনেক দিনই আর নেই। তাই মা আবার অন্য সুরে বলে চললেন, 'এমন একদিন আসবে যখন সমরখন্দ জয়ের স্বপ্ন সফল হবে। এখন সবাই শান্তিতে থাকতে চায়। কাসিমবেগের মত এমন দানিশমন্দ উজীর তোমার। এমন প্রতিভাবান স্থপতি যিনি ওশের শৈলাবাস তৈরি করেছেন, তিনি তোমার খিদমত করছেন। তোমার মা'র অনুরোধ তোমার কাছে : সমরখন্দ অভিযান কয়েক বছর স্থগিত রাখ।... খানজাদা ঠিক কথাই বলেছে, উপত্যকাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার কাজ হাতে নাও বরং; আন্দিজানে, মার্গিলানে, ওশে চমৎকার চমৎকার মহল, মাদ্রাসা তৈরি করাও।'

এমন দৃঢ় স্বরে অনেক দিন কথা বলেননি কুতলুগ নিগর-খানুম। মাথা নামিয়ে

নিল কাসিমবেগ। বাবরের চোখ আটকে রইল পেয়ালার কুমিসের দিকে, মুখে পড়ে পেয়ালার কানার সোনালী রংয়ের আভা। ঠিক কথা... কিন্তু বেগরা কী বলবে? ভাবল কাসিমবেগ। 'আর সমরখন্দ? বেগদের কী বলব?' ভাবলেন বাবর। খানজাদা বেগমের সুরেলা কণ্ঠ স্তব্ধতা ভঙ্গ করল:

'শাহজাদা, নবাইয়ের কবিতা আপনার কণ্ঠস্থ। মনে করুন ফরহাদ কি অপূর্ব সব বাড়ি তৈরি করেছিলেন। আপনার ভগিনীর চিরকালের স্বপ্ন আপনাকে ফরহাদের মতই স্রষ্টারূপে দেখার। এর থেকে পবিত্র, এর চেয়ে বড় আর কোন কাজই নেই পৃথিবীতে!'

বাবরের মনে পড়ল ওশের শৈলাবাসের সেই মুহূর্তগুলিতে কী সুখ তিনি অনুভব করেছিলেন। 'সমরখন্দ পালিয়ে যাবে না... কিন্তু ফরহাদের খ্যাতি— মহান খ্যাতি। তাছাড়া মায়ের কথাও সত্যি ... কেবল বেগদের কি বলব?' কাসিমবেগের দিকে তাকালেন বাবর:

'এ কি করা সম্ভব আমাদের পক্ষে?'

কাসিমবেগ বুঝল যে সমরখন্দ অভিযান স্থগিত রাখার কথা হচ্ছে। সাহসী যোদ্ধা হিসাবে ক্রোধ হল তার; রাজ্য শাসনের অংশগ্রহণকারী হিসাবে জানে যে বাবর অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাচ্ছেন। সবচেয়ে অভিজাত ও প্রতিপত্তিশালী বেগরা চাইছেন এই অভিযান; বহুদিন ধরেই অভিযানের প্রস্তুতি চলছে। বাধা পার হয়ে লাফ দেবার জন্য সমস্ত পেশি শক্ত হয়ে উঠেছে যে ঘোড়ার তা এখন থামান আর সম্ভব নয়। যদি থামানোর মত শক্তি থাকে তো হয় ঘোড়া নিজের মেরদন্ড ভাঙবে না হয় তার আরোহী ছিটকে পড়বে। একথা সোজাসুজি না বলাই ভাল ভাবল কাসিমবেগ। বুকে হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল :

'হুজুরে আলী, আপনার হুকুমবরদার এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না।'

'তার মানে মালিকা সাহেবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করব?'

'কি চান উনি আমার কাছে?' মনে মনে রাগ হল উজীরের। আজ মাকে, বোনকে খুশি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ওদিকে গতকালই উদগ্রভাবে বলছিলেন, ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে অভিযানে, লড়াইয়ের যেতে, সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে। বয়স কম, সেই কারণেই খামখেয়ালী। যেন এক দুর্বল শিশু অন্দরমহলের পরামর্শে চালিত।... যাই হোক কুতলুগ নিগর-খানুমকেও একেবারে ছাঁটাই করে দিতে পারছে না কাসিমবেগ, নিজের চোখেই দেখেছে মায়ের গভীর প্রভাব তাঁর জোয়ান ছেলের ওপর।

'মালিকা সাহেবার অনুরোধই আমার কাছে পবিত্র আইন' বলল কাসিমবেগ। 'আপনার হুকুমবরদার কেবল বলতে চাইছে যে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমস্ত প্রতিপত্তিশালী বেগদের সমর্থন থাকা প্রয়োজন।'

কাসিমবেগের প্রতি বিশেষ প্রীতিপূর্ণভাব প্রদর্শনের জন্য তাঁর নামের সঙ্গে 'আমীর উল্-উমরা' খেতাব যোগ করা হত। কুতলুগ নিগর-খানুমও তা ভোলেননি।

'জনাব আমীর উল্-উমরা,' তার প্রতি মধুর হেসে বললেন তিনি, 'মির্জা বাবরকে আপনি সাহায্য করবেন অন্যান্য বেগদের সমর্থন পেতে, ঠিক কিনা?'

'মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব, মালিকা সাহেবা!... কিন্তু বেগদের মনের বাসনা একটু বুঝি আমি ... আমাকে যদি অশিষ্ট, অমার্জিত বলে মনে না করেন তো বলি ওদের কথার যাথার্থ্য কোনখানে...'

'বলুন!'

কাসিমবেগ একমুহূর্তের জন্য চোখ বুঁজে, ঘাড় টানটান করল, সাদার ছোঁয়াচ না লাগা কুচকুচে কালো দাড়ির প্রান্তভাগ উটের লোমের তৈরি দামী চেকমেনের গলার কাছে গিয়ে ঢুকল। তারপর সে সোজা হয়ে বসে মাথা তুলল। বাবরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ আমীর তৈমুর ও প্রখ্যাত পণ্ডিত মির্জা উলুগবেগ সমরখন্দে চমৎকার সব নির্মাণকার্য চালাতে পেরেছিলেন তার কারণ হল তাদের হাতে ছিল বিরাট এক রাজ্যের ক্ষমতা ও ধনসম্পত্তি, এখন সেই বিরাট রাজ্য টুকরো টুকরো হযে গেছে। এই অপূর্ব ফরগানা যদিও বিশাল তবুও কোন এক সময়ের এক ও শক্তিশালী মাভেরান্নহরের একটি অংশমাত্র।

খানজাদা বেগম তখুনি বুঝতে পারলেন যে কী ইঙ্গিত দিচ্ছে কাসিমবেগ। জিজ্ঞাসা করলেন:

'জনাব আমীর উল্-উমরা কি বলতে চান যে বড় বড় নির্মাণকার্য চালাবার ক্ষমতা আমাদের নেই?'

'বেগম সাহেবা, আপনি বলছিলেন যে আন্দিজান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক বিশাল সরমখন্দের সঙ্গে। বেগরা বলতে পারেন তা করার জন্য রাজ্যকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার প্রতিটি অংশ, যারা এখন স্বাধীন, সেগুলিকে একত্রিত করতে হবে একটি হাতের মুঠিতে, অভিযান বিনা কেমন করে তা সম্ভব, কার পতাকাতলে তাদের একত্রিত করা হবে? আপনার এই বিরাট নির্মাণ কার্যের পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব নয় রাজ্য শতভাগে বিভক্ত বলে।'

বাবরকে পুরোপুরি রাজী করিয়ে ফেলেছে কাসিমবেগ, তিনি এখন উদ্বিগ্ন হয়ে চেয়ে আছেন মায়ের দিকে। মা কী করে উজীরের যুক্তি খণ্ডন করেন।

'জনাব কাসিমবেগ, বিশাল বিশাল নির্মাণকার্য কেবলমাত্র আমীর তৈমুর আর মির্জা উলুগবেগই হাতে নেননি। হীরাটে মীর আলিশের তিন মশহুর ইমারত— ইখ্লাসিয়া, খালাসিয়া, উন্সিয়া* নির্মাণ করান। আর তিনি ছিলে শাসকের একজন

* ইখ্লাসিয়া — নিষ্ঠাভবন, খালাসিয়া — আরোগ্যভবন, উন্সিয়া — মৈত্রীভবন।

সলাহ্‌কারমাত্র সেই মীর আলিশেরের চাইতে মির্জা বাবরের ক্ষমতা মোটেই কম নয়।'

'ঠিক, ওয়ালিদা সাহেবা, ঠিক।' কুতলুগ নিগর-খানুমের কথাগুলি বাবরের অন্তরের অন্তরতম কোণে সুপ্ত থাকা বাসনাকে জাগিয়ে তুলল। প্রখ্যাত হবার, নিজের যশ ছড়াবার তারুণ্যের যে স্বপ্ন তাঁর ছিল তাকে রূপ দেবার জন্য কখনও তিনি বিরাট যুদ্ধজয়ের কল্পনা করতেন, কখনও বা অপূর্ব কবিতা বা দস্তান সৃষ্টি করতেন মনে মনে। কিন্তু যুদ্ধজয় করে কি নবাইয়ের মত মহান ব্যক্তির মান অর্জন করা যায়? তাছাড়া সৈনিকের যশও পরিবর্তনশীল, অত্যন্ত চঞ্চলও বটে! এই তো সমরখন্দের কাছ থেকে ঘুরে এলেন, সাতমাস ধরে কষ্ট পেয়েছেন, মহান জয়ের স্বপ্ন দুষ্প্রাপ্য স্বপ্ন হয়েই রয়ে গেল। মহান কবি হলেন কেমন হয়? কিন্তু সেও যেন এক পাখী, অনধিগম্য উচ্চতায় উড়ছে, বাবর অনুভব করলেন সেই পাখীকে ধরার শক্তি তাঁর নেই আপাতত। মা কিন্তু আর একটি পথ বলে দিলেন আরো সহজ: যদি নবাই নির্মিত ইখ্‌লাসিয়া, খালাসিয়া, উন্‌সিয়ার খ্যাতি ফরগানা উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তবে যুবক বাবর নির্মিত প্রাসাদগুলির খ্যাতি হীরাট পৌঁছতে পারবে না কেন? পারে। নবাইয়েরও কানে যাবে সে খ্যতি। জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, বাবর আবার কে, তাঁর সঙ্গে আগেভাগেই পরিচয় করে নিতে পারলে ভাল হয়। তারপর, হয়ত বাবর হীরাট যাবেন নয়ত নবাই এ অঞ্চলে আসবেন। হীরাটের বর্তমান শাসক হুসেন বাইকারার বর্তমান দরবার আলিশেরের ভাল লাগছে না বলে যে কানাঘুষা চলছে তা বাবরের অজানা নেই। হয়ত মহান কবি তাঁর, বাবরের গুরুও হবেন!

হঠাৎ তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, গলার স্বরে ফুটে উঠল শাসকের কর্তৃত্বময় সুর :

'ওয়ালিদা সাহেবা ঠিক কথাই বলেছেন! বেগদের বোঝাতে হবে, উজীরে আজম!'

এ হল 'ফরমান' — আদেশ। কুতলুগ নিগর-খানুম আর খানজাদা বেগমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: কাসিমবেগ পরাভূত হয়েছে, হার মানবে সে এবার।

কিন্তু কাসিমবেগ নিজের মতে অটল — তার বিস্তৃত স্কন্ধের প্রাচীরের আড়ালে বড় বড় বেগরা আছে।

'হুজুরে আলী, আপনার ফরমান অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করার আগে বেগদের আরও একটি মনোবাসনা আপনাকে জানাতে অনুমতি দিন।'

বাবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা নাড়িয়ে অনুমতি দিলেন। জাঁকাল কালো গোঁফে হাত বোলাল কাসিমবেগ। নির্দ্বিধায় তাকাল খানজাদা বেগমের দিকে (যে ঔদ্ধত্য খুবই বিরল তার পক্ষে):

'বেগম সাহেবা, আপনি যথার্থই অপূর্ব তুলনা দিয়েছেন আমাদের বাদশাহের সঙ্গে আজকের ফরহাদের। এই ফরহাদের খিদমতে নিযুক্ত বলে গর্বিত বেগরা। আমাদের

স্বপ্ন,' মৃদু হাসল উজীর, 'ফরহাদ শিরীনের মিলন করিয়ে দেওয়া।' তারপরই মুখেচোখে গম্ভীর ভাব ফুটিয়ে বলল, 'আর আপনার জানা আছে আমাদের শিরীন আজ সমরখন্দে , বেচারী, কষ্ট পাচ্ছে, বন্দিনীর মত।'

বিভ্রান্ত বাবরের মুখে অল্প লালের ছোঁয়া লাগল।

কাসিমবেগ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সমস্যার উল্লেখ করেছে।

পাঁচবছর বয়সেই বাবরের বাগদান হয় সমরখন্দের শাসক সুলতান আহমদের কন্যা আয়ষার সঙ্গে। এই সুলতান আহমদের সৈন্যদলের প্রচণ্ড ক্ষতি হয় কুভাসাই পার হবার সময়। এখন আয়ষার চৌদ্দবছর বয়স। গত কয়েক বছর বাবর তাঁকে মোটেই দেখেননি, কিন্তু যেই দেখেছে সবাই একবাক্যে বলে তিনি তাজা গোলাপের কুঁড়ির থেকেও সুন্দর। এই সুন্দরী তরুণীই তাঁর উদ্ধারকর্তা বাবরের অপেক্ষায় আছেন, বাবরকে যারা কাজে লাগাতে চায়, তারাই তাঁকে এ খবর এনে দিয়েছে। উত্তেজিত বাবর চান বাইসুনকুরের অত্যাচারে জর্জরিত তাঁর শিরীনকে উদ্ধার করতে, সবাইকে তাঁর যুদ্ধকৌশল দেখিয়ে উদ্ধার করতে। আয়ষা বেগমকে তাঁর মনে নেই ঠিকই, কিন্তু সেই তাঁর পাঁচবছর বয়স থেকেই মনে আছে অন্য এক চমৎকার মেয়েকে, সুলতান আহমদের বাগদত্তাকে। কেন জানি মনে হয় আয়ষাও এখন তেমনই সুন্দরী।

প্রথা অনুযায়ী কনের মুখের ঢাকা সরাতে এক নিষ্পাপ বাচ্চা ছেলে তখন কুতলুগ নিগর-খানুম আতিথ্য নিয়েছিলেন সমরখন্দে: সুলতান আহমদের বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়েছিল তিনি, পাঁচবছর বয়সী বাবরও মায়ের সঙ্গে ছিলেন। সুলতান আহমদের ছেলেরা মারা গিয়েছে। যদিও কুতলুগ নিগর-খানুমকে ঈর্ষা করত সবাই আর তাঁর ছেলের দিকে বাঁকা চোখে দেখত, তবুও তাঁকেই, বাবরকেই 'সিংহের মত ছেলের জন্ম দেবে কনে'— সবার এই উচ্ছ্বসিত শুভকামনার মধ্য দিয়ে কনের মুখের ঢাকা খুলতে বলা হল। সেই ঘটনার অনেক কিছুই স্মৃতি থেকে বেমালুম উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু নিজের কেমন এক দুর্বোধ উত্তপ্ত অনুভূতি যা তিনি অনুভব করেছিলেন ছোট ছোট হাতে কনে বউয়ের কোমল মুখ অনাবৃত করে দেবার সময়, তা মনে আছে। সেই থেকে সেই অনুভূতি তাঁর বহুবার হয়েছে— সুন্দর কবিতা পড়ে, সুন্দর গান শুনে, চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে। আর চন্দ্রাননা সুন্দরীদের ছবি প্রায়ই তাঁর মানসপটে ভেসে উঠে উদ্দীপিত করে তোলে তাঁকে স্বপনে জাগরণে। পাঁচবছরের সেই ছেলেটি অবশ্যই নারী সৌন্দর্যের বিশেষ দিকটি বুঝত না, যদিও কনেবধূর সামনে নিজের যে উৎকণ্ঠা হয়েছিল তা পরিষ্কার মনে আছে। তরুণ বাবরের কাছে সবাই যখন সমরখন্দের কন্যার প্রশংসা করত, বাবর তখন কল্পনা করতে পারতেন কেমন সে মেয়েটি, আয়ষা।... সুলতান আহমদের কনের কথা আর বিভিন্ন বইয়ের নায়িকাদের কথাও মনে পড়ে। আয়ষাকে না দেখেই বাবর ইতোমধ্যেই তাঁকে ভালবাসেন—তাঁর তরুণ মনের উদগ্র, সেই সঙ্গে কোমলপবিত্র কল্পনায়।

যদি সুন্দরী আয়যা তাঁর শত্রুদের হাতে বন্দীজীবন কাটাচ্ছেন— বাবর তা জেনেও কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন আন্দিজানে? ...

'জনাব কাসিমবেগ,' কুতলুগ নিগর-খানুম বললেন, 'আমাদের মির্জার বাগদত্তার সম্পর্কে আমাদেরও কম উদ্বেগ নেই। আমরা তার মাকে লিখেছিলাম আয়যা বেগমকে তার বড়বোন রাজিয়ার কাছে তাশখন্দ পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করে। সম্ভবত সে অনুরোধ ইতোমধ্যেই পূরণ করা হয়েছে ...'

নেতিবাচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল কাসিমবেগ।

'দুঃখের বিষয়— হয়নি,' বলল সে, 'আপনার দাস হালে সমরখন্দ থেকে একটা চিঠি পেয়েছে।... আমার এক বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়েছে সেটা... চিঠিটা সঙ্গে সঙ্গে হুজুর আলীকে দেখাতে সংকোচ বোধ করেছিলাম।...'

'কী চিঠি? কিছু ঘটেছে নাকী?' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন বাবরের মা।

'আয়যা বেগম তাঁর মা ও বোনের সঙ্গে তাশখন্দ চলে যাবার যোগাড় করেছিলেন কিন্তু মির্জা বাইসুনকুর তাঁদের আটকেছেন, তাছাড়া তাঁদের বাড়ির কাছে পাহারা বসিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, বাড়ি থেকে কাউকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। সত্যিই— বন্দিনী। এখন তাঁরা কেবল আন্দিজানের সাহায্যের অপেক্ষায় আছেন!'

প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন বাবর। বেচারী মেয়েটির সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করার জন্য বাইসুনকুরকে সাজা দেওয়া উচিত! অন্য সব ইচ্ছাকে চাপা দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তখুনি সেনাদল নিয়ে সমরখন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার ইচ্ছা।

খানজাদা বেগম অনুভব করলেন ভাইয়ের মনের অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে।

'খোদা আপনার সহায় হোন বন্দিনীদের দ্রুত উদ্ধার করতে,' বললেন তিনি। 'কিন্তু কেবল যুদ্ধ বিগ্রহের সাহায্যেই কি উদ্ধার করা যায়? সমরাভিযান কি শত্রুতা আরো বাড়িয়েই দেয় না? মির্জা বাইসুনকুর যখন জানতে পারবেন আপনার অভিযানের কথা তখন আয়যাকে আরো ঘৃণা করবেন। হয়ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাঁকে উদ্ধার করাই উচিত, হুজুর...'

একথায় বাবরের রাগ বেড়ে গেল।

'শান্তি? শান্তির পথ খুঁজতে হবে অপমানকারীর সঙ্গে?'

বাবরের মা বললেন ছেলের উদ্দেশ্যে:

'মির্জা বাইসুনকুরের কাছে শান্তির দূত পাঠাও, বাছা আমার।... তোমাদের মধ্যের বিবাদ মেটান অসম্ভব নয়।'

যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে তখন শান্তির কথা কী করে বলা যায়? যে পক্ষ দুর্বল বলে মনে করা হয় সে পক্ষই প্রথম শান্তি প্রস্তাব দেয়। সে বাইসুনকুরের চেয়ে দুর্বল নয়।

'বাইসুনকুর অত্যাচার চালাচ্ছে! আর আমি তা মেনে নিয়ে শান্তির প্রস্তাব দিয়ে

দূত পাঠাব? আয়েষাকে শাদী করার জন্য বাইসুনকুরের সামনে নতজানু হতে হবে? না, তা হবে না, আঘাতের উত্তরে আঘাতই হানতে হয়!'

'মালিকা সাহেবা, আজকের জমানায় শান্তি দিয়ে জুলুমকে জয় করা যায় না!' কাসিমবেগ বাবরের দিকে তাকাল। 'এখন প্রয়োজন শক্তিমানদের মধ্যে সর্বশক্তিমান হওয়া। তাছাড়া কথা হচ্ছে যেমন তেমন কিছু নিয়ে নয়, সমরখন্দ নিয়ে! সবাই এগোচ্ছে সমরখন্দের দিকে, সবাই চাইছে সমরখন্দ! উত্তর দিক থেকে শয়বানি খান তাক্ করে আছে। হীসারের বাদশাহ্ খুস্‌রো সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সমখন্দের ওপর। মির্জা বাইসুনকুর দুর্বল শাসক, মাভেরান্নহরে রাজধানী ধরে রাখতে পারবেন না তিনি। যদি আমাদের বাদশাহ্ সে রাজধানী দখল না করেন তো অন্যরা দখল করবে— তাঁর পূর্বপুরুষের গর্বের রাজধানী চলে যাবে অন্য বংশের দখলে। আর যদি শয়বানী বা খুস্‌রো সমরখন্দ দখল করে তো তাদের শক্তি এত বাড়বে যে আন্দিজানের পক্ষেও... আমাদেরও অবস্থা আরো কঠিন হবে তখন। সময় নষ্ট করলে চলবে না কিছুতেই!'

'আমীর তৈমুরের সব বংশধররা মিলিত হয়ে সামরিক সন্ধি করা যায় না?' জিজ্ঞাসা করলেন কুতলুগ নিগর-খানুম আর বিষণ্ন মনে প্রতীক্ষা করে রইলেন সেই উত্তরের যা তার নিজেরও জানা ছিল।

'কার নেতৃত্বে, কার পতাকাতলে? কোন্ শক্তি তাদের একত্রিত করবে? বাইসুন্‌কুরের শক্তি, বুদ্ধি কিছুই নেই। মাভেরান্নহরকে রক্ষা করতে পারেন কেবল আমাদের বাদশাহ্ — মির্জা বাবর। এই উদ্দেশ্যেই আমরা আমাদের সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছি, আমাদের বাদশাহের খিদমতে লেগেছি। এ বছর যদি সমরখন্দ দখল করি, আল্লাহ্‌র দোয়ায় আর বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না, তখন সত্যিকারের শান্তি ও স্বস্তি আসবে। আর সময়ও থাকবে যে-কোন ধরনের মহল তৈরির জন্য!'

খানজাদা বেগম কল্পনার পাখা মেলে উড়তে থাকা উজীরকে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন :

'এর মানে — এক কথায়: বেগদের বোঝাবার জন্য আমাদের ওয়ালিদা সাহেবা যে অনুরোধ জানিয়েছেন আপনি তা প্রত্যাখ্যান করছেন?'

কাসিমবেগ সসম্মানে বুকে হাত রাখল:

'অযোগ্য দাসকে তার অকপটতার জন্য ক্ষমা করবেন, বেগম, কিন্তু আমাদের হুজুরে আলীর অনুমতি নিয়েই আমি আমার মনে যা ছিল তা বলেছি।'

দুই আগুনের মাঝে পড়লেন বাবর। 'সন্ধি স্থাপন কর, নির্মাণকার্য চালাও!' মা বলছেন। তার অর্থ হল, 'হরিণের মত দায় দায়িত্বহীন জীবন যাপন কর।' কিন্তু কাসিমবেগ ঠিকই বলছে বর্তমান জগতে শান্তিতে বাস করা সম্ভব নয়। হিংস্র নেকড়ের দলের মাঝে হরিণ বেশিদিন বাঁচতে পারে না, নেকড়ের দলের মাঝে হতে হবে সিংহ।

এই দীর্ঘ, শক্তিক্ষয়কারী আলোচনা বন্ধ করতে সিদ্ধান্ত নিল কাসিমবেগ।

'হুজুরে আলী, আপনি আজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবেন বলেছিলেন। ঘোড়া বহুক্ষণ তৈরি। ... মালিকা সাহেবার প্রস্তাব আজ সন্ধ্যায় সব বেগদের সঙ্গে একত্রে আলোচনা করা যায় না কি? বেগদের এক বিরাট সভা ডাকা যাবে ...'

খানজাদা বেগম মায়ের সঙ্গে ক্ষিপ্র দৃষ্টিবিনিময় করলেন: একজন বেগকে বোঝান গেল না, আর সব বেগকে বোঝান? কুতলুগ নিগর-খানুম চিন্তায় পড়লেন কী করে কথাবার্তা চালানো যায় এরপর, কিন্তু বাবর তরুণসুলভ ক্ষিপ্রতায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন:

'সভা কাল ডাকা যাবে, ভাল করে সবকিছু চিন্তা করা দরকার। এখন ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে আসা দরকার...।'

৪

ওশের থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত ছোট ছোট টিলাভরা সমতলভূমি, আশ্চর্য উজ্জ্বল মেঠোফুলে — নীলচেবেগুনী ঘণ্টাফুলে, লাল পোস্তফুলে ঢাকা।

বাবরের ঘোড়া চলেছে ধীরে সুস্থে; দূরের বরফঢাকা পাহাড়চূড়া থেকে চোখ সরাচ্ছেন না বাবর। সেই সঙ্গেই অনুভব করছেন যে লম্বা ঘাসের ওপর ঘোড়া কেমন নরমভাবে পা ফেলছে। বসন্তের সৌন্দর্য চোখ আর মন ভরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মন তাঁর শান্ত হচ্ছে না, মায়ের আর উজীরের মধ্যে, নিজের মধ্যেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কঠিন বিবাদ। নিজের মধ্যে যে তর্ক-বিবাদ তার জট তিনি নিজের খুলতে পারবেন না। এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন না কি যিনি এই জট খুলে দেবেন ঠিক তেমনি ভাবে যেমন বাবর চান? কেমনভাবে তিনি চান? পীরের সঙ্গে কথা বলবেন নাকি? অসুস্থ হয়ে পড়ায় খাজা আবদুল্লা ওশে আসতে পারেননি, কিন্তু বাবর জানেন তিনিও সমরখন্দ অভিযানের পক্ষেই ছিলেন। মওলানার কাছে তিনি একথা বহুবার শুনেছেন যে, যতদিন মাভেরান্নহর একত্রিত না হবে ততদিন যে-কোন বড় স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। তার মানে আবার যুদ্ধ আর নির্মাণকার্য স্থগিত রাখতে হবে। ... অনির্দিষ্টকালের জন্য ...

অশ্বারোহী পাহাড়ের ঢালের ওপর উঠল। এখানে থেকে চারপাশটা ভালো করে দেখা যায়। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কাসিমবেগের মুখ দিয়ে বিস্ময় ধ্বনি বেরিয়ে এল:

'কতভেড়ার পাল!'

সত্যিই পশ্চিম দিকে দেখা যাচ্ছে গোটা দশেক টিলার ওপর থেকে নেমে আসছে ভেড়ার পাল। অনেক অনেক পাল। পঁচিশ বছর বয়সী খাজা কালান বেগ, যার গায়ের রঙটা চাপা, চোখের ওপর হাত আড়াল করে দূরে তাকাল।

'উ-হু-হু!' বিস্ময় ধ্বনি করে উঠল সে 'আরো বড় বড় ঘোড়ার পাল আছে।'

'ঘোড়ার পাল পূর্বদিকেও, দেখুন দেখুন!'

ঘোড়া আর ভেড়ার পাল এগিয়ে আসছে দ্রুত। তার মানে, ওরা চরছে না — ওদের তাড়িয়ে আনা হচ্ছে। ঐ তো দুটি ভেড়ার পাল দেখা যাচ্ছে ঢালে। তারপর আরো দুটি। দূরের পাহাড়গুলির ওপার থেকে একের পর এক ছুটে বেরিয়ে এল চারটি ঘোড়ার পাল আর দ্রুত ছুটে ঢালের দিকে যেখানে বাবর তাঁর অনুচরবৃন্দ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

বাঁদিকে থেকে আরো ঘোড়ার পাল এগিয়ে আসতে লাগল।

ঘোড়া আর ভেড়ার পালগুলি ওশের দিকে এগিয়ে আসচে। তারপর পাহাড়ের পটভূমিতে আলাদা করে দেখা গেল কতকগুলি ঘোড়সওয়ার।

তাহলে এই ব্যাপার! আহমদ তনবাল তিনশত অশ্বারোহী নিয়ে হানা দিতে গিয়েছিল—তারাই ফিরে আসছে। খুশিতে চীৎকার করে কাসিমবেগ বলল:

'কী দারুণ শিকার!!'

খাজা কালানও উত্তেজিত হয়ে বলল:

'আশ্চর্য! বিশাল!'

সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। হবে না আবার! এই ভেড়া আর ঘোড়ার পালের এক পঞ্চমাংশ যায় বাদশাহের ভাগে আর বাকী অংশ ভাগ করে দেওয়া হয় বেগ ও দরবারের অন্যান্য উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে। এ যেন আকাশ থেকে পাওয়া ধন! বেগরা আনন্দ চাপতে পারছে না।

বাবর ঘোড়া ফেরালেন তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে থাকা অশ্বারোহী বাহিনীর দিকে। লাগাম ঢিলে করে দিলেন, ঘোড়াটি উড়ে চলল পক্ষীরাজের মত। বেগরাও দৌড় দিলেন তাঁর পিছনে পিছনে, এক টিলা থেকে আর এক টিলায়। একটি টিলার ওপর থামলেন বাবর।

বাহিনীর আগে আগে আসছে আহমদ তনবাল, বর্মঢাকা শরীর। বুকের বাঁদিকে আর বাঁকাঁধ আড়াল করা ঢালটায় রোদ পড়ে চকচক করছে। আহমদের ঘাড়ে তীর লেগেছে, ক্ষতস্থানটা বেঁধেছে সে একটুকরো সবুজ রংয়ের কাপড় দিয়ে। মুখচোখ বসে গেছে তার, গালের হাড়দুটো আরো উঁচু দেখাচ্ছে। বাবরের থেকে পঞ্চাশ পা দূরে ঘোড়া থেকে নামল সে, নতজানু হয়ে বসে সামনের মাটি চুম্বন করল:

'হুজুরে আলী, আমাদের দুশমন চাগ্রাকদের আচ্ছা সাজা দেওয়া হয়েছে কর না দেওয়ার জন্য। ওদের থেকে নিয়ে নিয়েছি ষোলহাজার ভেড়া আর আড়াইহাজার ঘোড়া!'

'অভিযান ভালোয় ভালোয় কেটেছে তো?'

'ঐ হারামজাদা রাখালগুলো আদেশ মানতে চাইছিল না, হুজুরে আলী, ওরা

বিদ্রোহ করে। আমাদের তিনজন সিপাহীকে মেরে ফেলে, দশজনকে ঘায়েল করে ....
কিন্তু আমরাও খুব ভাল করে বদলা নিয়েছি!'

বলে আহমদ বাহিনীর পুরোভাগে চলতে থাকা এক তাগড়াই চেহারার যুবককে ইঙ্গিতে ডাকল। যুবকটি ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা বস্তাটি নিয়ে লাফিয়ে নেমে এল ঘোড়া থেকে, মির্জার দিকে এগিয়ে এল মোটা কাপড় দিয়ে সেলাইকরা বস্তাটা রক্তে মাখামাখি। সৈন্যটা বস্তা থেকে ঢেলে দিল মানুষের কাটা মাথা কতকগুলো। আহমদ তনবাল গুনতে লাগল: পনেরোটা। কেন কে জানে বাবর ভাবলেন, 'চাগ্রাকরা আমাদেরই তুর্কভাষী ... আর আমরা ওদের...' গায়ে কাঁটা দিল। নিজেকে বোঝাতে চাইলেন যে ঠিকই শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তাঁরই আদেশ অনুযায়ীই আহমদ তনবাল তা করেছে: ওরা তুর্কভাষী, একই পরিবারের লোক, কিন্তু কর দিতে হবে আত্মীয়স্বজনকেও। কিন্তু এই চাগ্রাকরা তাঁর শাসন মানে না, তার কর-আদায়কারীদের ওপর তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, নিজেরাই এখন তলোয়ারের আঘাত পেল... নিজেকে বোঝাতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। ঐ মুণ্ডুগুলোর একটার ... ওদের একজনের দাড়ি ওঠেনি, মসৃণ হলদেটে মুখ, সবে গোঁফ উঠতে আরম্ভ করেছিল। চাগ্রাকতরুণটির বয়স সতেরোবছরের বেশি নয় কিছুতেই। ঘাড়ের একেবারে শুরু যেকানে সেখানে কেটে ফেলা হয়েছে তার মাথাটা।

বাবরের মুখ মলিন হয়ে গেল। কাসিমবেগের দিকে ফিরলেন। কোন কথা বললেন না।

আহমদ তনবাল ও তার সিপাহীরা বাবরের কাছে প্রশংসা ও পুরস্কার পাবার প্রত্যাশায় আছে। ষোলহাজার ভেড়া, আড়াই হাজার ঘোড়া কম কথা নাকি! তিনজন সৈন্য মরেছে ঠিকই, কিন্তু তার বদলে ঐ তো প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, পনেরোটা কাটামাথা গড়াগড়ি খাচ্ছে ঘসে পড়ে। আর সাহস প্রদর্শন করেছে তারা মাত্র এই ক'জনকেই হত্যা করে নয়। সাহসের জন্য উৎসাহিত করতেই হবে তাদের।

বাবরের মুখোচোখ ফেকাসে হয়ে যেতে দেখে উদ্বিগ্ন কাসিমবেগও তাই মনে করে। নিহত লোকেদের মাথা কেটে নেওয়া এ একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতবছর সমরখন্দের কাছে তরুণ শাহ অনেক কাটামাথা দেখেছেন। যখন কেউ বলে যে আমি অনেক শত্রু মেরেছি অথচ তার প্রমাণ দেয় না তাহলে কেউ বিশ্বাস করে না। এমন লোক আছে গল্প করেই বলে অনেক করেছে। আর এখানে যোদ্ধার কৃতিত্ব তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে: যোদ্ধা কাটা মাথার পরিমাণ দিয়ে বোঝাতে চাইছে যে দায়িত্ব পালন করেছে সে।

'হুজুরে আলী,' ফিসফিস করে বলল কাসিমবেগ, 'আমি বলব?'

মাথা নাড়লেন বাবর। কাছে এগিয়ে এসে কাসিমবেগ আবার ফিস ফিস করে বলল :

'পুরস্কার হিসাবে যদি তলোয়ারটা দেওয়া হয়... আপনি রাজী?'

বাবরের অস্ত্রবাহকের কাছে যত তরবারি ছিল তার মধ্যে একটি ছিল সোনালী হাতলসমেত বাগদাদের তরবারি। দুয়েক বার বাবর সেটি কোমরবন্ধে পরে আবার খুলে ফেলেছেন— বড় ভারী মনে হয়েছে। কিন্তু এবার সেটিকে ঝুলিয়ে দিয়েছেন অস্ত্রবাহকের কোমরবন্ধে। বাবরের চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেটির ওপর, কাসিমবেগ বুঝল।

'সম্মানিত বেগ,' আহমদ তনবালকে উদ্দেশ্য করে জোরে জোরে বলল, 'এই বিশাল অভিযান শেষ করে আপনি ফিরে আসায় আমাদের বাদশাহ্ অত্যন্ত আনন্দিত। আবার আপনি দেখিয়ে দিলেন মির্জা বাবরের প্রতি আপনার বিশ্বস্ততা কতদূর বিস্তৃত। আমাদের বাদশাহ্ এবং তাঁর নিকটজনেরা সবাই বলছেন 'ধন্য আপনি!' বিজেতাদের সম্মানে ওশে বিরাট ভোজসভা হবে, সমস্ত বীর যোদ্ধারা উপযুক্ত পুরস্কার পাবে। আর এখন আমাদের বাদশাহ্ মির্জা বাবর আপনাকে দান করছেন তাঁর নিজের এই সোনার হাতল বসান তলোয়ারটি!'

কাসিমবেগ অস্ত্রবাহকের হাত তেকে বাগদাদের তরবারিটি নিয়ে আহমহ তনবালের দিকে এগিয়ে দিল, আহমদ তনবাল, নতজানু হয়ে বসে উপহারটি তুলে ধরে খাপ থেকে তরবারিটি খুলে ধরে চার আঙুলের ওপর লম্বালম্বি রেখে ইস্পাতের ওপর চুম্বন করল আর উদ্বেগে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল:

'মৃত্যু পর্যন্ত আপনার উদারতা ভুলব না, মালিক, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনার খিদমত করার শপথ নিলাম।'

৫

সেইদিন সন্ধ্যানাগাদ শহরের প্রান্তে খাটান শত শত তাঁবুর সামনে বেজে উঠল ঢাক, সানাই, জ্বলে উঠল মশাল আর আগুন, আরম্ভ হল বিরাট উৎসব। বেগ, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা, দাসসহচরেরা প্রাসাদের কর্মচারীরা — যেই ভেড়া বা ঘোড়া লাভ করেছে এই অভিযানের ফলে সেই আনন্দে মত্ত। বাবরের চমৎকার তাঁবুতে এসে উপস্থিত হয়েছেন সবচেয়ে খ্যাতি-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রধান ভোজ উৎসবে। বাজিয়েরা বাজনা বাজিয়ে তাদের কান জুড়িয়ে দিচ্ছেন, গায়ক তাদের শোনাচ্ছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ গানগুলি।

তাঁবুর ভেতরে বাবর বসেছিলেন একটু উঁচু মঞ্চের ওপর, চারধাপ গিলটি করা সোনার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় সেখানে। মির্জার নীচে, তাঁর ডানদিকে সবচেয়ে সম্মানিত বেগদের মাঝে বসে আছে আহমদ তনবাল, যোদ্ধার পোশাকের বদলে এখন তাঁর পরনে জরির চাপান, রূপালী রংয়ের উষ্ণীষ আর সেই রংয়েরই কোমরবন্ধে ঝুলছে বাবরের উপহার দেওয়া তরবারি। সবাই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে সফল

অভিযান শেষ হওয়া আর পুরস্কার পাওয়ার জন্য। আহমদ তনবালের সব থেকে প্রীতিকর মনে হয়েছে কুতলুগ নিগর-খানুমের আর খানজাদা বেগমের অভিনন্দন জানানোটা— সে তাঁবুতে ঢুকতেই প্রথম যারা তাকে অভিনন্দন জানায় তাঁরা তাদের মধ্যে ছিলেন। বাবরের মা ও বোন সেইদিকেই বসলেন আহমদের দিকে আধাআধি পাশ ফিরে; মাঝে মাঝে আহমদ তনবাল আড়াচোখে তাকাচ্ছিল তাঁদের দিকে: বেগমের তন্বী দেহ, তার রামধনু রংয়ের রেশমের পোশাকে ঔজ্জ্বল্য ও প্রলোভন মাতাল করে তুলতে লাগল বেগকে, তার সবচাইতে সুখের প্রত্যাশাকে প্রশয় দিতে লাগল।

তরুণ বাদশাহের ভোজ উৎসবগুলিতে মদ পরিবেশিত হত না। নিজে বাবর এ পর্যন্ত কখনও মদ চেখে দেখেননি। কাসিমবেগ মদ পছন্দ করত না এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানে মদ খাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল সে। কিন্তু অন্যান্য বেগরা মির্জা উমরশেখের সঙ্গে আনন্দে কাটানো দিনগুলির কথা মনে করতে করতে বাবরের চোখের আড়ালে উজীরের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করত।

এই তো এখনই আলি দোস্ত্‌বেগ মাথা তুলে তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা শরবত পরিবেশককে চোখ টিপে ডেকে চোখের ভঙ্গিতে আহমদ তনবালকে দেখিয়ে দিল। শরবত পরিবেশনকারী মৃদু হেসে বুঝিয়ে দিল যে সব বুঝেছে, তারপর অন্য একটা রূপোর পাত্র থেকে কাচের পেয়ালায় পানীয় ঢেলে দিল। যখন আহমদ তনবাল হাতে পেয়ালা তুলে নিল, মদের গন্ধ এসে ধাক্কা দিল নাকে।

'খান, বেগ, সমরখন্দের অভিযানে আপনি আরো অনেক বেশি সফল হবেন, ' নিচুসুরে বলল আলি দোস্ত্‌বেগ।

আহমদ তনবাল মাথা নিচু করে কৃতজ্ঞতা জানাল, তারপর পেয়ালা নিঃশেষ করে দিয়ে সামনে মাংসের টুকরোর দিকে হাত বাড়াল।

'এখন আমাদের মাংসের ভাণ্ডার ভর্তি, যতদিনে আমরা সমরখন্দ, বুখারা দখল করব, ততদিন পর্যন্ত চলবে,' মাতাল আলি দোস্ত্‌বেগ সবাই যাতে শুনতে পায় এমনভাবে জোরে জোরে বলল। 'অভিযান আরম্ভ করতে হবে শীগগিরি!'

বাবর পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন বেগদের সমরখন্দ অভিযানে যাবার এত ইচ্ছা ধনী হবার জন্য। তাদের প্রবল ইচ্ছার বিরোধিতা করা আগেও কঠিন ছিল আর এখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ী নদীর খরস্রোতের মত, সেই স্রোতকে পিছন দিকে ফিরানর ক্ষমতা আর কারো নেই এখন।

৬

মওলানা ফজলুদ্দিন কয়েকদিন হল এসে আছেন খরস্রোতা বুবরাসাইয়ের তীরে, অতি সুন্দর সবুজ মনোরম জায়গায়। ছোট্ট বাড়িটি আর তার সামনে বারান্দা, যেখানে

স্থপতি সাধারণত কাজ করতেন, তার কাছেই কয়েকটি নাসপাতি গাছ। উঠোনের এক কোণে ছাঁচতলায় ঘোড়া বাঁধার জায়গায় দুটি ঘোড়া বাঁধা। চাঁদকপাল, পাটকিলে ঘোড়াটি মির্জা বাবর তাঁকে উপহার দিয়েছেন।

মওলানা ফজলুদ্দিনকে বাদশাহের ব্যক্তিগত স্থপতি নিযুক্ত করা হয়েছে, বাদশাহের কাছে আদরসম্মান পেয়েছেন তিনি, তাতে প্রথমে আনন্দিত হওয়ারই কথা। মির্জা বাবর আর স্থপতি দু'জনে মিলে আগামী বহু বছর ধরে আন্দিজানে মাদ্রাসা, গ্রন্থাগার প্রভৃতি নির্মাণের পরিকল্পনা রচনা করেছেন, এ ব্যাপারে মওলানার প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেছেন, আরো বলেছেন যে যতদিন তিনি অভিযানে ব্যস্ত থাকবেন খানজাদা বেগম নির্মাণকার্যের তদারক করবেন, তাই প্রতিটি নকশা, খুঁটিনাটি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা বলে নেওয়া ভাল। যখন মওলানা ভাবলেন বেগমের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সাক্ষাতের কথা, তার হৃদয় ছেয়ে গেল যুগপৎ আতঙ্ক ও সুখের অনুভূতি।

কিন্তু গতকাল আবার শোনা গেল যে বাবর নতুন করে সমরখন্দ অভিযানে যাবার তোড়জোড় করছেন আর এই অভিযান চালাতে সর্ব শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন, এর জন্য প্রয়োজন রাজকোষের সমস্ত অর্থ, নির্মাণকার্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হবে। আর যদি বাবর সমরখন্দ অধিকার করতে না পারেন, যদি, আল্লাহ্ না করুন একেবারেই পরাজয় স্বীকার করেন? তাহলে মাওলানার সমস্ত স্বপ্ন আপনা থেকেই উবে যাবে। আর এমন কি বাবর সমরখন্দ দখল করলেও মাভেরান্‌নহরের শাসক হয়ে তিনি সেখানেই থেকে যাবেন। ফরগানার সম্বন্ধে আগেকার মত চিন্তা কি আর করবেন? রাজধানীকেই তো সবচেয়ে বেশি সুন্দর করে তোলায় মন দেওয়া হয়, তখন কি আর আন্দিজান রাজধানী থাকবে?

মওলানার সমস্ত কাজকর্ম, সমস্ত পরিকল্পনা এই নশ্বর, ভঙ্গুর জগতে যেন বালির ওপর গড়া প্রাসাদ ...

মুল্লা ফজলুদ্দিন বসে বসে একটা জ্যামিতি বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলেন কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই। তাঁর মেজাজ ক্রমশই খারাপ হতে থাকল।

ফটকে ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ হল। বুড়ো চাকরটি কাঠের বেলচা দিয়ে ছাঁচতলায় ঘোড়া বাঁধার জায়গায় নাদ পরিষ্কার করছিল, ফটকের দিকে এগিয়ে গেল সে। তারপর বারান্দার কাছে এসে বলল:

'মুল্লা, কে যেন ভেতরে আসতে চাইছে।'

''কে যেনটা' আবার কে?

'আলুথালু পোশাক পরা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে বেশ জোয়ান চেহারা বলছে, 'আমি ওঁর ভাগনে।' ... ওকে ফাটকের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে বলেছি।

'ভাগনে? দাঁড়া তো, দাঁড়া,' উঠে দাঁড়ালেন মুল্লা ফজলুদ্দিন, খালিপায়ে চামড়ার জুতো গলিয়ে নিয়ে তিনি আধখোলা ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দীর্ঘদেহী এক যুবক, আলুথালু ধুলোমাখা চোগা আর ক্ষয়ে যাওয়া জুতো পরনে, দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে। চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। তাঁর চোখের চাউনি এবং মুখের হসি ভীষণ পরিচিত।

'মামা', বলে লোকটি মুল্লার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'তাহির! তাহিরজান!' তাকে জড়িয়ে ধরলেন মওলানা, চেপে ধরলেন বুকে। 'বেঁচে আছিস! বেঁচে আছিস! মরণের মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে আছিস! হাঃ তোকে চিনতে পারা দুষ্কর!.. এত বদলে গেছিস!.. তোর মুখে কি হল রে?'

'আর জিজ্ঞাসা কোরো না মামা...'

'যাক, ভিতরে আয় পরে সব বলিস'খন ...'

সেই দেখার প্রথম মুহূর্তেই মুল্লার সব কথা মনে পড়ল।

না, তিনবছর আগে তাহির মরেনি, আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন। তাগড়াই চেহারা ছেলেটির, সুলতান আহমদের দলবলকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল।... আর ঐ শয়তানটা — ঐ নামকরা শয়তানটার নোকর, ঐ সমরখন্দের প্রাক্তন শাসকের নোকর, নিজের বর্শা দিয়ে তাহিরকে মেরে ফেলেছে ভেবে চলে গিয়েছিল উঠোন ছেড়ে।... 'বেচারী বোনটি আমার,' ভাবলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন, 'ছেলেকে রক্তমাখামখি অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সেই যে জ্ঞান হারাল, আর চোখ মেলল না।' আর তাহির, মামার ডেকে আনা হাকিমদের চিকিৎসার তিনদিন বাদে জ্ঞান ফিরল তার। বর্শার আঘাতে ফুসফুসের ক্ষতি হয় কিন্তু হৃৎপিণ্ড ও যকৃতে কিছু হয়নি, তাহিরের অল্প বয়স ও প্রচণ্ড শক্তি তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে তোলে ক্রমশ। আত্মীয়-প্রতিবেশীরা বলাবলি করতে লাগল যে তাহিরের কাছে মৃত্যু এসেও শেষে নিল তার মাকে। মুল্লা ফজলুদ্দিন বোনের স্মৃতিতে চল্লিশদিন শোক পালন করে তারপর কুভা ছেড়ে চলে যান — সেই থেকে ভাগনার খবর তিনি আর জানেন না।

'তোমার আব্বা কেমন আছেন? ভাল?' তাহিরকে ওপরে উঠতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাহির নোংরা পোশাকে পরিষ্কার আসনের ওপর বসতে সংকোচ পেল, একধারে বসল সে।

'আব্বা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন... আর আমিও মামা, প্রায় বছর ঘুরতে যাই কুভার বাইরে... আত্মীয়রা এক বুড়ী বিধবাকে এনে দিয়েছে বাবাকে রান্নাবান্না করে দেওয়ার জন্য। আমি ... বাড়িতে থাকতে পারলাম না আর, সব সময় কেবল মা'র কথা মনে পড়ে।'

অবশ্যই একমাত্র মা'র স্মৃতিই তাকে ঘরছাড়া করেছে। হতভাগী রাবিয়া, তার সেই আর্তচীৎকার কিছুতেই ভুলতে পারে না সে। গতবছরের আগের বছর সে সমরখন্দ পর্যন্ত গিয়েছিল। পথে কাজ করেছে ফসল তোলার, কারাভানের সঙ্গে গিয়েছে,

খুঁজেছে তাকে, সর্বত্র জিজ্ঞাসাবাদ করেছে রাবিয়ার সম্বন্ধে, 'আমার বোনটিকে দেখেছ কেউ? সুলতান আহমদের লোকের তাকে নিয়ে গিয়েছে!' কিন্তু চিহ্নটি নেই তার একেবারে।

ডামাডোলের সময়। সুলতান আহমদ সেই বছরই মারা যান যে বছর ফরগানা আক্রমণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, সিংহাসন দখল করে প্রথমে তাঁর ভাই সুলতান মাহমুদ, তারপর তাঁর ছেলে বাইসুনকুর। ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে হাতিয়ার উঠিয়েছে, ছেলে বাবার বিরুদ্ধে। একজন লোক তাহিরকে বলে অনেক বন্দিনীকে নাকি তাশখন্দের বাজারে বিক্রি করা হয়। গতবছর সে পায়ে হেঁটে তাশখন্দ পৌঁছায়, খাওয়া জোটেনি ভাল, পোশাক ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে। সেখানেও রাবিয়াকে পায়নি। ঘোলাটে নদীর মত বয়ে চলেছে জীবনটা। বৃথাই যে খুঁজে বেড়াচ্ছে তা বুঝতে পারে তাহির — ঘোলা নদীর জলে মুক্তো খুঁজে বেড়ান যেন — কিন্তু খোঁজা বন্ধ করতে পারে না।

'ভাগনা রে, তুই যে তিন বছর ধরে বেচারী মেয়েটাকে খুঁজে চলেছিস, তা তোর উদার মনেরই পরিচয়। বিশ্বস্ততা পুরুষমানুষের উপযুক্ত গুণ— মানলাম। কিন্তু আন্দাজে হাতড়ে বেড়ান মানেও তো নিজের ক্ষতি করা। তাছাড়া ভেবে দেখ: ওর ভাগ্যই এমনি ছিল। কপালের লিখন কে খণ্ডায়? যদি সে বেঁচে থাকে... তো কেউ তাকে বিয়ে করেছে। সন্তানও হয়েছে তার। তিন বছর ধরে তো আর কুমারী করে রেখে দেব না তাকে? নিজেই ভেবে দেখ।'

'একথা আমি অনেকদিনই ভেবেছি মামা... আমি কেবল তার সামনে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই... আর কিছুই না...

'কোন পাপ?'

'রাবিয়াকে তার বাবা মা আন্দিজান পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আমিই বলে রাজী করেছিলাম কুভাতে থেকে যাবার জন্য।'

'তখন তুই জানবি কি করে যে এমন ঘটনা ঘটবে?'

'জানতাম না ঠিকই... কিন্তু যতদিন আমি তাকে খুঁজে না পাব, তাকে দেখতে না পাব, আমার শান্তি আসবে না কিছুতেই। যদি রাবিয়ার আপনি যেমন বলছেন বিয়ে হয়ে থাকে, নিজের ঘরসংসার হয়ে থাকে তো... আমি আমার ভাগ্য মেনে নেব। আর যদি না হয়? যদি তার সম্মানের পারিবারিক জীবন না থাকে, আর এখন তার উদ্ধারকর্তার অপেক্ষায় — আমার অপেক্ষায় থাকে? ওকে তো ভুলতে পারছি না এখনও? ও-ও যদি আমাকে ভুলতে না পেরে থাকে?'

সহানুভূতিতে মাথা নাড়ালেন মুল্লা ফজলুদ্দিন:

'তিন বছর কাটল, তিন বছর... আমাদের প্রত্যেকে, প্রত্যেকেই বদলে গেছে। আগের যে মনোকষ্ট তার কোন ঔষধ নেই, দেখছি।' বলে কথা ঘোরালেন এবার অন্য

দিকে। 'তাহিরজান, তোর মামা এখন ধনী হয়ে উঠেছে,' বলে মুল্লা ফজলুদ্দিন জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে ফুৎনা ঝোলান কালো চামড়ার একটা ছোট থলি বের করে আনলেন। প্রথমে তিনি কয়েকটি সোনার মোহর তাকে দেবেন ভাবলেন, তারপর পুরো থলিটাই এগিয়ে ধরলেন ভাগিনার দিকে।'এই নে, আজ জুম্মাবার, বাজারের দিন, অনেক কিছু আসবে, তোর যা দরকার কিনবি।'

'না মামা, অমনি না ... আপনি আমাকে ধার দিন।'

'ঠিক আছে, বেশ ধারই সই! যা দরকার নিবি, যখন তোর টাকাপয়সা হবে ফিরিয়ে দিস।'

'এ হল অন্য কথা।'

সন্ধ্যায় মুখে ফিরল তাহির। সৈন্যরা যে জুতো পরে পায়ে সেই জুতো কিনেছে চমৎকার এক জোড়া, মাথার মোগলটুপী আর মোটা পশমের চেকমেন। তাহিরের হাতে তলোয়ার, সেটার খাপটা রঙচটা-দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোন সৈন্যের ব্যবহার করা। বিস্মিত হলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন:

'তলোয়ার কী হবে তোর?'

'বাবরের ফৌজে রাজাকারদের নাম লেখান হচ্ছে...'

এবার স্থপতি বুঝলেন ভাগনা ওশে এসেছে কেন, আঁতকে উঠলেন:

'পাগল হলি নাকি? তাহির, সবাই যুদ্ধ থেকে দূরে পালায়, আর তুই কিনা নিজে বিপদের মুখে মাথা গলিয়ে দিচ্ছিস! সমরখন্দের বর্শার চোটও যথেষ্ট হয়নি তোর?'

'মামা, সে ঘটনার পরে কতবার মরার মুখ থেকে ফিরে এসেছি। তাশখন্দের এক বেগ এক গরিবলোকের মেয়েকে জোরজবরদস্তি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল— ঠিক যেমন রাবিয়ার ভাগ্যে হয়, আমি থাকতে না পেরে, ঝাঁপিয়ে পড়লাম আর এই— মুখের কাটাদাগ আমার, এ সেই বেগের ছোরার দাগ...'

'এখনও বুঝিসনি যে শক্তিরই জয় দুনিয়াতে?'

'তাই আমি শক্তিশালী সৈন্যদলে নাম লেখাতে চাই। অত্যাচারীরা শক্তিকে ভয় পায়।... মানুষের অনেক কষ্ট দেখেছি, মামা সাধারণ লোকের সঙ্গে সব দুঃখ ভাগ করে নিয়েছি আমি। অনেকে আমায় বলেছে যে মির্জা বাবরের মনটা পরিষ্কার, সৎ চিন্তাধারা।... ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ ছাড়া আর কে আমাদের সাহায্য করতে পারে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মুল্লা ফজলুদ্দিন:

'কিন্তু মির্জা বাবরের বয়স অতন্ত অল্প। আমিও তাঁর ওপর আশা করেছিলাম, ভেবেছিলাম, ফরগানাকে সুন্দর করে তুলব... আবার যুদ্ধ, আবার রক্ত ... সবাই আমরা অন্ধকারের মধ্যে আছি, অন্ধকার রাত্রির আলিঙ্গনে। এই সময় ন্যায় বোধহীন, ধূর্ত। দেখিস, তুইও যেন জালিম বেগেদের হাতের অস্ত্রে পরিণত হোস না।'

'আমাকে বিশ্বাস করুন মামা, তা হবে না, অন্যায়ের পথে থাকব না আমি...'

'বাবর নিজের বেগদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন, প্রশ্রয় দিচ্ছেন অন্যায়কে।'

'তার কারণ হয়ত আমার মত লোকের সংখ্যা মির্জা বাবরের দলে খুব কম? বেগদের দলবল নিয়েই ফৌজ তৈরি হয়। বহুদিন ধরেই তা চলে আসছে।... আমি আর কোন পথ পেলাম না খুঁজে মামা। একা একা আমি কিছুই করে উঠতে পারব না।'

মুল্লা ফজলুদ্দিন একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ভাগনার দিকে। যা স্থির করেছে ও, তার থেকে পিছু হঠান যাবে না ওকে, না কিছুতেই না।

'যে নাম লেখাচ্ছে তার সঙ্গে কথা বলেছিস তুই?'

'হ্যাঁ। সে বলল, 'তোর ঘোড়া নেই, পদাতিক দলে নেব তোকে।' আমার তো পায়ে হেঁটে হেঁটে অভ্যাস হয়ে গেছে, মামা।'

'সব থেকে বেশি ক্ষতিস্বীকার করে পদাতিক বাহিনী, তুই ভেবে দেখেছিস একথা?'

'তাতে কী... এক যুদ্ধ বা চল্লিশটা যুদ্ধ... যার মরার কথা সে মরবেই।'

'যুদ্ধ মৃত্যু ওসব কথা এখন থাক, ভাগনে!'

সকালে নাস্তা খাওয়ার পর মুল্লা ভৃত্যকে আদেশ দিলেন ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে থাকা দুটি ঘোড়াকেই লাগাম-জিন পরাতে।

'ঐ ঘোড়াটা নে,' লম্বাপা ঘোড়াটা দেখিয়ে তাহিরকে বললেন, 'তুই পদাতিক দলে গেলে আমার মানে লাগবে।'

স্থপতি নিজে বসলেন বাবরের উপহার দেওয়া পাটকিলে রংয়ের চাঁদকপালী ঘোড়াটায়।

দু'জনে মিলে বাবরের মহলের দিকে চললেন।

মুল্লা ফজলুদ্দিন কাসিমবেগকে অনুরোধ করলেন তাহিরের জন্য।

'বাদশাহ্‌কে অনুরোধ করতে চাই, আমার ভাগনেকে তিনি যদি ... তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদলে নেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ও মির্জা বাবরের বিশ্বস্ত যোদ্ধা হয়ে থাকবে।'

কাসিমবেগ দেখল কি মজবুত, শক্তিমান চেহারা তাহিরের।

'এর আগে সৈন্যদলে ছিলি কখনও?' তাহিরের মুখে ক্ষতচিহ্নটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল কাসিমবেগ।

'না, ছিলাম না কখনও,' তাহিরের উত্তরটা অতন্ত রুক্ষ, অনমনীয় শোনাল।

মুল্লা ফজলুদ্দিন যোগ দিলেন:

'জনাব আমীর উল-উমরা, আমার ভাগনেটি চাষী পরিবারের লোক, কিন্তু সিপাহী হতে গেলে যে সব গুণ থাকা দরকার সে সবই ওর আছে। আপনার কুভা নদীর

পুলের ওপর সমরখন্দ সৈন্যদলের কি দারুণ ক্ষতি হয়? তখন আমাদের বিজয় এনেছিল যারা তাদেরই একজন এই তাহির!...'

'আমাদের বিজয় এনেছিল?' অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল কাসিমবেগ। 'কেমন করে?'

স্থপতি সংক্ষেপে বলা কাহিনীতে মনে হল যেন গ্রামের সাধারণ কয়েকটি ছেলে এমন কাজ করেছে যা বেগ যা যোদ্ধারা করতে পারেনি। কাসিমবেগের সেকথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল না।'

'কুভার জয় খোদার দান, মওলানা!'

'অবশ্যই, খোদা নিজে এই ছেলেগুলির মনে সরু পুলটা ধ্বংস করে ফেলার কথা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।... তখন তাহির গুরুতর আঘাত পায়, মরতে মরতে বেঁচে যায়, জনাব কাসিমবেগ!'

'তাই নাকি!' এবার খানিকটা প্রসন্ন মনে উজীর তাকাল তাহিরের দিকে। 'সমরখন্দের লোকেদের ওপর তোমার যেন কোন পুরানো হিসাব চুকানোর ইচ্ছে আছে, নওজোয়ান?'

'হ্যাঁ।'

যে লোকটা নাম লিখে নিচ্ছিল, কাসিমবেগ তাকে বলল:

'চিলমহরম পাহাড়ের নিচের যাদের তালিম দেওয়া হচ্ছে সেই সিপাহীদের দলে এই ছেলেটির নাম লিখে নাও।' তারপর মুল্লা ফজলুদ্দিনকে বুঝিয়ে দিল, 'সব থেকে ভালদের বেছে নেওয়া হয়েছে ঐ দলে। যাদের বাদশাহের দেহরক্ষীদলে নেওয়া হবে।'

৭

বেগদের বৈঠকে সমরখন্দ অভিযান রমজান মাসে শুরু করা হবে বলে স্থির হল। প্রধান প্রস্তুতির প্রায় সবটাই ওশে করা হবে।

বাবর চেষ্টা করছেন কুতলুগ নিগর-খানুমের সামনে না পড়ার। অভিযানের পূর্বের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত সময় কাটান নিজের তাঁবুতে একা। বইপুঁথি পড়েন।

আজ সন্ধ্যার নামাজের পরে বাবর তাঁর 'অতীত কথাতে' লিখেছেন পিতার মৃত্যুর কথা। ভৃত্য এসে খবর দিল কুতলুগ নিগর-খানুম আর আলি দোস্তবেগ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। খাতা বন্ধ করে বাবর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন মাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য, তাঁকে এনে সম্মানের আসনে বসালেন।

কুতলুগ নিগর-খানুমের চেহারা মলিন। কপালের একটু ওপরে, ঠিক সিঁথির কাছে এক গোছা সাদাচুল চোখে পড়ছে। বয়স তাঁর মাত্র চল্লিশ বছর, পোশাক পরেন বৃদ্ধার

মত, ঝুঁকে পড়ে হাঁটাচলা করেন। বাবরের মায়া হল মায়ের জন্য, নিচু শান্তস্বরে তিনি নিজেই সেকথা আরম্ভ করলেন যা কয়েক মুহূর্ত আগে মোটেই বলতে চাননি:

'আম্মাজান, আপনি ভাববেন না যে আমি আপনার সব উপদেশ ভুলে গিয়েছি। খোদা যদি তেমনি দিন দেন তবে সমরখন্দ অভিযান থেকে ফিরে এসে তারপর আপনি যা যা বলেছিলেন সব করব আমি।'

'আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, সবকিছু দেখতে পান তিনি। আমরা তাঁর দাস মাত্র — কোন কিছু নিয়ে রাগ করা উচিত নয় আমাদের। খোদার দোয়া থাক তোমার ওপর, আমার বাছা মির্জা, তোমার মনের যত ভাল ইচ্ছা যেন পূরণ হয়!'

আলি দোস্তবেগ তার শক্তিশালী হাতগুলি ওপরে ওঠাল দোয়া করার ভঙ্গিতে:

'ইলাহি আমিন!' নিজের মোলায়েম মাকুন্দ মুখের ওপর বুলিয়ে নিল।

এই মাকুন্দ লোকটি বাবরের নানী এসান দৌলত বেগমের চাচাত ভাই। সেই কারণে বেশ জাঁক করে নিজের নামের আগে খেতাবের মত ক'রে যোগ করে'তাগোই' (অর্থাৎ বাদশাহের মামা) এবং সেই কারণেই কুতলুগ নিগর-খানুমের প্রতি তার অভিভাবকসুলভ মনোভাব। আর তাই সবাই রেশমী আসনের ওপর বসলে আলি দোস্তবেগ কুতলুগ নিগর খানুমের দিকে তাকাল, চোখে কিছুটা অনুপ্রেরণা দেওয়ার মত ভঙ্গি আর জিজ্ঞাসা যেন বলতে চাইছে আরম্ভ করা যাক, তাহলে? খানুম মাথা নাড়ালেন কিছুটা সম্মতি জানিয়ে আর কিছুটা আলি দোস্তবেগকে কথা আরম্ভ করার অধিকার দিয়ে। আলি দোস্তবেগ একটু কেশে নিয়ে, মাথা নিচু করে বলতে আরম্ভ করল:

'হুজুরে আলী, আপনার ওয়ালিদা সাহেবা আর বিশ্বস্ত মামা আপনার কাছে এসেছেন এক অতি সূক্ষ্ম সমস্যার বিষয়ে পরামর্শ করতে। আপনার মাননীয়া ভগিনী খানজাদা বেগমের বিশ বছর পূর্ণ হল। এবার বিবাহের প্রয়োজন। সে চাঁদের মতই সুন্দর, দিনের মতই পরিষ্কার, বুদ্ধিমতী ও বিনয়ী, কিসের মত যে বলি... জানি না কিসের মত, যাক এটা আসল কথা নয়। আসল কথা হল এখন পর্যন্ত তাঁর উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায়নি। আপনার ওয়ালিদা সাহেবা ও মামা চিন্তায় পড়েছেন: এমন উপযুক্ত সময় চলে যাচ্ছে...'

'আরো দু' এক বছর বসে থাকলে তো ওকে নিয়ে হাসাহাসি আরম্ভ হয়ে যাবে। লোকে বলবে মির্জা উমরশেখের মেয়ে আইবুড়োই রয়ে গেল,' কুতলুগ নিগর-খানুম বললেন।

বোনকে নিয়ে এমন ধরনের কথাবার্তা বাবর এর আগেও শুনেছেন। আজ আলি দোস্তবেগের দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে যে উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাওয়া গেছে। শিশুসুলভ কৌতুহলে বাবর সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন :

'কে আমার বোনকে শাদী করতে চায়?'

আলি দোস্তবেগ এমনি সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইল না। 'কে একথা বলতে সাহস করবে যে আমি ফরগানার বাদশাহের বোনাই হবার উপযুক্ত?' বৃদ্ধ বেগ সাড়ম্বরে জবাব দিল।

'তবু?' আবার জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বাবর।

আলি দোস্তবেগকে এবার গুপ্তকথা জানাতেই হল।

'হুজুরে আলী, আপনার সিপাহসালারদের মধ্যে আছে সুলতান আহমদ তনবাল। বড় বংশ, সাহসী যোদ্ধা, আঠাশ বছর বয়স। গতবছর কেমন করে ও ইয়াকুববেগের ষড়যন্ত্র ফাঁস করতে সাহায্য করে মনে আছে আপনার? আর চাগ্রাকদের বিরুদ্ধে অভিযান?...

বাবর ঘাড় নেড়ে জানালেন মনে আছে। কিন্তু যখন তিনি খানজাদা বেগমকে আহমদ তনবালের পাশে কল্পনা করলেন বুকটা তাঁর ব্যথায় টনটন ক'রে উঠল — কোনো মিল, মনের কোনো মিলই নেই।

'আম্মাজানের কি মত আছে?'

কুতলুগ নিগর-খানুম গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'আর কি উপায়ই বা আছে? ' প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করলেন তিনি। 'রাজাবাদশার উপযুক্ত পাত্রী খানজাদা। কিন্তু এই গোলযোগের সময়ে ভাল পাত্র কোথায় পাব? তোমার মামা আর আমি খোঁজখবর করে জেনেছি: বেগ আহমদ তনবাল অত্যন্ত খানদানী ঘরের সন্তান, তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন সুলতান, স্বয়ং চেঙ্গিজ খানের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। তাঁর বড় ভাই বেগ তিলবা বর্তমানে তাশখন্দে — তোমার মামা খান মাহ্‌মুদের উজীরে আজম। যদি বেগ আহমদ আমাদের জামাতা হন তো নিজের বড় ভাইয়ের সাহায্যে তিনি তোমার মামা খান মাহ্‌মুদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করবেন। তাছাড়া এমনিতেও এমন প্রতিপত্তিশালী বেগ তাঁর আত্মীয়পরিজন সৈন্য সামন্ত সমেত তোমার পক্ষতলে, এ এক বিরাট অবলম্বন।'

'ঠিক কথা!' গভীর বিশ্বাসে বলে উঠল আলি দোস্তবেগ।

বাবর কাঁধ ঝাঁকালেন, কী বলবেন বুঝতে পারলেন না: এমনকি সঙ্কোচ হল তাঁর— বোন তাঁর থেকে পাঁচবছরের বড়, এদিকে মা আর বৃদ্ধ বেগ তাঁকে এমনি গুরুতর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বলছেন?

'বেগমের নিজেরও ভালই হবে এ বিবাহে,' বলে চলল দোস্তবেগ, কোন বাদশাহের সঙ্গে শাদী হলে, মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে, চলে যেতে হবে তাঁর প্রাণপ্রিয় ভাই আমাদের বাদশাহের আশ্রয় ছেড়ে...'

'ও কাছে থাকলে আমারও বেশ ভাল হবে' আবার তাঁকে থামিয়ে দিলেন কুতলুগ নিগর-খানুম, 'খানজাদা আমার প্রথমা কন্যা, আমার পরামর্শদাতা, এখানে বিয়ে হলে আমার চোখে চোখেই থাকবে, একা বোধ করব না আমি!'

বাবর ভাবলেন অনেককিছু যা তাঁর মাথায় আসে না তা মা জানেন দৃঢ়স্বরে বললেন:

'আম্মাজানের যখন মত আছে, তখন সব মিটে গেল।'

দোস্তবেগ খুশি হয়ে উঠল :

'ঠিক তাই, হুজুর, ঠিক তাই! কথায় বলে: মা রাজী তো খোদাও রাজী!' কুতলুগ নিগর-খানুম কিন্তু আনন্দিত নন। কেন? বাবর জিজ্ঞাসা করলেন:

'আর বেগম নিজে কি বলছেন?'

কুতলুগ নিগর-খানুম অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন তাঁর মনখারাপের কারণ:

'বেগম রাজী নয়। যখন জানতে পারল, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল।'

'এমন সময় সব মেয়েই কাঁদে,' হি হি করে হেসে বলল দোস্ত্‌বেগ।

'থামুন বেগ,' হঠাৎ বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন কুতলুগ নিগর খানুম। 'থামুন.. খানজাদা বেগমের মানসিক অবস্থা আমাকে অত্যন্ত চিন্তিত করে তুলেছে। বাবরজান,' এবার চাপা স্বরে তিনি বললেন, 'আমি হঠাৎ শুনে ফেলি তার ভয়ঙ্কর কথাগুলি ... সে আত্মহত্যা করতে চায় ... কী যে করি, কী যে করি বুঝতে পারছি না...'

'কী?' লাফিয়ে উঠলেন বাবর।

বৃদ্ধ বেগ কিন্তু চুপ করে রইল না।

'হুজুরে আলী, আপনার বোন আপনাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসেন,' বলল সে, 'আপনার অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না। আপনার মহামাননীয় ওয়ালিদা সাহেবা আর আমি এসেছি আপনার কাছে এই অনুরোধ নিয়ে যে আপনি খানজাদা বেগমকে কাছে ডেকে কথা বলুন। রাজ্যের স্বার্থে আপনার বোনকে সম্মতি দিতেই হবে। আলী নসব বেগ আহমদ বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠিয়েছেন। তিনি ও তাঁর আত্মীয়বর্গ আপনার অনুগ্রহের অপেক্ষায় আছেন। আপনি প্রত্যাখ্যান করলে তাঁরা আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন। তাছাড়া মালিকা সাহেবাও ঠিক কথাই বলেছেন— আরও তিন-চার বছর বেগম ঘরে বসে থাকলে আপনার শত্রুরা গুজব ছড়াবে যে এই আইবুড়ো বেগমের জন্য পাত্র খুঁজে পেল না। এই গুজবে আপনার পরিবারের ক্ষতি হবে! খানজাদা বেগম যদি আপনার মঙ্গল চান তো রাজী হতে হবে তাঁকে। হতেই হবে ...

বাবর দু'হাতে মাথা চেপে ধরে দিশাহারা হয়ে চুপ করে রইলেন। এমন ঘটনার সম্মুখীন হওয়া তাঁর জীবনে এই প্রথম। অন্য কেউ হলেও বা কথা ছিল।... নিজের মায়ের পেটের বোন! তার সঙ্গে এ নিয়ে কথা আরম্ভ করতেও অস্বস্তি লাগছে বাবরের।.. একদিকে মা তাঁর সাহায্যের অপেক্ষায় আছেন.. সাহায্য চাইছেন, আবার ওদিকে তাঁর বোন নিজের জীবনটা শেষ করে দিতে চলেছে— কী দারুণ পাপই না হবে তাহলে।

'ঠিক আছে', নিজের জন্য কোন কিছু সিদ্ধান্ত না নিয়েই বললেন বাবর শেষে, 'বেগম আসুক একবার আমার কাছে, একা ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

খানুম তাড়াতাড়ি জায়গা ছেড়ে উঠলেন:

'এখুনি... এখুনি ওকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি!'

ফোকলা মুখ ফাঁক করে মৃদু হাসল দোস্তবেগ।

'হুজুরের আলী, আপনার সিদ্ধান্ত সকলের কাছে আইন!' বলে মুখ পাথরের মত শক্ত করলেন, যেন বাবরকে দৃঢ় হবার ইঙ্গিত দিলেন।

তার দু'জন এখন একা।

বাবর ছোট ছ'পায়া মেজ্-এর ওপর একটা বই রেখে আস্তে আস্তে পাতা উলটাচ্ছেন, প্রদীপদানের দুটি প্রদীপের আলো যে তাঁর বই পর্যন্ত এসে পড়ছে না তা লক্ষ্য করছেন না। খানজাদা বেগমের পরনের একরঙা হলুদ পোশাক, বসে আছেন তিনি, মুখেচোখে রোগার্ত পাণ্ডুর ভাব।

'আপনার কী হয়েছে, আপাজান?' বাবর বলতে যাচ্ছিলেন।

'হুজুরে আলী, আপনার সাহায্যের প্রত্যাশায় আছি আমি!'

খানজাদার বিষণ্ণ মুখমণ্ডল বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু গলার স্বর দৃঢ় শোনাল। আবার বাবর অনুভব করলেন: বুকটা ব্যথা করে উঠল। মেয়েরা কাঁদলে থাকতে পারেন না তিনি। ভাগ্য তাঁর মাথার ওপর এত এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি? বাবর আন্তরিক দুঃখ নিয়ে বললেন:

'আমার নিজেরই সাহায্যের প্রয়োজন, যে পরিস্থিতিতে আমি পড়েছি, আমি নিজেই তার থেকে বেরোবার পথ খুঁজছি। একটা পর একটা কঠিন কাজের তার এসে চাপছে মাথায়। আপনি আপনার চোখের জল দিয়ে আমাকে কোণঠাসা করে ফেলতে চাইছেন?'

দ্রুত আত্মসংবরণ করবার চেষ্টা করলেন খানজাদা:

'শাহজাদা, আমি শুনেছি যে... আহমদ তনবাল পাহাড়ে মারা রাখালদের মাথাগুলো কেটে নেয়, বয়ে আনে একগাদা কাটামাথা ...'

বাবরের মনে পড়ল গোঁফদাড়ি না গজান রক্তমাখা মানুষের মাথাটা, কেঁপে উঠলেন তিনি।

'খুনজখম ছাড়া যুদ্ধ হয় না,' বোনের চেয়ে নিজেকেই বেশি বোঝাতে চাইলেন। 'আমাদের সিপাহীরাও তো মারা গেছে।'

'আমি আমার এই সামান্য জীবন কোন আলোকপ্রাপ্ত লোকের সঙ্গে কাটাবার স্বপ্ন দেখতাম। আহমদ তনবালের হাত রক্তমাখা, ও খুনী। শাহজাদা, আপনি কি ওকে আমার যোগ্য মনে করেন?'

'আপনার উপযুক্ত পুরুষমানুষ হয়ত সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু

ওয়ালিদা সাহেবাও বোধহয় আপনাকে... কারণগুলোর কথা কিছু বলেছেন ... আর আমিও ... আপনাকে অনুরোধ করতে বাধ্য।'

খানজাদা বেগম জ্বলন্ত মোমবাতির স্বল্প আগুনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কল্পনা করলেন আহ্‌মদ তনবালকে, তার কদর্য চেহারা, মাকুন্দ মুখ, ভাবলেন তার সঙ্গে একবিছানায় শুতে হবে, — ঘৃণায় সারা শরীরটা কেঁপে উঠল তাঁর:

'আমি ঐ বেগকে ভয় পাই!'

'ভয় পাবার কিছু নেই বেগম! কাউকে আপনার এক কণা ক্ষতিও করতে দেব না আমি।'

'কিন্তু আপনার বোনকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে এমন একজন... ঘৃণ্য লোকের সঙ্গে — এর থেকে বড় আর অপূরণীয় ক্ষতি আর কী হতে পারে?'

বাবরের দৃঢ়তা শিথিল হয়ে যেতে লাগল ক্রমে।

'মন্দ... ভাগ্যই মন্দ! আমি সারা দিন এমন সব লোকের মধ্যে যাদের পছন্দ করি না। আমাকে দিয়ে সেই সব কাজ করায় যা আমি করতে চাই না। কিন্তু আমাদের রাজ্যের কথা, মাভেরান্‌নহরের কথা ভেবে নিজেকে বাধ্য করি সে সব করতে।'

দু'জনে যেন পরস্পরের কথা না শুনে যে যার নিজের কথা বলে যাচ্ছে — যদিও খানজাদা বেগম ভাইকে বেশি ভাল করে বুঝতে পারেন, সহানুভূতি বোধ করছেন তাঁর জন্য। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল ভাইটি যখন খুব ছোট্ট ছিল কী আদরে তাঁকে কোলে করতেন তিনি।

'বাবরজান, আমার একমাত্র ভাই, একমাত্র রক্ষক, আপনার জন্য জীবন দিতেও পিছপা হব না আমি! আপনার খাতিরে আহ্‌মদ তনবালকে বিয়ে করতেও রাজী হতাম হয়ত আমি। কিন্তু আপনার সংবেদনশীল মনের কথা খুব ভাল করেই জানি আমি: যেহেতু আমি সারা জীবন অসুখী থাকব, আপনার হৃদয় বেশি কষ্ট পাবে আমার দুঃখে, আমার নিজের হৃদয়ের থেকেও বেশি।'

'কিন্তু আমি খোদার কাছে দোয়া জানাব। আমার ধারণা, আপনি অসুখী হবেন না।

'যদি আমি এই লোকটিকে শাদী করি তাহলে সারা জীবন কষ্ট পাব আমি, বিশ্বাস করুন বাবরজান! আর মাভেরান্‌নহরের স্বার্থের কথা যদি বলেন... বাদশাহও মানুষ, তিনিও বেঁচে থাকেন মাত্র একবার।... আমাদের হৃদয় কি বলে তা মন দিয়ে শোনা উচিত আমাদের। পরিচ্ছন্ন মন মানুষকে কখনও প্রতারণা করবে না!'

খানজাদা বেগম এমন আন্তরিক আবেগের দমকে বলে যাচ্ছিলেন যে তাঁর হৃদয়ের আগুনের ছোঁয়া লাগল বাবরের মনেও। নিষ্ঠুর ম্লেচ্ছের দল, রাজ্যের দায়দায়িত্ব, ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা, এ সব কিছু যেন শীতে জমা বরফেরই মতই! খানজাদা বেগম যেন সেই বরফ গলিয়ে দিচ্ছিলেন, বাবরের হৃদয় যেন গলে যাচ্ছিল। আবার তাঁর

মধ্যে ফিরে এল বসন্তের উষ্ণতা, তরুণবয়সের স্বাধীনতা — স্বস্তিতে হালকা হয়ে গেল তাঁর বুকটা।

খানজাদা কথা বলছেন আর তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

'বাবরজান আপনার মনটা পরিষ্কার, আপনি প্রতিভাবান, আত্মত্যাগী তরুণ!.. এই বেগরা নিজেদের স্বার্থকে রাজ্যের স্বার্থ বলতে শিখেছে। ওরা আপনার অল্পবয়সের সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু যখন ওরা আপনাকে অপ্রিয় কোন কাজ করার জন্য চাপ দেবে তখন, আমার আর্জি, নিজের মন কী বলে কান পেতে শুনুন। আপনার পরিষ্কার মনই হল সব থেকে ভাল উপদেষ্টা। নিজের মন কখনও আপনাকে প্রতারণা করবে না!'

খানজাদা বেগম ভাইয়ের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন:

'শাহজাদা, আমি আপনার পরিষ্কার মনের কাছে ন্যায়ভিক্ষা করছি। আপনার মন আপনাকে যা বলে আপনি আমাকে সেই আদেশ দেবেন! আমি তা মেনে নেব!'

বাবর আসন থেকে লাফিয়ে উঠে বোনের হাত ধরে তুলে দাঁড় করালেন তাঁকে।

'আর কাঁদবেন না, এবার চুপ করুন!' ফিসফিস করে বললেন তিনি। কোন রকমে নিজেকে সামলে রেখেছেন তিনি কেঁদে যাতে না ফেলেন। 'আমার একমাত্র, মায়ের পেটের বোন আমার কাছে সব বেগের থেকেও আপন! এই বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় যত বিপদই আসুক না কেন, সে সবের দায়িত্ব আমি নিলাম! যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন আমার বোনের বিয়ে তাঁর ভাল না লাগা লোকের সঙ্গে হতে পারবে না কিছুতেই!'

সমরখন্দ

১

বাবরের সৈন্যদল সমরখন্দ অবরোধ করে রইল সারা গ্রীষ্ম ও শরৎকাল। গোটা সাতমাস ধরে বাইসুনকুর শহরের তোরণদ্বার বন্ধ রেখেছে। শেষে ক্ষুধা এবং অন্যান্য যে দুঃখকষ্ট সহ্য করছিল সমরখন্দবাসীরা সেসব দৃশ্য আর সহ্য করতে না পেরে বাইসুনকুর শীতের এক হিমজর্জর রাতে গোপনে শহর ছেড়ে পালাল এবং তার আত্মীয়পরিজন আর বিশ্বস্ত লোকেরাও দলে দলে পালাল হিসারের দিকে।

সমরখন্দের বেগরা যখন তাদের শাসকের পলায়নের কথা জানাতে পারল তখনি শহরের তোরণদ্বার খুল দিতে আদেশ দিল।

বাবরের অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত তিনহাজারের বেশি সৈন্য— সমরখন্দের দিকে পরিচালিত বিশাল জনসমুদ্রের এক অংশ ঢাকের সানাইয়ে জোর আওয়াজের তালে

তালে শহরে এসে ঢুকল। পাঁচবছর বয়সে বাবর প্রথম এই অপূর্ব দেশটি দেখেন— আর এখন, এই দ্বিতীয় বার। সমরখন্দের কোথায় কি তা তাঁর ভাল মনে নেই। চোখের সামনে আকাশে নীল হিমবাহের মত ভেসে বেড়াচ্ছে অপূর্ব গম্বুজগুলি। বাবর কাসিমবেগকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের কোনটি উলুগবেগের মাদ্রাসা আর কোনটিই বা বিবি খানুমের মাদ্রাসা। কেল্লার দেয়াল বরাবর সৈন্যদল দাঁড়িয়ে পড়েছে: বাবর মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছেন গোর-এ-আমীরের অপূর্ব সুন্দর গম্বুজ। এ হল তাঁর মহান পূর্বপুরুষদের সমাধি। তাঁদের কথা শুনে শুনেই তাঁরও যশলাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। এই গম্বুজটা তিনি নিজেই চিনতে পারলেন কেউ বলে দেবার আগেই। সমাধিসৌধটির শোভা আর তার নিঁখুত অলঙ্করণ বাবরকে চমৎকৃত করল।

যে টিলাটার ওপরে শহরের কেল্লাটা তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে বাবর একসঙ্গে দেখতে পেলেন শহরের বারান্দাসমেত বাড়িগুলি। রাস্তা আর গলির সারি। এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর মনে হল তাঁর বাগদত্তাও এখন এই অগুন্তি বাড়িগুলির কোন একটি জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, বিজেতার দিকে। বেচারী বন্দীজীবনের দুর্দশা থেকে রেহাই পেল, তাঁর অপেক্ষায় আছে। তবে এত যোদ্ধার মাঝে তাঁকে চিনতে পারবে তো সে?

ঘোড়াকে ধাক্কা দিয়ে বাবর কাসিমবেগের কাছে এগিয়ে গেলেন।

'বন্দীদের সম্বন্ধে জানতে কাউকে পাঠিয়েছেন?'

এই প্রশ্নের গোপন অর্থ কাসিমবেগ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল না।

'কোন্ বন্দীদের কথা বলছেন, হুজুরে আলী?'

বাবর কাসিমবেগকে তাঁর বাগদত্তার কথা মনে করিয়ে দিতে লজ্জা পেলেন (বয়সে তাঁর বাবার সমান)। অদ্ভুত লজ্জা পেয়ে গেলেন, চোখ নামিয়ে নিলেন। কাসিমবেগ আন্দাজ করলেন :

'ও বন্দী... বন্দীনি' বাবরের জিভের ডগায় আটকে যাওয়া কথাটা উচ্চারণ করল সে।

'আপনার নুয়ান কুকলদাসকে পাঠিয়েছি সুলতান আহমদের মেয়ের খবর জানতে। সন্ধ্যানাগাদ খবর পাবেন, হুজুরে আলী।'

কেল্লার ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন তাঁরা — তার ভেতরে সর্ববৃহৎ যে সৌধটি তা হল চারতলবিশিষ্ট নীল প্রাসাদ — কোক-সরাই। এই কোক- সরাইয়ে অনেক শাহেরেই মৃত্যু হয়েছে, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দু'ধরনেরই মৃত্যু, প্রাসাদটি বহুদিন ধরেই লোকের মনে ভয় জাগায়, তাই সমরখন্দের শেষ কয়েকজন শাসক সেখানে আর থাকতেন না। কোকতাশে* আরোহণ অনুষ্ঠান হবার পরেই প্রাসাদ ছেড়ে যেতেন। বাবরও কেল্লার ডানদিকে, বুস্তান-সরাই প্রাসাদে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

* 'নীল পাথর'। অভিষেকের জায়গা। বর্তমান সমরখন্দের গোর-এ আমীর সৌধপ্রাঙ্গণে রক্ষিত।

যখন সন্ধ্যাবেলায় বুস্তান-সরাইয়ে বাতি জ্বালা হল তখন বাবরের জন্য নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে নুয়ান এসে ঢুকল। সারা ঘরটা গিলটি করা সোনায় সাজান, কিন্তু ভীষণ ঠান্ডা ঘরটিতে। অনেক কম্বলের আসন এনে পাতা হয়েছে তবুও গরমপোশাক ও টুপি পরেই কথাবার্তা বলতে হচ্ছে।

নুয়ান কুকলদাসের গলা ক্রমশ উষ্ণ, স্বাভাবিক হয়ে হল। যে দিন থেকে বাবর শাসক হয়েছেন সেদিন থেকে নুয়ানের মত সমবয়সী সহচররা অনেক পিছনে পড়ে গেছে: বাদশাহ্‌কে ঘিরে থাকে বেগরা, বন্ধুরা নয়, এই নিয়ম। কিন্তু আজ বাবর ও নুয়ান আবার কাছাকাছি হয়েছেন— এতে দু'জনেরই আনন্দ।

নুয়ান উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছে :

'বাদশাহের তরফ থেকে... আমরা দিয়ে এলাম, সোনার কঙ্কণ, নানা ধরনের জামাকাপড়, আরো খুবানী, বাদামের মিঠাই। আপনার বড় খালাজান মেহ্‌র নিগর-খানুম নিজে এসে অভ্যর্থনা জানালেন...'

মেহ্‌র নিগর-খানুম হলেন কুতলুগ নিগর-খানুমের বড় বোন আর মরহুম সুলতান আহমদের বড় বেগম। আয়যা বেগমের মা অল্প বয়সেই মারা যান, মেহ্‌র নিগর-খানুমের কোন সন্তান না থাকায় তিনি মেয়েটিকে নিয়ে মানুষ করেন, এখনও তিনি নিজের মায়ের মতই তার দেখাশোনা করেন। বাবরের ভাবতে মজা লাগল: বেশ হল — খালা আর শাশুড়ী দুই-ই হবে।

'চেহারা কী খারাপ হয়ে গেছে!' টেনে টেনে বলল নুয়ান। 'খিদের কষ্ট পেয়েছে এরা দারুণ, অনেকদিন রুটি দেখেনি। 'সোনা ফেলেও আটা জোগাড় করা যায়নি কোথাও,' খানুম একথা বললেন। কাঁদছিলেন, খুব কাঁদছিলেন। বললেন ভুষির রুটি খেয়ে থেকেছেন। আগুন জ্বালাবার কাঠ নেই শীতে কাঁপছে।

'বাইসুনকুর মেয়েদের প্রতিও এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন নাকি?'

'মির্জা বাইসুনকুর নিজেও শেষ ক'দিন পেটভরে খেতে পাননি।... সাতমাস অবরোধে বসে থাকা, তামাশা নাকি। রাস্তায় রাস্তায় লাশ পড়ে আছে। অকাল পড়েছে, অকাল। বেচারীরা গাধাকুকুরের মাংস খেয়েছে আমরা তো এত সব কথা জানতাম না... ওদের ওখান থেকে ফিরে কাসিমবেগকে সংক্ষেপে সবকথা বললাম। এক গাড়ি আটাময়দা আর চাল, একগাড়ী কাঠ, দশটা ভেড়া এসব আমি নিজে নিয়ে গিয়ে খানুমকে দিয়ে আসি। তারপরেই কেবল আমার এখানে আসার অনুমতি মিলল।

নুয়ান কুকলদাস কয়েক মুহূর্তে চুপ করে রইল, রহস্যভরা মৃদু হাসি একটু দেখা গেল তার মুখে, এবার আয়যা বেগমের কথা বলবে, বাবর অধৈর্য হয়ে হাত নাড়িয়ে বললেন:

'বল, নুয়ান, বল...'

'সোনা দিয়ে সাজান এই ঘরটার মতই একটা ঘর,' নুয়ান ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'সফেদ জালিদার বোরখা পরে সামনে এলেন আয়ষা বেগম,' আবার থামল নুয়ান। সত্যি বলতে কি আয়ষা বেগমকে তার পছন্দ হয়নি, মুখ ঢাকা থাকায় দেখতে পায়নি সে, কিন্তু দেহটা ভীষণ ছোটখাট, রোগা, ক্ষীণদেহী একেবারে— 'একেবারেই... রোগা বলে মনে হল। 'সুস্বাগতম!' বললেন আমায়। গলার স্বর এত কোমল, মিষ্টি পরিষ্কার।

'এ মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়,' ভাবলেন বাবর। আয়ষা বেগমের কথা মনে করে তিনি আন্দিজান থেকে এখানে ছুটে এসেছেন, কিন্তু তাকে সঙ্গে সঙ্গে দেখার উপায় নেই। তাঁদের দেখা হওয়া নিয়মবিরুদ্ধ, নিন্দা ছড়াবে তাহলে, তাঁর অধীরতায় তিনি তাঁর আপনজন এই মেয়েটির মনে কষ্ট দিতে পারেন।

নুয়ান কুকলদাসের মুখে পড়া যাচ্ছে যে তার কাছে আছে এই অযৌক্তিকতার ঔষধ। নুয়ান জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বারকরে আনল সাদা রেশমের ছোট্ট একটা তামাকের থলি।

'আয়ষা বেগমের পক্ষ থেকে মেহর নিগর-খানুম এই থলিটি দিয়েছেন!'

বাবর থলিটি হাতে নিয়ে চেপে দেখলেন। মনে হচ্ছে যেন কিছু নেই, কিন্তু যখন তিনি থলিটির গলায় বাঁধা দড়িটি ঢিলে করে হাতের ওপর উপুড় করে দিলেন সেটি, দুটি ছোট হীরা পড়ল তাঁর হাতের ওপর। দুটি হীরাই ভোরের শিশিরকণার চেয়ে সামান্য বড়, কিন্তু সে তুলনায় বেশ ভারী। ঝকঝক করছে হীরাগুলি — কোমল ও উজ্জ্বল তাদের দ্যুতি।

'থলেটার ভিতরটা উল্টো ক'রে দেখুন!' বলল নুয়ান।

সুন্দর সুন্দর পুঁতি লাগান ছিল থলিটির উপর আর ভিতর দিকে লাল রেশমীসুতো দিয়ে সেলাই করা ছিল একটি কথা যা বাবর প্রথমে লক্ষ্য করেননি। একটাই কথা, কিন্তু কি মিষ্টি! 'উদ্ধারকর্তাকে', একটি কথাই বাবরের কাছে মনে হল প্রেমের কবিতার চেয়েও মিষ্টি। তার মানে এটি আয়ষা বেগম আগেই সেলাই করে রেখেছিলেন, নুয়ানের সামনেই তো এমন সেলাই করতে পারেন না। তাহলে তিনি এই বিশ্বাস নিয়ে ছিলেন যে বাবর এসে তাঁকে উদ্ধার করবে।

'মির্জা, যে হীরাগুলো আপনি হাতে ধরে আছেন তাদের ইতিহাস শুনুন,' সরলভাবে বলে চলল নুয়ান। 'জানেন কোথা থেকে এই হীরাদুটো পাওয়া যায়? সুলতান আহমদ যখন সমরখন্দের তখ্‌তে বসে ছিলেন তখন তাঁর উষ্ণীষে শোভা পেত হীরাদুটি।... তাঁর কন্যার ইচ্ছা এই হীরাদুটি আপনার সঙ্গে আবার সমরখন্দের সিংহাসনের শোভা বাড়াক। মির্জা, ওদুটো আপনার মাথায় শোভা পাবে আরো একশ' বছর!'

সুলতান আহমদের নাম শুনে বাবরের মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল: এই তো সেদিন সে বেঁচে ছিল, বাবরকে পরাজিত করে, তার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে হয় বাবরকে।

পরাজয়ের পরে সন্ধি। কিন্তু হীরাদুটি থেকে এমন স্বচ্ছ আলো ফুটে বেরোচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন সেই রশ্মি কোনবধূর চোখের আলোর ঝিকিমিকি। কনেবধূ তাঁর অপেক্ষায় আছেন!... তাছাড়া — তিনি তো জয়লাভও করেছেন!

'আয়ষা বেগমের যা ইচ্ছা তাই হবে!' বলে বাবর হাতে তালি দিয়ে ডাকলেন তাঁর তোশাখানার তত্ত্বাবধানকারীকে।

লোকটি হীরাদুটি সেলাই করে চমৎকারভাবে বসিয়ে দিল সেই উষ্ণীষটিতে যেটি বাবর সাধারণত উৎসব-অনুষ্ঠানে পরেন...

সেইদিন সন্ধ্যায় বাবর তাঁর না-দেখা প্রেমিকা ও বাগদত্তাকে দেখবার অদম্য ইচ্ছায় পুড়তে পুড়তে গজল লিখতে আরম্ভ করলেন:

চন্দ্রবদনা, তোমার রূপের কত কথা বলে লোকে!
কবে যে জীবন সার্থক হবে দর্শনে নিজে চোখে...

২

শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীদের তাড়িয়ে আনা হয়েছে সমরখন্দের রেগিস্তান চকে, শহরের কাজী তাদের কী বিচার করেন তা শোনার জন্য; ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক জড়িয়ে শীতে কাঁপছে তারা।

বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারীরা প্রমাণ করেছে যে এরা গুরুতর অপরাধে, প্রতারণার অপরাধে অপরাধী। সমরখন্দ অবরোধের সময় তারা বাবরের কাছে এই প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠিয়েছিল: রাতের বেলায় সমরখন্দের ফিরোজা দরওয়াজার কাছে আসুন, আমরা দরজা খুলে দেব। দশজন বাহাদুর সিপাহী যেই ফিরোজাদরওয়াজার কাছে গোরি আশিকানের কাছে গিয়ে পাঁচিলে উঠতে আরম্ভ করেছে অমনি ওরা ওদের ধরে বাইসুনকুরের সিপাহসালারের হাতে তুলে দেয়।

'আমরা না, আমরা না... যারা আপনাদের সিপাহীদের ধরিয়ে দিয়েছে তারা পালিয়েছে!' আতঙ্ক দমন করে অপরাধীদের একজন চীৎকার করে বলল।

কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিল না।

শাহী ফরমান অনুযায়ী এবং দুশমনদের শাস্তি দেবার যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন পূর্বপুরুষরা, সে অনুযায়ী জল্লাদ অপরাধীদের হাত পিছমোড়া ক'রে বেঁধে একজন একজন ক'রে নিয়ে চলল এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে খোঁড়া গর্তগুলির কাছে, জোর করে তাদের বসিয়ে দিতে লাগল নতজানু হয়ে, নিচু করে। ঘাড়ের ওপর তরবারির এক আঘাতে দণ্ডিতদের গরম রক্ত ছিটকে পড়ছিল চকের পাথরের ওপর, ঠাণ্ডায় গরমরক্ত পড়ে উষ্ণ বাষ্প উঠছিল।...

গর্তটা বুঁজিয়ে দেওয়া হল। সারারাত ধরে পড়তে থাকা তুষার চোখধাঁধান সাদা চাদরে ঢেকে দিল এই মৃত্যুদণ্ডের সমস্ত চিহ্ন।

পরের দিন দুপুরের দিকে ঠাণ্ডা একটু কমল, নীল গম্বুজের ওপর তুষার গলতে আরম্ভ করল।

জোহ্‌রের নামাজের পর মির্জা বাবর ঘোড়ায় চড়ে সমরখন্দের দোকানপাট দেখতে বেরোলেন। তাঁর পাশে পাশে চলেছে—কাসিমবেগ, তাঁর পিছনে একটু দূরে আহমদ তনবাল আর খানকুলি নামে আরেক জন বেগ, কয়েকজন সিপাহী। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিলেন সমরখন্দের বৃদ্ধ কবি জোহ্‌রি যিনি সমরখন্দের কোথায় কী ভাল জানেন।

তাঁরা পেরিয়ে গেলেন পথিক পর্যটনকারীদের আবাস খানকাহ্‌ উলুগবেগের সময়ে এর ওপরে বিরাটা গম্বুজ তৈরি করা হয়। জোহ্‌রি একটা রাস্তা দেখালেন যেটা গেছে পুব দরওয়াজার দিকে।

'মির আলিশের যখন সমরখন্দে আসতেন, তখন অনেকবার গেছেন এই রাস্তা দিয়ে। এই রাস্তার শেষে এখনও দাঁড়িয়ে আছে সেই বাড়িটি যেটিতে মির আলিশেরের ওস্তাদ আবদুল্লাইস কাজ করতেন।'

'মির আলিশেরের আলোচনাসভায় থেকেছেন আপনি?' বাবর জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, আমরা দু'জন একবয়সী কিন্তু তাঁকে আমি আমার ওস্তাদ বলে মনে করি। তাঁকে আমার কবিতা পড়ে শুনিয়েছি, তিনি সর্বদা আমাকে উপদেশ দিতেন। উনি কিন্তু আমায় ভুলে যাননি, তাঁর প্রখ্যাত সৃষ্টি 'মজালিস-উন-নফাইস'-এ তিনি এই অধমের নামও উল্লেখ করেছেন।'

সাদাদাড়ি জোহ্‌রির (তাঁর ভ্রূগুলিও সাদা হয়ে গেছে) প্রতি কিঞ্চিৎ ঈর্ষা হল বাবরের। বাবর যদি অমন কবি হতে পারতেন যিনি নবাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন! কবিতাছন্দ নিয়ে একটু নাড়াচাড়ার বেশি আর কিছু হল না তাঁর, আর যা লেখেন তাও অন্যদের দেখাতে সঙ্কোচ বোধ করেন।... 'এই হল ব্যাপার, তবুও কবি হবার আশা ছাড়ব না আমি, সেই কারণেই আজ,' একটু হাসলেন বাবর, 'সঙ্গে সমরখন্দের প্রতিপত্তিশালী বেগদের নিইনি, নিয়েছি এই বৃদ্ধ কবিকে যিনি আলিশের নবাইয়ের সমবয়সী, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা করেছেন।'

জোহ্‌রি তাঁদের নিয়ে গেলেন রুটিওয়ালাদের মহল্লায়। রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে। রাস্তায় জমে থাকা বরফের ওপরে এখনও কারুর পা পড়েনি, কোন কোন খানে বরফ জমা এত উঁচু হয়ে উঠেছে যে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা লোকেদের জুতো ঠেকে যাচ্ছে বরফে। ছায়ায় ঠাণ্ডা হাওয়া যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে মুখ, কিন্তু যেখানে বাড়িগুলির পাঁচিল বা দেওয়ালের কাছে রোদ পড়েছে সেখানে বরফগলা জল জমা হয়েছে।

নিচু নিচু বাড়িগুলির সমান ছাদগুলি লক্ষ্য করলেন বাবর। সেগুলির ওপর থেকেও বরফ সরিয়ে ফেলা হয়নি। একজন লোকও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। রুটির

দোকানগুলির দিকে এগিয়ে চললেন তাঁরা। সেখানেও একই অবস্থা, সব দোকান বন্ধ। বাবরের বিস্ময় আরো বেড়েই চলল :

'আচ্ছা মওলানা, রুটিওয়ালারা অন্য শহরে চলে গেছে নাকি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জোহরি :

'হুজুরে আলী, তিনমাস ধরে বাজারে রুটি আসছে না। আটা নেই। ঘেরাওয়ের সময় এদের অনেকে মরেছে না খেয়ে। লোকেরা একেবারে নির্জীব হয়ে পড়েছে। ছাদে উঠে বরফ পরিষ্কার করার মত অবস্থা নেই।'

বাবরের মনে হল যে এই দুর্ভাগ্যের জন্য জোহরি বাবরকে খোঁটা দিলেন। কাসিমবেগের দিকে তাকালেন বাবর যেমন সবসময় তাকান সমর্থনের আশায় অথবা না বলা প্রশ্নের উত্তর চেয়ে। কাসিমবেগ ভর্ৎসনার সুরে কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন:

'তবুও হয়ত কিছু রুটিওয়ালা এখনও বেঁচে আছে, কী বলেন মওলানা?

'আছে, আছে... বেঁচে আছে হয়ত। কিন্তু তাদের সাহায্য করা দরকার। এখন যদি বাদশাহের হুকুম হত ওদের আটা দিতে... তাহলে হয়ত দোকানপাট আবার খুলত, আর লোকেরা সমরখন্দের বিখ্যাত রুটি খেতে পেত...'

কাসিমবেগ দেখল, বাবর অবিলম্বে তা করতে প্রস্তুত।

'হুজুরে আলী, আমাদের নিজেদেরই সামান্য দানা আছে, আর সৈন্যদলের জন্য রসদ প্রয়োজন। বিক্রি করার জন্য আটা দেবার মত সংস্থান নেই। পরে দেওয়া যাবে হয়ত...'

বৃদ্ধ কবি আশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন বাবরের দিকে। বৃদ্ধের হাড় বার করা কাঁধে কালো কাপড়ের চোগার জন্য নাকি, জোহরির ছোট করে ছাঁটা দাড়ির জন্য কে জানে কবির চেহারা বাবরকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল মাহ্মুদ মুজাহবের তৈরি নবাইয়ের প্রতিকৃতির কথা। যদি বাবর মওলানা জোহরির আশা পূরণ করতে সক্ষম না হন তার মানে নবাইয়ের আশানুযায়ী কাজও তিনি করতে পারবেন না। রেকাবে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুরে বাবর বললেন:

'দানা ও আটা দিতে আদেশ করছি ব্যবসায়ীদের নয়, রুটিওয়ালাদের, একজন বিশ্বস্ত লোক এর দেখাশোনা করুক। রুটিওয়ালারা রুটি তৈরি করে আমাদের নামে বিতরণ করুক সব থেকে যারা কষ্ট পাচ্ছে ক্ষুধায় তাদের মধ্যে। পাঁচ ছ' বস্তা নিলে ফৌজের রসদে টান পড়বে না। কাল অথবা পরশু জিজাক থেকে দানা নিয়ে এসে পৌঁছবে কারাভান।

'খোদা আপনার মঙ্গল করুন, হুজুরে আলী।' আনন্দিত হয়ে বললেন জোহরি।

আনন্দিত হলেন কিন্তু তিনি একাই। আহমদ তনবাল তার শক্তিমান স্বাস্থ্যবান ঘোড়ার লাগাম টেনে বেশ শুনিয়েই গজগজ করল:

'এত আটা কোথায় পাওয়া যাবে যে বাইসুনকুরের ফেলে যাওয়া এত ক্ষুধার্ত লোকের ক্ষুধা মেটান যাবে? আমরা তো এখানে ওদের খাওয়াতে আসিনি।'

ওশে পাঠান ঘটকেরা বাবরের কাছ থেকে শূন্যহাতে ফিরে আসায়, খানজাদা বেগমকে স্ত্রীহিসেবে না পাওয়ায় আহমদ তনবাল গোপনে বাবরের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ আরম্ভ করে। কিন্তু বাবরের প্রতি আক্রোশ ঢাকার চেষ্টা করে 'আমার বেনজীর হুজরে আলী' প্রভৃতি মনভোলান কথা দিয়ে।

'খুদাবন্দ বেগ', বাবর আরো উদ্ধত ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসলেন ঘোড়ায়। আমরা সমরখন্দকে খাওয়াবার জন্য আসিনি ঠিকই, কিন্তু আমরা তাকে লুঠ করতেও আসি নি!'

তনবাল এই ইঙ্গিতে ভয় পেয়ে গেল— গতকাল তার লোকেরা জহুরীর দোকান ভেঙেছে। বেগের চোখ গোল হয়ে গেল, কিন্তু তখুনি আবার নিরুদ্বেগ ভাব আনার চেষ্টা করল মুখে।

'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার আজীম, বেনজীর হুজুরে আলী,' বলল সে। 'কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই শহরে লড়াইয়ের সময়কার কিছু শিকার পাওয়ার হক আছে কিনা আমাদের — এই জন্য না এত সিপাহী কুরবান দিলাম আমরা? লুঠের মাল নেওয়ার অধিকার বিজেতার আছে, এ আমাদের পুরানো রেওয়াজ!'

তনবালের কথা ভাল লাগল সৈন্যদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা খানকুলির— তার মাথা নাড়াতে, হাসিতেই তা বোঝা যাচ্ছে। বেশির ভাগ সিপাহীরই তনবালের কথা ঠিক বলে মনে হয়। যদি সব বেগই এমন ভাগ না পায় যাতে তার সন্তুষ্ট হতে পারে, তাহলে সমরখন্দ বিজেতা সাধারণ সিপাহীদের হাতে আর কীই বা আসবে? অথচ জয় করা হল সমরখন্দ — কোন একটা ছোটখাটো গ্রাম নয়।

বাবর জানতেন তাঁর সৈন্যদলের অনেকে অসন্তুষ্ট। কিন্তু বেগদের ইচ্ছামত কাজ করতে দিলে সমরখন্দবাসী অনাহারে মারা যাবে। কিন্তু এরা তো তাঁর প্রজা, এখন তাঁরই প্রজা। অথচ এদের অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গেলে তাঁর বেগ আর যোদ্ধারা চীৎকার করবে, 'ওদের কেন দেওয়া হচ্ছে আমাদের ভাগ?

বাবর কাসিমবেগের দিকে তাকালেন। উজীর যেন অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে তাকিয়েছিল।

'অনাহারের কারণ তো কেবল বাইসুনকুর নয়, ঠিক কিনা?' নরম সুরে বাবর বললেন। 'যদি আমরা সাতমাস সমরখন্দ অবরোধ না করতাম...'

বাবর ঘৃণ্য তনবালের সামনে কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করেন, কাসিমবেগের তা ভাল লাগল না। উজীর একমাত্র উপায় দেখল এ কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়ার :

'হুজুরে আলীর হুকুম আমাদের কাছে আইন! তর্ক করার প্রয়োজন নেই! কালই রুটি তৈরির জন্য ময়দা দেওয়া হবে, আমি নিজে ক্ষুধার্তদের মধ্যে রুটি বিতরণের তদারক করব।'

বাবর উজীরের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালেন।

'যাক এব্যাপারে ফয়সালা হল,' বললেন তিনি নিশ্চিন্তসুরে। তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন, 'চলুন এবার বইয়ের দোকানগুলো দেখা যাক।'

মওলানা জোহরি আঁকাবাঁকা অলিগলি দিয়ে নিয়ে চললেন তাঁদের। হঠাৎ তাঁরা এসে পড়লেন একটা খোলামেলা জায়গার সামনে যেখানে বইয়ের দোকানের সারির সবগুলি দোকানই বন্ধ। হঠাৎ একটা গোলমাল, কী এক দুর্বোধ্য চীৎকার শোনা গেল, দোকানগুলির পিছন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধা মাথায় কোন ওড়না নেই, খালি পা, চোখে উন্মাদদৃষ্টি, আর তার পিছনে মধ্যবয়সী কৃশদেহী এক পুরুষমানুষ।

'হায়! আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলল, মরণ হোক আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌ও না খেতে পেয়ে মরুক!'

অশ্বারোহীদের দলটিকে দেখে বৃদ্ধা ও পুরুষমানুষটি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পুরুষমানুষটি কিছুতেই তার হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না, মহিলাটি কিন্তু আবার চীৎকার করে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল।

'খোদা নিজেই মরুক ঘেরাও হয়! মরুক না খেতে পেয়ে আমার ছেলের মতই! মরুক!'

'মুল্লা কুতুবুদ্দিন, কি হয়েছে?' চেঁচিয়ে জোহরি জিজ্ঞাসা করলেন পুরুষমানুষটিকে।

এতক্ষণে পুরুষমানুষটি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ছুটে এসে, দুর্বল, ক্ষীণদেহী বৃদ্ধাটির হাত ধরে সহজেই টেনে নিয়ে গেল দোকানের পিছনে বাড়ির আঙ্গিনার মধ্যে তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বুকের ওপর হাত জোড় করে ঘোড়সওয়ারদের কাছে ফিরে এলো।

'মাফ করবেন হুজুর, মাফ করবেন আমায়। সন্তানের মৃত্যুতে আমার ভাইয়ের স্ত্রীর মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। না খেয়ে থাকতে হয়েছে আমাদের। খিদের জ্বালা সইতে না পেরে আমার ভাইপো খইল খায়, তাতে সারা শরীর ফুলে ওঠে, মারা যায়।

শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'এই হতভাগ্য লোকগুলোকে আরো কষ্টে ফেলতে চায়, লুঠপাটের কথা ভাবা হচ্ছে আবার।' কারুর দিকেই তাকালেন না বাবার। কিন্তু আহমদ তনবাল আর খানকুলি দ্রুত দৃষ্টিবিনিময় করল, ভ্রূ কুঁচকে উঠল তাদের।

মুল্লা কুতুবুদ্দিন শহরের বইয়ের ব্যবসায়ী হিসাবে সুপরিচিত। যখন জোহরি তাকে চুপিচুপি বললেন তার কাছে কে এসেছেন, কী জন্যে এসেছেন, মুল্লা কুতুবুদ্দিন ব্যস্ত হয়ে দোকান খুললেন তাড়াতাড়ি। ঘোড়া থেকে নামলেন বাবর, মওলানার সঙ্গে গিয়ে ঢুকলেন দোকানের ভিতর। দোকানী ধীরেসুস্থে তাক থেকে নামিয়ে আনতে থাকে দুষ্প্রাপ্য বইগুলি, দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ধুলো মুছতে থাকে। বাবরের দিকে এগিয়ে দেয় বইগুলি, সেগুলির সম্পর্কে অল্প দু'চারকথা বলে।.... দামী সোনার জলে কাজ করা মলাটে মাহমুদ কাশগরী আর আবদুরহমান জামীর বই।... এখানে নানা রকমের

আঁকা ছবিসমেত আবদুরজ্জাক সমরখন্দীর বই।... আর এ হল আবুজের* ওপর নবাইয়ের লেখা 'মেজান-উল-ঔজান'। এই বইটাই বহুদিন ধরে খুঁজছেন বাবর, সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছেন কোথায় কেনা যায় বইটি। এখানে তিনি দেখতে পেলেন এমন অনেক বই যা তাঁর গ্রন্থাগারের শোভা বাড়াবে, যাদের মূল্য তাঁর কাছে সোনাদানার থেকেও অনেক বেশি। ধুলোভরা এই দোকানঘরে বাবরের মনে হল তিনি যেন রূপকথার গল্পের গুপ্তধনের গুহায় পৌঁছে গেছেন।

'আর কী আছে? আর কী?' উত্তেজিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

মুল্লা কুতুবুদ্দিন একটার পর একটা অমূল্য বই দেখিয়ে যেতে থাকল তাঁকে। কাসিমবেগও মওলানার পিছন পিছন ভিতরে চলে এসেছেন সবার অলক্ষ্যে, ভাল করেই জানেন তিনি দক্ষ লিপিকরের হাতে লেখা, সূক্ষ্ম অলঙ্করণে ভূষিত এই গ্রন্থগুলির কত দাম হতে পারে। সমরখন্দের ধনভাণ্ডার শূন্য, তিনি তা আগে থেকেই অনুমান করেছিলেন, আন্দিজান থেকে যে সোনা তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তা এমন কিছু বেশি নয়, আর অভিযানে সোনা সঙ্গে করে আনা হয়েছে বইপত্র কেনার জন্য নয়। এদিকে বাবরের নির্বাচিত বইয়ের স্তূপটা ক্রমশ বড় হয়ে চলেছে—গোটাদশেকের বেশিই হবে। কাসিমবেগ তাঁর কানের কাছে বলল:

'হুজুরে আলী, আমাদের সঙ্গে খাজাঞ্চী নেই।...'

বাবর সেকথার অর্থ ঠিক ধরতে পারলেন না, তখন তিনি বিচরণ করছেন কেবল বইয়ের জগতে, বহির্জগতের অস্তিত্ব ভুলে গেছেন।

'খাজাঞ্চী? খাজাঞ্চীকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে,' বলে বইয়ের দোকানীকে তাঁর বেছে নেওয়া বইগুলি দেখিয়ে বললেন, হিসাব করবেন, আমার গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণকারী আর খাজাঞ্চী এসে দাম দিয়ে নিয়ে যাবে এগুলি।'

যাঁর উদারতা এবং আরো অনেক অনেক গুণের কথা সবাই জানে সেই সমরখন্দের শাসকের সেবা করতে পেরে যে খুশি হয়েছে তা জানাবার জন্য মুল্লা কুতুবুদ্দিন কুর্নিশ করল। কিন্তু বাবরের মনে হল বইব্যবসায়ী যেন আরো কিছু বলতে চায়, অথচ সাহস পাচ্ছে না।

'কী চান আপনি মুল্লা? বলুন, সঙ্কোচ করবেন না ... আপনার বইগুলো সমস্ত মূল্যেরও ঊর্ধ্বে।'

'হুজুরে আলী', বইব্যবসায়ী সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'এ সময়ে অর্থের বিনিময়ে খাদ্য কেনা অসম্ভব, এদিকে ছেলেরা কাঁদছে সারাদিন ক্ষুধার তাড়নায়, শুনে বুক ফেটে যায়। যদি সম্ভব হয় অন্তত সামান্য একটু আটা...'

'ঐ বৃদ্ধ আর এই ইজ্জতদার মানুষটি... ক্ষুধার তাড়নায় জর্জরিত, অবরোধের

* আরবী, ফরাসী, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় কাব্য রচনাগীতি।

ফলে একেবারে ক্ষীণদেহী হয়ে পড়েছে। আর আমি বলছি অর্থের কথা, বইয়ের কথা,' নিজেকে ধমক দিলেন বাবর, কিন্তু রুটির দোকানের সারির কাছে কাসিমবেগের বলা কথা মনে করে কিছু বললেন না (কেবল ঘাড়টা নাড়ালেন একটু) ভাবলেন চালাকি করতে হবে। পরে, বেগদের কোন অসন্তোষ না জাগিয়ে শাহীর বাবুর্চি গোপনে সব ব্যবস্থা করবে।

'খুদা হাফিজ! দুশ্চিন্তা করবার কোন প্রয়োজন নেই!' যেন উদাসীনসৌজন্য দেখিয়ে বলে বাবর দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন চত্বরে, যেখানে আহমদ তনবাল বিষণ্ণমুখে অনুচরপরিবৃত হয়ে বসেছিল নিজের ঘোড়ার উপর।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় অতি গোপনেই বইয়ের ব্যবসায়ীর বাড়িতে একবস্তা আটা, একটি নধর ভেড়া আর কিছু অর্থ পৌঁছে দেওয়া হল কিন্তু তা হলেও পরের দিন ভোরবেলাতেই সে সম্বন্ধে জানতে আর কারুরই বাকী রইল না। ঠিক তেমনিভাবেই ছড়িয়ে পড়ল এ খবর যেমন ছড়িয়ে ছিল রুটির দোকানীদের একগাড়িভর্তি আটা এনে দিয়েছিল কাসিমবেগের লোকেরা সে কথা। এতদিন বরফঢাকা অবস্থায় পড়ে থাকা তন্দুরগুলিতে আগুন জ্বালাল রুটিকারিগররা। গরম গরম, টাটকা তৈরি করা রুটির গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে শহরময়। ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা সত্যি সত্যিই বাবরের নামে রুটি বিতরণ করল সবার মধ্যে।

সমরখন্দবাসীরা বাবরের প্রতি যতখানি সন্তুষ্ট তাঁর বেগ আর অনুচররা তাঁর প্রতি ততখানিই অসন্তুষ্ট লুটতরাজ করতে না পারায়। সমরখন্দের ক্ষুধার্ত দীনহীন রূপ দেখে দেখে যাদের মনে ঘৃণা ধরে গিয়েছিল সেই সব বেগরা সিদ্ধান্ত নিল বাবরের অনুমতি না নিয়েই তারা ফিরে যাবে উষ্ণ ও প্রাচুর্যভরা ফরগানাতে।

৩

যে সব সৈন্য তন্দুরে সবেমাত্র তৈরি গরম গরম রুটি বস্তাভরে এনে অনাহারক্লিষ্ট সমরখন্দবাসীদের মধ্যে বিতরণ করছিল তাদের একজন ছিল তাহির। প্রথমে তারও রাগ হয়েছিল এই আদেশ মানতে: 'যারা রাবিয়াকে লুঠ করে নিয়ে গেছে তাদেরই সেবা করতে এসেছি নাকি?' কিন্তু মানুষের দুঃখদুর্দশা দেখে তারও প্রাণ গলে, সামনে যখন সে দেখল কাঁথাকানিপরা লোকগুলিকে , দেখল যুবকদের যাদের ঘাড়গুলো চুলের মত সরু হয়ে গেছে, ক্ষুধায় নির্জীব বৃদ্ধবৃদ্ধাদের, তখন তার সেই অসন্তোষের আর একটুকুও অবশিষ্ট রইল না। তাছাড়া তার মাথায় আর একটা কথা এল, হয়ত এই অভাগাদের মধ্যে কষ্ট পাচ্ছে তার রাবিয়াও। হয়ত এদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে রাবিয়াকে জানে, দেখেছে তাকে?

তাহিরের মাথায় শিয়ালের চামড়ার টুপি, গায়ে খাটো চামড়ার কোর্তা, গত

কয়েকমাস দূরে অনবরত ঘোড়ায় চড়েই চলাফেরা করেছে, ফলে তার হাঁটার ধরন পাল্টে গেছে। ভালুকের মত করে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে পা ফেলে হাঁটে সে। কিন্তু হাতগুলো তার চটপট রুটি বার করে আনতে লাগল।

ক্ষুধায় জর্জরিত লোকগুলির বিস্ফারিত দৃষ্টি কিন্তু দেখছিল কেবল তাহিরের হাত আর তার এগিয়ে দেওয়া রুটির দিকে, তাহিরের মুখের দিকে দেখছিল না তারা। রুটির বস্তার দিকে এগিয়ে আসছিল তারা সাবধানে, ছোট ছোট পা ফেলে যেন পা ঘষে ঘষে পথটা অনুভব করতে চাচ্ছে। অবাক হয়ে তাহির দেখতে লাগল যে লোকগুলি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে পা তুলে একটা ছোট্ট নালা পার হতেও পারছে না; দাঁড়িয়ে পড়ে অপেক্ষা করছে তাদের থেকে আর একটু বেশি শক্তি যাদের আছে তারা সাহায্য করবে এই আশায়।

প্রত্যেককে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল তাহির। এদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে রাবিয়াকে দেখেছে বা তার সম্বন্ধে কিছু জানে?

এই যে চোগাপরা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধাকে ধরে আর নিজেও ভর দিয়ে আছে বৃদ্ধার গায়ে।

'খালাজান, আপনাদের মধ্যে আন্দিজান বা কুভার মেয়ে কেউ আছে নাকি?'

'না বাছা, তেমন কেউ নেই!' তাজিকভাষায় উত্তর দিল মহিলাটি।

বহুবার বলা সেই কথাগুলিই আবার আউড়ে গেল তাহির:

'আমার বোনটিকে খুঁজছি। চার বছর হল সুলতান আহমদের সৈন্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়।

'বেচারী!' বলল মহিলাটি। বৃদ্ধাটি তার হাত থেকে রুটি নেবার সময়ে নিচু হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল।

একটু দূরে একজন লোক দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রুটির বস্তার দিকে আর অধৈর্য হয়ে ঢোক গিলচে। অল্প গোঁফদাড়ি তার মুখে, লম্বাচেহারা, বয়স বছর পয়ঁত্রিশ হবে।

'সুলতান আহমদের দলে কাজ করেছিস আগে কখনও?'

লোকটি একমুহূর্ত চুপ করে রইল তারপর ভয়জড়ানস্বরে বলল:

'করতাম, কেন?'

'কতদিন আগে?'

'সে অনেকদিন হল।'

'আন্দিজান গিয়েছিলি?'

'না... যাবার পথেই ফিরে আসতে হয়েছিল।'

তার কথা বলার ধরন আর মুখচোখ সেই বদমাশদলের লোকগুলোর মত। কেঁপে উঠল তাহির। এ কি তাদেরই একজন নাকি?

রুটির দোকানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা তার দলের লোকটিকে ডেকে তাহির তার হাতে ধরিয়ে দিল পড়ে থাকা সামান্য কয়েকটি রুটিসমেত বস্তাটা তারপর আবার এগিয়ে গেল সেই স্বল্পগোঁফদাড়ি, অনাহারে স্ফীতমুখমণ্ডল লোকটির কাছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে সরে গেল একপাশে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল লোকটি।

'আরে ভাই, কী চাই আমার কাছে? গরিব লোক আমি! যেতে দাও আমায়! এসেছিলাম কেবল রুটির জন্য ... রুটির জন্য!'

ও চিনতে পেরেছে নাকি তাহিরকে ? হয়ত ওর কাছেই মিলবে সেই সূত্র যা ধরে তাহির রাবিয়ার কাছে পৌছে যাবে? আরো একটু নরমসুরে কথা বলতে হবে ওর সঙ্গে।

'রুটি পাবে তুমি। বেশি করেই দেব রুটি। সত্যিকথা বল কেবল। তার মানে সুলতান আহমদের সৈন্যদলে কাজ করতে?'

'বললাম তো করতাম...'

'কুভানদীর পুল পেরিয়ে গিয়েছিলে?'

'কোন পুল? যেটা ভেঙে পড়ায় আমাদের দলের লোকজন মারা পড়েছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সেটাই!' রাগ আর আনন্দ দুই ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগল তাহির। তার মানে, এই সেই বদমাশটা! তলোয়ারের এক খোঁচায় প্রাণটা বার করে দিলে হয়। কিন্তু তাহলে রাবিয়ার খোঁজ পাওয়া যাবে কেমন করে?

লোকটির পোশাকটা আঁকড়ে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল তাহির:

'রাবিয়া কোথায়? বল শীগগির!'

অনাহারের দুর্বল লোক আর একটু হলে পড়েই যাচ্ছিল তাহিরের পায়ের কাছে, মনে হল যেন এখুনি তার দেহটা টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়বে।

'কো... কোন রাবিয়া?' তোতলাতে তোতলাতে কোনরকমে বলল সে।

'রাবিয়া, রাবিয়া! কুভার সেই মেয়েটিকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে তোমরা? কোথায় এখন সে? সত্যি কথা না বললে মাথাটা কেটে ফেলব তোর! বল্ সব কথা!'

'আরে ভাই! রাবিয়া নামের কোন মেয়েই আমি কখনও দেখিনি, ভাই। মেরে ফেলতে চাও — মার কিন্তু শুধু ভেব না যে আমি ও কাজ করেছি। তখন মেয়েদের দিকে তাকাবার মত মনের অবস্থা ছিল না আমার, ভাইটা আমার পড়ে গেল পুল থেকে, নদীর স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওকে, তিনদিন ধরে খুঁজেছি নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে, কিন্তু পেলাম না... কিছুই পেলাম না.. লাশটাও না। জলায় ডুবে গেছে।'

লোকটিকে একটু সরিয়ে দিল তাহির হাতের ধাক্কায়, কিন্তু তার জামার হাতটা ধরে রইল। মনে পড়ছে, সেই লোকগুলির একজন অন্যজনকে ডাকছিল জুমান বলে।

'তোর নাম কী?' তাহির আবার একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লোকটির চোখের দিকে।

'নাম? মামাত।'

'জুমান নয়?'

'কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রে নিলেই ত পার। এই মহল্লার সবাই জানে আমার নাম মামাত, আমি চামড়া তৈরি করি।'

তাহির ভাবল, 'ওর ভাই যেহেতু কুভাসাইয়ে ডুবে মারা গেছে সেই হেতু ওরও অধিকার আছে আমার গলা চেপে ধরার!' যেমন চট্ করে জ্বলে উঠেছিল তার রাগ তেমনই হঠাৎ নিভেও গেল সে রাগ।

'জুমানকে তুমি জান নাকি ভাই?'

হঠাৎ মামাত মাথা চেপে ধরল:

'দাঁড়াও, দাঁড়াও... ছিল বটে আমাদের মাঝে এক জুমান মাইমাক। শুনেছি দুটি মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল ও। তার মানে তোমাদের ওখান থেকেই নিয়েছিল।'

'সমরখন্দে এনেছিল তাদের?'

'মেয়েগুলোকে? তা তো জানি না... আমি ওরা-তোপার কাছে ঐ যে অক্‌সুব নদীটা আছে, জান ত, ঐ পর্যন্ত যাই। অক্‌সুব পর্যন্ত যাবার পরেই আমাদের মির্জা মারা যান। তখন আরম্ভ হল গোলমাল। বিরক্তি ধরে গেল আমার।... ছেড়ে দিলাম সৈন্যদলের কাজ।'

'এখন জুমান মাইমাক কোথায়?'

'তা বলতে পারব না। বছর তিন-চার হল দেখি না আর তাকে। খিস্তিবাজ লোক ছিল, মরে গেছে নাকি অন্য মির্জার কাছে কাজ করছে কে জানে। মির্জাও তো আশেপাশে কম নয়। তাশখন্দে মাহমুদ খান, তুর্কীস্তানে শয়বানী খান। হিসারে একজন।'

'চুলোয় যাক এই লড়াই-হাঙ্গামা,' প্রচণ্ড রাগে বলে উঠল তাহির। 'তুমি কারিগর আর আমি ছিলাম চাষী। এ কী সময় এল বল দেখি যে আমরা একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করছি?'

এবার তাহিরের মুখটা ভালো করে লক্ষ্য করল মামাত, একটা ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেল, ঘাড় নাড়াল সে:

'মেয়েটি তোমার কে হয় ভাই? বোন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাহির, বলে ফেলল হঠাৎ:

'সবার চেয়ে প্রিয় সে আমার। আমার চোখের মণি ছিল সে।'

মামাত তাহিরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল:

'পাবে খুঁজে পাবে ওকে এখানে আমার চেনাজানা বন্ধু অনেক। জিজ্ঞাসা করব সবাইকে। আমার বিবিকে বলব। সে মেয়েদের মধ্যে খোঁজ নেবে।'

তাহির বুঝল মামাত তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে অন্তর থেকেই। 'চল

মামাত।' যখন তারা রুটির দোকানে এসে ঢুকল তাহির রুটিভরা বস্তা থেকে চারটি রুটি তুলে নিল।

'এই নাও! রুটির জন্যই তো এসেছিলে।'

কাঁপা কাঁপা হাতে রুটিগুলো নিয়ে জামার ভিতরে ঢোকাবার আগে কয়েকবার শুকল গরম আটার গন্ধ, দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল তার। যত ক্ষুধার্তই হোক না কেন, তাহিরের সামনে সে আত্মসংযম হারিয়ে রুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না। কেবল রুটির গন্ধে যেন মাতাল হয়ে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল:

'রুটির থেকে... দামী আর কিছু নেই রে ভাই। খোদা যেন তোমাকে এমন কোন দিন... দেন না যা আমরা ভোগ করেছি... একটু খেয়ে নিয়ে একটু বল পেলেই নিজের গ্রাম পর্যন্ত যাব। ঐ পাহাড়ের ওপাশে আমাদের ভাইরা থাকে। জাতে আমরা কুইয়ানকুলাক। গ্রামে গিয়ে দু'বস্তা দানা নিয়ে আসব।... ঘোড়া ছিল একটা, শরৎকালে সেটাকে কেটে খেয়ে ফেললাম। পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে ভয় পাচ্ছিলাম—যদি পড়ে যাই, শীতে জমে যাই। এখন ভয়ের আর কী আছে...'

'তোমায় কোথায় খুঁজে পাব?' তার কথার মাঝখানেই বলল তাহির।

'মুচীপাড়ায়... আমার একটা বাড়ি আছে। মামাত বলে জিজ্ঞেসা করলেই যে কেউ দেখিয়ে দেবে। পালোয়ান-মামাত ... একসময় জোয়ান চেহারা ছিল রে ভাই। আর এখন কোনক্রমে হাঁটি...'

'ভুলো না! ওর নাম রাবিয়া... আর আমি — কাসিমবেগের দলের সৈন্য। নাম তাহির।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহিরবেগ, যদি কিছু জানতে পারি তো খুঁজে বার করব আপনাকে। আমাদের লোকেরা আপনার এমন ক্ষতি করেছে আর আপনি আমার মঙ্গল করলেন। কখনও ভুলব না একথা, এর প্রতিদান দেব নিশ্চয়ই। চলি তাহলে!'

তাহিরের দৃষ্টি অনুসরণ করল তাকে। 'কার দোষে ওর ভাই মরেছে জানতে পারলেই....'

রুটির দোকান থেকে একটু দূরে চলে গিয়ে মামাত তাড়াতাড়ি হাত ঢুকিয়ে দিয়ে জামার ভিতর গরম রুটির এক টুকরো ছিঁড়ে নিল, চোরের মত সন্ত্রস্তভাবে ঠেসে দিল সেটা মুখের মধ্যে।

৪

'সমরখন্দ দখল করে নিলেই সব গোলমাল মিটে যাবে।' ভেবেছিল আন্দিজানের বেগ আর সৈন্যরা। কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। তিনহাজার সৈন্যের দলের জন্য লাগে প্রায় ছ'হাজার ঘোড়া। এই হাড়কাঁপান শীতে অবরোধের ফলে শূন্য এই শহরে একই

সঙ্গে শহরবাসীদের খাওয়ানো, সৈন্যদলের জন্য যথেষ্ট খাদ্যসংগ্রহ করা ও ঘোড়ার আহার জোগান অসম্ভব। শহরদ্বার উন্মুক্ত, ওরা-তেপা আর কার্শির দিকে বাহিনী পাঠান হয়েছে কঠোরভাবে কর আদায়ের জন্য — পুরনো, নতুন যত কর হতে পারে— দানাশস্যের মাধ্যমে, শুধু দানাশস্যের মাধ্যমে গ্রহণের জন্য। শহরের বাজারগুলি নতুন করে খোলার জন্য সবরকম চেষ্টা চালান হচ্ছে। তবুও মাভেরান্নহরের রাজধানীর জীবন স্বাভাবিক হচ্ছে না কিছুতেই। প্রতীক্ষায় আছে সমরখন্দ, চুপ করে আছে, দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সমরখন্দ: গত কয়েক বছরে বড় ঘন ঘন মালিকবদল হয়েছে তার, এক লোভীহাত থেকে আর এক লোভীহাতে গিয়ে পড়েছে—তারা সবাই ভেবেছে কেবল নিজের স্বার্থের কথা, শহরের কথা কেউ ভাবে নি।

'ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের!' বৈঠকে বেগদের বোঝাতে লাগলেন বাবরের ওস্তাদ খাজা আবদুল্লা। 'বসন্তকাল এলো বলে, খোদার ইচ্ছায় ফসল তোলার সময় আসা পর্যন্ত যদি টিকে থাকতে পারি তো সব দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠা যাবে। দুর্দশা কেটে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে এক শক্তিশালী— কার্শি আর শাহ্‌রিসাব্‌জ থেকে উজগেন্দ পর্যন্ত একচ্ছত্র সল্‌তনত। আল্লাহ্‌র দোয়ায় আমাদের দখলে আসবে এক বিশাল দেশ, এমন রাজধানী যখন আমাদের দখলে! আমাদের বাদশাহ মির্জা বাবরের স্বপ্ন যেন গোটা মাভেরান্নহর ঐক্যবদ্ধ হয়, যেমন ছিল উলুগবেগের সময়, যাতে মাভেরান্নহরের পুরনো খ্যাতি ফিরে আসে, সেই সুখের দিনগুলো যেন পুনরুজ্জীবিত হয়। আমাদের বাদশাহের এই অভিলাষই হল আমাদের পাক মকসদ। সেই উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য আল্লাহ্ শক্তি দিন আমাদের।'

খানকুলিবেগ ও আহমদ তনবালের বিরক্তি লাগছিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে অন্যান্য বেগদের মত তারাও হাত উপরে তুলে বলে উঠল:

'শক্তি দিন আল্লাহ্! ইলাহী আমিন!'

তারপর বৈঠক থেকে যে যার বাড়ি চলে গিয়ে আবার দু'জন তিনজন করে মিলিত হতে লাগল। বলাবলি করতে লাগল:

'তাহলে, আমাদের মির্জা উলুগবেগের মতই আজীম বাদশাহ্ হতে চান, কি বলেন আহমদবেগ?' ব্যঙ্গের হাসি হাসে খানকুলি।

চুলার কাছে উষ্ণতায় বিছান মখমলের ওপর বসে তারা সন্ধ্যার আহারপর্ব সারছিল। আহমদ তনবাল ছুরি দিয়ে একটুকরো মাংস কেটে নিয়ে বিদ্রূপ করে বলল:

'নওজওয়ান মির্জার আজীম বাদশাহ্ হবার জন্য কেবল একটুখানি ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।'

'কী সেটা? অ্যাঁ?'

'শুনলেন না আজ বৈঠকে। সমরখন্দের চাষীরা তাদের বীজদানা সব খেয়ে ফেলেছে। আমাদের বীজদানা থেকে দিতে হবে... ঐ যা কার্শি থেকে নিয়ে এসেছে

কারাভান... দিতে হবে ধার হিসেবে।... যখন ফসল তুলবে ওরা তখন নাকি সুদেমূলে ফেরত দেবে।'

'বোঝ ঠ্যালা। গোদের ওপর বিষফোঁড়া!'

'আরে খানকুলিবেগ! সহ্য করতে হবে, খোকাবাবু যে শাহান্‌শাহ্ হতে চাচ্ছেন। এখান থেকে নড়বেন না উনি! উনি যে সমরখন্দের জামাই হন! এখানে ওঁর কনে রয়েছেন... তাই এই 'রাজধানীর' ভিখারীগুলোর কাছে নিজেকে ভালো মহৎ প্রতিপন্ন করতে চাচ্ছেন। আটা বিলোচ্ছেন, আবার প্রতিসপ্তাহে কবিদের ডেকে মুশায়রা হচ্ছে।'

'শোনা যাচ্ছে উনি কবি হতে চান তা সত্যি নাকি?'

'তা নয় তো কী! সেই জন্যই তো চতুর্দিক থেকে কবিদের ডেকে এনে জড় করছেন, কিন্তু তাদেরকে তো খাওয়াতে হবে— তাতেই নিঃশেষ হয়ে যায় লড়াইয়ে পাওয়া ধনসম্পত্তি যা আসলে আমাদেরই প্রাপ্য! বই কেনার জন্য কোষাগারের সব সোনা ব্যয় করতেও পিছপা নন উনি। সেও আমাদের ঘাড় ভাঙা হল!'

খানকুলি তার স্বল্পদাড়িতে হাত বুলোল।

'আন্দিজান চলে যাব ভাবছি। কিন্তু মির্জা যেতে অনুমতি দিচ্ছেন না,' বলল সে। 'কী ঘেন্না ধরে গেছে যে আমাদের মির্জার ওপর, তা খোদাই জানেন!'

আহমদ তনবাল উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, দরজাটা হুড়কো লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

'মোহতরম খানকুলিবেগ! বেগরা যদি না থাকে তো বাদশাহ্ কী করবেন?.. বেশির ভাগ সৈন্যই আমাদের সঙ্গে যাবে এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। লড়াইতে জিতলাম আমরা। কষ্ট সহ্য করলাম আমরা। আর এখন... ঐ কচি ছেলেটার কাছে অনুমতি চাইতে হবে কেন?'

'ঠিক বলেছেন!' ফিসফিস করে বলল খানকুলিবেগ। 'আমাদের বেগদের প্রত্যেকেই তার নিজের কাছে বাদশাহ... অনুমতি না দেয় তো ভারী বয়ে গেল, চলে যাব আমি ঠিকই!'

'আমিও অতটুকু কচি ছেলেটার কাছে আর মাথা নিচু করব না। বেঁচে থাকলে অন্য বাদশাহ্ খুঁজে নেব। এই তো আখসিতেই রয়েছেন মির্জা জাহাঙ্গীর। বুখারাতে সুলতান আলি মির্জা। আরে রাজাবাদশার তো আর অভাব নেই কোথাও। আর তাদের সবারই প্রয়োজন এই আমাদের মত লড়ায়ে বেগেদের... কেবল একটা কথা বলি আপনাকে — আন্দিজানে বেশিদিন থাকার দরকার নেই। বিপদে পড়ার ভয় আছে ওখানে।'

'আখসি যেতে বলেন?'

'হ্যাঁ। আখসি গিয়ে উজুন হাসানের সঙ্গে দেখা করা চেষ্টা করুন। ও আপনাকে জাহাঙ্গীরের সৈন্যদলে নিয়ে নেবে।'

'নেবে কি ? আর জাহাঙ্গীরের কি সাহস হবে ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার?

'দাঁড়াবে।... তাঁর দলে তেমন বেগের সংখ্যা বাড়লে চাপ দেওয়া যাবে তাঁর ওপর। তখ্তের ওপর নজর আছে তাঁর।... বিশ্বাস করুন।..'

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় যখন আহ্মদ তনবালের বিশ্বাসী লোকেরা প্রহরায় ছিল তখন খানকুলিবেগ তার পঞ্চাশজন অনুচর নিয়ে চুপিসারে ফিরোজাদরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। একসপ্তাহ্ বাদে আহ্মদ তনবাল নিজেও চলে গেল— জামিনে কারাভান নিয়ে যাচ্ছে এই অজুহাতে। সেই যে গেল আর ফিরল না সমরখন্দ। সোজা রওনা দিল আখসির দিকে। এরপর বিভিন্ন প্রয়োজনে শহরের বাইরে যাওয়া আর কোথায় যেন হারিয়ে যাওয়া বেগ আর তাদের অনুচরদের সংখ্যা বেড়ে চলল খুব তাড়াতাড়ি। ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল যখন তখন রাতের অন্ধকারে কেল্লার পাঁচিল পেরিয়ে পালাতে লাগল সবাই। শীতকাল শেষ হবার মুখে বাবরের সঙ্গে সমরখন্দ আসা বেগদের সংখ্যা কমে অর্ধেকে দাঁড়াল। বাবর তাঁর একজন বিশ্বাসী লোককে আন্দিজান পাঠালেন পালিয়ে যাওয়া বেগদের ফিরিয়ে আনতে। কুড়িদিন বাদে খবর পাওয়া গেল যে আহ্মদ তনবাল আর তার দলের লোকরা খোলাখুলি বিদ্রোহী হয়ে বাবরের দূতকে আন্দিজান আর আখ্সির মাঝামাঝি কোথায় ধরে মেরে ফেলেছে।

কাসিমবেগের পরামর্শ অনুযায়ী বাবর খাজা আবদুল্লাকে আন্দিজান পাঠালেন। কিন্তু উজুন হাসান ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা, যারা আগে খাজা আবদুল্লার উপদেশ মানত—তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তার মুরিদও ছিল—এবার কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ-অনুরোধে কানও দিল না। আর সোজাসুজি আক্রমণ করে বসল আন্দিজান যার ফলে তাদের মুরশিদ খাজা আবদুল্লা আর বাবরের বিশ্বাসী বেগদের দুর্গদ্বার বন্ধ করে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হল।

ফরগানা উপত্যকায় অশান্তি ঘনিয়ে এল।

৫

নিয়তির অপ্রত্যাশিত আঘাত — তরুণ মির্জার কঠিন রোগ বিশ্বাঘাতক বেগদের বাধিয়ে তোলা গোলমালকে আরো বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করল।

বুস্তান-সরাই মহলের দ্বিতলের বিশ্রামকক্ষে শুয়ে ছিলেন বাবর। প্রচণ্ড জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে তাঁর দেহ।...

আন্দিজান থেকে দূত এসে বাবরের দেহরক্ষীপ্রধানকে দেখাল গালার মোহরছাপ দিয়ে আঁটা গোল করে পাকান একটা চিঠি, কিন্তু চিঠিটা তার হাতে দিল না সে।

'মালিকা সাহেবা, বাদশাহের ওয়ালিদা সাহেবা আদেশ দিয়েছেন কেবলমাত্র স্বয়ং বাদশাহের হাতেই দিতে হবে এ চিঠি!'

বাবর প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করেন আন্দিজান থেকে দূত এসেছে কিনা। সেই জন্য দেহরক্ষীপ্রধান দূতকে উপরে নিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু বিশ্রামকক্ষের দরজায় তাদের পথরোধ করলেন বৃদ্ধ হাকিম।

'এই বার্তা আগে পড়বেন উজীরসাহেব। যদি ভাল খবর হয় তো বাদশাহকে জানান হবে।'

'বাদশাহের ওয়ালিদা সাহেবা আর তাঁর ওস্তাদ খাজা আবদুল্লা সাহেবের আদেশ যেন কেবল তিনিই...'

'দুঃসংবাদ হলে তা হুজুরে আলীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে,' দুঃখিত কিন্তু দৃঢ়স্বরে তাদের বাধা দিলেন হাকিম। 'কয়েকদিন আগেই তিনি বেশ সেরে উঠছিলেন, কিন্তু... দায়দায়িত্ব মানুষের কষ্ট বাড়ায় হে, আর তারই ফলে অসুখবিসুখ হয়। পুরোপুরি সেরে ওঠার আগেই উনি বিছানা ছেড়ে উঠেছিলেন — তাই আজ আবার প্রচণ্ড জ্বর উঠেছে।'

'আন্দিজানের বিপদ,' দূত শেষ যুক্তির আশ্রয় নিল। 'এ চিঠি এখুনি তাঁর হাতে না দিলে দেরি হয়ে যাবে। রেগে যাবেন হুজুরে আলী!'

'না, না, পারা যাবে না, মাফ করবেন।'

'কিন্তু হাকিম সাহেব...'

'না! না!'

এই তর্কাতর্কি বাবরের কানে গেল। কনুইতে ভর দিয়ে উঠে যতটা পারলেন জোরে চীৎকার করে বললেন:

'যদি দূত হয় তো ভেতরে আসতে দিন। আমার হুকুম।'

বিশ্রামকক্ষের একেবারে শেষ প্রান্তে নরম বিছানা পাতা। সেই বিছানা থেকে খানিক দূরে থামল দূত, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাঁটু ঘষে ঘষে আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে চিঠিটা দু'হাতে ধরে বাবরের দিকে এগিয়ে দিল।

বিছানার উপর উঠে বসলেন বাবর, জ্বরে মুখচোখ লাল, কাঁপুনি বন্ধ হচ্ছে না, মাথা রাখলেন উঁচু করে রাখা বালিশের উপর। মোহর ভেঙে পাকান চিঠিটা খুললেন। প্রথম চিঠিটার মধ্যে আর একটি ছোট চিঠি। প্রথম চিঠির নীচে খাজা আবদুল্লার স্বাক্ষর। অন্যটি লিখেছেন কুতলুগ নিগর-খানুম। দুটি চিঠির মূল কথা একই। আন্দিজানকে অবরোধ করা হয়েছে, খুবই সংকটজনক অবস্থা। বাবর ছাড়া আর কেউই বাঁচাতে পারবে না তাদের এমন সময়। দুটি চিঠিরই শেষে অনুরোধ যেন বাবর যত শীঘ্র সম্ভব এসে পৌঁছান।

আন্দিজান অবরুদ্ধ ! বিশ্বাসঘাতক বেগরা আন্দিজানের সিংহাসনে জাহাঙ্গীরকে বসাতে চায়! তার মানে: সেনাদলের নেতা করতে চায় মোহমদ তনবালকে, ছিনিয়ে নিতে চায় বাবরের পিতৃগৃহ! তিনি ভেবেছিলেন ওরা বিশ্বাসী—হোক লোভী, স্বার্থপর, কিন্তু তা বলে এতখানি?

কাঁপুনির ফলে বাবরের মাথাটা বালিশ থেকে পড়ে গেল, ভার সামলাতে পারলেন না তিনি। এবার সবশেষ।

তনবাল আর জাহাঙ্গীর যদি আন্দিজানের যুদ্ধ জয়লাভ করে তো তাঁর দলের বেশিরভাগই সেদিকে চলে যাবে! তাঁর কাছে তাহলে কে থাকবে? হয়ত এখনই, যখন তিনি শয্যাশায়ী তাঁর দলের লোকেরা ছুটছে, ছুটছে...ঐ... তনবালের দলে যোগ দিতে? আর কাসিমবেগ?... ভীষণ আশংকা জাগল বাবরের মনে। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে লাফিয়ে উঠে বসলেন বিছানায়।

'কাসিমবেগ কোথায়?'

'এখুনি আসবেন উজীরের কাছে লোক পাঠান হয়েছে,' নরমসুরে বললেন হাকিম। 'শুয়ে পড়ুন হুজুরে আলী, আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন!'

বাবরের রোগজর্জরিত মস্তিষ্কের কল্পনায় হঠাৎ দেখা দিল তরবারি হস্তে তনবালের মূর্তি। সেই তরবারি! ওশে তনবাল ঐ তরবারি চুম্বন করে, শপথ করে যে আমৃত্যু তার সেবা করবে... ঐ, ঐ তনবাল তরবারিটি তুলে নিয়ে বাবরের মাথার ওপর ঘোরাতে আরম্ভ করল... তনবালের পায়ের কাছে— মানুষের কাটা মুণ্ডুগুলো বস্তা থেকে বেরিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেগুলির একটি... হায় আল্লাহ্।... ও যে মায়ের মাথা...

সেই ভয়ংকর দৃশ্য ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল বাবরকে বিছানা থেকে। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালেন তিনি, নগ্নপায়ের নিচে অনুভব করলেন নরম গালিচার রোঁয়ার স্পর্শ। চেষ্টা করলেন দাঁড়িয়ে থাকার।

'আমার তলোয়ার এনে দাও!' চীৎকার করে বললেন বাবর। 'এখুনি! আমার তলোয়ার দাও!'

হাকিম শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন ঝটকান দিতে থাকা তরুণদেহটি।

'আপনি অসুস্থ হুজুরে আলি, আপনার শুয়ে থাকা উচিত।...'

হাকিম বাবরকে এগিয়ে দিচ্ছেন তনবালের তরবারির কোপে নীচে, বাছুরের মতো বেঁধে রেখেছেন তাঁর পা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাবর টলতে টলতে ছুটে গেলেন দরজার দিকে।

'ঘোড়া নিয়ে এস! আন্দিজান যাচ্ছি আমি! আমার তলোয়ার কোথায়? বেগদের বল! তৈরি হতে শীগগিরি!'

হাকিম দৌড়ালেন তাঁর পিছু পিছু। পোশাকের জিম্মাদার কাউলী করে পশুলোমের আঙরাখাটা বাবরের কাঁধে ফেলে দিল। মুহূর্তখানেক ইতস্তত করে জুতোও পায়ের কাছে এনে রেখে দিল। একপা জুতোর মধ্যে গলালেন বাবর, অন্য পাটি গলাতে পারলেন না আর। মাথা ঘুরে গেল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে।

'বিশ্বাসঘাতক!' এইটুকুই কেবল বলতে পারলেন তিনি তনবালের প্রতি, রক্তমাখা

খোলা তরবারিহাতে যার মূর্তি তাঁর সামনে তখনও নাচানাচি করছিল, 'রক্তপিপাসু ঘাতক!'

হঠাৎ বাবর হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালেন।

গভীর রাতে চোখ মেললেন তিনি। চোখ মেলে দেখতে পেলেন হাকিমকে, মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তুলোয় করে ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলছেন বাবরের মুখে, ঠোঁটে। জিভটা এমন ফুলে গেছে যে প্রচণ্ড ভারী হয়ে গেছে। সারা দেহের ওপর যেন কী একটা ভার লাগছে।

বাবর চোখ মেলেছেন দেখে কাসিমবেগ তাঁর মাথার কাছে এগিয়ে গেলেন।

'আল্লাহ্‌র কৃপা!... আপনি আমাদের এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!'

কী যেন বলতে চাইলেন বাবর, কিন্তু প্রচণ্ড ভারী হয়ে যাওয়া জিভটা নাড়াতে পারলেন না; চোখ ভিজে উঠল তাঁর।

'এখন কেমন বোধ করছেন, হুজুরে আলী?'

আবার নীরব বাবর। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার, কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। কাসিমবেগ বুঝলেন বাক্‌শক্তি হারিয়েছেন বাবর।

মুখ ঘুরিয়ে নিলেন উজীর, যাতে, ষোলবছর বয়সী বাকহারা তরুণটি তার অবলম্বন, সীপাহী আর উজীরের চোখের জল দেখতে না পায়।

আন্দিজান

১

শুধু রাতের অন্ধকারে হল না, আবার আকাশে এসে জড় হল মেঘের দল।

ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল কেল্লা। আন্দিজানের রাস্তাঘাট উৎকণ্ঠায় নীরব হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ, জনহীন... ঐ যে সতর্কভাবে সামান্য ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ তুলে খুলে যাচ্ছে তোরণদ্বার।

সবার সামনে চলেছেন পুরুষের পোশাক পরা খানজাদা বেগম। মাথায় পুরুষের টুপি, কোমরে চওড়া কোমরবন্ধে ঝুলছে খঞ্জর। তাঁর অনুচরদের মধ্যে রয়েছেন মওলানা ফজলুদ্দিন— তাঁর কোমরবন্ধের পার্শ্বদেশে ঝুলছে তরবারি।

সমরখন্দ থেকে দূতমারফত যেই খবর পাওয়া গেল যে বাবর কঠিন রোগে পড়েছেন, জীবনসংশয় তাঁর, অমনি দুর্গের প্রতিরক্ষার ভার যাদের ওপর ছিল তাদের এক অংশ ষড়যন্ত্রকারীদের দলে যোগ দিল। প্রাচীরের প্রতিটি ঝরোকা পাহারা দেবার জন্য যথেষ্ট লোক আর রইল না। রাতের বেলায় সবার অলক্ষ্যে দেওয়ালের গায়ে মই লাগিয়ে দুর্গে শত্রুদের প্রবেশ করার বিপদ আরও বেড়ে গেল। খানজাদা বেগম

প্রতিরক্ষাব্যবস্থার তদারক করছিলেন— পুরুষের পোশাক নেহাৎ খেলাছলে পরেননি তিনি।

পথের পাথরে ঘোড়ার নাল ঠুকে আগুনের ফুলকি তুলছিল ঘন অন্ধকারের বুকে। উষ্ণ হাওয়া বইছে। সে হাওয়ায় বৃষ্টির গন্ধ। মুল্লা ফজলুদ্দিন ভাবলেন বসন্তকাল আগতপ্রায়, দুর্গের ভিতরে বাগানগুলিতে খুবানী আর বাদাম ফলতে আরম্ভ করেছে। বসন্তে রোদ খেলে ভালো। এখন তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন— রাত, অন্ধকার, এক ফোঁটা আলোও দেখা যায় না। প্রকৃতি, দুর্গ, শহর— সবকিছু কালো চাদরে ঢাকা পড়েছে।

ফজলুদ্দিনের মনে পড়ল সেই সুখের দিনগুলির কথা যখন তিনি খানজাদা বেগমকে দেখাতেন পরিকল্পিত মাদ্রাসা ও মহলগুলির নকশা ও ছবি শুনতেন তাঁর মুখের প্রশংসাবাক্য। বাবর যখন সমরখন্দ দখল করলেন মওলানা ধরেই নিয়েছিলেন যে তাঁর স্থাপত্যকলার পরিচয় দানের স্বপ্ন সফল হবে। তাঁর আনন্দে খানজাদা বেগমেরও আনন্দ হয়েছিল— কয়েকবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি স্থপতিকে, অনেকক্ষণ করে আলোচনা চালিয়েছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন কোন জায়গায় মহল আর মাদ্রাসা তৈরি করলে ভাল হয়, নির্মাণকার্য আরম্ভের প্রস্তুতি কেমনভাবে করা যায়।...

খানজাদা বেগম তাঁকে আপ্যায়ন করতেন নিজের ছয়টি কক্ষবিশিষ্ট রহস্যময় মহলের প্রথম কক্ষটিতে। ঐ মহলে তিনি তাঁর বাঁদিদের নিয়ে থাকেন। সাধারণত বেগম রেশমী পর্দার আড়ালে বসে থাকতেন। কখনও কখনও কৌতূহলবশত পর্দা সরিয়ে দিতেন।

'দেখি দেখি, গম্বুজওয়ালা ইমারত আর মিনারের মাঝখানে জায়গাটাতে কী থাকবে দেখান তো?' হয়ত জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

দু'দিক থেকে দু'জনে ঝুঁকে পড়তেন কাগজটির উপর, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস মিলিয়ে যেত। খানজাদার চোখ হয়ে উঠত দ্যুতিময়, আর মওলানার মুখে কুলুপ পড়ত— একটা কথাও বেরোত না, যেমন হত ওশে সেই বারাতাগের প্রথম দিনগুলিতে— বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটত। ভয় হত তাঁর এমন কোন কথা বলে ফেলবেন যার সঙ্গে বর্তমান প্রসঙ্গের কোন সম্পর্কই নেই, ভয় হত— দাসদাসীদের সামনে আর বেগমের কাছে মনের কথা প্রকাশ করে ফেলবেন। আর সবচেয়ে বেশি ভয় করেন কুতলুগ নিগর-খানুমের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে। তিনি প্রায়ই ওঁদের আলোচনার সময় উপস্থিত থাকতেন। চোখের দৃষ্টি গোপন করে হাজার বার মাথা নোয়ান স্থপতি তাঁর উদ্দেশ্যে।

শেষ যেদিন তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয় খানজাদা বেগম হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করে বসলেন:

'মওলানা, আপনি এতদিন পর্যন্ত বিবাহ্ করেননি কেন?'

সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভূত মহিলার উপযুক্ত স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেই চলতেন যদিও বেগম, তবুও মওলানার লক্ষ্য এড়াল না কী অকপট উৎকণ্ঠা, আগ্রহ, আশায় জ্বলজ্বল করছে তাঁর চোখদুটি। বলে ফেলবেন নাকি তঁর গোপনকথা? নাঃ তা হবে নিছক পাগলামি। ঠাট্টার মাধ্যমে উত্তর এড়িয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন ফজলুদ্দিন:

'বেগম, আমি চিরকুমার থেকেই মরতে চাই।'

'আরে, আমিও তো তাই চাই।'

'আপনি... এমন অভিজাতবংশীয়া বেগম, কেমন করে একা থাকবেন তা' আমি ভাবতে পারি না।'

'কেন?'

'আপনি তো... এই দুনিয়ায়... কত প্রখ্যাত, কত নামজাদা রাজাবাদশা যাঁরা নিজেকে সুখী মনে করবেন...'

'হয়ত আছেন এমন কেউ... আচ্ছা মাওলানা, কোন বাদশাকে আপনি আমার উপযুক্ত বলে মনে করেন?...'

'যদি আমার মত প্রয়োজন তো বলি, আপনার উপযুক্ত হতে পারেন কেবল ফরহাদই।'

'কেন কেবল ফরহাদ? ফজলুদ্দিন দিশাহারা হয়ে পড়লেন, ওদিকে খানজাদা বেগম আর একটি কুটিল প্রশ্ন করে বসলেন:

'ফরহাদ— স্থপতি, কারিগর, যেমন আপনি। তাই জন্য কি?'

'হায় বেগম... এমন কথা বলার অধিকার নেই আমার,' স্বরে বিষাদ ও গুরুত্ব ফুটিয়ে বললেন তিনি।

খানজাদা বেগমও এবার তামাসার সুর পরিত্যাগ করলেন। বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন, দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর।

'কেন যে আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন খানদানী বংশের সন্তান করে?' অকপট সুরে বললেন। 'সাধারণঘরের মেয়ে হলে নিজের সুখ খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা হত না হয়ত...'

এই স্বীকৃতি যতই দুঃখের হোক না কেন, বলতে সংকোচ হয় ফজলুদ্দিনকে তা আনন্দ দিয়েছিল। তার মানে, খানজাদা বেগম অনুমান করে নিয়েছেন তাঁর প্রেমের কথা? শুধু জানেনই যে তা নয়— 'শাহজাদীর' প্রতি তাঁর একান্ত অনুরাগে তাঁর সমর্থনও আছে হয়ত? হয়ত সেজন্যেই অমনভাবে বললেন যে তাঁর ও স্থপতির মধ্যে সামাজিক ব্যবধান তাঁর অর্থাৎ বেগমেরও মনোকষ্টের কারণ? ওঃ, যদি খানজাদা বেগমও তাঁকে ভালবেসে ফেলেন তাহলে তিনি কেমন করে অতিক্রম করবেন তাঁদের মাঝখানের এই দুস্তর ব্যবধান? ওশে তাঁর নির্মিত ছোট্ট বাসভবনটির জন্য মির্জা

বাবর তাঁকে মস্ত বড় সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আর যদি ফজলুদ্দিন বিরাট বিরাট নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন যার ফলে সারা দুনিয়ায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে তখন? তখনও কি তিনি নামজাদা, অভিজাতবংশীয় লোকেদের থেকে নীচেই পড়ে থাকবেন? বাবর তাঁর ভগিনীকে স্নেহ করেন। তাঁর হৃদয় দয়ায় পূর্ণ। হয়ত তিনি তাঁদের প্রতি কৃপা করবেন?

ফজলুদ্দিনের স্বপ্ন তাঁকে অনেকদূর নিয়ে গেল, কিন্তু সে তো স্বপ্নই শুধু? এদিকে বেগমের প্রতি অনুরক্ত স্থপতির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ, মাঝে মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করার শুভ ইচ্ছা—এই-ই আপাতত স্থপতির পক্ষে গভীর সুখের কারণ।...

এদিকে আন্দিজান অবরুদ্ধ। বিদ্রোহী বেগরা সারা মাভেরান্নহরে গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে। স্থপতির স্বপ্ন, আনন্দ সবকিছুকে গ্রাস করল আজকের এই রাতের মতই ঘন অন্ধকার। তাঁর নকশাপত্রগুলি পরিণত হয়েছে কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় কাগজে। যুদ্ধের প্রতি, সৈন্যদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা মওলানার। কিন্তু আজ কেল্লায় যখন শুনলেন সমরখন্দ থেকে আশা দুঃসংবাদ আর দেখলেন অস্ত্রসাজে জজ্জিত খানজাদা বেগমকে তখন আর একপাশে সরে থাকতে পারলেন না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভাবলেন ভাগ্যের আঘাত কখন আসবে তার অপেক্ষায় থাকার চেয়ে খানজাদা বেগমের অনুচর হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে লড়াইতে নামা অনেক ভাল। জীবনে এই প্রথম তিনি তরবারিসমেত কোমরবন্ধ পরলেন।

উদ্বেগময় ও ভয়ংকর অন্ধকারে নিস্তব্ধ শহরের রাস্তা দিয়ে চলেন ঘোড়ায় চড়ে অন্যান্য সৈন্যদের পাশে পাশে, সামান্য দূরে তিনি দেখতে পাচ্ছেন খানজাদা বেগমকে আর ভাবছেন যে তিনি বেগমকে রক্ষা করতে পারবেন। এই চিন্তায় একটু আশ্বস্ত হলেন তিনি।

মির্জাদরওয়াজার কাছে দুর্গপ্রাচীরের বাইরে থেকে তাঁরা শুনতে পেলেন যুদ্ধে আহ্বানকারী শিঙ্গা, ঢাকঢোলের আওয়াজ, শতশত সৈন্যের চীৎকার।

'দুশমন চেষ্টা করছে ফটক খোলার, শহরে ঢুকতে চাইছে!' চীৎকার করে বলেই খানজাদা বেগম লাগামে ঢিলা দিলেন।

সৈন্যরা তাঁকে ছাড়িয়ে তোরণদ্বারের দিকে এগিয়ে গেল কিন্তু মির্জাদরওয়াজার কাছে গোলমাল, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত করে রাখা মইগুলি, প্রাচীর পেরিয়ে ছুঁড়ে ফেলা জ্বলন্ত তীর— এসবই ছিল তাদের লক্ষ্য অন্য দিকে ঘোরাবার জন্য একটা চাল মাত্র : ঠিক সেই সময়ই দুর্গপ্রাচীরের অন্য এক জায়গায় শত্রুরা খাড়া করেছে প্রধান সিঁড়িটা। খাজা আবদুল্লার লোক সেখানে খুবই কম।

খানজাদা বেগম তাঁর সিপাহীদের নিয়ে পাহারার বুরুজের দিকে এগিয়ে গেলেন। বুরুজের সৈনিক মশাল জ্বালাল। মশালের আলোয় সবাই দেখতে পেল একটা সিঁড়ি পাতা রয়েছে দেওয়ালের গায়ে। মওলানা, ফজলুদ্দিনের ভয় হল যে খানজাদা বেগম

সবার আগে সিঁড়িতে উঠবেন, তাই সবাইকে পেরিয়ে তিনি পা রাখলেন সিঁড়িতে। প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সৈন্যরা। খানজাদাও সেখানে উঠে এলেন হাতে মশাল ধরে। ফজলুদ্দিন আলতো করে মশালটা নিয়ে নিলেন খানজাদার হাত থেকে।

'সাবধান বেগম, আলোয় শত্রুকে নিজের চেহারা দেখাবেন না।'

প্রাচীরের বাইরে থেকেও প্রশস্ত সিঁড়ি পাতা হয়েছে দেখতে পেল দুর্গরক্ষাকারীরা। সাহায্য এসে পৌঁছানয় সাহস পেয়ে প্রহরীকক্ষে প্রহরারত সৈনিকটি দু'হাতে একটি সিঁড়ির প্রান্ত ধরে উল্টো দিকে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তখনই শত্রুদের ছোঁড়া একটি তীর এসে তার বুকে বিঁধল। বেচারী ছেলেটি সিঁড়িসমেত হুড়মুড়িয়ে পড়ল নিচে।

প্রাচীরের গায়ে পাটাতনের উপর পাথর রাখা ছিল। খানজাদা বেগম একটা পাথর অতি কষ্টে তুলে নিয়ে নিচে ছুঁড়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরাও পাথর ছুঁড়তে লাগল নিচে: নিচে থেকে ভেসে আসা গালিগালাজ আর আর্তচীৎকারে বোঝা যাচ্ছে যে সেগুলি লক্ষ্যে গিয়ে পড়ছে।

এবার প্রাচীরের বেড়ের ঠিক উল্টো দিকে খাকানদরওয়াজা থেকে ঢাকঢোল, শিঙার আওয়াজ, জয়োল্লাস শোনা যেতে লাগল। আওয়াজটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল— এবার শহরের একেবারে কাছে।

'বেগম, শুনছেন!' ভীতস্বরে বললেন ফজলুদ্দিন, 'দুশমন ঢুকে পড়েছে শহরে!'

মরিয়া চীৎকার করে উঠল নুয়ান কুকলদাস।

'হায় বেগম, বিশ্বাসঘাতকরা খাকানদরওয়াজা খুলে দিয়েছে। প্রাসাদে ফিরে যেতে হবে, এক্ষুনি!'

খানজাদা বেগম দ্রুত নেমে চললেন সিঁড়ি দিয়ে মওলানা ফজলুদ্দিন ও অন্যান্য অনুচরাও মশাল ধরে পথ দেখাতে দেখাতে ছুটে চললেন তাঁর পিছনে। সবাই দ্রুত ঘোড়ায় চড়লেন।

'মশাল ফেলে দিন!' খানজাদা বেগম বললেন।

অন্ধকারে মশাল ধরে থাকা মওলানা দারুণ চমৎকার নিশানা হতে পারতেন। অন্ধকারে সবাই দ্রুত এগিয়ে চললেন শহরের মধ্যে অবস্থিত প্রাসাদের দিকে। দ্রুত! আরো দ্রুত!

কিন্তু যখন তাঁর প্রাসাদ থেকে সামান্যই দূরে তখন তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়াল বর্শা ও মশালধারী অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য। তারপর তাঁরা মশালের আলোয় দেখতে পেলেন আহমদ তনবালকে, জরির কোমরবন্ধ, উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণপরা। ফজলুদ্দিনের বুকের ওপর যেন চেপে বসল লোহার ঠাণ্ডা বেড়।

শত্রুসৈন্যের দলটি খানজাদা বেগম আর তাঁর অনুচরদের ঘিরে ধরল। আহমদ তনবাল উল্লসিত স্বরে একজন সৈন্যকে বলল:

'মশাল দে তো।... আরে, খানজাদা বেগম যে? নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। এর মানে কী? আপনি এমন পোশাক পরেছেন কেন, যেন এক বীরপুরুষ?'

'প্রকৃত পুরুষমানুষ যারা বিশ্বাসী এবং সাহসী তারা আর কেউ নেই যে এ দুনিয়ায়!'

'আন্দিজানে প্রকৃত পুরুষমানুষ যদি না থাকে তো আমরা এসে পড়েছি, বেগম!'

তনবালের পিছন থেকে হেসে উঠল উজুন হাসান। আরো অশ্বারোহী সৈন্য এসে জড় হয়েছে। মশালের আলো পড়ল মাকুন্দ আলী দোস্তবেগের মুখে—চোখ কুঁচকে আছে সে, মুখে করুণ হাসি। শহর ছেড়ে যাবার সময় বাবর এর হাতে শহর রক্ষার ভার দিয়ে যান। বাবর মৃত্যুশয্যায় এ খবর শুনে আলী দোস্তবেগ বাবরের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। তাই তনবালের সঙ্গে চুক্তি করে অবরোধকারীদের কাছে খুলে দিয়েছে খাকানদরওয়াজা।

খানজাদা বেগম ঘৃণাপূর্ণ স্বরে চীৎকার করে উঠলেন:

'প্রকৃত পুরুষমানুষ আপনারা নাকি? বীরত্ব আর বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে কোন ফারাক নেই আপনাদের কাছে! গতকালই বাবরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ নিয়েছেন, আর আজ... আর এও জানি: কালই আবার আপনারাই জাহাঙ্গীর মির্জার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন!'

তরবারির হাতলে হাত রাখল তনবাল।

'ভেবে কথা বলুন, বেগম!' বলল সে। 'মির্জা বাবর অন্যায় কাজ করেছেন। সমরখন্দ দখল করার পর আন্দিজান জাহাঙ্গীর মির্জার হাতে চলে আসা উচিত ছিল। কিন্তু বাবর তাতে সম্মত হননি! আমরা ন্যায়ের জন্য লড়াই করে আজ জয়ী হয়েছি!.. আর আপনি, আপনি...' হঠাৎ মাথায় রাগ চড়ে গেল বেগের, 'আপনি লজ্জা ভুলে আমাদের অপমান করছেন? আপনাকে কে শিখিয়েছে এমন আচার-আচরণ যা মোটেই শাহজাদীর উপযুক্ত নয়? ঐ স্থপতি নাকি, যে আপনার কাছে ঘুরঘুর করছে?'

ঘৃণাপূর্ণ চোখে তাকিয়ে রইল ফজলুদ্দিনের দিকে ফজলুদ্দিনও চোখ সরিয়ে নিলেন না।

'বেগম আমাদের পুরুষমানুষদের প্রতি উপযুক্ত উপদেশই দিয়েছেন!.. বেগমের কথার অন্য অর্থ ধরতে পারে কেবল দাঙ্গাবাজরাই!'

'কে দাঙ্গাবাজ?!' খাপ থেকে তরবারি খুলে নিয়ে মওলানার দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল তনবাল। তখুনি খানজাদা বেগমও ঘোড়া চালিয়ে দিলেন, তনবালকে বাধা দেবার জন্য।

'বিদ্বান লোকের ওপরে অস্ত্র তুলে ধরা লজ্জার কথা!'

তনবাল আর খানজাদার ঘোড়ার মধ্যে সংঘর্ষ হল, ঘোড়াদুটি পিছনে পায়ে

ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। খানজাদার মাথার উপর তরবারি ঘোরাতে লাগল তনবাল:

'ঐ... ঐ নকশাআঁকিয়ে লোকটার প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা? হীরাটের নীচ বংশের, পাপী ঐ লোকটাকে? বিশ্বস্ত লোকদের কাছেই শুনেছি যে ঐ মুল্লাটা বেগমকে প্রলোভনের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তখন বিশ্বাস হয়নি। এখন — বিশ্বাস হল।'

'আমার দোষ ধরার তুই কে রে, বেইমান!' বলে খানজাদা খঞ্জরটা তুলে নিলেন হাতে।

আঘাতটা লাগল তনবালের পোশাকের নিচে লোহার বর্মে, খঞ্জরটা খানাজাদার হাত থেকে ছিটকে পাথরের ওপর পড়ে আওয়াজ তুলল। তনবালও তরবারি চালাল— বেগমের টুপিটা টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ল, তাঁর দীর্ঘচুলের রাশি এসে পড়ল কাঁধের ওপর। মির্জা জাহাঙ্গীর তাঁর দেহরক্ষী দল নিয়ে সেখানে এসে পড়লেন। তাঁকে দেখে দোস্তবেগ তনবালকে সতর্ক করে দিল:

'যথেষ্ট হয়েছে খোদাবন্দ আহ্‌মদবেগ, এবার থামুন!'

খানজাদা বেগম মির্জা জাহাঙ্গীরের আপন বোন না হলেও বোন তো। সবার সামনে তাঁর পিতার কন্যাকে অপমানিত হতে দেবেন না কিছুতেই। আহ্‌মদ তনবাল তখনই ঘোড়া ফেরালেন জাহাঙ্গীরের দিকে। দোষ ঢাকার চেষ্টা করলেন:

'দেখলেন, দেখলেন, হুজুরে আলী? আপনার বোন অস্ত্র হাতে নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তার কাছে আছে নচ্ছার এই স্থপতিটা। ওই তো তাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে!'

'মওলানা ফজলুদ্দিন তোর মত বিশ্বাসহন্তা বেগের থেকে হাজারগুণে ভাল!' চীৎকার করে বললেন খানজাদা বেগম। 'ওঁর শিল্প আন্দিজানের গর্বের কারণ হতে পারত। তোমরা, তোমরা... খুনী, বিশ্বাসঘাতকের দল... খোদার গজব নাজেল হোক তোমাদের ওপর এই স্বপ্ন পদদলিত করে দেবার জন্য! আমাদের স্বপ্ন ভেঙে দেবার জন্য!'

শেষের কথাগুলি বলার সময় বেগমের চোখে জল দেখা গেল। ঘোড়াকে চাবুকের আঘাত করে প্রাসাদের প্রবেশ পথের দিকে যেতে চাইলেন, কিন্তু সৈন্যদের সারির সামনে থামতে হল। পিছনে ফিরে দেখলেন মওলানা ফজলুদ্দিনের কী হল।

ফজলুদ্দিন কোমর হাতড়ে হাতড়ে তরবারিটা খুঁজে পেয়ে আনাড়ির মত বার করে এনে খানজাদা বেগমের পথরোধ করে থাক সৈন্যসারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন। কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যরা সাঁড়াশিফাঁদে ধরে ফেলল তাঁর ঘোড়াটা, বাঁহাত থেকে ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়ে নিল, ডানহাতের ওপর ভারী মুগুর নিয়ে আঘাত করল, তরবারিটা পড়ে গেল মওলানার হাত থেকে।

জাহাঙ্গীরের ইঙ্গিতে সৈন্যরা খানজাদা বেগমের সামনে থেকে সরে গেলে

খানজাদা বেগম প্রাসাদের ভিতর ঢুকে গিয়ে আর একবার পিছন ফিরে তাকালেন, দেখতে পেলেন তনবালের লোকরা মওলানাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়েছে, হাতগুলো এক মুহূর্তে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়ে গেল তারপর তাঁর পিঠে বর্শা ধরে রেখে কোথায় যেন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

২

অন্ধকার কারাকক্ষে একা পড়ে রইলেন যখন তখনই হাতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন। আন্দিজান শহরের প্রান্তে প্রস্তরনির্মিত এই গারদখানায় এনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে বন্দি করা হয়েছে তাকে, দরজার বাইরে থেকে পড়েছে ভারী তালা। তা'ছাড়া বাইরে দু'জন প্রহরীও বসান হয়েছে। দুর্গপ্রাকারের কাছে মির্জা জাহাঙ্গীর ও আহমদ তনবালের সংক্ষিপ্ত কথোপকথন থেকে তিনি বুঝেছেন যে খানজাদা বেগমের সম্মানহানির অভিযোগ আনা হবে তাঁর ওপর। এই অভিযোগে অভিযুক্ত অপরাধীদের পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হয়। যা হতে চলেছে আগামীকাল। মুল্লা ফজলুদ্দিন আরো বুঝলেন খানজাদা বেগমের নামে কলঙ্ক দিয়ে কী আনন্দই না হচ্ছে আহমদ তনবালের! বেগ প্রতিশোধ নিচ্ছে পুরনো অপমানের আর জাহাঙ্গীর তার সব কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছে, কারণ সে আর তার মা ফতিমা-সুলতান বেগম প্রমাণ করে দিতে চাইছিলেন যে বাবরের সঙ্গে যুক্ত সবাই কত নীচ আর তাঁরা শরীয়তের প্রয়োজনে, আইনানুযায়ী আন্দিজানের তখ্‌ত দখল করেছেন, কী ন্যায়ের কাজই না করছেন তাঁরা।

স্যাঁতসেতে, দুর্গন্ধময় অন্ধকার ঘরটিতে ফজলুদ্দিন পিছমোড়া করে বাঁধা হাতটা দেয়ালে চেপে ধরতে লাগলেন বারবার, যাতে ঠাণ্ডায় কব্জির ব্যথাটা একটু কমে। কিন্তু কমছে না ব্যথাটা, বেড়ে চলল উলটে। এ কেবল মুগুরের একটা আঘাত। আর কাল ... কাল তার ওপর কেমন পাথরবৃষ্টি হবে!... মনে মনে কল্পনা করলেন তিনি, কালকের ঘটনা। মাথা ঘুরে উঠল, তাঁর মনে হল যেন তিনি এখন কারাগারে বন্দী নন, যেন তিনি দুটি দোদুল্যমান পর্বতের মাঝে, আর যেন পর্বতগুলির গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বড় বড় পাথরের চাঁই, পিষে মেরে ফেলবে তাঁকে এখুনি। এই কল্পিত দৃশ্যে তিনি এমন ভয় পেয়ে গেলেন যে মরিয়া হয়ে ছুটে গেলেন দরজার দিকে, কাঁধ দিয়ে দরজার ওপর আঘাত করে সর্বশক্তি দিয়ে চীৎকার করে বললেন: 'খোল! খোল, বলছি! খোল!'

এই অপ্রত্যাশিত চীৎকারে চমকে উঠল প্রহরী, তারপর রেগে জিজ্ঞাসা করল:

'তুই কি পাগল হলি নাকি? কী হয়েছে কী?'

'হাতের বাঁধন খুলে দাও! আমার প্রাণটা নেবে তো কাল, হাতটা এদিকে বিকল হয়ে গেল! খুলে দাও বাঁধন!'

প্রহরীদের মেজাজ ভীষণ খারাপ ছিল: হবে না? তারা এখানে এই বন্দীটাকে পাহারা দিচ্ছে, আর অন্যরা এ সময় বাবরের সমর্থনকারীদের ধনসম্পত্তি লুঠপাট করছে। এখন রাত্রিবেলা হলেও আন্দিজানের রাস্তাঘাট, বাড়িগুলির উঠানে হৈচৈ শোনা যাচ্ছে, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কুকুরের ডাক, মেয়েদের চীৎকার-কান্না, গোরুর হাম্বারব, ভেড়ার চীৎকার। হায়, হায়, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী ক্ষতিই হয়ে গেল তাদের। বন্দীও তেমনি এক অকর্মা বুদ্ধু। প্রহরীদের মধ্যে যার বয়স বেশি সে ঘড়ঘড় করে বলল:

'হাতটা ভেঙে দিয়েছে বলছে রে!... ওরে বেজন্মা কালই তো পরপারে পৌঁছে যাবি, আজ আর হাত নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?

'জল্লাদ তোমরা!'

প্রহরী চীৎকার করে ধমক দিল:

'চোপ্ রও! জিন্দা লাশ! নাহলে এখনি এসে ওর ওপর আরও ঘা দেব!'

'আমার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে একি শুনছি আমি,' বললেন ফজলুদ্দিন নিজের মনে। 'মানুষ এত নির্দয় হয়ে যাচ্ছে কেমন করে? আমায় যেমন মরতে হচ্ছে এ মোটেই ভাল না। মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই যখন তনবালের 'সঙ্গে লড়াই করতে করতে হাতে তরবারি ধরে মৃত্যুই তো ভাল ছিল।... আর এখন এই জন্তুগুলোর গালিগালাজ শুনতে হচ্ছে, কালই পাথরবৃষ্টিতে মরতে হবে... খানজাদা বেগমের সামনে তনবালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ত পারতাম। হায় কিসমৎ, কেন তুমি আমাকে তখন এগিয়ে দিলে না?'

রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল, প্রথমে রাস্তায় তারপর বিচারালয়ের পাথরবাঁধান উঠানে।

'কে যায়? দাঁড়াও!'

তিনিজন অশ্বারোহী এসে ঢুকল উঠানে। একজন প্রহরীকে বলল:

'খোদাবন্দ কাজী মওলানা খাজা আবদুল্লা, বাদশাহের ফরমান নিয়ে এসেছেন!'

একে একে নামল তারা ঘোড়া থেকে। প্রহরীদের উঁচিয়ে ধরা বর্শার একেবারে সামনে গিয়ে থামল।

'ফরমান দেখাতে হবে আমাদের সর্দারকে!' বয়সে বড় প্রহরীটি গলা ঘড়ঘড় করে বলল।

বিচারালয়ের দরজার উপর একটা চিরাগ জ্বলছে মিটমিট করে। হলকাহলুদ রংয়ের আলখাল্লাপরা খাজা সোজা প্রহরীদের দিকে এগিয়ে গেলেন, নিশ্চিত ধীর স্বরে বললেন:

'সর্দারকে খুঁজে পেলাম না আমরা। তোমরা ছাড়া ধারেকাছে আর কেউই নেই। কেন বল তো?'

অল্পবয়সী প্রহরীটির স্বরে বিরক্তি আর চাপা রইল না:

'লুঠপাট করতে গেছে সবাই!'

খাজা আবদুল্লা গোল করে পাকান একটা কাগজ দেখালেন।

'তাহলে হুকুম তোমাদের তামিল করতে হবে,' তেমনই ধীরস্বরে বললেন তিনি। 'নাও, পড়!'

দু'জন সৈন্য যারা পিছনে ছিল, ঘোড়াগুলোকে দেয়ালে আংটার সঙ্গে বেঁধে কাছে এগিয়ে এল।

'ওখানে দাঁড়াও তোমরা!' ঘড়ঘড়েগলা চীৎকার করে বলল।

সৈন্যরা সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রহরী বর্শাটা সরিয়ে নিয়ে খাজা আবদুল্লাকে পথ করে দিল। তারপর তাঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দেখল। দামী কাগজে সামান্য কয়েকটা কথা লেখা, লেখার নীচে জমকালো একটা মোহরছাপ। প্রহরী কাগজটা আলোর কাছে নিযে এসে মোহরছাপ পর্যবেক্ষণ করল ভালো করে (পড়তে তো পারে না সে)।

'তুই পড় দেখি!'

কিন্তু অন্যজনের একেবারে অক্ষরজ্ঞানই নেই। খাজা আবদুল্লাকে জানে কিন্তু সে। কাগজটা হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল তারপর তাকাল খাজা আবদুল্লার দিকে:

'পীর, এ কিসের ফরমান?

'এ ফরমানে লেখা আছে যে এখানে যে লোকটি বন্দী সে অত্যন্ত বিপজ্জনক বিশ্বাসঘাতক, আমাদের ওকে নিয়ে যেতে হবে কেল্লার ভিতরের গারদে।'

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের একজন বেশ জোরে বলল:

'খোদাবন্দ কাজী ঐ বেজম্মাটাকে ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন সেখানে!'

খাজা আবদুল্লা আন্দিজানের কাজী এবং অনেক সম্মানিত ব্যক্তির ধর্মীয় উপদেশদাতা সেকথা কে না জানে? বয়সে বড় প্রহরীটি প্রথম দেখামাত্রই চিনেছে তাঁকে। কিন্তু তার দ্বিধা হচ্ছিল তা সত্ত্বেও, কারণ সে জানে এই সেদিনও কাজী ছিলেন বাবরের পক্ষে।

'এ ফরমান কি মির্জা জাহাঙ্গীর নিজে দিয়েছেন?' ঘড়ঘড়েগলা শক্ত করে চেপে ধরল বর্শাটা।

'যদি সন্দেহ হয়, পড়ে দেখ্!'

'আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে বেজম্মাটাকে দারুণ কড়া পাহারায় রাখতে, দারুণ কড়া পাহারা, পীর!'

'একে কি তোমরা বল কড়া পাহারা? তোমাদের বড় সর্দার কই? আর ছোট সর্দার? কেবল তোমরা দু'জন কেন? আর যদি... বন্দীর পক্ষের লোকেরা দল বেঁধে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে? না, না তাড়াতাড়ি একে কেল্লার ভিতরে নিয়ে যেতে হবে! দরজা খোল!'

অল্পবয়সী প্রহরীটি অন্যজনের দিকে তাকাল যেন বলতে চাইল, 'বুঝছ না: কাজীও মির্জা জাহাঙ্গীরের দলে চলে এসেছে,' কিন্তু অন্যজনের মনে তখনও সংশয়:

'আমরা সর্দারকে কী বলব এরপর?'

'তোমরা দু'জনেই যাবে আমাদের সঙ্গে,' বললেন খাজা আবদুল্লা, 'সবাই মিলে একে পাহারা দেব, নাহলে দু'জনে কিছু হবে না।'

একথায় এবার আশ্বস্ত হল ঘড়ঘড়েগলা। দেয়ালের গায়ে বর্শাটা হেলান দিয়ে রেখে দরজাটা খুলল। কিন্তু সে একপা ভিতরে দেবার আগেই খাজা আবদুল্লার সঙ্গীদের একজন তার শিরস্ত্রাণের উপর বসিয়ে দিল মুগুরের এক ঘা, তারপর ধাক্কা দিয়ে তাকে কারাকক্ষের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। তা দেখে হাঁকুপাঁকু করতে থাকা অপরজনকেও মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা সরু বস্তা পরিয়ে দিল মাথায়।

খাজা আবদুল্লা স্পষ্টভাবে ফিসফিস করে বললেন:

'মেরে ফেলো না! রক্তপাতে কোন মঙ্গল হবে না আমাদের!'

'ওরা আমাদের কথা জানিয়ে দেবে পরে!'

প্রহরীটি ওদিকে ছটফট করছে বস্তা থেকে মাথা বার করার জন্য বুদ্ধ, করুণস্বরে কাকুতিমিনতি করছে:

'ছেড়ে দিন, পীর! কোনদিনও আপনার কোন ক্ষতি করব না! মেরে ফেলবেন না আমায়!'

'ভাল চাস তো চুপ কর,' চেঁচিয়ে উঠল একজন সিপাহী। ফজলুদ্দিন নিজের ভাগ্নের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন।

'দাঁড়াও!' খাজা আবদুল্লা তাহিরকে আদেশ দিলেন। 'ওর হাত-পা বাঁধো, তাই যথেষ্ট আর অন্যজনের তো জ্ঞান নেই।'

'দেখছি আমি।'

তাহির আর খাজা আবদুল্লার দিকে ছুটে গেলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন:

'মুল্লা!... ভাগ্নে আমার!... তাহিরজান!... আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ তোমরা!'

স্থপতির হাতের বাঁধন না খুলে সাবধানে, শক্ত করে ধরে তাঁকে বাইরে নিয়ে এলেন খাজা আবদুল্লা। দেয়ালের গায়ের প্রদীপের আলোয় ফজলুদ্দিনের হাত-বাঁধা দড়িটা কেটে দিলেন ছোরা দিয়ে।

তাহির আর তার সঙ্গীরা দ্বিতীয় প্রহরীটিকে টেনে নিয়ে গেল কুঠুরীর মধ্যে, তারপর কুঠুরীর দরজা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে।

'ভাগ্নে রে কী করে তোকে খোদা আমার কাছে পাঠিয়েছেন?'

'সমরখন্দ থেকে এসেছি দূত হয়ে।'

'মির্জা বাবর সুস্থ হয়েছেন?'

'হ্যাঁ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আসছেন এদিকে, সাহায্য করতে!'

'আন্দিজানের পতন হয়েছে, জানেন তিনি?'

'এখনও জানেন না, সেখানেই তো গোল!...'

খাজা আবদুল্লা ফিসফিস করে বললেন :

'আস্তে! আস্তে কথা বলুন!'

মামাকে নিজে ঘোড়ায় বসিয়ে দিল তাহির, তারপর সবাই ধীরে ধীরে সতর্কভাবে চলল শহরের রাস্তা দরে। ভাগ্যের কথা কারুর চোখে পড়েনি তারা। বিজয়ীদল লুঠপাট নিয়েই বিশেষ ব্যস্ত ছিল।

তিনটি ঘোড়ায় করে চারজন এসে পৌছাল দুর্গপ্রাচীরের কাছে। এখানে একেবারেই নির্জন।

'এখানে প্রাচীর পার হওয়াই সব থেকে সুবিধাজনক,' খাজা আবদুল্লা এ পর্যন্ত একবারও গলা উঁচু করে কথা বলেননি।

সবাই নামল ঘোড়া থেকে। তাহিরে সঙ্গী ঘোড়ার পিঠে বাঁধা থলি থেকে পাকান দড়ির একটা বিরাট গোলা বার করল। তাহিরই দড়ির সিঁড়িটা ছুঁড়ে দিল প্রাচীরে গায়ে, তারপর চারজনে তারা প্রাচীরের উপর উঠল। খাজা আবদুল্লা মুল্লা ফজলুদ্দিনের পাশে দাঁড়ালেন ('ফটক দিয়ে বার হবার বিপদ আছে!'—বুঝেছি পীর, ধন্যবাদ, ওস্তাদ!'), পোশাকের ভিতর থেকে কী একটা বার করে ফজলুদ্দিনের হাতে গুঁজে দিলেন। ত' হল মোহরভরা একটা চামড়ার থলি।

'হুজুরে আলীর ওয়ালিদা মালিকা সাহেবের কাছ থেকে।'

'উনিও জানেন আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছে?'

'চোখে জল নিয়ে খানুম অনুরোধ করেছেন বারবার আপনাকে উদ্ধার করতে। তনবাল খানজাদা বেগমের নামে কলঙ্ক দিতে চায়, জানেন বোধহয়। কিন্তু যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি ততক্ষণ মির্জা বাবরের পরিবারের গায়ে একটা দাগও পড়তে দেব না। ঠিক কিনা?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই!' পোশাকের ভিতর মোহরের থলিটা ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন, 'আমি এখন সোজা যাব মির্জা বাবরের কাছে!'

'মওলানা,' আরো নেমে গেল খাজা আবদুল্লার গলার স্বর। 'মালিকা সাহেবা আর আমিও আপনাকে অন্য পরামর্শ দিতে চাই,' এরপর আরবীভাষায় বলতে আরম্ভ করলেন। ফজলুদ্দিনকেও একসময় তিনি আরবীভাষা শিখিয়েছেন, সেই জন্যই মওলানা তাঁকে ওস্তাদ বলে ডাকেন। 'মওলানা! সমরখন্দ যাবে তাহিরবেগ। ও তো দূত। হয়ত মির্জা বাবর সমরখন্দ ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। দূত তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। আর আপনার অমূল্য প্রতিভা মওলানা, আপনার উচিত তাকে রক্ষা করা, মাভেরান্নহরের এই ভয়ঙ্কর গোলমালের দিনগুলি খুব শীগগির শেষ হবে না।...

আপনি নিজেই তো একসময় হীরাট যেতে চেয়েছিলেন। সেই ইচ্ছাপূরণ করার সময় হয়েছে এবার।'

ফজলুদ্দিন এর আগে হীরাটে গিয়েছেন, সেখানে যাবার দীর্ঘ পথ মনে মনে কল্পনা করলেন তিনি। সেই পথ গিয়েছে কয়েকটি অশান্ত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে, বহুমাস লাগে সেপথ পেরোতে। স্থপতির হৃদয় বিষণ্ণতায় ভরে গেল। সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু কিসের জন্য? আহত হাতের ব্যথাটা যা ভুলে গিয়েছিলেন প্রায়, চাগিয়ে উঠল আবার। ডানহাতের কব্জিতে হাত বুলালেন ফজলুদ্দিন।

'নিজের জায়গা... নিজের দেশ কেমন করে ছেড়ে যাব আমি, ওস্তাদ?'

'এখন যেখানে আলিশের নবাই আছেন সেই খোরাসানই হবে আপনার দেশ, মওলানা।'

'অবশ্যই... কিন্তু জন্মভূমি... হয়ত আর ফিরে আসা হবে না, বাড়িতে আমার বইপত্র, নকশাদি রয়ে গেছে, তাহির!'

'আমি বাড়িতে ফিরে সেগুলো সব ভাল করে লুকিয়ে ফেলব, মামা, আশ্বস্ত হোন!'

ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেল ফজলুদ্দিনের—খানজাদা বেগমের জন্য, বেশ বুঝতে পারলেন তার দেখা আর কোনদিনই পাবেন না। তিনি জানেন, তাঁকে হীরাট পাঠাবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কুতলুগ নিগর-খানুম আর খাজা আবদুল্লা তার অন্যতম কারণ খানজাদা বেগম ও স্থপতির মধ্যে স্নেহময় ও জটিল সম্পর্ক, যা তাঁদের আনন্দ ও কষ্ট দুই-ই এনে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন ফজলুদ্দিন। শেষে খাজা আবদুল্লার উদ্দেশ্যে বললেন:

'মৌলবী, মির্জা বাবরের নাম অকলঙ্ক রাখার জন্য যা প্রয়োজন তা করব আমি। কেবল একটা অনুরোধ: মালিকা সাহেবাকে বলবেন, মিথ্যা রটনায় কান না দিতে। খানজাদা বেগমকে সন্দেহ করার কোন কারণই নেই, তাঁর তুল্য পবিত্র আর কেউই নেই।'

'আপনিও ঠিক তেমনই, মওলানা, এ আমি জানি। আপনার ইমানদারীতে বিশ্বাস না থাকলে কি আর আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিতে যাই? এমন কাজ করতে হবে তা কখনও ভাবিনি, তাহিরবেগ খুব উৎসাহ দিয়েছে আমায়। বলে শত্রুর সামরিক কৌশলের সামনে আমাদেরও কিছু কলাকৌশল অবলম্বন করতে হবে।'

'আপনি আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন, ওস্তাদ! কিন্তু আপনি নিজেও সতর্ক হোন, এই আমার অনুরোধ। আর ভাগ্নে তুইও!...'

পুবদিগন্তের আকাশে ফিকে রং ধরতে আরম্ভ করেছে। মুল্লা ফজলুদ্দিন কোমরে দড়ির ফাঁস বাঁধতে আরম্ভ করলেন।

'আবার দেখা হবে মামা!'

'সবই আল্লাহ্র ইচ্ছা।... তাহির আমার নকশাগুলো... আর অন্যান্য কাগজপত্র... যেন হারিয়ে যায় না। তুই যুদ্ধে ব্যস্ত তোর পক্ষে সেগুলোকে রক্ষা করা কষ্টকর। তাই সম্ভব হলে সেগুলো সব খানজাদা বেগমকে দিয়ে দিবি।... সবকিছু দিবি।... কেবল নকশাই নয়, বুঝলি?'

'তাই করব!'

'আপনার এই অনুরোধ আমি নিজে পৌঁছে দেব বেগমের কাছে!' খাজা আবদুল্লা বললেন।

পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন তাঁরা, তারপর কেল্লার প্রাচীর বেয়ে নামতে আরম্ভ করলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন— প্রাচীরের ১১ টি ধাপ* নামতে হবে তাঁকে।

৩

প্রত্যূষে মুল্লা ফজলুদ্দিন কুবার দিকে যাবার পথে পা বাড়ালেন।

পরের দিন দুপুরবেলায় আহমদ তনবালের লোকেরা হানা দিল খাজা আবদুল্লার এক মুরীদের বাড়ি, যেখানে স্বয়ং খাজা আবদুল্লা গা ঢাকা দিয়েছিলেন। কুঠুরীতে আটকাপড়া প্রহরীরা কে কীভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে মুল্লা ফজলুদ্দিনকে সবই স্বীকার করেছে তনবালের কাছে।

আহমদ তনবাল মহা খুশি হয়ে ঘোড়া চালাল সেদিকে যেখানে খাজা আবদুল্লা ধরা পড়েছেন। খাকানদরওয়াজার কাছে রাস্তা লোকে লোকারণ্য অস্ত্রসাজে সজ্জিত সৈন্যপরিবৃত হয়ে ধীরে ধীরে চলেছেন খাজা আবদুল্লা। তিনি যেন এক অপরাধী, পা পর্যন্ত ঝুল পোশাক পরা, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, মলিন মুখ। মাথার সাদা পাগড়ি আর সাদা পোশাক দাড়িগজিয়ে ওঠা মুখমণ্ডলের কালো রংকে আরো প্রকট করে তুলেছে।

তনবালকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল লোকেরা। যে নোকরেরা খাজা আবদুল্লাকে নিয়ে যাচ্ছিল তারাও থেমে পড়ল। লাগামে টান দিয়ে ঘোড়া থামাল তনবাল:

'এই যে মিথ্যাবাদী পীর! বাবরের লেজুড়! আমাদের বিরুদ্ধে এত চক্রান্ত করেও আশ মেটেনি , এবার প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছ, ঐ বেজন্মটাকে তার প্রাপ্য শাস্তি থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছ!'

'নিরপরাধকে অন্যায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি মাত্র।'

* এক ধাপ আধুনিক হিসাব অনুযায়ী ৭০ সেন্টিমিটার।

যাও। আর তোমরা,' ক্রুদ্ধ দৃষ্টিবর্ষণ করল বেগ ভিড়ের লোকেদের দিকে, 'এখানেই থাকবে তোমরা! যে আমাদের পিছন পিছন যাবে, তলোয়ারের ঘায়ে মরবে! কোন মায়াদায়া দেখানো হবে না! কোন মায়াদয়া নয়!'

ঘণ্টাখানেক বাদে আহমদ তনবাল তার দলবল নিয়ে দুর্গপ্রাচীরের প্রহরীকক্ষ ছাড়িয়ে দুর্গে ঢুকল। তখন আন্দিজানবাসীরা প্রহরীকক্ষের কাছে গিয়ে দেখল দুর্গের খিলানে ঝুলছে খাজা আবদুল্লার দেহ। পীরের মাথার পাগড়িটা তাঁর পায়ের নিচে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, লম্বা হয়ে ঝুলে আছে দেহটা, ইতোমধ্যেই শক্ত হয়ে গেছে। সাবধানে তারা ফাঁসি কাঠ থেকে নামাল দেহটা, তাঁরই মাথার পাগড়ীটা খুলে তাতে জড়িয়ে নিল মৃতদেহটি তারপর বিনা দোষে মৃত্যুবরণকারী শহীদের সম্মানে তাঁকে দাফন করল।...

৪

বসন্তের অঢেলধারায় বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটের অবস্থা হয়েছে জলাভূমির মত। জল আর ভিজে মাটি ছিটোতে ছিটোতে ছুটে চলেছে তাহির, ঘোড়া টির প্রতি মায়া দেখাচ্ছে না একটুও। তাড়াতাড়ি, আরো তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে সমরখন্দ, আন্দিজানের ঘটনার কথা পৌঁছে দেওয়ার দরকার অবিলম্বে। মির্জা বাবর যদি ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে আন্দিজানবাসীদের বিশ্বস্ততার ওপর আস্থা নিয়ে সমরখন্দ ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েন, যদি তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া না যায়—তো ভীষণ বিপদ! জোরে আরও জোরে ঘোড়া ছুটোতে থাকে তাহির। ঘোড়াটা বেশ মজবুত। কিন্তু তার প্রায় পেট পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে কাদামাটিতে, তাতে ছোটা খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে। পড়ে গেল ঘোড়া, নাক দিয়ে বেরিয়ে এল রক্তমেশানো ফেনা। এ ঘটনা ঘটে কুভার কাছে। ঘোড়ার সাজটা খুলে নিয়ে হেঁটে রওনা দিল তাহির তারপর কুভাতে ঘোড়া জোগাড় করল, কিন্তু একদিন দৌড়বার পর সেটিও আর পারল না। এখন সামনে পড়ে আছে কোকন্দ, খজেন্ত, জিজ্জাখ— এখনও দিনদশেকের পথ।... মাথার উপর দিয়ে পাখীগুলো উড়ে চলছে— তাদের দেখে হিংসা হয় তাহিরের।

ওদিকে, তাহির যদি পাখী হয়ে উড়েও যেত তাহলেও কিন্তু সমরখন্দে বাবরের দেখা পেত না। বাবর তাঁর মা আর গুরুকে সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রুত চলা যাচ্ছিল না ঠিকই, কিন্তু তিনি আশা করছিলেন যে আন্দিজান আরো বেশ কিছু দিন এই অবরোধ সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। আন্দিজানে সারাবছরের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য মজুত করা আছে, আছে খাজা আবদুল্লার মত সাহসী পরিচালকের অধীনে হাজার হাজার লোক। সমরখন্দে এ দুয়ের কোনটি না থাকা সত্ত্বেও সাতমাস ধরে তারা অবরোধ ঠেকিয়ে টিকে আছে।

সমরখন্দ ছেড়ে এসে বাবর বুলুনগুর গ্রাম পেরিয়ে, খালিলিয়া কেল্লা ছাড়িয়ে, সংগজোর নদীর আরো কাছে এগিয়ে চললেন।

সবে ভারী অসুখ থেকে ওঠার কারণে বাবরকে অনেক বলে কয়ে রাজী করান হয়েছে তিনঘোড়ায় টানা গাড়ির ভিতর বসতে। ভিতরে বসার জায়গায় অনেকগুলি নরম গদি পেতে দেওয়া হয়েছে, গাড়ির দু'পাশে আর পিছনে পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি খানাখোঁদলে গাড়ি যেই পড়ছে লাল পর্দাগুলি আগুনের শিখার মত লকলক করে উঠছে। নরম গদি থেকে নেমে এসে বাবর গাড়ির পিছন দিকে পর্দা সরিয়ে সাগ্রহে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন ফেলে আসা পথের দিকে।

তাঁর সৈন্যদলের থেকে প্রায় ক্রোশখানেক দূরে ঠিক তেমনই আর একটি গাড়ি, আরও সুন্দর করে সাজান। দশজন অশ্বারোহী সৈন্যের প্রহরায় সেই গাড়িটিতে চলেছেন বাবরের মাসী মেহ্‌র নিগর-খানুম ও তাঁর ভাবী বধূ আয়ষা। বাবর সমরখন্দ ছেড়ে যাচ্ছেন জানতে পেয়ে বুখারার বাদশাহ্‌ সুলতান আলি শাহ্‌রিসাব্‌জ-এর কাছে নিজের সৈন্যদল মজুত রেখেছে, অপেক্ষায় আছে রাজধানীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। একথা বাবর আগে থাকতে আঁচ করেছিলেন, সেজন্যই নিজের ভাবী বধূকে সমরখন্দে রেখে যেতে চাইলেন না— সুলতান আলির কাছে ভাল কিছু আশা করা যায় না। তাছাড়া মেহ্‌র নিগর-খানুম ও আয়ষা বেগমও সমস্ত রকম বিপদ এড়িয়ে যেতে চাইলেন সময় থাকতে থাকতে: এক বাইসুনকুরকে দেখেই যথেষ্ট হয়েছে। এখন তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হল তাশখন্দ। এখন সেখানে শাসন করছেন মেহ্‌র নিগর-খানুমের বড় ভাই ও বাবরের মামা মাহ্‌মুদ খান। আয়ষা বেগমের বোন রাজিয়া সুলতান বেগমও তাশখন্দে মাহমুদ খানের সঙ্গে। আর একেবারে জিজ্জাখ পর্যন্ত তাশখন্দ আর আন্দিজান যাবার পথ একই। তাই বাবর মাসী ও নিজের ভাবী বধূ আর তাঁদের সব জিনিসপত্র, লোকজনসমেত তাঁদের সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। ভাবী বর-বধূর মধ্যে অন্তত এক ক্রোশ দূরত্ব বজায় রাখার যে প্রথা প্রচলিত তা ভঙ্গ না করার জন্যে তাঁরা চলেছেন দুটি দলে বিভক্ত হয়ে। সন্ধ্যাবেলায় সংগজোর নদী পেরিয়ে এসে সবুজ টিলাগুলির ওপর যখন থামল সৈন্যদল তখনও দুই দলের মধ্যে সেই দূরত্ব বজায় রইল, তাঁবু খাটানও হল ভিন্নভিন্ন জায়গায়।...

টিলার গায়ে ঘন্টাফুল ফুটে আছে। পরিচ্ছন্ন বাতাস, মিষ্টি হাওয়া বইছে। নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাবরের নিজেকে হালকা মুক্ত মনে হল।

সমরখন্দ ছেড়ে আসার সময় মনে যে অশান্তি আর দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল তা একটু একটু করে কেটে যেতে লাগল।

কিন্তু মনখারাপ হবার কারণ তো ছিলই!

অত কষ্ট করে দখল করা হল সমরখন্দ, আর তারপর ছেড়ে এলেন নিজের ইচ্ছায়! সব কার্যকলাপ, সব প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে গেল যেন মনে হয়েছিল, সেই

কারণেই গত কয়েকদিন ধরে সারাক্ষণ মেজাজ খারাপ ছিল বাবরের। কিন্তু এখন এই সবুজ টিলাগুলির ওপর তাজা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে নিতে আনন্দ হচ্ছে তাঁর, এখন তিনি সমরখন্দের কথা বা তাঁর উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনাগুলির কথা ভাবছেন না, ভাবছেন কেবল যে নিজের মা আর গুরুকে রক্ষা করতে যাচ্ছেন। এই হল খানজাদা বেগমের উপদেশ অনুসারে নিজের হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দেওয়া, এতে আছে উদারতা মহত্ব। বাবরের হেফাজতে—তাঁর ভাবীবধূও চলেছে এ বেশ ভাল কাজ — প্রকৃত পুরুষমানুষেরই উপযুক্ত।

ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন বাবর। সংকীর্ণ গিরিপথ 'তৈমুর দরওয়াজা' পার হবার সময় বাবর গাড়ির দরজা খুলে নিজের সহিসকে কাছে ডাকলেন। আদেশ দিলেন:

'বু-পো-লী ঘ্-ঘোড়া ঘোড়া-দাও!'

বাবরকে বেশ সুস্থই মনে হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তোতলাতে লাগলেন—দুরারোগ্য ব্যধির ফল। তাঁর কথা শুনতে পেলেন কাসিমবেগ, গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন তিনি।

'হুজুরে আলি, ঘোড়া দিয়ে কী হবে আপনার?'

বাবর বুঝতে পারলেন যে আবার তোতলাতে থাকবেন তাই মাথা নেড়ে জানালেন তাঁর প্রয়োজন, আর সহিসের দিকে তাকালেন আদেশসূচক দৃষ্টি নিয়ে : 'যা বললাম কর!'

বোঝাতে লাগলেন কাসিমবেগ। ছোট করে ছাঁটা দাড়ি, সাদামাথা, ছোটখাট চেহারার হাকিম বাবরের গাড়ির খোলা দরজার পাশে পাশে চলতে লাগল আর অনুরোধ করতে লাগল ঘোড়ায় না চড়তে অন্তত আরও তিন—চারদিন। তোতলাতে তোতলাতে বাবর বললেন :

'খ্-খানিক্ ক্ষণ ঘ-ঘোড়া-য় চড়ে যেতে চাই!'

সহিস নিয়ে এল চমৎকার সাজপরান একটি ঘোড়া।

'ফিরিয়ে নিয়ে যা!' চীৎকার করে বললেন কাসিমবেগ, কিন্তু বাবর ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দিলেন না। আদেশ দিলেন :

'দ্-দে ঘ-ঘো-ড়া!' তারপর মৃদু হেসে বললেন : 'ভয়্-ভয় প্-পাবেন না, বেগ!'

থেমে পড়ল গাড়ি। গাড়ির ভেতর থেকে নামিয়ে দেওয়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বাবর এগিয়ে গেলেন ঘোড়ার দিকে। অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর ঘোড়ার জিনের নিচটা ধরে এক ঝটকায় উঠে বসলেন জিনের ওপর। মৃদু হাসল সহিস চোখে প্রশংসার দৃষ্টি নিয়ে, বাবরের দিকে এগিয়ে দিল লাগামের প্রান্ত।

কাসিমবেগ বাবরের থেকে ঠিক এক ধাপ পিছনে পিছনে চললেন, যদি কিছু ঘটেই তো সঙ্গে সঙ্গে যাতে সাহায্য করতে পারেন।

কিন্তু বেশ ভাল ভালয় তাঁরা জিজ্জাখ পৌঁছলেন।

অতি ছেলেবেলা থেকেই বাবর ঘোড়ায় চড়তে অভ্যস্ত। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ঘোড়ায়

চড়তে। গাড়ির ভিতরের নরম গদী বালিশ তাঁকে রোগশয্যার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ঘোড়ার এই চনমনে, তাজা, খুশিভরা দৌড় বাবরের শরীরে জাগিয়ে তুলল নতুন শক্তি যা রোগে পড়ার সময় থেকে মরে গিয়েছিল তাঁর ভেতরে। যত দূর যাচ্ছেন বাবর ঘোড়ায় চড়ে, তত বেশি সুস্থবোধ করছেন তিনি।

জিজ্জাখ পেরিয়ে এসে আবার তাঁরা রাত কাটাবার জন্য জন্য থামলেন সবুজ টিলার ওপর। বাবরের আর ভাবী বধূর তাঁবু খাটান হল পরস্পরের থেকে বেশ কিছু দূরে। কিন্তু আজ যে বাবর ঘোড়ায় চড়েছেন, সুস্থবোধ করছেন তিনি, এ খবর পৌঁছেছে তাঁর মাসী ও ভাবী বধূর কাছেও।

মেহর নিগর-খানুম বরের মাসী হন সম্পর্কে, তাই কনে-বধূর মাতৃতুল্যা। প্রথা অনুযায়ী সওগাত আদান-প্রদানের পক্ষে উপযুক্ত পরিস্থিতি। সন্ধ্যাবেলার নামাজের পরে উজীর নিয়ে এলেন নিগর-খানুমের কাছ থেকে বাবরের জন্য উপহার : সোনালী রংয়ের চোগা, জরির কাজকরা কোমরবন্ধ, দামী, রূপার হাতলওয়ালা ঘোড়ার চাবুক। চোগা হল বাবরের সুস্থ হয়ে ওটার জন্য আনন্দের চিহ্নস্বরূপ। কোমরবন্ধ বলছে যে ভাবী বর আরো শক্তিমান, ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। আর চাবুক... চাবুকটা পাঠিয়েছেন সে কি আজ তিনি সারাদিন ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন বলে? নাকি এর অন্য কোনও অর্থ আছে : যে মির্জা বাবর দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আন্দিজানে গিয়ে শত্রুবিনাশ করুক?

উপহার পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন বাবর। কালই তাঁদের বিচ্ছেদ হবে : কাল তাঁরা সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছবেন যেখান থেকে তাশখন্দের দিকে পথ ঘুরে গেছে উত্তরে। এর প্রতিদানে মাসীকেও কিছু উপহার দিতে হয়। কিন্তু কী উপহার? অভিযানে বেরিয়ে মহিলার উপযুক্ত উপহার কোথায় খুঁজে পাবেন তিনি? এই জনহীন স্তেপে... কাসিমবেগ বরাবরের মতোই এবারও পরামর্শ দিলেন চাঁদির থালাভর্তি আশ্রফী পাঠাতে। এর উপর বাবর আরো যোগ দিলেন : আশরফী ভরা চাঁদির থালাগুলি খালি হয়ে পড়া গাড়িটায় করে পৌঁছে দিতে বললেন।

'গাড়িটাও কি উপহার হবে? যদি কাল আপনার গাড়ি প্রয়োজন হয়?'

'খোদার দোয়ায় প্রয়োজন হবে না আশা করি। মেয়েরাই গাড়ি চড়ে যাক।'

আর কোনো কথা বললেন না কাসিমবেগ, বুঝলেন এ হল আদেশ।

পরের দিন সকালে দুটি সুন্দর সাজান গাড়ি, মালবোঝাই গাড়ি আর উটের সার উত্তরদিকের পথ ধরল—মির্জাচুল হয়ে তাশখন্দ পৌঁছবার জন্য। বাবরের আদেশ অনুযায়ী তাঁর সৈন্যদল থেকে আরো একশ সৈন্য চলল সেই দলের সঙ্গে।

শীঘ্রই সেই গাড়ি আর সৈন্যের দল চোখের আড়ালে চলে গেল। বাবরের সৈন্যদল যেমন চলছিল চলতে লাগল, এদিকে বাবর একটা টিলার ওপর একাকী দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন দূর অন্তহীন স্তেপের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া গাড়িগুলির

দিকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন তাঁর ভাবী বধূকে বিদায় জানাচ্ছিলেন, জানাচ্ছিলেন শুভযাত্রার কামনা।

একশ দিন কাটালেন বাবর সমরখন্দে, কিন্তু আয়ষা বেগমের সঙ্গে মুখোমুখি একবারও দেখা হয়নি তাঁর। বাধা ছিল প্রচলিত প্রথার, বাধা ছিল তাঁর তরুণবয়সের সলজ্জতা। টিলায় দাঁড়িয়ে তাঁর মনে পড়ল সেই গজলটি যেটি তিনি বুস্তান-সরাই মহলে রচনা করতে আরম্ভ করেন :

চন্দ্রবদনা, তোমার রূপের কত কথা বলে সবে,
মুখোমুখি তাহা হেরিয়া নয়ন সার্থক হবে কবে।

পরে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে সারাদিন তিনি চেষ্টা করতে থাকলেন গজলটি শেষ করার :

রূপসী তোমার জানু 'পরে মাথা যদি না রাখতে পারি,
তোমারে হারিয়ে তক্ষুণি আমি দূর দেশে দেব পাড়ি।

এর পরের বার যেখানে তাঁরা রাত কাটাবার জন্য থামলেন, সেই কুশতিগেরমনে, বাবর তাঁর মনে ঘোরাফেরা করতে থাকা এই পংক্তিক'টি কাগজে লিখে ফেললেন। এই অংশটি দিয়ে তিনি গজলটি শেষ করবেন ভাবলেন আর গজলের মাঝের অংশ আরও তিন-চারটি বয়াৎ পরে ধীরে সুস্থে লিখবেন ভাবলেন।...

আন্দিজানের ভয়ঙ্কর ঘটনাবলীর খবর বাবরের আরো কাছে এগিয়ে আসতে লাগল ক্রমশ— সে খবর নিয়ে চলেছে তাহির।

যখন বাবরের সৈন্যদল নাব্ নদী পেরিয়ে গেল তখন তাহির কোকন্দ পেরিয়ে খোদারবেশ মরুভূমিতে এসে পড়েছে। বাবর ছ'বার থেমেছেন ছ'রাত কাটাবার জন্য, সপ্তম দিনে, খজেন্তের অল্পদূরে সৈন্যদলের দিকে ছুটে এল কালো ঘোড়ায় চড়ে, নোংরায় মাখামাখি, ক্লান্তিতে আধখানা হয়ে যাওয়া তাহির।

'কেন আপনি সমরখন্দ ছেড়ে এলেন, হুজুরে আলী?!' চীৎকার করে কাঁদতে লাগল দূত।

আন্দিজানের পতনের খবর, যাদের ওপর শহর প্রতিরক্ষার ভার ছিল তাদের বিশ্বাসঘাতকতার খবর বাবরকে প্রচণ্ড আঘাত দিল। যেন সারা পৃথিবী যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল, দুলে উঠল আকাশ ও মাটি যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, বাঁদিকে সির-দরিয়া নদীটা মনে হল যেন ফেঁপে উঠে পড়ে ছাপিয়ে সেই এলাকা বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নদীর ওপারে খজেন্ত পর্বতপালা দেখা যাচ্ছে। হায়, এখান থেকে আন্দিজান কত দূর! দূর সমরখন্দও! বিমাতা ভাগ্যদেবী হাতছানি দিয়ে বাবরকে এখানে এনে এক আঘাতে তাঁর দখল থেকে ছিনিয়ে নিল সমরখন্দ আন্দিজান দুই-ই! তাঁর ত্রিশঙ্কুর অবস্থা দেখে হাসাহাসি করছে আন্দিজানে বিশ্বাসঘাতক তনবাল, সমরখন্দে সফল সুলতান আলি, তুর্কীস্তানে যে শক্তিসঞ্চয় করে উঠেছে সেই শয়বানী খান। তারা হাসছে এই ভেবে যে তিনি অল্পেতেই বিশ্বাস করেন সবার ওপর! তাদের এই হাসি চারপাশের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে!

তাহির বলল আলী দোস্তবেগের বিশ্বাসঘাতকতার কথা, বাবরের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে খাজা আবদুল্লাকে খাকানদরওয়াজায় ঝুলিয়ে দেওয়ার কথা। আর থাকতে পারলেন না বাবর, ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়ে ছুট লাগালেন। নিজেই জানেন না কোথায়। সকাল থেকে জল খেতে পায়নি ঘোড়াটা। ঘোড়া তাঁকে নিয়ে গেল নদীর খাড়া পাড়ের কাছে। হঠাৎ মনে পড়ল বাবরের নদীর পাড় ভেঙে বাবার মৃত্যু হয়েছিল। নদীর যে পাড়টায় তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সেটাও যেন এখন হঠাৎ ধসে পড়ছে, ভেঙে নদীর স্রোতের দিকে নামছে। আতঙ্কিত বাবর নদীর স্রোতের দিক থেকে মুখ ফেরালেন, কিন্তু তখন পাহাড়গুলি যেন চোখের সামনে নড়েচড়ে উঠল, সেগুলিও যেন তারপর মাটির গভীরে কোথায় পড়ে যেতে লাগল।

ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন বাবর, আরো জোরে কাঁদতে থাকলেন—কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল কাঁধদুটো।

একা থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর কাসিমবেগ বুড়ো হাকিমকে নিয়ে এগিয়ে এলেন তাঁর দিকে। কান্না চেপে রেখে শোকার্ত গলায় কাসিমবেগ বললেন :

'হুজুরে আলী, আমাদের সবারই দুর্দিন উপস্থিত।... আমার সব সম্পত্তি লুঠ করে নিয়েছে। ছেলে গুরুতর আহত...'

মাথা তুললেন বাবর। মুখমণ্ডল ভিজে। হাকিম তরুণের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

'এত শোক করার দরকার নেই মির্জা, আল্লাহ্র দোয়ায় ওয়ালিদা সাহেবা ও ভগিনী সুস্থ আছেন—দূত তাই বলেছে।... আপনি জীবিত থাকলে সবকিছুই ফিরে পাবেন আপনি। নিজের শরীরের কথা ভাবুন! আবার অসুখে না পড়লে হয়।'

বাবর যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না, তিনি যেন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন তাঁর প্রিয় গুরুর দেহটা—ফাঁসি কাঠে ঝুলছে। আবার চোখ বেয়ে জল নেমে এল।

'পীর, কার হাতে আপনি ছেড়ে গেলেন আমায়?... অমন লোককে মেরে ফেলল! এর বদলা নিতেই হবে আমায়! নিতেই হবে!'

এতক্ষণে কেবল লক্ষ্য করলেন হাকিম যে কী পরিষ্কার কথা বলছেন বাবর তোতলামি আর একটুও নেই।

‘শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত লড়াই করব, শপথ করছি!’

বাবরের মুখচোখ কখনও মলিন কখনও রক্তাভ হয়ে উঠছে কিন্তু কথাগুলি উচ্চারণ করছেন তিনি পরিষ্কারভাবে।

‘বদলা নেবার দিন আসবে! লড়াই করব আমি! সবাইকে একত্র কর, সবাইকে খবর দাও! আমি যাচ্ছি... আন্দিজানের দিকে!’

ঘোড়া ঘুরিয়ে বাবর এগিয়ে গেলেন নিজের সৈন্যদলের দিকে।

৫

বাবর মার্গিলান আর ওশ দখল করলেন, আন্দিজানের কাছে আহমদ তনবালের সৈন্যদল ছত্রখান হয়ে গেল, বাকিরা গিয়ে কেল্লার মধ্যে আশ্রয় নিল।

এই জয়ের আনন্দে মশগুল হয়ে বাবরের বেগরা অত্যন্ত অসাবধান হয়ে পড়ল। একদিন বাবরের বাহিনীর এক অংশ খাকান খালের কাছে তাঁবু খাটাল রাত কাটাবার জন্য, কিন্তু রাতের পাহারার কোনো বন্দোবস্ত করা হল না। ভোরবেলায় তাঁদের ছাউনির ওপর শত্রু হানা দিল। আধঘুমন্ত লোকেরা আতঙ্কে যে যেদিকে পারল ছুট দিল, প্রহরার কাজের তত্ত্বাধানের ভার যার ওপর সেই বেগও ছিল তাদের মধ্যে। বাবরকে প্রহরাহীন অবস্থায় ফেলে পালাল সবাই। তাঁর কাছে মাত্র জনাদশেক অনুচর ছিল। একটু দূরে তনবালের সৈন্যদলের অগ্রবর্তী অংশের তীরন্দাজরা যারা পালাচ্ছে তাদের দিকে তীর ছুঁড়ছে দেখে বাবর লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠলেন। বাবরের মনে হল যেন তাঁর সামনে শত্রুসংখ্যা বেশি কিছু নয়। ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের দশজন সৈন্যকে নিয়ে বাবর এগিয়ে গেলেন তীরন্দাজদের দিকে। তীরন্দাজরা পিছন ফিরে দৌড় দিল। তাদের পিছনে ধাওয়া করতে করতে এমন মত্ত হয়ে গেলেন বাবর যে বেশ দেরিতে লক্ষ্য করলেন ঝোপের আড়াল থেকে শত্রুপক্ষের একদল অশ্বারোহী সৈন্য বেরিয়ে এল তাঁর দিকে। তাদের সামনে সকালের সূর্যের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আহমদ তনবালকে বর্মপরা, হাতে ঢাল। ঘোড়ার লাগামে টান দিয়ে গতিরোধ করলেন বাবর। কে আছে তাঁর কাছে? তিনজন, তাদের মধ্যে একজন হল তাহির। বাকিরা পিছন ফিরে দৌড় দিয়েছে এই পাতা ফাঁদ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য। বাবর যদি একটু তাড়াতাড়ি করতেন তিনিও পালাতে পারতেন হয়ত।

কিন্তু পালাতে পারেন না তিনি, যে তাঁর এত ক্ষতি করেছে সেই ধূর্ত বিশ্বাসঘাতক আহমদ তনবালের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাঁকে! ঘোড়ার লাগাম ঢিলা করে দিয়ে বাবর দ্রুত নিপুণহাতে ধনুকে তীর পরালেন। আহমদ তনবাল এগিয়ে আসতে আসতেই খাপ থেকে খুলে নিল তরবারি; বাবর তীর ছুঁড়লেন তনবালের উত্তেজনায় লাল মুখের দিকে, দুই ভুরুর মাঝখান লক্ষ্য করে। শিরস্ত্রাণের কানাতের ওপর ধাক্কা

খেয়ে পড়ে গেল তীর। লক্ষ্য নিঁখুত ছিল কিন্তু ধাতব শিরস্ত্রাণ ছিল ধারাল তীরের থেকেও মজবুত। বর্ম-শিরস্ত্রাণ পরা যোদ্ধার দেহের উন্মুক্ত অংশ কেবল মুখমণ্ডল ও ঘাড়ের সামান্য একটু। দ্বিতীয় তীরটি ছুঁড়লেন বাবর তনবালের ঘাড় লক্ষ্য করে কিন্তু তনবাল ঢাল দিয়ে আড়াল করল—তীরটা ঢালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল।

তনবালের অশ্বারোহী সৈন্যরা ছুটতে ছুটতেই তীর ছুঁড়তে লাগল বাবরের দিকে। একটা তীর বিঁধল হাঁটুর একটু নিচে উঁচু জুতোয়। তনবাল একেবারে কাছে এসে গেছে, তার ডানহাতে ধরা তরবারি ঝকঝক করছে—সেই তরবারিটা, ভাবলেন বাবর, ওশে সোনার হাতলওয়ালা বাগদাদের তরবারিটি তিনিই উপহার দিয়েছিলেন তনবালকে। সেই সঙ্গে তিনি অনুভব করলেন পা বেয়ে কী প্রচণ্ড ব্যথা নামছে। তাহলে তনবাল তাঁকে মারতে চাচ্ছে সেই তরবারিটা দিয়েই যা সে সেদিন চুম্বন করেছিল বাবরের প্রতি বিশ্বস্ততার চিহ্ন হিসাবে? ধনুকটা এখন একেবারেই অকেজো, তবু বাবরের হাত তখনও চেপে ধরে রয়েছে সেটাকে; কেমন এক অদ্ভুত উদাসীনতার জন্য তরবারি হাতে তুলে নিতে যেন খেয়ালই হল না তাঁর—ব্যথায় কাতর হওয়ার দরুন, নাকি সুযোগই পেলেন না বলে? বাগদাদী তরবারি নেমে এল তাঁর শিরস্ত্রাণের ওপর। চোখে সর্ষেফুল দেখলেন বাবর, মাথার মধ্যে কেমন আওয়াজ হতে লাগল। যদিও শিরস্ত্রাণ থাকায় তিনি রক্ষা পেয়ে গেছেন তবু তাঁর ঘাড়ের নিচ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। 'জুতোটাও রক্তে ভরে গেছে বোধহয়', পড়ে যাবার উদ্যোগ করতে করতে ভাবলেন বাবর—যেন নিজের সম্বন্ধে না, আর কারুর কথা ভাবছেন তিনি। তনবাল জয়োল্লাস করে উঠে আবার তরবারি তুলে ধরল। কিন্তু পিছন থেকে তাহির এগিয়ে এল তাঁর কাছে, মুহূর্তে জোরে টান দিল তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে, তারপর বাবরের পিঠে ধাক্কা দিল। বাবরের ঘোড়া দৌড় লাগাল, তনবালের তরবারি প্রচণ্ড জোরে বাবরের তূণীরের উপর পড়ল, তীরগুলো ভেঙে গেল আর তার বাঁধনও।

'মির্জা! লাগাম ধরুন! সোজা হয়ে বসুন!' বাবরের ঘোড়ার ওপর চাবুক কষাতে কষাতে চীৎকার করে বলল তাহির।

এই অভিজাত সুন্দর ঘোড়াটার প্রতি ক্বচিৎ কখনও এমন ব্যবহার করা হত। উড়ে চলল ঘোড়াটি তার মালিককে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

ওশে ফিরে এলেন বাবর সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। মাথার ভিতরের ভোঁ ভোঁ আওয়াজটা খুব শীঘ্র গেল না।

কিন্তু আঘাতের যন্ত্রণা থেকে বেশি কষ্ট দিচ্ছিল তাঁর ভাগ্যের এমনি অন্যায় আচরণে। আহমদ তনবালকে তাঁর উপহার দেওয়া তরবারি আঘাত করল তাঁরই মাথায়, কী নিষ্ঠুর পরিহাস! আবার বলা হয় যে দুনিয়ায় সব কিছু আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে, সৎলোক ন্যায়বিচার পায় আর অসৎলোকের জন্য থাকে প্রতিশোধ।

তাহলে নিয়তি কেন শাস্তি দিচ্ছে না তনবালকে যার কারণে কেবল বাবরই নয় আরো অনেকে দুঃখ ভোগ করেছে? যখন ঐ বদমাশটার মুখোমুখি হলেন বাবর তখন কেন ওরই হাতে বেশি শক্তি আর সাফল্য এল?

কুতলুগ নিগর-খানুম ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন :

'আল্লাহ্‌র দোয়ায়, আমার ছেলের প্রাণ রক্ষা হয়েছে!... তোমার তো মাত্র ষোলবছর বয়স, মির্জা। যখন তোমার বয়স হবে আহমদ তনবালের মত তখন তোমারও অনেক যুদ্ধজয়ের অভিজ্ঞতা হবে। এখন এই সব ভেতরের কোন্দলের ফলে আমাদের দেশের অবস্থা নিঃস্ব। তাই তোমার আর মির্জা জাহাঙ্গীরের মধ্যে মিলন ঘটাবার যে চেষ্টা করছেন তোমার মামা মাহ্‌মুদ খান তা ঠিকই করছেন। আখসি যাক জাহাঙ্গীরের হাতে আর আন্দিজান তোমার থাক।'

'এই ছোট্ট ফরগানা রাজ্যকেও কি দু'ভাগ করতে হবে? কোথায় গোটা মাভেরান্‌নহরকে একত্রিত করা, তার বদলে কিনা ওয়ালিদা সাহেবা...'

'এখন আর অন্য কোন পথ নেই, বাবরজান!... আর তাছাড়া শুধুমাত্র রাজ্যের ভাবনা ভাবলেই তো চলবে না। তাশখন্দে তোমার ভাবী বধূ একা রয়েছেন... বোনের কাছ থেকে চিঠি পেলাম, লিখছে : অবিলম্বে এসে বধূকে নিয়ে যাও।'

বাবর এর উত্তরে ভাবলেন বলবেন : তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, 'চন্দ্রমুখী' সবেমাত্র তার পঞ্চদশ বসন্তে পা দিয়েছে, তাঁর নিজেরও বয়স কম। কিন্তু বলতে পারলেন না সেকথা। তিনি নিজেই বধূর সঙ্গে মিলিত হতে চাচ্ছেন, যাকে তিনি এতদিন স্বপ্নে দেখেছেন...

৬

জৌজামাসের* এক উষ্ণ সন্ধ্যায় আন্দিজান প্রাসাদের হারেমে জমকালো সন্ধ্যাভোজের আয়োজন করল দাসীরা। বাদশাহ্ অবশেষে দেখা করতে আসছেন তাঁর যুবতী স্ত্রী আয়ষা বেগমের সঙ্গে, যিনি সারা সপ্তাহ ধরে এই দিনটার অপেক্ষায় আছেন। সোনারূপার বাসনপত্র সাজান, চারিদিকে রেশমি গালিচা ঝোলান। আয়ষা বেগমের প্রথম বিশ্রামকক্ষটিতে ফুলতোলা গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আয়ষা বেগমের রং করা ভ্রূ শুকিয়ে উঠবার আগেই কে যেন উৎকণ্ঠিতস্বরে ফিসফিস করে বলল :

'এসে গেছেন! এসে গেছেন! বাদশাহ...'

সোনার জরির পোশাক পরে উপস্থিত হলেন বাবর। গত দু'বছর ধরে অনবরত

---

* হিজরী সংবতের একটি মাস, মোটামুটি ২২ মে' থেকে শুরু।

পরীক্ষার ফলে অনেক পরিবর্তন হয়েছে বাবরের। শক্তপোক্ত আঠারবছর বয়সী যুবকের উপযুক্ত চওড়া কাঁধ তাঁর।

মাথা নিচু করে বাবরকে অভ্যর্থনা জানালেন আয়ষা বেগম। বাবরের তুলনায় তাঁকে দেখাচ্ছে অত্যন্ত ছোটখাট, ক্ষীণদেহী। মাথায় উঁচু টুপি, কানের মুক্তার দুলগুলি তাঁর ক্ষীণগ্রীবার কাছে মনে হচ্ছে যেন ভীষণ বড় মাপে।

দাসীরা দরজার কাছে নিচু হয়ে কুর্নিশ জানাল বাবরকে। বাবর লক্ষ্য করলেন তাদের কয়েকজনের চোখ যেন দুষ্টুমিতে ঝলকে উঠল, অস্বস্তি বোধ করলেন তিনি। কিন্তু এই হয়ে আসছে এতকাল ধরে যখন বাদশাহ আসেন হারেমে স্ত্রীর কাছে রাত কাটাতে, দাসী-পরিচারিকাদের আগে থাকতেই খবর দেওয়া হয় এসম্বন্ধে, যাতে তারা সবকিছু আগে থাকতেই প্রস্তুত করে রাখে কিন্তু বাবরের মনে হল এমন সময়ে এত লোকের এখানে থাকার কোনো অর্থ হয় না।

আয়ষা বেগম দেখা গেল আরো বেশি লাজুক।

'বসুন, হুজুরে আলী!' অস্ফুট, কম্পিতকণ্ঠে তিনি বাবরকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট সম্মানের আসনে বসতে আহ্বান জানালেন।

দ্বিতীয়কক্ষের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম পর্দার আড়ালে যুগ্মশয্যাবিশিষ্ট পালঙ্ক দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকাবার ইচ্ছা সংবরণ করতে পারলেন না বাবর, সেকথা ভেবে লজ্জা হল তাঁর। দস্তরখানের কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি গদীর ওপর এমনভাবে বসলেন যাতে শয্যা দেখা না যায়। কিন্তু দেখা যেতে লাগল। দস্তরখানের ওপর চোখ আটকে রেখে আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলেন :

'আপনার শরীর সুস্থ তো, বেগম?'

'আল্লাহ্‌র রহমতে ভালই আছি।'

আয়ষা বেগম লাজুকভাবে বসলেন বাবরের থেকে বেশ দূরে দস্তরখানের এক প্রান্তে।

এক অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

যুবতী স্ত্রীর সবকিছুই যুবতী স্ত্রীর মত, কেবল মনটা রয়ে গেছে বালিকা বয়সেরই। আর চেহারা... ঘনঘন রোগভোগ আর অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করার ফলে রুগ্ন, দুর্বল। রূপকথার চন্দ্রমুখী পরী, যে বাবরের স্বপ্নে দেখা দিত সে কল্পনাতেই রয়ে গেল। বাস্তব প্রতারিত করেছে তরুণকে। আসলে তো তিনি তাঁর তরুণী স্ত্রীকে জানতেনই না— বিবাহের পরই প্রথম তাঁরা দু'জন পরস্পরকে দেখলেন (এমনই প্রথা!)। দুটি হৃদয়ের সংযোগ ছাড়া কেবলমাত্র শারীরিক ঘনিষ্ঠতা পীড়াদায়ক—অন্তত বাবরের তাই মনে হয়। তাঁর হৃদয়কে আলোকিত করে তুলতে পারেননি আয়ষা বেগম, পুরুষোচিত প্রবল আবেগ জাগিয়ে তুলতে পারেননি। তাই 'রাজকার্যে ব্যস্ত' থাকায় প্রায়ই তিনি নিজের বিশ্রামকক্ষে রাত কাটাতেন। আর এখন দরবারে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কয়েকটি

বিশেষ দিনে মাত্র শাহ্ বেগমের সঙ্গে রাত্রিযাপনের সুযোগ পেতেন। বাবরের পিতা মির্জা উমরশেখও সেই প্রথা মেনে চলেছেন। আয়শা অনুভব করেন যে তাঁদের মধ্যের সম্পর্ক অস্বস্তিকর ও পীড়াদায়ক। একথা জেনে তিনি কষ্ট পেতেন যে তিনি বাবরের মনোমত স্ত্রী নন, এমন স্ত্রী নন যাকে বাবর গভীরভাবে ভালবাসতে পারেন।

লালটকটকে পাত্র থেকে সোনার পেয়ালায় চা ঢেলে বাবরের দিকে এগিয়ে ধরলেন আয়শা বেগম। 'একেবারে বাচ্চা মেয়ের হাত, আর কাঁপছে—আমার ভয়ে নাকি?' ভাবলেন বাবর।

'ধন্যবাদ', অপরাধীভাবে বললেন মাত্র। যে মেয়ের ছবি তিনি স্বপ্নে লালন করেছেন, যার কোলে মাথা রাখতে চেয়েছেন, সেই মেয়ে তাঁর সামনে বসে আছে লাজুক বিষণ্ণভাবে, যেন তিনি সম্পূর্ণ অচেনা কেউ। এ সেই মেয়ে নয়, কিন্তু তবুও...

মেয়ে খানসামা সোনার থালায় সাজিয়ে নিয়ে এল কাবাব, জিরার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। তার বয়স বছর পঞ্চাশ হবে কিন্তু চটুল ভঙ্গিতে মাথার রুমালটা বেঁধেছে বাঁকা করে। তাঁদের দুজনের লাজুক বিষণ্ণ মুখ দেখে ঠাট্টা করে বলল :

'হুজুরে আলী, যুবতী স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই কি যুবক স্বামীর উচিত নয়? কত আগ্রহের বিষয় আপনার জানা আছে... শুনছি সমরখন্দ থেকে নাকি দূত এসে পৌঁছেছে। কী সুখবর তারা নিয়ে এসেছে?'

খানসামা ঢাকাটা খুলে ধরতেই হরিণের নরম মাংসের তৈরি শিককাবাবের আর জিরার মিশানো খুশবু ছড়িয়ে পড়ল।

'আর বেগম সাহেবা আপনিও হাসিখুশি হোন। এমন সুখেভরা যৌবন জীবনে একবারই কেবল আসে। এ যৌবনকে ভোগ করুন, বেগমজান, তারপর যখন আমার মতো বয়স হবে তখন এ দিনগুলোর কথা মনে করে সুখী হবেন!'

বলে হেসে কোমর দুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন আয়শা।

'চেখে দেখুন তো, বেগম!' বলে বাবর কাবাবের দিকে হাত বাড়ালেন কিন্তু মাংসতে হাত না ছুঁইয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন আগে বেগমের নেওয়ার জন্য।

'না, না সে কী... আপনি আগে নিন...' ফিসফিসিয়ে বললেন বেগম।

'ঠিক আছে, এই আমি নিলাম। এবার আপনি নিন...' কাবাবও তাঁদের মনে স্ফূর্তি আনতে পারল না, আবার চা পান আরম্ভ হল।

'নিজের শহরের জন্য আপনার মন কেমন করে নাকি বেগম?'

এবার একটু সাহস করে আয়শা বেগম বাবরের মুখের দিকে তাকালেন :

'সমরখন্দের জন্য?... হ্যাঁ করে।'

'যদি আল্লাহ্‌র দোয়া হয় তো গ্রীষ্মকালে যেতে পারবেন সমরখন্দ।'

'যেতে পারলে ভাল হত... কিন্তু কেমন করে... আমি একা যাব নাকি?'

'আল্লাহ্‌র সাহায্য পেলে সমরখন্দ দখল করে নেব, তখন আমরা সবাই সমরখন্দ চলে যাব।'

'চলে যাব? আর আন্দিজান কার হাতে থাকবে?'

'আপাততঃ মির্জা জাহাঙ্গীরের হাতে', বলেই আবার অন্ধকার হয়ে গেল তাঁর মুখ।

কিছুই বুঝলেন না আয়ষা বেগম, বিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচকে উঠল কেবল। আন্দিজান দখল করতে বাবরকে কম কষ্ট সইতে হয়েছে নাকি? আবার নিজে থেকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছেন এ শহর।

'সমরখন্দের জন্য মন কেমন করে ঠিকই!' আয়ষা বেগম বললেন, 'কিন্তু আমি চাই শান্তিপূর্ণ জীবন, এখানে আপনার পিতৃগৃহ!'

যখন তিনি এমন আন্তরিকভাবে কথা বলতে থাকলেন তখন তাঁর মুখচোখ বাবরের কাছে মনে হল বেশ আকর্ষণীয়।

'আর আপনার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, জাঁহাপনা,' ক্রমশ উদ্দীপ্ত হয়ে বলে চললেন আয়ষা বেগম, 'অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন আপনি, আর সমরখন্দ বিনাযুদ্ধে দরওয়াজা খুলে দেবে না। নিজের দিকে তাকান একবার। আমার অনুরোধ, অভিযানে যাবেন না।'

'আমাদের এখনকার পরিস্থিতি আমার ও আপনার পক্ষে যথেষ্ট সম্মানের বলে মনে করেন আপনি?'

'এমন কথা বলছেন কেন? আপনি আপনার নিজের দেশে আর এখানে আপনিই শাসক।'

ব্যঙ্গের হাসি খেলে গেল বাবরের মুখে।

'শাসক কেবল নামেই', বলে তিনি চারভাঁজ করা একটুকরো কাগজ বার করে আনলেন পোশাকের ভিতর থেকে, এগিয়ে ধরলেন আয়ষা বেগমের দিকে।

গত কয়েকমাস ধরে বাবর তাঁর মনের ব্যথাবেদনার কথা কাগজেকলমে লিখে ফেলার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন, তাই প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায়ই কবিতা লিখলেন তিনি। এই কাগজটিতে তিনি লিখেছেন চারছত্রের এক কবিতা।

কাগজটির ভাঁজ খুলে ছত্রগুলির উপর চোখ বুলালেন আয়ষা বেগম।

বিশ্বাস নেই যারা হতে চায় শুধু গদিয়ান।
নেইকো ইমান, দুনিয়াটা আজ বড়ো নিষ্প্রাণ।
ছিন্নবস্ত্র বেগ হও বরং হে বাবর!
বড়োই খারাপ একটা মুকুটে দুই সুলতান!

'এমন কবিতা রচনার জন্য অভিনন্দন জানাই জাঁহাপনা!'

'ধন্যবাদ... কিন্তু আপনি কি এর প্রকৃত অর্থ বুঝলেন?'

'বুঝেছি... মির্জা জাহাঙ্গীর যে আখ্‌সিতে আর একটি রাজ্য সৃষ্টি করেছেন তা আপনাকে পীড়া দিচ্ছে, তাই তো? আগের এক রাষ্ট্র— দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল।'

'এতে জাহাঙ্গীরের কোনো দোষ নেই, বেগম। জাহাঙ্গীর এখনও শিশু। আহমদ তনবাল, আলি দোস্ত্‌বেগের মত শক্তিশালী বেগরা আমার বিরুদ্ধে।'

আলি দোস্ত্‌বেগের সঙ্গে তাঁর জটিল সম্পর্কের কথা বলতে লাগলেন বাবর। বেগম জানেন গত বছর বাবর সবকিছু হারিয়েছেন। তখন তিনি বাস করছিলেন দক্ষিণে তুর্কীস্তান পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে ওরা-তেপাতে। হঠাৎ একদিন আলি দোস্ত্‌বেগের কাছ থেকে দূত এসে উপস্থিত তাঁর কাছে (সেই সময় আলি দোস্ত্‌বেগ মার্গিলানের শাসক ছিল, আহমদ তনবালের সঙ্গে বিবাদ চলছিল তার)। 'আমি যে ঐ কুত্তা আহমদ তনবালকে আন্দিজানের দরওয়াজা খুলে দিয়েছিলাম আমার যে আমার সে অপরাধ যদি ক্ষমা করেন মির্জা বাবর, তো তিনি মার্গিলান আসুন, আমি তাঁকে দরওয়াজা খুলে দেব,' দূত আলি দোস্ত্‌বেগের এই কথা জানাল বাবরকে। দু'দিন বাদে বাবর মার্গিলান পৌঁছলেন রাতের বেলায়। আলি দোস্ত্‌বেগ কথা রেখেছিল। অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন বাবর। শীঘ্রই দোস্ত্‌বেগেরই সহায়তায় আন্দিজানও দখল করলেন।

উদারতার প্রতিবাদে উদারতা! না, বাবর আরো বেশি উদারতা দেখাবার সিদ্ধান্ত নিলেন : কাসিমবেগের জায়গায় বসালেন আলি দোস্ত্‌বেগকে! একজনকে উপরে উঠিয়ে দিলেন, অপরজনকে বিনাকারণে নিচে নামিয়ে দিলেন।

তাতে হলটা কী? আলি দোস্ত্‌বেগ অধিকাংশ বেগের ওপর প্রভাব বিস্তার করল। কেবল নামে মাত্র ক্ষমতা রইল বাবরের হাতে। ওদিকে কাসিমবেগ তো এতদিন বাবরের সঙ্গছাড়া হননি। একদিন কাসিমবেগ প্রমাণ করে দিলেন যে আলি দোস্ত্‌বেগ আহমদ তনবালের সঙ্গে নতুন করে ষড়যন্ত্র করেছেন। দোস্ত্‌বেগের সমর্থনকারীরা বলল যে কাসিমবেগ মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন, এমন হুমকি দিল তারা যে যদি দোস্ত্‌বেগের কোন ক্ষতি হয় তো বাবরও অক্ষত থাকবেন না।... কাছেই কোথাও আহমদ তনবাল তরবারিতে শান দিচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্যে, আন্দিজানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে। এমন একটা সুযোগ পেলেই বাইরে-ভিতরে সব শত্রু একজোট হবে, তখন কি হবে? দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হচ্ছে বাবরকে আলি দোস্ত্‌বেগের ষড়যন্ত্র। শক্তি নেই তাঁর এই শত্রুদের দমন করার।

'আলি দোস্ত্‌বেগ আর আহমদ তনবাল যেন আমাকে মাকড়সার জালে জড়াচ্ছে,' আয়ষা বেগমকে বললেন বাবর, 'সেই জাল ছিঁড়ে ফেলে পালিয়ে যেতে চাই এখান থেকে, নাহলে... ঐ মাকড়সাগুলোর ভোজে লাগব আমরা।'

'সমরখন্দেও তো আপনার অগুন্তি শত্রু জাঁহাপনা। যদি আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়...'

'সমরখন্দে বন্ধুও কম নেই।'

'সমরখন্দের দূত কি আপনাকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে?'

সমরখন্দের দূতের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল তা গোপন থাকাই উচিত।

সমরখন্দের বেগদের এবং সুলতান আলির মধ্যে বিরোধ ক্রমশই বেড়ে উঠছে। মজিদ তরহানের নেতৃত্বে বেগরা যার যার সৈন্যদল নিয়ে শহর ছেড়ে চলে গেছে। একহাজার সৈন্য অধৈর্য হয়ে বাবরের অপেক্ষা করে আছে উর্গুতে। সমস্ত কিছুর জন্য প্রস্তুত বেগরা, আর তাদের একহাজার সৈন্য—এ খুব সোজা ব্যাপার নয়! সম্প্রতি বুখারা দখল করে শয়বানী খান এখন তাক করছেন সমরখন্দের উপর। যদি বাবর অবিলম্বে সেখানে না পৌছান তবে সুলতান আলি শয়বানী খানের হাতে তুলে দিতে পারে রাজধানী। শয়বানীর রক্তপিপাসার কথা জানা আছে সবার, তাই শহরের লোকেরা বাবরের সামনে কেল্লার দরওয়াজা খুলে দিতে প্রস্তুত।

ভাগ্যর পাতা খেলার ছকে যে নতুন বাঁক নিয়েছে, যে সুযোগ তাঁর সামনে তুলে ধরেছে তাকে কাজে লাগাবেন নাকি?

'দূত প্রকৃতই আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমাদের সমরখন্দে,' বাবর উত্তরে বললেন আয়ষা বেগমকে এমন একটি বাক্য যাতে কোনো কিছুই বলা হয় না। 'কিন্তু সুলতান আলি তো অমনি অমনি সিংহাসন ছেড়ে দেবে না!'

'তার মানে আবার যুদ্ধ! আবার বিপদ!...

'বেগম, পাহাড়চূড়ায় বরফ থাকে না এমন হয় না কখনও, তেমনি প্রকৃতপুরুষমানুষের জীবনও বিনা বিপদে কাটে না।'

'জাঁহাপনা বলছিলেন মাকড়সার জালের কথা... আপনি সমরখন্দ চলে যাবেন আর আমরা? আমরা থেকে যাব... এই মাকড়সার জালের মধ্যে?'

'আপনার অভিরুচি হলে আপনাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'যুদ্ধের মাঝে?'

মুখ রাঙা হয়ে উঠল বাবরের : হাল্কা বিদ্রূপের তীর বিঁধল সোজাসুজি।

'যতদিন অভিযান শেষ না হয় ততদিন আপনারা তিনজন, ওয়ালিদা সাহেবা, খানজাদা বেগম ও আপনি ওরা-তেপাতে থাকতে পারেন, জায়গাটা ভাল, শহরের শাসকের স্ত্রী আমার ওয়ালিদা সাহেবার ভগিনী। সেখান থেকে সমরখন্দ পৌছানও সহজ।'

'ওরা পেতা? ঐ পাহাড়ী এলাকায় রাস্তাও নিশ্চয়ই একেবারেই ভাল না। আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি না।'

'গাড়িতে বসে যেতে পারেন।'

ধীরস্থির জীবন পছন্দ করতেন আয়ষা বেগম, পছন্দ করতেন এক জায়গায় থাকতে, কোথাও যাওয়াকে তিনি যন্ত্রণা বলে মনে করতেন।

'উঃ ভয় হয় আমার... গাড়ি, রাস্তা সবই।'

'বিমাতা ভাগ্যদেবী এখানেও আমাকে ঠকিয়েছেন,' ভাবলেন বাবর, 'এমন অস্থির লোককে দিয়েছেন এমন ক্ষীণদেহী স্ত্রী যে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে ভালবাসে!' আর এখন এসব আলোচনা করেই বা লাভ কী? দুর্বল স্ত্রীলোক, এঁকে আগলে রাখা দরকার। তিনি আগলে রাখবেন এঁকে!

চেষ্টাকৃত খুশি খুশিস্বরে বাবর বললেন :

'বেগম, আপনি গাড়িতে যেতে ভয় পান আর ঘোড়ায় চড়তেও পারেন না, তাহলে আপনাকে আমি... কোলে করে নিয়ে যাব!'

'ঠাট্টা করবেন না! কোলে করে নিয়ে যাবার উপযুক্ত নই আমি...'

আয়ষা বেগমের কথাগুলি বাবরের কাছে মনে হল কী এক অচেনা মিষ্টি ইঙ্গিত, এক আহ্বান! যৌবনের রক্ত ছলছলিয়ে উঠল। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'উপযুক্ত!'

'আপনার পায়ে পড়ি অমন ঠাট্টা করবেন না...'

'প্রমাণ চাই, প্রমাণ চাই?' বালকসুলভ চাপল্য নিয়ে বাবার ভয় দেখাতে লাগলেন বেগমকে।

আয়ষা বেগম হরিণীর মত চকিত হয়ে লাফিয়ে উঠলেন, দৌড়ে পালাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বাবার চট করে ধরে ফেললেন আয়ষা বেগমকে, এক মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ল বিবাহের রাত্রে সুন্দর করে সাজান গাড়ি থেকে তিনি যখন তাঁর বধূকে কোলে করে নামিয়ে এনেছিলেন তখন তাঁকে যেমন হাল্কা মনে হয়েছিল এখনও ঠিক তেমনি সহজেই তাঁকে তুলে নিলেন। পা দিয়ে পর্দা সরিয়ে দিয়ে শয্যার কাছে নিয়ে গেলেন তারপর ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন মাথার কাছের বাতিগুলি।

আজকের রাতের মত এমন প্রেমময়ী আর কোনোদিন হননি আয়ষা। আশ্চর্য, এই শয়নকক্ষেই অন্যান্য রাতগুলি তাঁদের কেটেছে একেবারে অন্যরকমভাবে। 'এখন থেকে প্রতিরাত কাটাব এখানে,' মনে মনে ভাবলেন বাবর, প্রেমসোহাগের ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে।... আবার তখুনি তাঁর মনে হল, 'সমরখন্দ চলে যাব... জানি না, কত সপ্তাহ, মাস কাটাতে হবে এই সুখ ছাড়া। আন্দিজানে থেকে গেলেই তো ভাল হয়!'

কেন কে জানে আবার তার মনে পড়ল তাঁদের বিবাহরাত্রির কথা। আয়ষাকে আলিঙ্গন আর চুম্বনে ভরিয়ে দিয়ে তিনি প্রতিদানে আয়ষার থেকে আশা করছিলেন বিশেষ এক ধরণের অনুরাগের, বিশেষ কিছু কথা আর আচরণের। চেয়েছিলেন আয়ষার মনপ্রাণ জয় করে নিতে আর আয়ষাও যেন তাঁর মনপ্রাণ জয় করে নেন। কিন্তু আয়ষা বেগম অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে ছিলেন সেদিন, তাঁর উত্তপ্ত সোহাগের প্রত্যুত্তর দিচ্ছিলেন অত্যন্ত সতর্কভাবে—বোধহয় মা-ধাইমাদের

উপদেশ ছিল এমনি। তাঁর আরও মনে পড়ল : পোশাক বদল করবার সময় আয়ষার সরু হাতের কব্জি থেকে চুনীবসান সোনার ভারী কঙ্কণটা পড়ে যায় কোথায়। একটু পরে তাঁর খেয়াল হয় যে কঙ্কণ নেই, সময়-অসময় বিচার করলেন না তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন:

'আরে আমার কঙ্কণ? অমন চমৎকার চুনিগুলো! জাঁহাপনা, একটু অপেক্ষা করুন, আমি খুঁজে দেখি...'

বলে তাঁর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিলেন নিজেকে।

সেকথা মনে পড়ে বাবরের আজও প্রচণ্ড রাগ হল। আজ বাবরের ঘুম আসতে দেরি হল, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন ঘুমন্ত আয়ষার ক্লান্ত-সুখী মুখের দিকে।...

ভোরের সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। রাতের তারাগুলি নেভার সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল বাবরের সেই অনুভূতিও যা গতকাল সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা বদলে দিতে পারে। স্বামীস্ত্রী প্রাতরাশ করতে বসলেন। বাবরের মাথায় আবার ঘুরছে আহ্‌মদ তনবাল আর আলি দোস্ত্‌বেগ যে তাঁকে ঘিরে মাকড়সার জাল বুনছে সেকথা। গতকাল বাবার দূতকে বলেছেন নিশ্চয়ই যাবেন সমরখন্দ। সেকথা বলেছেন তাঁর বিশ্বস্ত লোকেদের, যাদের নেতৃত্বে আছেন কাসিমবেগ। তারা বোধহয় ইতোমধ্যেই গোপন প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিয়েছে। আজ সকালে আরো পরিষ্কার করে বুঝতে পারলেন যে সে পরিকল্পনা পরিবর্তন করা উচিত নয়।

আয়ষা বেগম বুঝলেন যে স্বামীর মেজাজ বদলে গেছে, তাই মৌন হয়ে রইলেন। তাঁর মুখের দিকে একবারও তাকাননি বাবর, তাকিয়েছিলেন কেবল একবার তাঁর সরু কব্জিতে ঝুলে থাকা চুনীবসান সোনার কঙ্কণের দিকে।

'বেগম, আপনি ওরা-তেপাতে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন কি?'

আয়ষা বুঝলেন বাবরের সমরখন্দ যাবার ইচ্ছা মিলিয়ে তো যায়ইনি বরং আরো দৃঢ় হয়েছে সে ইচ্ছা। কয়েক মাসের জন্য বিচ্ছেদ ঘটতে যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে—এতে কি মানে হয় না যে বাবরের তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা নেই? অভিমান ভরা স্বরে আয়ষা বললেন :

'জাঁহাপনা সমরখন্দ আগে আপনার অধিকারে আসুক, তারপর আমি আমার নিজের শহরে গিয়ে ঢুকব। ওরা-তেপাতে যাবার ইচ্ছা নেই...'

এমনভাবে তিনি একথাগুলি বললেন যে বাবরের মনে হল তিনি যে আবার সমরখন্দ দখল করতে পারেন তা বিশ্বাস হচ্ছে না আয়ষার। কিন্তু আর কিছু বললেন না তিনি। হারেম ছেড়ে চলে যাবার সময় ঠাণ্ডা স্বরে বললেন :

'আচ্ছা, বেগম, যদি খোদার দোয়া হয় সমরখন্দে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।...'

১

বাবরের অভিপ্রায় ছিল শয়বানী খানের আগেই সমরখন্দের সিংহাসন থেকে সুলতান আলিকে বিতাড়িত করা। সুলতান আলিকে কেউই দেখতে পারত না।

'অপদার্থ'—বুস্তান-সরাই মহলের আনাচেকানাচে একথাই কানাকানি করে বলত সবাই। তবুণ শাসকের বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ বেগ আবু ইউসুফ আর্গুন, যে সুলতান আলির হারেমে নতুন নতুন সুন্দরী-বন্দিনীর যোগান দেয় সেও তার ওপর আশা ছেড়ে দিয়েছে। খোলা মর্মরপাথরের জলাধারসমেত হামামের অনতিদূরে এক নিরালা কক্ষে বসে রাজকার্য ও পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসে সে। কক্ষের দেওয়ালে একটি বিশেষ ধরনের জানলা আছে, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না (জানলাটি তৈরি হয়ে ছিল সুলতান মাহ্‌মুদের সময়ে), সেই জানলা দিয়ে আঠারবছরবয়সী লম্পট নগ্ন মেয়েদের জলে আছাড়ি পিছাড়ি খাওয়ার দৃশ্য উপভোগ করতে করতে সুরাপান করে, আর প্রত্যাশায় থাকে শুধুমাত্র দর্শনসুখের নয় আরো কিছুরও...

এবারও ছেলের সুবুদ্ধি জাগাতে ব্যর্থ চেষ্টা করল জোহ্‌রা বেগম : সুরা আর লালসায় ওর বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে।

বিড়বিড় করে সুলতান আলি বলল :

'কী?... আবার ঘেরাও? ও এখনও হয়নি ঘেরাও... ষড়যন্ত্রকারীরা বাবরের সামনে সমরখন্দের দরওয়াজা খুলে দেবে? আর আমার পীর খাজা ইয়াহিয়া তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন?... বেশ, বেশ, দিক... নেতা... বাবরকে ঢুকতে দেব শহরে আর দুর্গেও, তারপর ওকে ধরে জ্বালিয়ে দেব ওর চোখগুলো—জ্বলা... জ্বলন্ত শলা দিয়ে... লোহার ডাণ্ডা দিয়ে। হা-হা-হা...'

প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেল জোহ্‌রা বেগম।

সে মনে প্রাণে বিরোধী সমরখন্দ বাবরের হাতে তুলে দেওয়ার। তার আদেশেই বাবরের ভক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের ধ্বংস কর হয়েছে। তার পরামর্শেই প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত লোকেরা বাবরের সৈন্যদের অগ্রগামী দলটিকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে বিপদে ফেলেছে: কিন্তু বাবরের মূল সৈন্যদল বা তাঁর বাবর নামকে তো আর সে পরাস্ত করতে পারবে না : সর্বনাশ হল সমরখন্দের আর তার অপদার্থ সন্তান সুলতান আলিরও।

হায় আল্লাহ্‌ কোথা থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে?

নিজের মহলে এসে জোহ্‌রা বেগম উজ্জ্বল আলোকিত কক্ষগুলির মধ্যে ছটফট করে বেড়াতে লাগল। রাত্রি ভোর হওয়া পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না সে।

আপাততঃ বিপজ্জনক ঘটনাবলীর সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া গেছে ভাবল সে : বন্দী করা হয়েছে সেই ষড়যন্ত্রকারীদের যারা গত অবরোধের সময় থেকেই বাবরের প্রতি অনুরক্ত—এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত অনুমতি আদায় করা গেছে আধমাতাল সুলতান আলির কাছে। তাহলেও শহরে ক্রমশই কমে যাচ্ছে জোহরা বেগমের বিশ্বস্ত লোকের সংখ্যা। ষড়যন্ত্রকারী বেগদের ধনসম্পত্তি লুঠপাট করা হবে আর বেগদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে, এতে... সুলতান আলি আর তার প্রতি বিক্ষুব্ধ লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে! আর খাজা ইয়াহিয়া এত প্রভাবশালী যে তাঁর সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করা সম্ভব নয়!

জোহরা বেগমের চিন্তাধারায় বারবারই ঘুরে ফিরে আসছে শয়বানী খান। সুখী, সফল মানুষ! সুযোগের অপেক্ষা করেছে, শক্তিশালী সৈন্যদল গড়ে তুলেছে, সম্প্রতি অতি সহজেই বুখারা দখল করেছে। এবার যে-কোন মুহূর্তে এগিয়ে আসতে পারে সমরখন্দের দিকে। ইমানদার মুসলমান আর প্রকৃত যোদ্ধাও। তিনদিন আগে এক নকশবন্দিয়া দরবেশ গোপনে জোহরা বেগমকে এনে দিয়েছে শয়বানী খানের পত্র।

পর্দার আড়ালে লুকানো এক বিশেষ ধরনের কুলুঙ্গীতে রাখা সোনার ছোট্ট একটি বাক্স খুলল চাবি দিয়ে, বার করল সেই পত্রটি, বাতির আলোয় আরো একবার পড়তে আরম্ভ করল।

মধুরংয়ের পাতলা কড়মড়ে কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে কবিত্বময় সূক্ষ্ম ভাষায় যাযাবর খান বুদ্ধি ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছে, বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছে যে তার বয়স এখনও অল্প হওয়া সত্ত্বেও আবার বিবাহের সম্ভাবনার কথা ভাবেনি, সন্তানের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে। কিন্তু পত্রে সবচেয়ে যে জাদুকরা অংশ তা হল জোহরা বেগমের প্রতি প্রেমনিবেদন আর ইঙ্গিত যে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক সে; তা নাহলে এমন বয়াৎ লিখেছে কেন :

তোমার ঠোঁটের পরে আমার নিশ্বাস খেলে, ওগো মহীয়সী,
তোমার যে ছেলে শোনো আমারও সেই তো ছেলে, ওগো মহীয়সী।

জোহরা বেগমের মনে হল মুখের ওপর যেন এক শক্তিশালী পুরুষের গরম নিঃশ্বাস পড়ল। ছ'বছরের একাকী জীবন, সুদীর্ঘ ছয়টি বছর! সুন্দর ফুল, বৃথা ঝরে যাচ্ছে। বিবাহ করতে চাইত যদি সে তাহলে দেহে মনে শক্তিশালী, খ্যাতিমান, ধনী অনেক পাণিপ্রার্থীই এসে উপস্থিত হত : সুলতান মাহমুদের প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীর অপূর্ব রূপের খ্যাতি যে ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে। কিন্তু বিধবাজীবন কাটাতে হচ্ছে তাকে এই কারণে যে নিজে সে অভিজাতবংশের মেয়ে, স্বামী-পুত্র সিংহাসনের অধিকারী, দ্বিতীয়বার বিবাহ সে করতে পারে কেবল কোন দেশের শাসককেই, এমনি প্রথা।

আর তার কাছে গোপনে বিবাহপ্রস্তাব করেছে যে শয়বানী খান সেও তো সিংহাসনের অধিকারী? আবার পড়ল জোহ্‌রা বেগম, আর হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যেন সত্যি সত্যি কেউ তাকে আলিঙ্গন করে প্রেমমুগ্ধ স্বরে ফিসফিস করে বলল, 'আমার সুন্দরী প্রেমিকা!'

উঠে দাঁড়াল বেগম, আয়নার দিকে এগিয়ে গেল। বিনিদ্র রাত কাটাবার ফলে চোখের নীচে নীলচে ছাপ। কিন্তু ভুজোড়া যেন দোয়েল পাখীর পাখাদুটি। কালো চোখে আছে ঝলক। মসৃণ, শ্বেতমর্মর গ্রীবা, ওষ্ঠদ্বয় কামনায় অধীর।

শয়বানী খানের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি তা ঠিক, তার স্ত্রীপুত্র আছে তাও জানে জোহ্‌রা বেগম। 'আরে ঐ স্তেপের মেয়েগুলো আমার কাছে কোথায় লাগে! খানের মাথা এমন ঘুরিয়ে দেব যে ওরা সবাই আমার বশ মানবে!'

কাল আসবে সেই নকশবন্দিয়াদরবেশ বেগমের উত্তর জানবার জন্য।

কাগজ-কলম নিয়ে বসল বেগম।

বাতিদানের বাতিগুলো অনেক আগেই নিভে গেছে, তখনি কেবল বেগম লক্ষ্য করল যে ঘর ভরে গেছে ভোরের আলোয়। জানলার নীল মখমলের পর্দা সরিয়ে দিয়ে জোহ্‌রা বেগম মুখ রাখল ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসের সামনে।

হঠাৎ দুর্গের কাছের রাস্তা থেকে শোনা গেল পুরুষকণ্ঠের মর্মভেদী চীৎকার, তারপরেই শোনা গেল আবার এক নারীকণ্ঠের চীৎকার।

আবু ইউসুফ ও তার ছেলের পক্ষের অন্যান্য লোকেরা ষড়যন্ত্রকারী বেগদের খুঁজে তাদের বাড়িঘর লুঠ করছে। কল্পনায় দেখল জোহ্‌রা বেগম কেমন করে শহরময় সমরখন্দবাসীরা বর্শা আর তরবারির আঘাতে মারা পড়ছে। ধূর্ত, অবিশ্বাসী সব, ওদের চাই বাবরকে। আর তার নিজের চাই—শয়বানীকে। কিন্তু যদি শয়বানী খানের এই প্রেমনিবেদনও ধূর্ত ছলমাত্র হয়, তবে? সে সমরখন্দ দখল করবে, তখন জোহ্‌রা বেগমের জীবনে নেমে আসবে ঐ মেয়েটির মত দুর্ভাগ্য যার মর্মবিদারী কান্না সে শুনেছে মাঝরাতে?

উঃ কী ভয়ংকর, কেঁপে উঠল সারা শরীর। আবার হাতে তুলে নিল শয়বানী খানের চিঠিটা, তাতে যেন তার এই ভয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবেই আরো দুটি পংক্তি যোগ করা হয়েছে :

তুমি ছাড়া সমরখন্দ নিয়ে আর কি হবে আমার, সুন্দরী?
দিল ছাড়া মরদেহে কবে কার কী হবে আর, সুন্দরী?

স্বামীছাড়া কেবল সমরখন্দ তারই বা কী কাজে লাগিবে? এমন স্বামী চাই যে হবে প্রকৃত শাসক। যদি শক্তিমান, জীবনীশক্তিপূর্ণ শয়বানী খান না আসে সমরখন্দে আর

তার শূন্যপ্রাণে ভালবাসার আগুন না জ্বালায় তো সমরখন্দ হয়ে দাঁড়াবে কেবলমাত্র এক শূন্য অস্তিত্ব, মরদেহ।

আবার কামনার আবেশে শিউরে উঠল জোহ্‌রা বেগম। কাগজ-কলম নিয়ে খানকে পত্র লিখতে আরম্ভ করল। আরম্ভ করতে হবে প্রশংসায় আকাশে তুলে দিয়ে:

'শরীফ ইমাম, খালিফা, আমির-উল্‌-মুমিনিন, খোদার ইচ্ছাকে রূপ দেন যিনি...'

২

সমরখন্দের প্রথম প্রাচীরের ভিতরে, প্রশস্ত বাগানগুলিতে, উলুগবেগের মানমন্দিরের কাছের টিলাগুলিতে আবেরহমত নদীর দু'তীরে—সর্বত্র বিরাট অসংখ্য সৈন্যদল ঘাঁটি গেড়েছে। চোপান-আতা পাহাড়ের নিচে আর দূরে জরাফশান নদীর দু'তীর বরাবরও সেই সৈন্যদলেরই অসংখ্য ছাউনি পড়েছে।

আমির-উল্‌-মুমিনিন, এই সৈন্যদলের অধিনায়ক শয়বানী খান জায়গা নিয়েছে চমৎকার, প্রখ্যাত বাগিময়দানে উলুগবেগের পরিকল্পনায় নির্মিত প্রখ্যাত চালিশাতুন* মহলে। মহলের দ্বিতলে চারিদিকে বারান্দা পরিবেষ্টিত এক প্রশস্ত কক্ষ। সেখানে দ্বিপ্রহরের নমাজের পর সুসজ্জিত উঁচু বেদীর ওপর বসে আছে শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর শয়বানী খান।

খবর এল সুলতান আলি তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে এসেছে শক্তিশালী ভয়ঙ্কর খানের সঙ্গে দেখা করতে।

খানের ছোট ছোট চোখগুলি, যা দেখলে তা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না মোটেই, জ্বলে উঠল।

'প্রথমে আমাদের সুলতানদের ডাক। তারপর সমরখন্দের মির্জাকে এখানে নিয়ে আসবে।'

'কিন্তু আপনার তখ্‌ত যে নিচে, জাঁহাপনা!...'

'আমার জানমাজ যে-কোন তখ্‌তেরও উপরে!'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়! জাঁহাপনা!'

উটের লোম দিয়ে তৈরি হালকা খয়েরি রংয়ের নরম গালিচাটির একেবারে এক প্রান্তে বসল শয়বানী খান ইচ্ছা করেই।

যখন সুলতান আলিকে ভিতরে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হল তখন তার চোখে প্রথমেই যা পড়ল তা হল ভয়ঙ্কর খানের বসে থাকার নম্র ভঙ্গি। উঁচু আসনে বসে আছে সে, তার নিচে আরাম করে পা গুটিয়ে বসে আছে তার সুলতানেরা, জনদশেক

* আক্ষরিক অর্থে চল্লিশ স্তম্ভ

হবে। তাদের পোশাকআশাক তাদের বাদশাহের মত অতটা জাঁকহীন নয়। শয়বানী খানের পোশাকে কোনো অলঙ্কারই নেই। এদিকে সুলতান আলির উষ্ণীষে ঝলক দিচ্ছে মণিমাণিক্য, সোনার জরি ও মুক্তা সেলাই করা তার পোশাকে।

আঠারবছর বয়সী মির্জার অস্থির চোখগুলি এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। বয়সের অনুপযুক্ত স্থূল, গোলাকার দেহে মেয়েলি দুর্বলতা ফুটে বেরুচ্ছে। মায়ের আর আবু ইউসুফ আর্গুনের পরামর্শেই সৈন্যদলকে কেল্লার মধ্যে রেখে সে এখানে এসেছে। কী বিশাল শক্তিশালী সৈন্যদল নিয়ে শয়বানী খান সমরখন্দের দিকে এগিয়েছে তা বুঝেছে সুলতান আলি, তাই ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল সে।

সে কোথা থেকে জানবে যে আবু ইউসুফ বহুদিনই হাত মিলিয়েছে শয়বানী খানের সঙ্গে এবং তার প্রত্যক্ষ নির্দেশ অনুযায়ীই সে সুলতান আলিকে পরামর্শ দিয়েছে খানের কাছে আসার জন্য? আজ দ্বিপ্রহরের আহারপর্বের সময় সে অপদার্থকে বেশ ভাল করে পান করিয়েছে মাইনব সুরা, তাই এখন সুলতান আলি অভিবাদনের ভঙ্গিতে অল্প নিচু হতেই মাথাটা ঘুরে উঠল তার। তার স্থূল বিশালকায় দেহ টলে উঠল, আবু ইউসুফ তাকে ধরে না ফেললে সে গালিচার উপরেই গড়িয়ে পড়ত।

শয়বানী খান উঠে দাঁড়াল মির্জাকে অভিবাদন জানাবার জন্য। মুখে এসে লাগল মাইনবের গন্ধ : আরে এ দেখি মাতাল, মাতাল হয়ে এখানে আসার সাহস পায়! শয়বানী ইঙ্গিতে আদেশ দিল খানের ছেলে তৈমুর সুলতান আর জামাই জানিবেগের নিচে বসাতে সুলতান আলিকে।

সুলতান আলির মন ভরে উঠল খানের প্রতি শ্রদ্ধায়।

লাল রংয়ের পশুলোমের মস্তকাবরণের ওপরে সাদা উষ্ণীষ পরেছে শয়বানী, নীল বনাত কাপড়ের, ছোট হাতা হালকা চোগার বুকে সোনার বোতাম আঁটা, তার নিচে দেখা যাচ্ছে সবুজ রংয়ের পোশাক— সবুজ রং পয়গম্বরের রং, ইসলামী ঝাণ্ডার রং। আর বসার আসনটাও... 'স্তেপের লোকটা দেখছি বেশ ধার্মিক', ভাবল সুলতান আলি। কিন্তু সমরখন্দের শাসক সুলতান আলিকে যে অন্যান্য অনেকের—যারা তেমন অভিজাত নন—তাদেরও নিচে আসন দেওয়া হয়েছে, সেটা... আচ্ছা। সুলতান আলি ইচ্ছা করেই অবহেলাভরে অন্যান্য সুলতানের চোখের সামনে কোনরকমে পা মুড়ে বসল। শয়বানী খানের ছেলে তৈমুর সুলতান বিরক্তিভরে তাকাল পাশে উপবিষ্ট সুলতান আলির দিকে।

'মির্জা, আপনি আমার সন্তানের মত আপন হতে চান?' মিষ্টিস্বরে শয়বানী খান জিজ্ঞাসা করল সমরখন্দের শাসককে।

'গাজী খলিফা, আমরা আপনার আমন্ত্রণ পেয়েছি, সন্ধিচুক্তি করার জন্য...'

'আপনার ওয়ালিদা সাহেবা আপনার সঙ্গে আসেননি নাকি?'

'ওয়ালিদা সাহেবা আমাকে পাঠিয়েছেন', অকপট উত্তর দিল সুলতান আলি, অসতর্কভাবে তার ক্ষমতার সীমা প্রকাশ করে দিল এইভাবে।

'কিন্তু তাঁর আসার কথা ছিল তো...'

'আরে মেয়েরা... যুদ্ধ শান্তির ব্যাপার কিছু বোঝে না,' ভুল শোধরাবার চেষ্টা করল সুলতান আলি আনাড়িভাবে।

'না, না, আপনি তাঁর জন্য লোক পাঠান, মির্জা,' বলল খান মিষ্টিসুরে, কিন্তু এমনভাবে যা অমান্য করা যায় না।

সুলতান আলি তাকাল কাছেই হাঁটুগেড়ে বসে থাকা আবু ইউসুফের দিকে। আবু ইউসুফ ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়াল, শয়বানী খানকে কুর্নিশ করে বলল :

'আজিম গাজী, আদেশ করুন অবিলম্বে জোহ্‌রা বেগমকে আনতে যাবার জন্য।'

মিষ্টি হেসে আবু ইউসুফের দিকে তাকাল শয়বানী খান, 'আমার সবচেয়ে উমদা ঘোড়াগুলির একটি আপনার, বেগ।'

'ধন্যবাদ, জাঁহাপনা।'

'বেগ শহরে যাবেন,' হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল সুলতান আলি, 'খাজা ইয়াহিয়াকে জানাবেন আমাদের আদেশ। যেখানে আমি সুলতান আলি মির্জা হাজির রয়েছি যদি তিনি সেখানে না আসেন, তো আমাদের মধ্যে সন্ধি হবে না।'

'আপনার মুখ দিয়ে সত্য কথাই বেরিয়েছে, বাদশাহ সালামত', কিঞ্চিৎ অনুকম্পার সুরে বলল আবু ইউসুফ, তারপর রওনা দিল হুজুরদের আদেশ পালন করার জন্য। শয়বানী খান নিজের সুলতানদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানল।

'আপনারা ততক্ষণ আলাপ করুন মির্জার সঙ্গে,' বলে পিছনদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিচে নেমে গেল।

সুলতান আলি চোখ বুলিয়ে নিল সব সুলতানদের ওপর—তাদের মুখে কেবল শত্রুতার ছাপ। এদের মাঝে বসে থাকার কোনো মানে হয় না বুঝে সুলতান আলি উঠে পাশের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তখুনি তুর্কীস্তানের একজন সুলতান লাফিয়ে উঠে তার পথরোধ করে দাঁড়াল :

'আপনি এখন আমাদের কাছ থেকে কোথাও যেতে পারবেন না, মির্জা, এই হুকুম।'

বিশাল চেহারার এক সেপাই, মস্ত হাতের মুঠিটা তরবারির হাতলে রেখে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণে সুলতান আলি বুঝল সে ফাঁদে পড়েছে। মুহূর্তে নেশা ছুটে গেল তার। মলিনমুখে সে এসে আবার আগের জায়গায় বসল।

কয়েকঘণ্টা বাদে চারজন বাঁদী সমেত জোহ্‌রা বেগম বাগিময়দানে এসে উপস্থিত হল। মাথায় বিশেষভাবে বাঁধা সাদা রেশমী রুমাল ও কপালে অর্ধচন্দ্রাকারের স্বর্ণালঙ্কার পরায় তাকে দেখাচ্ছিল বিবাহবাসরের কনেবধূর মত। সাধারণত

অভিজাত মহিলারা যেমন পারে থাকেন তেমনি লম্বা হাতাওয়ালা ফুলতোলা কামিজ এঁটে বসেছে তার স্থূল কিন্তু নমনীয় দেহে। সাদা রেশমী পোশাকের প্রান্ত কামিজের নিচ থেকে এসে মাটিতে পড়েছে, দুদিক থেকে দু'জন বাঁদী সেই প্রান্ত তুলে ধরে আছে।

জোহ্‌রা বেগমকে নিয়ে আসা হল এই উপলক্ষে বিশেষভাবে সাজানো গোছানো একটি বড়ঘরে। শয়বানী খানের জ্যেষ্ঠা বেগম যার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, লক্ষ্য করল তাকে।

'কী বেহায়া রে!' ফিসফিসিয়ে বলল সে পাশে বসা তরুণী বেগমকে। 'কেমন দেখলি: পুরুষমানুষের জন্য আঁকুপাঁকু করছে, লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে কনেবধূ সেজেছে!... অপেক্ষা করবি তো যে ঘটকীরা এসে কথা পাড়বে, সব কিছু যেমন যেমন হওয়া দরকার হবে!... এমন লজ্জার হাত থেকে খোদা আমাদের রক্ষা করুন।'

যখন জোহ্‌রা বেগম দরবারকক্ষে এসে ঢুকল, শয়বানী তার কয়েকজন অনুচর নিয়ে সেখানেই ছিল। নত হয়ে খানকে কুর্নিশ করল বেগম এই প্রত্যাশায় যে খান তখ্‌ত থেকে গালিচার ফালির ওপর নেমে এস তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু খান যেন তার সোনার তখ্‌তের মধ্যে আটকে গেছে, সেখান থেকেই সংযত স্বরে বলল:

'খোদা আমদীদ, বেগম!'

জোহ্‌রা প্রত্যাশা করেছিল অন্যরকম অভ্যর্থনা। কেমন চুপসে গেল সে হঠাৎ, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তার।

'হুজুরে আলি, খলিফা, নিজেকে আমি তুলে দিতে এসেছি আপনার হাতে। আমার সন্তান, আমার মর্যাদা, সম্মান—সব, সব আপনার হাতে তুলে দিয়েছি!... বিশ্বাস করেছি আপনার মহত্ত্বকে... আপনার চিঠিতে...'

মোটা সাদা রেশমীকাপড় দিয়ে জোহ্‌রা বেগমের মুখ ঢাকা। দেখা যাচ্ছে না মুখ। খান তাকাল তার হাতের দিকে, আঙুলগুলির সোনার আংটি আর দামী পাথরের ভারে ঝুলে পড়েছে, হাতের রক্তবহা ধমনীগুলি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, যথেষ্ট বয়স হয়েছে বেগমের—কী আর করা যাবে! এ তো আর খানের উনিশবছরবয়সী তরুণী স্ত্রী নয়, যাকে সম্প্রতি লাভ করেছেন বুখারাতে।

শয়বানীর মনে পড়ল জোহ্‌রা বেগমের পুত্রসন্তান, সুলতান আলি, যাকে তার সুলতানরা প্রাসাদের অন্য অংশ নিয়ে গিয়ে শায়েস্তা করছে, তারই বয়স হল আঠার বছর।

'চিন্তা করবেন না বেগম', শান্তস্বরে বলল খান, 'আমাদের জানা আছে আপনার গোপন স্বপ্নের কথা। খোদার মর্জি হলে আপনার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না!'

কেবল এইটুকুই শুনতে পেল সে। জোহ্‌রা বেগম আর তার চারজন বাঁদীকে একটা ছোট ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দেওয়া হল।

সমরখন্দবাসীদের নিয়ে শয়বানী খান কী করবে তা কেউ জানে না, কিন্তু সিপাহসালাররা আর শয়বানীর অনুচরেরা বুঝতে পারছিল যে এমন কতকগুলি ঘটনা পেকে উঠেছে যার গুরুত্ব খুব কম নয়। তাই তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চালিশাতুন মহলের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তাদের মধ্যে মুহম্মদ সালেহ্ নামে এক শায়েরও ছিলেন। তাঁর মাথায় সূক্ষ্ম ভাঁজ দেওয়া উষ্ণীষ। ছোটহাতা রেশমী কামিজে বেশ দেখাচ্ছে তাঁকে। অনবরত যুদ্ধের ফলে রুক্ষ হয়ে উঠেছে স্তেপের সুলতানেরা, তেলপেক* মাথাছাড়া করে না কখনও না শীতে, না গ্রীষ্মে। তারা ভাল চোখে দেখে না এই শায়েরকে একে লেখাপড়াজানা তায় আবার পোশাকে-আশাকে সুরুচির ছাপ। তাই তারা সুযোগ পেলেই খোঁটা দেয় যে এই ফুলবাবু কবিটি এক সময় ভয়ঙ্কর তৈমুর লঙের অকর্মণ্য বংশধরদের, সমরখন্দের বাদশাহ্দের খিদমত করত।

নয়মান গোষ্ঠীর প্রধান কামবারবি বিদ্রূপ করে মুহম্মদ সালেহকে বলল :

'এই যে আমাদের তফাদার দোস্ত শায়ের সাহেব! আপনার প্রিয় চণ্ডী মা তার ছেলেকে নিয়ে এসে পৌঁছেছে সমরখন্দ থেকে। সমরখন্দের আত্মীয়াকে কাছে পেয়ে আপনি খুশি তো?'

'কামবারবি সাহেব, জানবেন জোহ্‌রা বেগমের জন্ম নয়মান উপজাতির বংশে, তাই তাঁকে আপনারই আত্মীয়া বলা উচিত।'

মানগিত, কুনগ্রাত, কুশ্‌চি উপজাতিগুলির সুলতানরা এই উত্তর শুনে হা-হা করে হেসে উঠল। নয়মান কিপচাকদের এই নেতার বড় নাক উঁচু ভাব। খালি নিজের উপজাতির লোকদের বলে উজবেক।

প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হল কামবারবি :

'আপনি আর আত্মীয় নিয়ে কথা বলবেন না... আপনি কি বার্‌লাস তুর্কী বংশের নন?'

শয়বানী খানের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা বার্‌লাস উপজাতির প্রতি, যে উপজাতির বংশে তৈমুরের জন্ম। মুহম্মদ সালেহ্ কাজ করেছেন হুসেন বাইকারার প্রাসাদে, সুলতান আলি মির্জার অন্তরঙ্গ ছিলেন, তারপর এসে যোগ দিয়েছেন শয়বানীর দলে। কিছু গোপনকথা বলেছেন তাকে, বুখারা আর দাবুসিয়ার দুর্গদুটি জয় করতে সাহায্য করেছেন, এইভাবে খানের প্রিয়পাত্র হয়েছেন। কিন্তু কামবারবি যে মুহম্মদ সালেহকে বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করে ঘৃণা করে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিকও নয়।

---

* পশুলোমের ভারী টুপি।

কবি ঠাট্টা করে ব্যাপারটা হালকা করে দিতে চাইল, 'আরে ভাই কামবারবি, এখন আমি—উজবেক তুর্কী!'

'চালাকি করবেন না! উজবেক হল এক কথা, তুর্ক একেবারে অন্য ব্যাপার!'

'তা কেন? সমস্ত উজবেক উপজাতিই আছে মাভেরান্নহরের তুর্কীদের মধ্যে।'

'কিন্তু আমরা আজীম উজবেক খানের বংশধর। আর শায়ের, আপনি হলেন সার্ত, ঐ... শহরের নিচুমানের ঐ ওদের বংশধর! সেকথা ভুলে যাবেন না!'

'কামবারবি সাহেব, আমার পূর্বপুরুষরা বাস করতেন তুর্কীস্তান শহরে, উজবেকদের একটা প্রবাদ আছে, 'আমাদের পিতৃভূমি—তুর্কীস্তান।' আছে কিনা এমন প্রবাদ?'

'তা আছে। থাকলেই বা কি?'

'আপনার পিতৃভুমি যখন তুর্কীস্তান, তখন আপনার পূর্বপুরুষ আমার পূর্বপুরুষের উৎপত্তি একই মূল থেকে। আপনি কামবারবি সাহেব, কোনো বিচ্ছিন্ন শাখা দেখে বিচার করবেন না, গাছের মূল দেখুন। তাহলে দেখবেন যে উজবেক খান ছিলেন দুশ বছর আগে আর আমাদের তুর্কীস্তান আছে হাজার বছর ধরে, উজবেক খানেরও আগে থেকে। উজবেক নামেরও আমাদের মধ্যে প্রচলন ছিল উজবেক খানেরও অনেক আগে থাকতে।'

'বললেই হল আর কি!' বিশ্বাস করল না কামবারবি।

'সত্যি, বিশ্বাস করুন! আমি বড় হয়ে উঠেছি খরেজমে, অনেক প্রাচীন বই পড়েছি... আপনি তো সহ্য করতে পারেন না বইপত্তর... জানেন, খরেজমশাহ্ মুহম্মদ, ঐ যে যিনি চেঙ্গিজ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তিনি তাঁর এক পুত্রের নাম দিয়েছিলেন উজবেক? তিনি যখন পুত্রকে ঐ নাম দিয়েছিলেন তার মানে সেই কবে থেকেই এই নামের আদর হয়ে আসছে! আর জানেন, এ নামের মানে কি? উজবেক মানে— নিজেই নিজের মালিক, 'স্বনির্ভর'। আমাদের গাজী খলিফা শয়বানী খানের নেতৃত্বে উপজাতিগুলি নিজেদের যে উজবেক বলে তার কারণ এই নয় যে উজবেক খান নিজেকে এই নামে জাহির করত অথবা তারও আগে খরেজমশাহের পুত্রের নাম তাই ছিল। বরং ঠিক তার উল্টো : তারা ঐ চমৎকার নাম নিয়েছিল তুর্কীদের কাছ থেকে...'

'যথেষ্ট হয়েছে! আবার তুর্কীদের দিক টেনে কথা বলছে!' সুলতানরা এই তর্ক মন দিয়ে শুনছে দেখে তাদের দিকে ফিরে বিরক্ত হয়ে বলল কামবারবি।

'তা নয় তো কী? আপনি নিজেই তো এখনি স্বীকার করলেন যে আপনার পিতৃভুমি তুর্কীস্তান। আর 'তুর্কীস্তান' কথার মানে হল 'তুর্কীদের দেশ'।

'হায় আল্লাহ্, এ কবি এবার আমাদের রুমের* তুর্কীদের বংশধর বলে না বসে!'

'না, না কামবারবি সাহেব, সুলতানরা, তা করব না আমি। রুমের তুর্কীদের...

* তুর্ক-ওসমানদের দ্বারা বিজিত বাইজান্টিম সাম্রাজ্য।

নিজস্ব ইতিহাস আছে। মাভেরান্‌হরের তুর্কীরা আনাতোলির* রুমের আবির্ভাবের বহুদিন আগে থেকেই বাস করত এই উপত্যকাগুলিতে। 'শাহনামা' পড়লে দেখতে পাবেন... কবি ফিরদৌসী বলছেন : হাজার বছর আগে দক্ষিণ দিকে খোরাসান থেকে বিস্তৃত ছিল যে দেশ তাকে বলা হত ইরান, আর খোরাসানের এদিকে, উত্তরের দিকে বিস্তৃত দেশকে বলা হত তুরান... আমাদের বাদশাহ্ শয়বানী খান ইতিহাস ভালো করেই জানেন। বুখারার মাদ্রাসাতে লেখাপড়া শেখার সময়েই আমাদের ইমাম সাহেবের মুখস্থ ছিল নবাই আর লুৎফির কবিতা, নিজে লিখেছেন গজল তুর্কী ভাষায়। শুনবেন?'

সাদাসিধে সুলতানদের শুনতে হল কুটিল শায়েরের শায়েরী।

বিরহের ঘোড়া ফেলে দিল মোরে, পিয়ারী এসেছে দরদী হয়ে,
শয়বানী ভালো হয়ে ওঠে ওরে, পিয়ারী এসেছে দরদী হয়ে।

'আমাদের খানের এ কবিতা তুর্কভাষায় নয়, উজবেকভাষায়!' কামবারবি কিছুতেই হার স্বীকার করতে চায় না।

'সব তুর্কী কবিই এই ভাষায় কবিতা লিখেছেন। নবাইয়ের তুর্কভাষা আর শয়বানী খানের উজবেক ভাষা একই ভাষা। এখন আমাদের মনপ্রাণও এক হওয়া দরকার, সুলতান সাহেবরা। তৈমুরের বংশধররা বলত, 'ঐ ওরা তুর্কী আর এরা উজবেক,' এইভাবে উপজাতি উপজাতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল, জনগণের মধ্যে বিভেদ এনেছিল। এবার আমাদের ইমাম সাহেব, খলিফা, দ্বিতীয় ইস্কান্দার** আবার আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। এই মহান কাজে সফল হোন আমাদের খান!'

তর্কযুদ্ধের এখানেই সমাপ্তি হল। গর্বিতভাবে মাথা উঁচু করে সেখান থেকে চলে গেলেন কবি।

কুশচি উপজাতির নেতা কুপাইবি কামবারবির দিকে তাকিয়ে বলল :

'দেখেছ, সার্তের ব্যাটারা কেমন ধরনের? কথায় কাবু করতে পারবে না ওদের!'

'কথায় না হলে তলোয়ার দিয়ে কাবু করব', ইচ্ছে করে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল কামবারবি।

সুলতানরা হেসে উঠল সবাই।

সন্ধ্যার মুখে পাঁচ-ছ'জন মুরিদসমেত খাজা ইয়াহিয়া এসে পৌঁছলেন সমরখন্দ

---

* 'এশিয়া মাইনরের' প্রাচীন নাম।

** দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের মিলন ঘটানোর চিন্তার জন্য প্রাচ্যে জনপ্রিয় ইস্কান্দার বা সিকন্দর নামে।

থেকে, ইনিই হলেন শেষ ব্যক্তি যার অপেক্ষায় ছিল শয়বানী খান নিজের পরিকল্পনামত কাজ আরম্ভ করার জন্য।

ঘোড়া থেকে নামবার সময় একটু বেশি তাড়াহুড়ো করছিলেন তার ফলে রেকাবের চামড়ার অংশে পা জড়িয়ে গেল। মুরিদরা সাহায্য করল তাদের পীরকে মাটিতে নামতে।...

সাদা জমকালো উষ্ণীষ, পীরেদের হাল্কা, সুন্দর পোশাক সাকারলত* পরনে খাজা ইয়াহিয়া যেন আত্মমর্যাদার প্রতিমূর্তি, সিংহাসনে উপবিষ্ট শয়বানী খানের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি সামান্য মাথা নিচু করে। কোরান পড়তে অভ্যস্ত মিষ্টি সুরেলা গলায় ভারিক্কি ভাবে বললেন :

'আসসালাম আলেইকুম, বাহাদুর খান! সমরখন্দের দরওয়াজা খোলা আপনার সামনে...'

শয়বানী তাঁকে বাধা দিয়ে বিদ্রূপ করে বলল :

'আপনি খুলে দিয়েছেন সমরখন্দের দরওযাজা?'

'স্রেফ খোদাতাল্লার মর্জিতেই সব কাজ হয়।'

'খোদার ইচ্ছা কাজে পরিণত করছি আমরা, আর বাকীরা নিজেদের ইচ্ছামত সমরখন্দ তুলে দিতে চেয়েছিল বাবরের হাতে!'

পীরের মুখচোখ থেকে আত্মমর্যাদার ভাব উপে গেল। তিনি বুঝলেন যে উল্টে কোনো হুল ফুটানো কথা বলায় বিপদ আছে।

'মানুষের দুর্বলতা তো থাকবেই, জাঁহাপনা... যদি আমরা কোনো অপরাধ করেই থাকি তো মাফ করবেন। অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে এসেছি আমি আপনার কাছে...'

'এসেছেন? নাকি নিয়ে এসেছে?'

কেঁদে ফেললেন খাজা ইয়াহিয়া।

'খাজাকে উপরে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রিয় মির্জার পাশে বসাও', আদেশ দিল খান।

খাজা ইয়াহিয়াকে নিয়ে চলে যাওয়া মাত্রই শয়বানী কাছে ডাকল তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা, বছরষাট বয়েসের মুল্লা আবদুররহিমকে।

তাদের দু'জনের মধ্যে কী কথাবার্তা হল তা সেখানে সমবেত হোমরাচোমরাদের কেউ জানতে পারল না। অনেক সুলতান অবাক হল যে শয়বানী সমরখন্দের খোলা দরওয়াজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়তে ব্যস্ত হচ্ছে না। কেন আর দেরি করা, কেন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে হস্তগত করা হচ্ছে না মাভেরান্নহরের প্রাণকেন্দ্রকে যার জন্য এতদিন ধরে শয়বানীর উজবেকরা অবিচল চেষ্টা করে এসেছে?

* উটের পশমে তৈরি হলুদ রঙের এক ধরনের চোগা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পীরদের পোশাক ছিল।

সেইজন্যেই বোধহয় ডাকা হয়েছে উচ্চমহলের সভা, এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য? যাই হোক না কেন যখন সভার প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে শয়বানী এসে ভিতরে ঢুকল তখন সভায় উপস্থিত সবারই কৌতূহল চরমে উঠল। এতক্ষণ পর্যন্ত যে যার জায়গায় বসেছিল, এবার তারা লাফিয়ে উঠে কুর্নিশ করল। শয়বানী ধীরে ধীরে নিজের বসার জায়গায় উঠে পা ভাঁজ করে জরির আসনের ওপর বসে রইল নির্বাক হয়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুল্লা আবদুররহিম কোরানের একটি সুরা পড়লেন—ইসলামের গাজীর সমস্ত অমূল্য প্রচেষ্টা যেন সফল হয় এই কামনা করলেন। তারপর আবার খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর আবার মুল্লাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শেষে আসল কথায় এলেন :

'আমাদের আজীম ইমাম, গাজী, খলিফা, খুদাবন্দ শয়বানী খান পাপে ডুবে যাওয়া এই শহরকে কেবলমাত্র দখল করতেই চাচ্ছেন না। পয়গম্বর মুহম্মদের দেখানো পাক পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবার সময় তিনি সাজা দিতে চান ধর্ম বিরোধী দুশমনদের। যদি আমাদের শাসক কেবল ধনসম্পত্তির কথাই ভাবতেন... তাহলে সমরখন্দকে একেবারে কপর্দকশূন্য হতে হত। কিন্তু আজীম শয়বানী খান জ্ঞানে দ্বিতীয় ইস্কান্দারের সমান, তিনি সর্বপ্রথমে ভাবেন দীন ও ইমানের—জয়ের কথা।

মুল্লা আবদুররহিমের থেকে একটু নিচে বসে ছিলেন মুহম্মদ সালেহ্। নিচুস্বরে কিন্তু স্পষ্টভাবে তিনি বললেন, 'ঠিক তাই!'

কবির কথায় কর্ণপাত না করে মুল্লা আবদুররহিম বলে চললেন, 'আমরা দেখছি যে তৈমুরের বংশধররা কত নীচ কাজ করতে পারে, দেশের কেমন দুর্দিন হতে পারে তাদের শাসনে, কত শীঘ্র তাদের শাসকরা ইনসাফ আর ইমান সব জলাঞ্জলি দিতে পারে। আবদুল লতিফের হুকুমে কোতল করা হয় উলুগবেগকে, অথচ তিনি ছিলেন আবদুল লতিফের জন্মদাতা পিতা। হীরাটে হুসেন বাইকারা কোতল করেন নিজের পৌত্র মুমিন মির্জাকে। সুলতান আলি—এই যে এখানে আমাদের কাছে ইনি বসে আছেন—নিজের বড় ভাই বাইসুনকুরকে ধরে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন, বাইসুনকুর অবশ্য পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তারপর আবার বাইসুনকুর ছোট ভাইকে ধরে ফেলেন...' একটু বিদ্রুপের হাসি হাসলেন মুল্লা, 'তার চোখ্ কানা করে দিতে চেয়েছিলেন, নিজের লোকের মতই ব্যবহার আর কি। কিন্তু আমাদের এই অতিথি মির্জা জল্লাদকে ঘুষ দিয়ে পালান। সমরখন্দের শাসকদের প্রাসাদ পরিণত হয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা, ভণ্ডামি, নোংরামির ঘাঁটিতে! কোরানে মুসলমানদের মদ্যপানে কঠোর নিষেধ আছে। আর এই তরুণ মির্জা... ঐ যে দেখছেন ওঁকে? ভালো করে লক্ষ্য করুন, দেখি—উনি মনে করেন যে নিষিদ্ধ পানীয় গ্রহণ করে মত্ত অবস্থায় আসতে পারেন ইসলামের গাজী, আমাদের পাক ইমামের কাছে! আমাদের পাক ইমাম আগেও জানতেন যে এই...

অকর্মণ্য মির্জা অল্পবয়স থেকেই পা রেখেছেন পাপের পথে, এবার সুলতানরা আপনারাও তা জানলেন...'

কিপচাক উপজাতির কুপাকবি চীৎকার করে বলল :

'লম্পট, মাতালটাকে ফাঁসি দেওয়া হোক!'

'তরুণ মির্জা অপরাধী নিশ্চয়ই', সমালোচনার ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে বললেন মুহম্মদ সালেহ, 'কিন্তু এর থেকেও বেশি অপরাধী এর পিতা সুলতান মাহ্‌মুদ। একেবারে দুশ্চরিত্র লোক ছিল। ধর্ম মানত না মোটেই। মেয়ে আর বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের নিয়ে লালসায় গা ভাসিয়েছিল। হতভাগ্য সমরখন্দবাসীরা তাদের বাচ্চা ছেলেদের রাস্তায় বার করতে ভয় পেত, নিজেদের বাড়ির মেয়েমহলে তাদেরকে লুকিয়ে রাখত মেয়ের মত করে...'

'আমি বলছি : ছেলে বাবাকেও ছাড়িয়ে গেছে লাম্পট্যে!' এমনভাবে বলল কামবারবি যেন তলোয়ার চালাল।

'আরে বাবা কি, ওর মা, মির্জার মা কেমন ধরনের?'

কুপাকবি একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল সবাই। অনেকেই গুজব শুনেছে যে শয়বানী খান বিবাহ করবে জোহরা বেগমকে। খান জানত যে ঐ মহিলাকে বিবাহ করলে নিজের সুলতানদের চোখে সে ছোট হয়ে যাবে, তাছাড়া বেগমের শিরাফুলে ওঠা হাতগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছিল না সে। মুল্লা আবদুররহিমেরও জানা ছিল খানের অভিপ্রায়ের কথা, তাই এ গুজবের মূল ছেঁটে ফেলার জন্য কিপচাকদের সুলতানের ক্রুদ্ধ প্রশ্নের খেই ধরে বললেন :

'শাসকদের পাপের ছোঁয়াচ লাগে তাদের স্ত্রীদেরও গায়ে। এই মির্জার মা, মনে হচ্ছে, নিজের লালসা মেটাবার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। সেই কারণেই কি সে ছেলেকে আমাদের হাতে তুলে দেয়নি?'

একজন সুলতান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রস্তাব করল :

'এমন নীচ মেয়েছেলেকে ঘোড়ার লেজে বেঁধে না মরা পর্যন্ত ঘোড়া ছোটাতে হয়!'

অন্য একজন বলল অন্য ধরনের শাস্তির কথা :

'বস্তার মধ্যে ওকে পুরে সবচেয়ে উঁচু মিনার থেকে ছুঁড়ে ফেলতে হয়!'

শয়বানী নীরবে শুনতে লাগল একটার পর একটা এই ধরনের ভয়ঙ্কর সাজার কথা। শেষে তাকাল মুল্লা আবদুররহিমের দিকে। আবদুররহিমের ইঙ্গিতে সুলতানদের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

বলতে আরম্ভ করল খান—গম্ভীর, ভারীস্বরে, আত্মপ্রত্যয় নিয়ে। শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ, বিশেষ করে তখন, যখন শয়বানী একের পর এক উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করে দিতে লাগল তৈমুরের বংশধরদের নৈতিক অধঃপতন,

ব্যাভিচার, ধর্মবিরোধী কাজের কথা, যার ফলে এককালের মহিমাময় রাজ্য ছারখার হয়ে যায়। হঠাৎ খান খাজা ইয়াহিয়ার দিকে ফিরল :

'এই যে, পীর, এই লম্পটগুলোর মুর্শীদ ছিলেন আপনার পিতা খাজা অহরার, 'পাক' বলতেন তিনি নিজেকে। শাসকরা ছিল তার ধর্মীয় প্রভাবের ওপর নির্ভর। কত ধনসঞ্চয় করেছেন তিনি—এ সবই কি সৎপথে, এঁ্যা পীর? আমরা জানি যে আপনি অনেক অনেক সোনার উত্তরাধিকারী হয়েছেন। সেই ধনের সহায়তায়ই আপনি আজ এই এগার বছর ধরে হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছেন সমরখন্দ। মাছে পচন ধরে তার মাথায়। যেমন পীর, তেমনি তার মুরিদ। এই যে তরুণ লম্পট মির্জা সুলতান আলি—ও তো আপনার মুরিদ—খোদার কাছে কথা দিয়ে ওর দায়িত্ব নিয়েছেন, ওর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন!'

সুলতান আলি আর খাজা ইয়াহিয়ার দিকে একে একে আঙুল দেখিয়ে তারপর মেঝেতে আঙুল ঠেকিয়ে শয়বানী বলল :

'আর ঐখানে, নিচে বসে আছে আর এক চরিত্রহীনা মেয়েছেলে... লজ্জা, বিবেক সব ভুলে এখানে এসেছে স্বামী খুঁজতে।... এমনি পীর আপনি! নিজের মুরিদ-মির্জার বিশ্বাসহনন করেছেন, সমরখন্দ বাবরের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। আর এই মুরিদ নিজের পীরের বিশ্বাসভঙ্গ করে আমার কাছে এসেছে। শহর বটে একখানা : বিশ্বাসহন্তা আর প্রতারকে পূর্ণ! একজন এদিকে যায় তো অন্যজন ওদিকে যায়। সুলতান একদিকে, তার মুর্শীদ অন্যদিকে। একে অপরকে গিলে ফেলতে পারে। পয়গম্বর মুহম্মদ ছিলেন ধর্মনেতা, শাসক আবার সেনানায়কও। যে পয়গম্বরের পথ অনুসরণ করবে না তাকে এই পীর আর ঐ মির্জার মতই অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে!'

নিজের দলের কিছু লোকের প্রতি ইঙ্গিত ছিল এ কথায়। তারা গোপনে বলাবলি করত, 'আমাদের খান তখ্‌ত পেয়েও খুশি নন, নিজেকে খোদ ইমাম আর খলিফা বলে প্রচার করতে চাইছেন।' মাভেরান্নহরের ঘটনাবলী বহুদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে শয়বানী ভালই বুঝেছে খাজা আহরারের মত লোকদের হাতে ক্ষমতা থাকার ফলে রাজ্য কেমন করে দুর্বল হয়ে পড়ে। নিজের রাজ্যে এমনটি সে কখনও হতে দেবে না, কিছুতেই না! বুখারার মাদ্রাসাতে পড়াশোনা করার সময়ই সে ভাল করে কণ্ঠস্থ করেছে শরীয়ৎ, তরিকৎ। এখন বিশেষ করে তার দলের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার থেকে বেশি ভাল করে জানে হাদিস বা বেশি ভাল করে আবৃত্তি করে কোরান। ধর্মীয় নেতার ক্ষমতা না থাকলে সে কেবলমাত্র একজন সেনানায়ক যে বিভিন্ন সুলতানদের আর বিভিন্ন উপজাতির লোকদের একত্রিত করেছে। আর তার আদেশাধীন শক্তিশালী সেনাদল ছাড়া ইমাম বা খলিফা হয়েই বা লাভ কি? সেনানায়ক-খলিফা—একসঙ্গেই হতে হবে তাকে।

'সমরখন্দে আমাদের দুশমনরা সাতমাথাওয়ালা ড্রাগনের মতই শক্তিশালী। কত বীরকে পরাজিত করেছে এই ড্রাগন! কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য, চিন্তাধারা সৎ, মঙ্গলজনক। খোদা, স্বয়ং খোদা ঐ ড্রাগনকে বার করে এনেছেন তার গর্ত থেকে, আমাদের হাতে তুলে দিয়ে বলেচেন, 'যা মন চায় তাই কর এটাকে নিয়ে।' আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সমরখন্দের দরজা বিনাযুদ্ধেই খুলে গেছে আমাদের সামনে।'

খানের অনুচররা যেন কেবল এখনি বুঝল কী বিরাট সাফল্যলাভ করেছে তারা। সমরখন্দ, শক্তিশালী সমরখন্দ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেছে, শহরের শাসক আর ধর্মীয় নেতা নিজেরা শয়বানী খানের বশ্যতা স্বীকার করেছে। আল্লাহ্‌ সত্যিই সর্বশক্তিমান; শয়বানী খান প্রকৃত গাজী, খোদার প্রিয়পাত্র, সেজন্যই এমন চমৎকার ভাবে সুকৌশলে এমন কঠিন কাজ সুসম্পন্ন করলেন।

মুল্লা আবদুররহিম উচ্চৈঃস্বরে বললেন :

'আমাদের পাক ইমাম দীর্ঘজীবী হোন!'

অন্যরাও লাফিয়ে উঠল জায়গা ছেড়ে :

'দ্বিতীয় সিকন্দর জিন্দাবাদ!'

'খলিফাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!'

'দুনিয়ার সমান আয়ু হোক গাজী খলিফার!'

সুলতান আলি আর খাজা ইয়াহিয়াও উঠে দাঁড়াল। ভয়ে মলিন মুখ, পা কাঁপছে তাদের। ভয় পাবারই তো কথা, শয়বানীর একটা কথায় তার অনুচররা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে তাদের।

খানের ইঙ্গিতে স্তুতিবর্ষণ বন্ধ হল, আবার সবাই বসল নিজের নিজের জায়গায়। খাজা আর মির্জার দিকে দেখিয়ে শয়বানী বলল :

'বেশ জ্বালাযন্ত্রণা দিয়ে তারপর এদের মেরে ফেললেও হয়ত কোনো পাপ হত না। কিন্তু আমরা আর একবার দুনিয়ার সামনে তুলে ধরব—যারা ইমান ও ইনসাফের পথে যায় তাদের শক্তি যে করুণাপ্রদর্শনেই, তার প্রমাণ। এই মেহমানদের খুন ঝরাব না আমরা, এদের জীবনভিক্ষা দেব!'

মির্জা ও খাজা যারা এতক্ষণে সব আশা হারিয়ে ফেলেছিল, এবার অনুগত দাসের মত নিচু করে কৃতজ্ঞতা জানাল। সুলতান আলির অহঙ্কার বা খাজা ইয়াহিয়ার আত্মমর্যাদার আর চিহ্নটুকুও নেই! এমনকি খাজা ইয়াহিয়ার চোখে জল এসে গেল:

'খোদা আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, জাঁহাপনা!...'

'দাঁড়াও!' গলা তুলে আবার বলল খান। 'খাজা ইয়য়াহিয়া নিজের আত্মসর্বস্বতায় ইমানকেও ভুলে গেছে! আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য তোমার হজ করার দরকার।... প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর দুই ছেলেকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও। কুপাকবি তুমি দেখো কাল সকালের আগেই যেন রওনা দেয়!'

'জো হুকুম, জাঁহাপনা!'

'আর এই নওজোয়ান মির্জা', সুলতান আলির দিকে তাকিয়ে শয়বানী বলল, 'আমাদের সন্তান হতে চেয়েছিল। যাক্, ধর্মপথবিচ্যুত পাপীকে প্রকৃত ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনা পুণ্যকর্ম। তৈমুর খান, তুমি ওকে নিজের দলে নিয়ে নাও।'

সুগঠিতদেহ তৈমুর খান ঘৃণাভরা চোখে তাকাল সুলতান আলির দিকে। কিন্তু বাবার কথাই হল আইন। তৈমুর মাথা নিচু করে আদেশ মেনে নিল।

'যদি ভাল ফল দেখায় তো ইনাম পাবে, আর যদি বেয়াড়াপনা করে তো মাথাকাটা পড়বে', বলল শয়বানী।

যারা বুঝবার তারা ঠিকই বুঝল সুলতান আলি বেশিদিন বেঁচে থাকবে না।

এবার নিচে বন্দি করা জোহরা বেগমের কথা ভাবা দরকার।

জোহরা বেগমের সৌন্দর্যের খ্যাতি বহুদিনই তার কানে এসেছে। একসময় সে ভেবেছিল তাকে সাময়িক স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার কথা। সেটা প্রথাবিরুদ্ধ নয়। ছন্দোবদ্ধ যে চিঠি সে পাঠিয়েছিল বেগমকে তাতে অবশ্য মেয়াদী নিকা করার কোনো কথাই ছিল না। অহঙ্কারী বিধবা সমরখন্দ সুন্দরী ভাবুক যে সে শয়বানীর হৃদয় জয় করেছে, সত্যি সত্যিই তার জীবনসঙ্গিনী হবে। আজ যে মোহভঙ্গ হয়েছে শয়বানীর, সেটা ছাড়াও তার বিবেক তার মন কুরে কুরে খাচ্ছে—কবিতা দিয়ে সে তো বেগমকে পথচ্যুত করেছে, এক কথায় প্রতারিত করেছে। এখন তার কাছে বড় কথা হল দেওয়ানে জোহরা বেগমের প্রতি সুলতানদের ঘৃণা প্রদর্শন করা, বেগমের পাপ আর কলঙ্কের কথা খানকে বোঝাবার চেষ্টা করা। বিবেককে একটু শান্ত করা গেল। 'জোহরা বেগম নিজেই তো দেখি একটা বাজে মেয়েছেলে, তাকে প্রতারণা করলে কোনো দোষ নেই', ভাবল খান। 'ওকে আমি মেরে ফেলতে দেব না সুলতানদের অবশ্যই। কিন্তু যে-কোনো সুন্দরীর চেয়ে বেশি প্রয়োজন আমার সুলতানদের সমর্থন লাভ করা। বেগম চেয়েছিল আবার বিয়ে করতে। নিজের কথা রাখব, ওর বিয়ে দেব।'

খানের কাছাকাছি যে সব সম্মানিত লোকেরা বসেছিল তাদের থেকে বেশ দূরে বসে ছিল স্থূলকায়, মুখে দাগভরা একজন লোক। তার ওপর গিয়ে পড়ল শয়বানীর দৃষ্টি। মনসুর বখ্‌শি—ও-ই হবে জোহরা বেগমের সুলতান। সুলতান হিসেবে তেমন কিছু না, কিন্তু সৈন্যচালনা ছাড়াও সে ঝাড়-ফুঁকও করত। প্রচণ্ড জোরে খঞ্জনী বাজিয়ে, যথেচ্ছ গালিগালাজ করে ভয় দেখিয়ে অসুস্থ লোকের দেহ থেকে ভূত-প্রেত তাড়াত। এজন্যই তার নাম হয়েছিল 'ভয়ঙ্কর'। এছাড়া আরও এক কারণে খ্যাতি ছিল তার—কিছুতেই তার স্ত্রী টেঁকে না, দু'এক বছর পরেই হয় পালিয়ে যায় নয় মরে রেহাই পায়।

'মনসুর বখশি, আবার তোমার স্ত্রী মরেছে, তাই না?' জিজ্ঞাসা করল শয়বানী।

'নিচে বসে আছে যে বেগম, বিয়ের পোশাক পরে এসেছে, দেখছ? তোমার সঙ্গে তার বিয়ে দিলে কেমন হয়?'

মনসুর লাফিয়ে উঠল জায়গা ছেড়ে, আকর্ণ হাসিতে মুখ ভরে গেল তার, নিচু হয়ে সম্মান জানিয়ে বলল :

'জাঁহাপনা আমার, আপনার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত! নিশ্চয়ই বিয়ে করব, নিশ্চয়ই!'

হা-হা করে হেসে উঠল সবাই। সব সুলতানই হাঁফ ছাড়ল যে শয়বানী এ জটও খুলল সুকৌশলেই।

'আমাদের ইমাম উপযুক্ত সিদ্ধান্তই নিয়েছেন।... ভয়ঙ্কর মনসুর বেহায়া বেগমকে তার আলিঙ্গনে পিষে ফেলবে...'

'দুজন দুজনের উপযুক্ত...'

যেই শয়বানী বলতে আরম্ভ করল অমনি হাসি উচ্ছ্বাস থেমে গেল :

'নিকা হবে সমরখন্দে। সুশৃঙ্খলভাবে সমরখন্দে ঢুকব আমরা।...'

খান একাধিকবার এসেছে সমরখন্দ, ভাল করেই জানা আছে এ শহর, আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছে সে কেমন করে তার সেনাদল প্রবেশ করবে শহরে আর জায়গা করে নেবে থাকার। সিপাহসালাররা নির্ভুল নির্দেশ পেয়ে শয়বানীর পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে চাররাহদরওয়াজা দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করতে আরম্ভ করল। ঠিক সেই সময়েই চাররাহর উল্টো দিকের সোজানগরানদরওয়াজা দিয়ে শত শত লোক পালিয়ে যাচ্ছে। বাবার তখন অবস্থান করছেন শাহরিসাব্জে। তাঁর সমর্থকরা শাহরিসাব্জের দিকে ছুটছে।

কিন্তু সবাই পালাতে পারেনি। শয়বানীর সৈন্যরা দ্রুতগতি ঘোড়ায় চেপে ঝড়ের বেগে ছুটে এসে অনেককে ধরে ফেলল, মহানন্দে লুঠপাট চালাল, যে বাধা দেবার চেষ্টা করল সেই মারা পড়ল।

লুঠপাট আরও বাড়ল রাতের অন্ধকারে। শুধু খাজা ইয়াহিয়ার ধনসম্পদেভরা বাড়িটাই নিরাপদে ছিল : সারারাত সে-বাড়ি পাহারা দিয়েছে কুপাকবির সৈন্যরা। কিপচাক সুলতানের নেতৃত্বে সৈন্যরা দেখতে লাগল কেমন করে খাজা ইয়াহিয়া তার দুই ছেলে আর বিশ্বাসী গোলামদের সাহায্যে বাড়ির বিভিন্ন অংশ থেকে টেনে টেনে আনছে সোনাবোঝাই সিন্দুকগুলো আর গোছাচ্ছে অন্যান্য জিনিসপত্র। ভোরবেলায় গোলামরা পাঁচটা ঢাকা গাড়ি আর গোটা দশেক উট মালবোঝাই করল। খাজার তিন বিবি মালবোঝাই গাড়িগুলোর মধ্যে উঠে বসল। খাজা ইয়াহিয়া, তার দেহরক্ষী আর ছেলেরা ঘোড়ায় চড়ে চলল। সমরখন্দ থেকে বিদায় নিয়ে এক সময়ের ক্ষমতাবান পীর দক্ষিণ অভিমুখে রওনা দিল। পাহাড়ি এলাকার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে খাজা ইয়াহিয়ার পথ। সরু গিরিপথের ওদিকে আর গিয়ে পৌঁছলো না কাফেলা। সন্ধ্যার

আধোআঁধারে নদীতীরে রাতকাটানোর জন্য থামার আগে কুপাকবি কেটে ফেলল হজযাত্রীদের—পীর, তার ছেলেদের, দেহরক্ষীদের সবাইকে। কেবলমাত্র মেয়েদের আর গোলামদের ভাগবাঁটোয়ারা করে দিল নিজের অনুচর আর সৈন্যদের মধ্যে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে। লুণ্ঠিত ধনসম্পদের অর্ধাংশ সে রাতেই কুপাকবি পৌঁছে দিল খানের কোষাগারে, খানের আদেশেই খাজা ইয়াহিয়াকে সে মেরেছে লোকচক্ষের অন্তরালে। এই হত্যার কথা জানতে পেরে সুলতান আলি বুঝল যে তার জন্যও সেই একই দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে। যেমন করেই হোক না কেন পালাতে হবে, ভাবল সে। শরতের এক ঘন কুয়াশাভরা দিনে সে দুজন দেহরক্ষীকে নিয়ে সবার অলক্ষ্যে সমরখন্দ কেল্লার পুর্ব দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলল সে পাঁজিকেন্তের দিকে। কিন্তু সেও বেশি দূর যেতে পারল না। সমরখন্দের কিছু দূরে পুবদিকে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদী সিয়াব। তারই তীরে তাকে ধরে ফেলে তৈমুর। 'অপদার্থের' মুণ্ডটা নিয়ে দেখান হল গাজী খলিফাকে।

জোহ্‌রা বেগম মনসুর বখশির সঙ্গে বিয়ের পরেই প্রথম আঘাতের স্বাদ পেল, যখন তার কাছে তার ছেলের মুণ্ডহীন লাশটা নিয়ে আসা হল। সে প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠল, পরনের পোশাকটা ছিঁড়তে লাগল, নিজের মাথায় ঘুষি মারতে লাগল, মুখ আঁচড়ে রক্ত বার করে ফেলল।

তা দেখে খুব মজা লাগল সবার, পরাজিত শত্রুর যন্ত্রণা দেখার মত আনন্দের আর কিছুই নেই তাদের কাছে।

৫

নদী বয়ে চলেছে শরতের বাতাসে খসে পড়া পাতার আবরণটাকে সঙ্গে নিয়ে।

পাতা পড়ে যেন হলুদ হয়ে গেছে জরাফশান নদী। অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত কয়েকশত অশ্বারোহী নদী পেরিয়ে চলে গেল সমরখন্দের ক্রোশ ছয়েক দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। সিয়াবের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তারা; চলেছে সতর্কভাবে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে। গ্রামগুলি এড়িয়ে চলার অথবা সবার অলক্ষ্যে সেগুলি পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। যদি বা তারা কোনো কৃষকের মুখোমুখী হচ্ছিল তো কৃষকরা ভয়ে তাড়াতাড়ি লুকাবার চেষ্টা করছিল। কৃষকরা ভাবছিল যে তারা শয়বানী খানের সৈন্যদল, যারা ইতিমধ্যেই সারা এলাকায় প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

কিন্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছে যে এই অশ্বারোহীরা নিজেরাই প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে শয়বানীর সৈন্যদলের মুখোমুখী হবার। যখন তারা সিয়াব পার হচ্ছিল রাতের বেলায় কাদামাটিতে কয়েকটা ঘোড়া আটকে যায়। লোকগুলি অনুচ্চস্বরে 'হেট্ হেট্' করছিল ঘোড়াগুলিকে টেনে তুলে আনার চেষ্টায় আর তাতে নিজেরাই আটকে যাচ্ছিল

কাদামাটিতে। নলখাগড়ায় মুখ হাত ছড়ে যাচ্ছিল। একজন আর থাকতে না পেরে জোরে গালিগালাজ করে উঠল। তখুনি একজনের কর্তৃত্বময় কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

'চেঁচাচ্ছিস কেন? বিপদ ডেকে আনতে চাচ্ছিস নাকি আমাদের ওপর?'

এ হল বাবরের গলা। সৈন্যটি বলল :

'মাফ করবেন জাঁহাপনা, এ ব্যাটাকে কিছুতেই টেনে তুলতে পারছি না।'

বিভিন্ন উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে জল এসে পড়ে সিয়াব নদীতে, তাই এই শীতের রাতে সিয়াবের ওপর জমা হয়েছে বাষ্প। আধা অন্ধকারে আর বাষ্প জমে থাকায় শক্ত মাটি আর গলা মাটির তফাৎ বোঝা যাচ্ছে না। দেরি করা চলে না বাবরের। দৃঢ়স্বরে তিনি বললেন :

'হয়েছে, ঘোড়াগুলোকে এখানেই ফেলে যেতে হবে!'

কাসিমবেগও সমর্থনে বলল :

'যাদের ঘোড়া রয়ে গেল তাদের আমি আমার ঘোড়ার দল থেকে ঘোড়া দেব।'

'পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলার সময় কত উট, ঘোড়া মারা পড়েছে, আমার ঘোড়া সে সব বাধা পেরিয়ে এসেছে। আর এখন এখানে একে মরতে হবে?' বিষণ্নস্বরে বলল তাহির (এই সৈন্যদলে সেও আছে)।

'এখন আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটজনক অবস্থা!' বাবর বললেন।

কাসিমবেগের অস্ত্রবাহী যে ঘোড়াগুলিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের একটিতে বসল তাহির। অন্য দু'জন সৈন্যের বাবরের দুটি বদলি ঘোড়ায় চড়ার সৌভাগ্য হল।

ঘোড়ার জন্য ভাবার আর সময় নেই! সমরখন্দ এসে পড়েছে প্রায়। যতটা সম্ভব দ্রুত আর কাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে এগিয়ে যেতে হবে! শয়বানী খানের লোকদের চোখে পড়লেই তারা সতর্ক হয়ে যাবে, গোটা সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তার বিরুদ্ধে টিকে থাকার মত ক্ষমতা ওদের আপাতত নেই।

সারা গ্রীষ্মকালটা বাবার ঘুরে বেরিয়েছেন পাহাড়ে পাহাড়ে, শাহ্রিসাবজ থেকে হিসার পর্যন্ত গিয়েছেন, সেখান থেকে গিয়েছেন জরাফশান নদীর উৎস ফান্দরিয়ার তীর পর্যন্ত। সমরখন্দের বেগরা নিজেদের সৈন্যবাহিনীসমেত হিসারের শাসক খুসরো শাহের কাছে চলে এসেছে। বাবরের সঙ্গে যারা আন্দিজান থেকে এসেছিল তাঁদের অনেকেই ফরগানা উপত্যকায় ফিরে গেছে, এত ঘন ঘন জায়গা পরিবর্তন আর আপাতদৃষ্টিতে সাফল্যের সম্ভাবনাহীন অভিযানে হাঁফিয়ে পড়েছিল তারা। খুব সম্ভব শয়বানী খানের গোপন সংবাদদাতারা তাকে জানিয়েছিল যে বাবরের সৈন্যদলে লোক ক্রমশই কমে যাচ্ছে। খান নিশ্চিত ছিল যে বাবর (কত সৈন্য আছে এখন তার, হাজারখানেক?) পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে অত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না, ফিরে যাবে আন্দিজান। অথবা আশ্রয় চাইবে তার চাচা আলাচা খানের কাছে, যে বেশ দূরে ইসিককুল ঝিলের ওপারে কোথাকার যেন শাসক। আর যাই হোক না কেন তার

সৈন্যদল এখন বাবরের সৈন্যদলের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি আর বর্তমানে যা আছে তার থেকে আরো অনেকগুণ বেশি বড় করে ফেলাও যায় খুব তাড়াতাড়ি তাই বাবর তো আর তাকে আক্রমণ করে বসবে না! নিঃস্ব হয়ে যাওয়া সমরখন্দ শহরে শয়বানী শ'পাঁচেক লোক রেখে দিল আর মূল সৈন্যদল নিয়ে ঘাঁটি গাড়ল শহরের থেকে সামান্য পশ্চিমে অবস্থিত খাজা দিদার নামে এক জায়গায়।

বাবর এক বিরাট ঝুঁকি নেবার সিদ্ধান্ত করেছেন—সমরখন্দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শয়বানীর নাকের ডগা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, যতক্ষণ সে এমন কোনো সম্ভাবনার কথা সন্দেহও করছে না। আবার খানের এই অজ্ঞানতা এক মুহূর্তে উবেও যেতে পারে। যদি তার চরেরা খানকে যথাসময়ে খবর দেয় তাহলে অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে সঙ্কটজনক। খান এমন ভাব দেখাবে যেন কিছুই জানে না। বাবরকে আরো কাছে এগিয়ে আসতে দেবে তার দুর্বল বাহিনী নিয়ে শহরের একেবারে কাছে, তারপর সর্বশক্তি নিয়ে আঘাত করবে তাদের। তাছাড়া শহরের ভিতরেও বাবরের চেয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্যই বেশি। আর বাবর যদি শয়বানীর হাতে পড়েন তো আর বেঁচে থাকতে হবে না তাঁকে। অবশ্য তাঁর বেগরা, সৈন্যরা যারা খানের দাসত্ব করবে তারা বেঁচে থাকবে—সুলতান আলির অধিকাংশ বেগদেরও শয়বানী নিজের সৈন্যদলে নিয়েছে। গাজী খলিফা মাভেরান্নহরে এক নতুন শাসকবংশের প্রতিষ্ঠাতা হতে চাচ্ছে, সেই জন্য তৈমুরের বংশধরদের নির্দয়ভাবে ধ্বংস করার শপথ নিয়েছে সে। এ কথা জানা আছে বাবরের। তাই তিনি স্থির করেছেন, লড়াই করতে করতে মরার। জীবন্ত অবস্থায় খানের হাতে পড়া চলবে না কিছুতেই।...

অন্ধকারের মধ্যেই তাঁর বাহিনী অনেক নালা, নদী, জলভরা খানাখোঁদল পেরিয়ে গেল। শরতের এই সময়ে নির্জন গাছপালাঘেরা এলাকাগুলি পেরিয়ে এসে পৌঁছল পুল মাগাক্ সেতুর কাছে। সেতুটা শহরের প্রাচীরের একেবারে কাছেই। দু'দিন আগে এখানে পাঠান হয়েছিল বিশ্বস্ত অনুচরদের, তারা এখানে তৈরি করে রেখেছে উঁচু উঁচু মই, সমরখন্দের প্রাচীর পার হবার জন্য। এখন জনাআশি সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে মইগুলি নিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে চলল খাড়া পাড়ের দিকে। আর বাবর অন্যান্যদের নিয়ে চুপিসারে এগিয়ে চললেন ফিরোজাদরওয়াজার দিকে, প্রবেশপথের বিপরীতে গাছ আর ঢিবির ছায়ায় লুকিয়ে রইলেন।

চারপাশ—নিস্তব্ধ। কেবল হঠাৎ দূর থেকে শোনা গেল প্রথম মোরগের ডাক। শহরের প্রাচীরের ওপর নেমে এসেছে রাতের অন্ধকার, ঘন মেঘে আবছা দেখা যাচ্ছে প্রাচীরের উপরাংশ আরও উপরে কোথায় চলে গেছে।

কাসিমবেগ বরাবরের মতই বাবরের পাশে দাঁড়িয়ে, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার। বাবর নিজেও সারা শরীরে কাঁপুনি অনুভব করছেন।

সমরখন্দের প্রাচীর। চারমাস আগে এমনই আঁধার রাতে বাবর এসেছিলেন এই

প্রাচীরের কাছে, খাজা ইয়াহিয়ার প্রবেশদ্বার খুলে দেবার অপেক্ষায়। কিন্তু দেখে ফেলেছিল তাঁদের, তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করেছিল তাঁদের ওপর, নিজের দলের আহত লোকদের আর্তনাদ, শত্রুপক্ষের লোকেদের ছুঁড়ে দেওয়া গা-জ্বলানো মন্তব্য সবকিছু শুনতে শুনতে ফিরে আসতে হয়েছিল তখন। প্রতারণা, খলতা, অবরোধ, অতর্কিতে আক্রমণ... মৃত্যু, মৃত্যু নিজের দলের লোকদের, শত্রুপক্ষের... এই সবকিছু মিলিয়েই হল এই যোদ্ধা, মাভেরান্নহরে সঙ্ঘবদ্ধ করার সঙ্কল্পে অটল রাজনীতিকের জীবন।

আবার যাতে ফাঁদ না পড়তে হয় বা শহরের ভিতরে তাঁর সমর্থকরা বিপদে না পড়ে, সেজন্য এবার বাবর প্রাচীরের কাছে তাঁর আসার কথা জানাননি কাউকে। কেবল নিজের ওপর আর তাঁর বেপরোয়া অনুচরদের ওপর ভরসা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই অনুচরের সংখ্যা এখন—বাবর সঠিক জানেন—দুশ' চল্লিশ। ওদিকে প্রাচীরের ভিতরে—পাঁচশ'। আর খানিকদূরে পাঁচ হাজার।

কে কার জন্য ফাঁদ পেতেছে এখানে? তিনি শয়বানীর জন্য না শয়বানী তাঁর জন্য?

কতবার বাবরের বেগরা তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছে এমন অদ্ভুত ঝুঁকি নেওয়া, বুঝিয়েছে যে ফিরে যাওয়াই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু নিজের পরিকল্পনা ত্যাগ করা—তার মানে মার খেয়ে ফিরে আসা আন্দিজানে; আহমদ তনবালের কর্তৃত্ব মুখ বুঁজে সইতে হবে। শরতের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় শীতের হিমের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দিন কাটাতেও ইচ্ছা হয় না! যুদ্ধই তাঁর পক্ষে শ্রেয়, যুদ্ধে হয় মরবেন নয় সিংহের মত যুদ্ধ করে শয়বানীকে পরাভূত করবেন।

সিংহ আর ধূর্ত শিয়ালের মত। ফাঁদ এড়িয়ে অতর্কিত শত্রুর উপর এসে পড়ে শিয়াল। সব ভরসা এখন এতেই।

কান খাড়া করে রইলেন বাবর।

রাত। নিস্তব্ধতা। নিজের বুকের ভেতর ধুকধুক করছে দারুণ জোরে—এ হলো তাঁর কিসমতের পদধ্বনি...

৬

যতক্ষণ সৈন্যরা প্রাচীন সমাধিস্থান চাকারদিজার পাশ কাটিয়ে মোটামুটি সমান জমির ওপর দিয়ে চলছিল ততক্ষণ তাহির মইগুলোর ভার অনুভব করেনি। কিন্তু যখন তারা খাতের খাড়া পাড় বেয়ে নিচে নামতে লাগল তখন ভারটা যেন ক্রমশ বাড়তে লাগল, হোঁচট খেতে লাগল সবাই আর অস্ফুট গালিগালাজ করতে লাগল। অন্ধকার গুহামুখটা পেরিয়ে গেল কুসংস্কারপ্রসূত ভয় নিয়ে—দিনের বেলায়ও কেউ এখানে আসে না আর

তারা... এই রাতের বেলায়... গুহাটা পেরিয়ে... আবার উপর ওঠা, বিশ্রী কাঁটাঝোপে আটকে যাচ্ছে পোশাকআশাক। শহরের প্রাচীরের এক অংশ দেখা যাচ্ছে খাতের মধ্যে থেকে, এখান থেকে প্রাচীর আরো অনেক বেশি উঁচু বলে মনে হচ্ছে।

ঘেমে নেয়ে শেষ পর্যন্ত সৈন্যরা মইগুলো নিয়ে এল প্রাচীরের নিচে।

সেইদলের নেতৃত্বে ছিল নুয়ান কুকলদাস। দলের লোকদের একটু জিরিয়ে নিতে দিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল সে।... ইঁটের প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় একটা পপলার গাছের সমান, আর প্রাচীরের ওপরটা এত চওড়া যে দু'জন লোক পাশাপাশি চলতেপারে তার ওপর দিয়ে, তা' জানে কুকলদাস। এখন কী হচ্ছে সেখানে? কে আছে ওখানে? মনে হচ্ছে সব নিস্তব্ধ। কোন আলো বা মশাল কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রহরীরা বোধহয় রাতে হিমে জমে যাওয়ায় নিচে প্রহরাকক্ষে গিয়ে ঢুকেছে।

তা যদি হয়—তো এই উপযুক্ত সময়।

মইগুলো সাবধানে তুলে ধরে সবাই প্রাচীরের উপরপ্রান্তে রাখল অত্যন্ত সতর্কভাবে ও নিঃশব্দে।

'উঠে যাও', 'অনুচরদের আদেশ দিল নুয়ান কুকলদাস ফিসফিস করে।

স্তব্ধ হয়ে গেল তারা সবাই। পঞ্চাশহাত উঁচু প্রাচীর, সোজা কথা নাকি, হাত ফসকে পড়লেই হল, হাড়গুলোও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! আর প্রহরীরা হঠাৎ যদি বুঝতে পারে? কার ওপরে সবার আগে এসে পড়বে তাদের ছোঁড়া তীর আর পাথর? মইটাও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

মইয়ের ধাপে প্রথম পা রাখল নুয়ান কুকলদাস।

'মরতে তো একদিন হবেই! বীরের মত মরাই ভাল!'

দ্বিতীয় মই বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল তাহির, সেটিও বেশ মজবুত—অনেকের ভার ধরে রাখতে পারে।

এবার বাকী সবাইও উঠতে লাগল। একটু পরেই নুয়ান ওপরে পৌঁছে গেল। চারপাশে তাকাল। দেওয়াল বরাবর চওড়া করে পাতা তক্তার ওপর দিয়ে এমন কি ঘোড়ায় চড়েও যাওয়া যায়।

প্রাচীরের ওপরের খাঁজের আড়ালে লুকিয়ে তাহির দলের অন্য একজনকে সাহায্য করল উঠে আসতে, ফিসফিস করে তাকে জিজ্ঞাসা করল:

'তোর কুড়ুলটা কোথায়?'

লোকটা কোমরবন্ধ থেকে কুড়ুল খুলে নিয়ে এগিয়ে দিল তাহির দিকে।

'খাঁজগুলোর গায়ে গায়ে লুকিয়ে থাক সবাই!' আদেশ দিল নুয়ান।

প্রাচীরের ওপর এই খাঁজগুলি না থাকলে নিচে চত্বর থেকে তাদের দেখে ফেলা খুব সহজ হত। বড় বড় খাঁজের আড়ালে আড়ালে মগ্ন হয়ে থাকা অন্ধকারে তাদের ছোট্ট দলটিকে পুরোপুরি সমবেত করা গেলে, তারপর প্রাচীরের গায়ের তক্তার ওপর

দিয়ে দ্রুত ছুটে চলল তারা নিচে দরওয়াজার দিকে। নামবার পথে কিছুদূর অন্তর অন্তর প্রহরাকক্ষ ছিল অবশ্য। যখন তারা প্রথমটির কাছে গিয়ে পৌঁছল ভিতর থেকে একজন কিপচাক ভাষার টানে ঘুমন্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ইরিস্তাই, তুই এলি নাকি? এত দেরি হল কেন? তোর জন্য অপেক্ষা করে করে...'

স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। তাহির দু'হাতে কুড়ুলটা আঁকড়ে ধরে বলল: 'হ্যাঁ, আমি... আমি এই...'

গলা চেনা ঠেকল না প্রহরীর কাছে, উৎকণ্ঠিত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল সে: 'কে তুই?'

নুয়ান কুকলদাস ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার কাছে, দরজা খুলে প্রহরী বাইরে আসামাত্রই বর্শা গিয়ে বিঁধল তার দেহে। এই প্রহরীর মৃত্যুচীৎকার নিচের প্রহরীদের জাগিয়ে তুলতে পারে।

'তাহির দরওয়াজার দিকে দৌড়াও। দরওয়াজার দিকে—শীগগির!' বলে কুকলদাস জনদশেক সৈন্য নিয়ে পরের প্রহরাকক্ষের দিকে ছুটে গেল। আর তাহির এক তক্তা থেকে আর এক তক্তায় লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে ছুটতে আরও দুটি প্রহরাকক্ষ পেরিয়ে গেল (সেগুলির দরজা ভেজানো ছিল), কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিচে ফিরোজাদরওয়াজার কাছে পৌঁছে গেল।

এই প্রবেশপথের প্রহরার দায়িত্ব ছিল ফজিল তরখানের উপর। তার দলের একশ' পঞ্চাশ জনের বেশির ভাগই যে যার ঘরে ফিরে গেছে। প্রাচীরের উপরে অবস্থিত প্রহরাকক্ষগুলিতে ও প্রবেশপথের কাছে ছিল মোট জনবিশ, তারাও তন্দ্রাচ্ছন্ন। চেতনা ফিরে অস্ত্র হাতে তুলে নেবার অবসর পেল খুব অল্প কয়েকজন—দ্রুত হাত চালাল নুয়ান। তাহির কুড়ুলহাতে ফটকের কাছে ছুটে গিয়ে জোরে আঘাত করতে লাগল ঘোড়ার মাথার মত বিশাল তালার উপর। প্রথম কয়েকবার আঘাতে কিছু হল না। ফজিল তরখানের বাড়ি কাছেই, ইতিমধ্যে তাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। পিছনে জ্বলন্ত মশালহাতে তার অনুচররা। তাদের দু'জন দেখতে পেল কে যেন ফটকের তালাটা খোলার চেষ্টা করছে—দুটো তীর এসে ফটকের কাঠের পাটায় বিঁধে গেল—একটা তাহিরের মাথার সামান্য ওপরে, অন্যটা সামান্য ডানদিকে। হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে গেল ফটকের কাছে। লড়াই হচ্ছে খঞ্জর, তরোয়াল, বর্শা দিয়ে, না-হয় ঘুষোঘুষি। নুয়ান কুকলদাস অত্যন্ত তৎপর ও বুদ্ধিমান। ফজিল তরখানকে তরবারির এক আঘাতে ফেলে দিল।

তাহির ওদিকে উন্মত্তের মত আঘাত করেই চলেছে একবার তালার উপর, একবার শিকলের উপর একবার পরিখার সেতুর শিকল লাগানো আছে যে কড়াগুলি, তার উপর। কড়া ও শিকলগুলি ঝনঝন করে খুলে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর তালাও খুলে পড়ে গেল।

দুর্গপ্রাচীরের বাইরে চওড়া জল ভরা পরিখা। যতক্ষণে তাহির ফটকটা খুলছিল, ততক্ষণে বাকীরা শিকলের পাক খুলে সেতু নামিয়ে দিল পরিখার উপর দিয়ে।

ইতোমধ্যে পরিখার অপরপারে বাবর আর কাসিমবেগ দলের সবাইকে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ফটক খুলে সেতু নেমে আসা মাত্রই তাঁরা খোলা তলোয়ার হাতে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে গিয়ে ঢুকলেন দুর্গের ভিতর। ফজিল তরখানের যে সব অনুচর ও সৈন্য জীবিত ছিল পালাতে আরম্ভ করল তারা। কাসিমবেগ সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করল।

এর পরের ঘটনাবলী আরও দ্রুত ঘটে চলল। নুয়ান আক্রমণ করল চাররাহদরওয়াজা—পিছন দিক থেকে, শহরের মধ্য থেকে। অন্য এক দল স্বয়ং বাবরের নেতৃত্বে ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সোজানগরানদরওয়াজার কাছে প্রহরীদের উপর। চারটি প্রবেশপথই দখল করা দরকার, শয়বানীর সৈন্যদল যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে হুড়মুড়িয়ে, কিছুই বলা যায় না।

শীঘ্রই লড়াইয়ের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। শেখজাদা দরওয়াজার কাছে খাজা ইয়াহিয়ার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সুসজ্জিত বাড়িতে আরামে ঘুমিয়ে ছিল কোতোয়াল জানওফা। চীৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গিয়ে ভয়ে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না সে; বাইরে বেরিয়ে এসে প্রবেশপথ প্রহরায় নিযুক্ত প্রহরীদের সঙ্গে ধাক্কা খেল সে। শহর দখল করে নিয়েছে বিরাট সৈন্যদল—তাদের তাড়া খেয়ে এখন ওরা পালাচ্ছে। কে শত্রু, কে মিত্র কিছুই বোঝার উপায় নেই—সবাই চেঁচাচ্ছে, গালাগালি করছে আর... দৌড়চ্ছে বাঁচবার জন্য।

কোতোয়াল জানওফা অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিল—ঘোড়ার মুখ ঘোরাল শেখজাদাদরওয়াজার দিকে, একমাত্র সেখানেই বাবরের লোকেরা এসে পৌঁছয়নি তখনও। কোতোয়ালের হুকুমে ফটক খুলে দেওয়া হল অবিলম্বে। নিজের একশ'জন হতবুদ্ধি সিপাহী সঙ্গে নিয়ে সে চলল খানের ছাউনির দিকে, হাজার হাজার সৈন্য এসে বাবর সমরখন্দ দখল করেছেন, এ খবর দেবার জন্য।

সমরখন্দবাসীরা ভয়ে ভয়ে রাতটা কাটিয়েছে, আলো জ্বালায়নি বা রাস্তায় উঁকিও দেয়নি, তাদের শহরে কী ঘটছে না ঘটছে কিছুই বুঝল না তারা। কেবল ভোরবেলায় নকীবদের ঘোষণা আর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়া গুজব শুনে তারা জানতে পারল যে বাবর তাদের মুক্ত করেছেন পরদেশী খানের হাত থেকে। শয়বানী খানের প্রতি অসন্তুষ্ট লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। সর্বত্র কারিগরদের বাড়িঘরদোর লুণ্ঠিত হয়েছে, কৃষকদের শস্য দলিত করেছে অশ্বারোহী সৈন্যরা। নির্দয়ভাবে নিহত খাজা ইয়াহিয়া আর তার দুই পুত্রের সমর্থকরা কালো পতাকার নিচে সমবেত করেছে কারিগর আর কৃষকদের প্রতিশোধ নেবার জন্য। ভূতপূর্ব সরকারের কর্মচারীরা যারা শয়বানীর জয়লাভে ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা হারিয়েছে তাদের মনেও প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল।

বাবরের দলের দু'শচল্লিশজন লোকের সঙ্গে যোগ দিল আরও হাজার দশেক। আরম্ভ হল দাঙ্গাহাঙ্গামা, দলে দলে লোক ছুটে বেড়াতে লাগল শহরময়। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য। খান খলিফার যে-সমস্ত লোক লুকিয়ে পড়েছিল, টেনে টেনে রাস্তায় বার করে আনা হচ্ছে তাদের। কয়েকজনকে ধরা হল পালাবার সময়। মারতে লাগল তাদের ছোরা, কুড়ুল, লাঠি দিয়ে। খুনের পর খুন চলতে লাগল। তাদের এই অন্ধ ক্রোধের তো সত্যিই কারণ আছে (গত দশ বছর ধরে সাধারণ মানুষ যে দুঃখ কষ্ট পেয়েছে তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে) সেই সঙ্গে মিলিত হল যারা কিছু সময়ের জন্য নিজেদের অপমান আর কষ্টের বদলা নিতে পারছিল না, তাদের নিষ্ঠুরতা।

যখন দুর্গপ্রাচীরের ওপারে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত শয়বানী খানের বাহিনী দেখা গেল তখন ওদিকে সূর্য উঠছে। পরিখার উপরের সেতুগুলি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। শহরের সব প্রবেশপথ বন্ধ, নিখুঁত প্রহরার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

শহরে হাঙ্গামা কিন্তু তখনও থামেনি।....

৭

সারারাত তাহির শহরময় ছুটে বেড়িয়েছে। জয়লাভের আনন্দ ক্লান্তি ভুলিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে কেবল অনুভব করছে প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না। শেষে আর থাকতে না পেরে কাসিমবেগের অনুমতি নিয়ে সে রুটির দোকানের সারির দিকে গেল—ভোর হয়ে এসেছে প্রায়, কিন্তু খেতে পাবার কোনো আশা নেই—রাস্তাঘাটে তখনও চলেছে দাঙ্গাহাঙ্গামা।

বাজারের চত্বরে অনেক লোক জড় হয়েছে, খানের কয়েকজন অনুচরকে ঘিরে ধরে পাথর দিয়ে মারছে তাদের। চারজন ইতোমধ্যে রক্তবন্যায় ভাসছে, নিঃশ্বাস পড়ছে না, বাকীরা মুখে হাতচাপা দিয়ে আর্তনাদ করছে। তাদের মধ্যে বছরকুড়ি বয়সের এক যুবক — তার গায়ের জামাটা ছিঁড়ে কুটিপাটি, সারা শরীরময় ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে, কাকুতিমিনতি করছে সে তাকে প্রাণে না মারার জন্য। ঘোড়া চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে চীৎকার করে বলল তাহির:

'এই, শোন সবাই! বাবর-মির্জা আদেশ দিয়েছেন! যারা হার স্বীকার করছে, তাদের বন্দী কর! অকারণ রক্তপাত ঘটিও না! এই ছোকরাও মুসলমান! বন্ধ কর সব! আমরাও নোকর। নোকরের কী দোষ? দোষ এদের খানের!... এখুনি বন্ধ কর এসব! মির্জা বাবরের হুকুম তামিল কর!'

এমন সময় দু'জন অশ্বারোহী সৈন্য ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এল। তাদের সাহায্যে তাহির আস্তে আস্তে শান্ত করল ভিড়ের লোকদের।

গোলমালে উত্তেজনায় সে ভুলেই গিয়েছিল কী কারণে এখানে এসেছিল।

শয়বানীর তিনজন অনুচরের এখনও সামান্য শ্বাস পড়ছে—তাদের বন্দী হিসাবে নিয়ে যাবে ভাবল। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে এক দীর্ঘকায় লোক ডাকল তাকে:

'দাঁড়াও তো...তাহির, নাকি?'

লোকটির দিকে তাকাল তাহির। হলদেটে গোঁফ, লম্বা, মজবুত চেহারা, হাতে তার ভারী একটা লাঠি। তাহিরের মনে পড়ল তিনবছর আগের ঘটনা, যখন এখানে দাঁড়িয়েই সে ক্ষুধার্ত সমরখন্দবাসীদের মধ্যে রুটি বিলোচ্ছিল।

'মামাত যে! তোমার হাতে লাঠি কেন? তুমি নিজেও কি কিপচাক নও?'

'আরে ভাই, শয়বানীর সাঙ্গোপাঙ্গরা সব উপজাতির লোকদের উপরই খুব অত্যাচার চালিয়েছে। আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে!'

এই লোকটির কাছে সে জিজ্ঞাসা করেছিল রাবিয়ার কথা, সেকথা মনে পড়ে তাহিরের বুকের মধ্যে পুরনো ব্যথাটা চাগিয়ে উঠল। বাবরের সৈন্যদলের লোকদের সঙ্গে বন্দীদের পাঠিয়ে দিয়ে তাহির লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে, মামাতকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল।

'মামাত-ভাই, তোমার মনে আছে আমার অনুরোধ?'

'জানতাম তুমি জিজ্ঞাসা করবে, ভাই... সেজন্যই তো ডাক দিলাম। ...আমার বিবি বেচারি কিছু শুনেছিল... ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে, তুমি যার কথা বলেছিলে। আন্দিজানের মেয়ে তো?'

'কুভার।'

'একই কথা, আন্দিজানের, ঐ দিকেরই। তাকে লুঠ করে এখানে নিয়ে এসেছিল। তারপর তুর্কীস্থানের এক সওদাগর তাকে কিনে নিয়ে যায়।'

'তারপর, তারপর?'

'তারপর সেই সওদাগর শয়বানীর দলের সঙ্গে সমরখন্দ আসে।'

'সেই মেয়েটিকে নিয়ে? বেঁচে আছে সে?'

'বেঁচে আছে!'

মামাতের হাত চেপে ধরল তাহির, হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করল:

'তার নাম রাবিয়া, রাবিয়া?'

'আমার স্ত্রীর জানা ছিল না তার নাম।

'দেখেছিল সে মেয়েটিকে?'

মামাত যখন ঘাড় নেড়ে জানাল দেখেছিল তাহির তাকে ঝাঁকুনি দিতে লাগল:

'কোথায়? কোথায়? শীগগিরি বল!'

'ফজিল তরখানের বাড়িতে।...তোমাদের লোকেরা তাকে আজ রাতে...' গলার উপর দিয়ে লাঠি চালিয়ে বুঝিয়ে দিল মামাত তার কি হয়েছে।

'তার বাড়ি কোথায়?

'চল আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দেব।'

লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠল তাহির, মামাতকে বসাল পিছনে। লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মামাত তাহিরের পোশাকটা আঁকড়ে ধরে সমরখন্দের গলিঘুঁজি দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

'খোদা, দেখো, বুকটা যেন ভেঙে দিও না! ও যেন বেঁচে থাকে! এ মিনতি রেখো, খোদা।' ছ'বছর ধরে নিষ্ফল চেষ্টা করেছে খুঁজে পাবার। এতদিনে সে নিজেকে বুঝিয়েছে রাবিয়াকে খুঁজে পাওয়া তার ভাগ্যে নেই। এই চিন্তায় সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন আশা হঠাৎ যেন ঝলকে উঠল বিদ্যুৎ চমকের মতো। প্রত্যাশায় আনন্দ ও কষ্ট দুই-ই অনুভব করছে সে, কারণ সে প্রত্যাশা বিদুৎ চমকের মতই নিভে যেতে পারে। সে সম্ভাবনার চিন্তায় তার বুকের মধ্যে ভীষণ ব্যথা করে উঠল।

দু'তলা একটা ইঁটের তৈরি বাড়ি দেখিয়ে মামাত বলল, 'এই বাড়ি!' বাড়িটির পিছনে দেখা যাচ্ছে প্রশস্ত বাগান।

বাড়ি, উঠান ও বাগানের সবগুলো ফটকই হাট করে খোলা—বাবরের অস্ত্রধারী সৈন্যরা বাইরে বার করে নিয়ে আসছে শক্ত করে আঁটা অলঙ্কৃত সিন্দুকগুলি, লাল নকশাকরা গালিচা, মোড়ক, পোঁটলা, বাসনপত্র, অনেককিছু। ফজিল ছিল বেশ বড় ধনী ব্যবসায়ী, শয়বানী খানের অন্তরঙ্গ তার ধনসম্পত্তি সব দখল করে নিয়ে বাবরের কাজে লাগান হবে।

ফটকের কাছে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল তাহির, মামাতকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভুলে গেলে সে, পরিচিত সৈন্যরা তাকে কীসব বলল কিছুই শুনতে পেল না সে, সোজা ছুটে গেল সে জেনানা মহলের দিকে। বারান্দায় সাদা কাফনে চাপা দিয়ে শোয়ান রয়েছে ফজিল তরখানের রক্তাক্ত লাশ। বাড়ির দ্বিতল থেকে আসছে মেয়েদের কান্নার আওয়াজ—মৃত ফজিল তরখানের বেগমরা আচারপালন করছে স্বামীর শোকে কেঁদে, কেউ বা কাঁদছে নিহত স্বামীর ধনসম্পত্তি অন্যেরা নিয়ে যাচ্ছে দেখে, আবার কেউ বা কাঁদছে ভয়ে যে এবার তাদের কী হবে।...

নিচের তলায় ঘরগুলির খোলা দরজা দিয়ে দেখল তাহির। কোথাও কেউ নেই। এখানে ওখানে পড়ে মেয়েদের অলঙ্কার, পোশাক-আশাক। এই তরখানের কয়টি বিবি আছে? রাবিয়া যখন তার হাতে পড়েছে, তখন নিশ্চয়ই রাবিয়াকেও সে বিয়ে করেছে? নাকি সে কেবল...দাসী?

উঠানের মাঝখানে বেরিয়ে এসে তাহির উপরদিকে, যেখান থেকে কান্না ভেসে আসছিল, তাকিয়ে হাঁক পাড়ল;

'এই, রাবিয়া আছে ওখানে?! রাবিয়া! কুভার রাবিয়া আছে ওখানে?' হঠাৎ কান্না থেকে গেল। মাথায় সবুজরুমাল বাঁধা এক মহিলা এসে দাঁড়াল ওপরের বারান্দার প্রান্তে।

তাহিরের মনে হল তার চোখ, ভ্রূ যেন অত্যন্ত পরিচিত...

'রাবিয়া! রাবিয়া!'

সবুজরুমাল বাঁধা মহিলাটি তাহিরকে দেখে চমকে সরে গেল, তারপর আবার এসে দাঁড়াল, এবার তাহির দেখতে পেল তার মখমলের পোশাক, গলায় মুক্তার মালা। রাবিয়া, সত্যি সত্যি রাবিয়া। কিন্তু আবার সরে গেল মহিলাটি: সৈন্যটির বিশাল চেহারা, গোঁফদাড়িভরা মুখ, মুখমন্ডলের ক্ষতচিহ্ন তার মনে ভয় ধরিয়ে দিল, কিন্তু গলার স্বর... গলার স্বর তার, তাহিরের। সেই স্বর বারবার ডাকছে তাকে বোঝাচ্ছে:

'রাবিয়া! রাবিয়া! আমি তাহির!'

ওপর থেকে তার মর্মবিদারী চীৎকার শোনা গেল:

'তাহির-আগা!'

এবার সে ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। তাহির দেখল সিঁড়ি বেয়ে কি দ্রুত নেমে আসছে তার পাগুলি, শুনল টুং টুং করে বাজছে তার বেণীতে ঝোলান ঝুমকো অলঙ্কারগুলি। চোখ মুখ সেই আগের দিনের রাবিয়ারই, কিন্তু অন্য ধরনের পোশাক-আশাক পরায় তার ভিতর কেমন যেন এক পরিবর্তন হয়েছে।

রাবিয়া ছুটে নিচে এসে থেমে গেল। তাহিরের থেকে চোখ সরাতে পারছে না। তাহির স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রতিমার মত। ভয়ে ভয়ে রাবিয়া ফিসফিস করে বলল:

'আপনি জিন নয় ত, তাহির-আগা?'

অনেকদিনই রাবিয়া ধরে নিয়েছে যে তাহির বর্শাবিদ্ধ মারা গেছে তাই প্রতিদিন খোদার কাছে দোয়া করেছে ওর রুহুর ওপর রহমত জানাতে। অনেক সময়ই সে দোয়ায় বলেছে, 'তাকে আর জীবন্ত কোনদিনই দেখব না, অন্তত স্বপ্নে তাদের দেখতে দাও!' খোদা তার দোয়া শুনেছেন নাকি?

'আমি বেঁচে আছি রাবিয়া! ছ'বছর ধরে খুঁজতি তোমায়!'

'বেঁচে আছেন আপনি?' তাহিরের দিকে এগিয়ে এল রাবিয়া। ছুঁয়ে দেখল তার পোশাক, তরবারি, তার হাতগুলো। যখন তাহির তাকে বুকে চেপে ধরল কেবল তখনই রাবিয়ার বিশ্বাস হল যে সে ভূত নয়... 'বেঁচে আছে! খোদা, ও বেঁচে আছে!'

তাহির তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে এলোমেলো কথা বলতে লাগল:

'রাবিয়া, আমার জীবন! তুমি, তুমিও বেঁচে আছ। ছ'বছর খুঁজেছি তোমাকে! কোথায় ছিলে তুমি? ছ'বছর... তোমাকে ছাড়া...'

হঠাৎ রাবিয়ার মনে পড়ল—এখন কে সে। হায় কপাল! ধনী সওদাগরের সপ্তম 'বিবি'! তাহিরের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ঝটকা দিয়ে:

'আমাকে ছোঁবেন না, তাহির-আগা! আমি আপনার উপযুক্ত নই!'

তাকে কিনেছিল ফজিল তরখান সেই লুঠেরা সৈন্যদের কাছে একথলি মোহর

দিয়ে। বুড়োর প্রতি অসম্ভব ঘৃণা হত রাবিয়ার। বহুদূরে তুর্কীস্তানের ইয়াসিস শহরে তাকে বিয়ে করে বুড়ো, তারপর দিনদশেকের মধ্যেই তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বুখারা গিয়ে ফিরে আসে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে। বুখারার মেয়েটিই ছিল তার স্ত্রী, আর বাকীরা... ঐ ... থাকত হারেমে, ঐ পর্যন্তই। বয়স্কাদের সঙ্গে যুবতী সেও। আসত মাঝেমধ্যে (খুব কদাচিৎ) রাতের বেলায় তার কাছে—বন্দিনী, দাসী মনে করে। সে বাধা দিত—ফিরে যেত বুড়ো।... কিন্তু এই কলঙ্ক ঘোচাবে কী করে সে, একসময় সে ছিল তাহিরের বাগদত্তা তারপর বিবাহিতা কি না, বোঝার জো নেই...

মনের দুঃখে কেঁদে ফেলল রাবিয়া মুখে হাত চাপা দিয়ে। তার গলার মুক্তোর মালা, বেনীতে লাগান রূপার অলঙ্কার, রেশমী পোশাক—সবই সওদাগরের অর্থে কেনা এ সত্যি!

'রাবিয়া সত্যি করে বল তো, তুমি স্বামীকে ভালবাস? সেই জন্য কাঁদছ?'

'আমাকে বিক্রী করেছে ওর কাছে জোর করে।... ওকে ঘৃণা করি আমি, ঘৃণা করি, ঘৃণা করি!'

'তাহলে তুমি কাঁদছ কেন?'

'তোমার জন্য তো নিষ্কলঙ্ক থাকতে পারলাম না আমি! আমি কিন্তু তোমাকে ভুলে যাইনি তাহিরজান! আল্লাহ্ আছেন মাথার ওপর সাক্ষী।... আর ঐ সওদাগর... বাঁদী করতে চেয়েছিল আমায়।'

যে ব্যথায় তাহিরের বুক টনটন করছিল তা সে বলে ফেলল অবশেষে:

'তোমার... কোন সন্তান আছে?

'কেবল নামেই স্ত্রী ছিলাম আমি।... বিধবার মতো ছিলাম...

দাসী ছিলাম।...'

ব্যথায়, করুণায় ভয়ে গেল তাহিরের মন। অবশ্যই একথা আগেও ভেবেছে তাহির, অসহায়া রাবিয়ার ওপর কেবল একজন অত্যাচারীর হাতই পড়বে না। তবুও যখন তাকে খুঁজছিল ভাবছিল কেবল: 'তাকে জীবিত পেলে হয়!' আর এখন সে তার সামনে দাঁড়িয়ে—জীবিত। আগের সেই কুসুমলিটি আর নেই—হতভাগিনী এক মেয়ে, সন্তান নেই, পরিবার নেই, কুটিল হাতে ভাঙা খেলনা, দামী পোশাকপরা, হারেমের বিধবা।... গভীর ক্ষতস্থান সারিয়ে তোলা হলেও, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দাগ রেখে যায় সে। তাহির ভাবল: এসব কিছুর ছাপ রাবিয়ার মন থেকে মুছে দেওয়া খুব সহজ হবে না, আর সে নিজেও যা কিছু এখন শুনছে তা ভুলে যাবে না খুব সহজে।

তবুও, তাদের এই মিলনে অশ্রুপাত হলেও এ তাদের জীবনে বিরাট আনন্দও তো এনেছে!

'রাবিয়া, আর কেঁদো না, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও যে আমরা দু'জনেই বেঁচে আছি, আমাদের দেখা হল, অবশেষে!... চল এবার!'

'কোথায়?'

'তুমি কি আমার বাগদত্তা নও?'

'তাহলে, আমি... আমার জিনিসপত্র নিয়ে আসি!'

'এখান থেকে কিছু নিতে হবে না। এ সবের কথা ভুলে যাও। এখানকার সব কথা ভুলে যাও। দ্বিতীয়বার আমাকে আর মনে করিয়ে দিও না!'

নিহত সওদাগরের ধনসম্পত্তি তখনও বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল সৈন্যরা, সেদিকে তাকিয়ে লজ্জাজড়িত স্বরে রাবিয়া বলল:

'বোরখা চাপা না দিয়ে... রাস্তা দিয়ে যেতে লজ্জা... করে আমার।'

তাহির নিজের চোগাটা খুলে দিল। সেটা মাথায় চাপা দিল রাবিয়া। রূপালী চোগাটা তার পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে ফেলল প্রায়। রাবিয়াকে ঘোড়ায় বসিয়ে দিল তাহির।...

শীঘ্রই বিয়ে হয়ে গেল তাদের—যুদ্ধের সময়ে আর অপেক্ষা করা চলে না।

আবার সমরখন্দে

১

নরম-সাদা চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে সমরখন্দের ঘরবাড়ি ছাদ, দেওয়াল, গাছপালা গম্বুজগুলি।

বুস্তান-সরাই মহলের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবর শহরের শোভা উপভোগ করেছিলেন। সাদা তুষারের বুকে গাছের শাখাপ্রশাখার জড়াজড়ি তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল সাদা কাগজে নস্তালিক অলঙ্করণের কথা। যেমন আলিশের নবাইয়ের যে পত্রটি আজ তিনি পেয়েছেন হীরাট থেকে। আবার তাঁর মন ভরে গেল গর্বে আর অনন্দে।

বাবর দুঃসাহসী প্রয়াসে শয়বানীর কাছ থেকে সমরখন্দ ছিনিয়ে নেওয়ার পর শায়েররা তাঁর তারিফ করে ইতোমধ্যেই এই উপলক্ষে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তারিখ কবিতা রচনা করেছেন—সেগুলির প্রথম আটটি শব্দের সংখ্যা রাশি যোগ করলে বাবরের বিজয়ের সঠিক তারিখ দাঁড়ায়। কিন্তু আলিশের নবাইয়ের অভিনন্দনবাণীটি গদ্যে লেখা হলেও অনেক বেশি আনন্দ দিয়েছে তাঁকে। হীরাট সমরখন্দ থেকে এত দূর, কত প্রখ্যাত বক্তি আর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নবাইয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এখন দেখা যাচ্ছে মহান কবি তাঁকে, বাবরকে জানেন, অতদূর থেকে তাঁর কার্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য

রাখছেন। 'এবার আপনি নিজের নামের উপযুক্ত বীরত্ব দেখিয়ে সমরখন্দ জয় করেছেন,' লিখছেন নবাই—এতে বোঝা যায় যে তিনি জানেন বাবরের প্রথমবার সমরখন্দ জয়ের কথা আর এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে বাবরের 'শের' নাম বৃথা যায় নি। হয়ত আলিশের নবাইয়ের কথায় আরও একটি ইঙ্গিত আছে: মির আলিশেরের মানবপ্রেম সুপরিচিত, তিনি হয়ত খুব ভাল চোখ দেখেননি বাবরের প্রথম সমরখন্দ দখল যখন সাতমাস অবরোধের ফল সমরখন্দবাসীদের অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সেবারের ঘটনাকে সিংহের আক্রমণ বলা যায় না কিছুতেই!

প্রশস্ত কক্ষের গভীরে গেলেন বাবর যেখানে সুদক্ষ শিল্পীর হাতে খোদাই কাজ করা দরজাসমেত আলমারিতে তার পুস্তকসংগ্রহ সংরক্ষিত ছিল। আলমারীর কাছেই রাখা আছে সুগন্ধি চন্দনকাঠ নির্মিত ছ'পায়াবিশিষ্ট একটি নিচু মেজ, তার উপর রয়েছে সোনালী সুতো দিয়ে বাঁধা একটি পত্র — এটিই তিনি পেয়েছেন নবাইয়ের কাছ থেকে। জরির আসনে বসে বাবর আবার একবার পড়তে আরম্ভ করলেন পত্রটি। পত্রের কয়েকটি অংশে এবারে বিশেষ অর্থ খুঁজে পেলেন, প্রথমবার পড়ার সময় সেগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। আন্দিজানের এক স্থপতির কাছে নবাই জানতে পেরেছেন বাবরের কাব্যপ্রতিভার কথা তাই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে বাবরকে আহ্বান জানিয়েছেন শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই নয় আরও সাহস ক'রে কবিতারচনাতেও নিজের শক্তি পরীক্ষা করতে। ঐ স্থপতি নিশ্চয়ই মওলানা ফজলুদ্দিন—আন্দাজ করলেন বাবর। বোঝা যাচ্ছে তিনিই হীরাটে পৌঁছে নবাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাঁকে বলেছেন বাবরের কবিতারচনা খেয়ালের ও আরও অনেক কিছুর কথা।... বাবরের ইচ্ছা হল পত্রের উত্তরের সঙ্গে একটি কবিতাও যোগ করে দিতে। সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাটিই বেছে নিতে হবে অবশ্যই। কিন্তু কোনটি?

অনেকক্ষণ ধরে পাতা উল্টিয়ে চললেন বাবর নিজের মোটা খাতাটার যেখানে তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন নিজের কাব্যপ্রচেষ্টা।

নিঃসঙ্গতার বিষাদ নিয়ে সেই যে গজলটি তিনি একসময় আরম্ভ করেছিলেন যখন তাঁকে একের পর এক বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হতে হয়, সেটি পাঠালে কেমন হয়? তখন তাঁর নিজেকে উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত মনে হয়েছিল। বাবর শুনেছেন যে এমন কি মহান মির আলিশেরকেও ভোগ করতে হয়েছে অন্তরঙ্গজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফল, তাঁর প্রিয় বন্ধু সুলতান হুসেন বাইকারাও তাঁকে সাহায্য করেননি, মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করার যে আকাঙ্খা ছিল তাঁর তাকে তৃপ্ত করতে দেননি। বাবর যদি নিজের কবিতায় প্রকাশ করতে পারতেন নবাইয়ের অন্তরের কথা!

অসম্পূর্ণ সেই গজলটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করবেন নাকি? কিন্তু তখনকার সেই নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আর নেই এখন (শয়বানী আবার শহর ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, সমরখন্দের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে ঠিকই, তবু বিজয় আর জনস্বীকৃতি

লাভের আনন্দে এখন পরিপূর্ণ বাবরের মন)। তাছাড়া নোকর এসে তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাল।

'অধীনের অপরাধ মাফ করবেন, জাঁহাপনা...'

'কী হয়েছে?' অসন্তুষ্ট বাবরের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

'আপনার ওয়ালিদা সাহেবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

'তাই নাকি?' লাফিয়ে উঠলেন বাবর। 'এসে পৌঁছেছেন?'

'পৌঁছেছেন। আর বেগমও এসে পৌঁছেছেন।'

'চমৎকার!' উচ্ছ্বসিত বাবর কাগজকলম সরিয়ে রাখলেন।

২

প্রায় ছ'মাস হল তাঁদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ নেই। কুতলুগ নিগর-খানুম, খানজাদা আর আয়ষা বেগম এতদিন অপেক্ষা করছিলেন ওরা-তেপায়, যতক্ষণ না বাবর তাঁদের আনার জন্য বিশ্বস্ত লোক পাঠান।

নিচের তলায় প্রশস্ত কক্ষে বাবর তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। বাবরকে আলিঙ্গন করলেন মাতৃদেবী, বাবর অনুভব করলেন কেমন যেন কৃশ তাঁর দেহ, হাত বেশ হালকা হয়ে গেছে। বোনের গালে রক্তিমাভা—বোধহয় হিমের মধ্য দিয়ে আসার ফলেই। চোখ তাঁর উদ্দীপনায় উজ্জ্বল: দীর্ঘপথ তাঁকে একটুও ক্লান্ত করেনি, খুশি, আরো সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে। খানজাদা বেগম বাবরের ডানকাঁধ ছুঁলেন—মহিলার তার পুরুষ আত্মীয়কে এইভাবে অভিবাদন জানানোরই প্রথা। অত্যন্ত আনন্দ হল বাবরের। আয়ষা বেগম সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছেন নীরবে, মাথা থেকে পশমের আবরণটি খোলেননি তখনও।

'আপনাদের এত দেরি হল কেন? কয়েক সপ্তাহ ধরেই আপনাদের অপেক্ষায় আছি!'

'এর পিছনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে ভাইজান, তাড়াহুড়ো করার উপায় ছিল না আমাদের,' বলে মৃদু হেসে খানজাদা ইঙ্গিতময় দৃষ্টি ফেরালেন আয়ষার দিকে।

সত্যি কথা বলতে কি স্ত্রীর বিরহে বিশেষ কাতর ছিলেন না বাবর, যদিও কোনো এক সময় লিখেছিলেন যে তাঁর পায়ের নিচে স্থান নিতেও প্রস্তুত তিনি। তরুণবয়সের সেই সব স্বপ্ন উধাও হয়েছে এখন। তবুও আয়ষা বেগমের প্রতি অমনোযোগী হতে পারেননি এবং হতে চানওনি তিনি। সতরবছয়সী ক্ষীণকায়া স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে ডানকাঁধ এগিয়ে দিলেন।

'খুশ আমদীদ, বেগম।'

স্বামীর কাঁধের কাছে আয়ষা তুলে ধরলেন কনুয়ের হাড়বারকরা রুগ্ণ হাতটি:

'জয়লাভের জন্য মুবারক, বাদশাহ্।'

'আর আপনাকেও মুবারক, বেগম নিজের শহরে ফিরে আসার জন্য।'

'ধন্যবাদ...' চোখ নামিয়ে নিলেন আয়ষা বেগম।

'আর পথেও বেচারী আয়ষা বেগমের খুব কষ্ট হয়েছে,' বললেন খানজাদা। 'এ সময় যাত্রা করা ওঁর পক্ষে বিশেষ কষ্টকর।'

এই তাহলে ব্যাপার! আয়ষা ক্ষীণদেহী হলেও হঠাৎ কেমন যেন স্থূলকায়া হয়ে গেছে। পোশাক ফুঁড়ে উঁচু হয়ে আছে দেহের মধ্যভাগ। কৃশ মুখমণ্ডলে হলদেটে ফুটকি কতকগুলি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ বাবর পিতা হতে চলেছেন? মাস ছয়েকের অন্তঃসত্ত্বা হবে।

আগেও ঘোড়ায় চড়ে বা ঢাকা গাড়িতে করে যাত্রা করলে আয়ষার কষ্ট হত, মাথা ঘুরত। আর এখন এই যাত্রায় তাঁর কেমন কষ্ট হয়েছে কল্পনা করতে পারলেন বাবর। বেচারী আয়ষা।

'এবার সব কষ্টের শেষ হয়েছে,' বললেন তিনি। 'আপনাদের জন্য গুছিয়ে রাখা হয়েছে আরামদায়ক ঘরদোর। আর যা কিছু প্রয়োজন হবে, আদেশ করবেন, বুস্তান-সরাইয়ে আমরা সবাই আপনাদের আদেশ পালনে প্রস্তুত।'

খানজাদা বেগম খুশিতে হাসলেন:

'ধন্যবাদ... ধন্যবাদ... আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হয়েছে।'

'আপনার অনুগত ভাইও আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর হয়ে পড়েছিল, বেগম... আপনারা গিয়ে বিশ্রাম নিন, এদিকে আমরা দস্তরখান বিছাতে বলি... ঐ চূড়ায়, আকাশের একেবারে কাছে।' বলে বাবর আঙুল দিয়ে দেখালেন ঘরের ছাতের দিকে আর হো হো করে হেসে উঠলেন ছেলেবেলার মত। তাঁর সঙ্গে বাকী সবাইও হেসে উঠল। এমন কি আয়ষাও।

আজকের দিনটা কী আনন্দের। নিজের হৃদয়ের ধুকধুকানি শুনতে শুনতে বাবর ভাবলেন, এ তাঁর ভিতরের বাঁশিতে সরু, মিষ্টি সুরে বাজছে পিতা হবার নতুন অনুভূতি। আর আয়ষা বেগমের মুখে খয়েরীহলুদ ছোপ ভর্তি হলেও বাবরের তাঁকে অত্যন্ত প্রিয়, আপনজন বলে মনে হল।

রাতের বেলায় যখন আলো নিভিয়ে দিয়ে তাঁরা শয্যায় আশ্রয় নিলেন, আয়ষা কম্বলটা বুক পর্যন্ত টেনে দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন উপর দিকে — নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছেন — অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বোঝা যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ বললেন :

'আপনার জন্য আমার গর্ব হয়, জাঁহাপনা।'

তাঁর আর তাঁর স্ত্রীর চিন্তাধারা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে মিলে যাওয়ায় চমকে

উঠলেন বাবর। একসময় তিনি আয়ষাকে বলেছিলেন, 'সমরখন্দে দেখা হবে'—সে কথা তিনি রেখেছেন। স্ত্রীর গর্ব হচ্ছে তাঁকে নিয়ে।

আয়েষা আরও বলতে চাইলেন যে শীঘ্রই যে তিনি বাবরের সন্তানের মা হতে চলেছেন তাতেও তিনি খুশি ও গর্বিত। সেকথা বুঝে বাবর জিজ্ঞাসা করলেন :

'কবে... কবে আনন্দ করা যাবে, বেগম?'

'তিনমাসও বাকী নেই... সময় যতই এগিয়ে আসছে ততই ভয় হচ্ছে।'

'ভয়ের কী আছে গো... এখুনি তো বললে যে 'গর্ব' হয় তোমার।'

'বলেছি... যদি খোদা আমাদের পুত্রসন্তান দেন তো তার নাম রাখব ফখরুদ্দিন, কেমন?'

বাপের নাম জাহিরুদ্দিন, বুদ্ধিমতী আয়ষা তাঁর নামের সঙ্গে মিলিয়ে ছেলের নাম রাখতে যাচ্ছেন।

'ফখরুদ্দিন — ভাল নাম। সত্যি। আর যদি কন্যাসন্তান হয় তো নাম রাখা হবে ফখরুন্নেসা, কেমন, বেগম?'

আয়ষা বেগম চেয়েছিলেন পুত্রস্তানের জন্ম দিয়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর গর্ভধারিনী হতে। বাবরকে উত্তরে বললেন তিনি :

'ঠিক আছে... কিন্তু খোদার কাছে আমি কামনা করছি পুত্রসন্তানের জন্য।'

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় যেন।'

ফখরুদ্দিন... ফখরুন্নেসা... চমৎকার দুটি নাম। এ নাম যাদের হবে খোদা তাদের ভাগ্যে সুখ দেন যেন।

৩

দুঃখ যেমন একা আসে না, আনন্দও যেমনি।

একের পর এক সাফল্য আসতে লাগল বাবরের জীবনে। সমরখন্দ জয়ের পরে, পূর্বে উর্গুত আর পশ্চিমে সোগদ্ ও দাবুসিয়া শয়বানী খানের ক্ষমতাচ্যুত বাবরের বশ্যতাস্বীকার করল। ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে শয়বানী, তাই সমরখন্দের অবরোধ তুলে নিয়েছে। প্রধান সৈন্যদলটা নিয়ে সরে গেছে।

আজ আবার সুখবর এসেছে কার্শি আর গুজার থেকে—বাবরের সেনাদল ঐ শহরগুলি থেকে শয়বানীর অনুগত শাসকদের বিতাড়িত করেছে, নতুন সরকার বাবরকে পাঠিয়েছে প্রচুর উপহার আর তাঁর অধীনে কাজ করবার জন্য শত শত সৈন্য। যে বেগরা ঐ সৈন্যদের নিয়ে এল বাবরের কাছে বাবরও তাদের ভরিয়ে দিলেন উপহারে, অর্থে, ভালো বাসস্থান দিয়ে...

গতকাল যে পত্রটি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন বাবর মির আলিশেরকে আজ আর

লেখার সময় পেলেন না: গ্রন্থাগারে যাবার মর্মরপাথরের সিঁড়িতে বোনের সঙ্গে মুখোমুখি হলেন তিনি।

'আপনি হীরাট থেকে বার্তা পেয়েছেন, একথা কি সত্যি জাঁহাপানা?'

'সত্যি। মহান মির আলিশরের কাছ থেকে।'

খানজাদা বেগম এ খবরে আনন্দ প্রকাশ করলেন, মনে হয় যেন তিনি ভাইয়ের থেকে কী এক গুরুত্বপূর্ণ খবর শোনার প্রত্যাশায় আছেন, কেমন বিষণ্ণভাব, ভাইয়ের প্রতি দৃষ্টিতে যেন প্রশ্ন। বাবর তখনও জানেন না সেটা ঠিক কী কারণে, কিন্তু বুঝলেন বোনের মনে গভীর দুঃখ আছে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে দৃঢ়স্বরে বললেন তিনি :

'চলুন আমার সঙ্গে... আমি আপনাকে হীরাটের চিঠি দেখাব।'

আলিশের নবাইয়ের চিঠিটা পড়তে পড়তে খানজাদা বেগম যখন সেই জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে আন্দিজানের স্থপতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, চোখদুটি তাঁর ভিজে উঠল।

'আপনার চোখে জল, বেগম? আর আমি ভেবেছিলাম আমার বোনটিকে একটু খুশি করব।...'

'এ চোখের জল... আনন্দের।... আমার ভাইয়ের খ্যাতি যে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে আমি আনন্দিত।'

'আমিও আমার প্রিয় বোনের সুখে সুখী হতে চাই!'

'কী করা যাবে—মন্দ ভাগ্য বোনের...'

'কিন্তু বোনের ভাইটি তো সর্বক্ষমতাসম্পন্ন, কৃতী', বাবর ঠাট্টার সুরে বলতে লাগলেন, 'সেও কি সাহায্য করতে পারবে না?'

'আমার জন্য অমনিতেই আপনার অনেক ঝামেলা সইতে হয়েছে, জাঁহাপনা। সেবছরে যদি... যদি তখন, ওশে, তনবালকে বিবাহ করতে সম্মত হতাম, তাহলে হয়ত সে আপনার সঙ্গে এমন শত্রুতা করত না।'

খানজাদা এমনি অকপটে মনের কথা বলায় বাবর একেবারে নিরস্ত্র হয়ে পড়লেন, কী গভীর যে তাঁর ভালবাসা বোনের প্রতি তা আরো একবার অনুভব করলেন। ইচ্ছে হল উদারহাতে বোনকে সুখে ভরিয়ে দিতে: তিনি ছাড়া আর কে তাঁর আপন বোনকে সুখ এনে দিতে পারে, এ বোনটির থেকে বেশি প্রিয় তাঁর কাছে তো আর কেউ নেই। এখন তাঁর সব আপনজনই: ভগিনী, মাতৃদেবী, তাঁর সন্তানের গর্ভধারিণী স্ত্রী সবাই এসে পৌঁছেছেন সমরখন্দের এই চমৎকার প্রাসাদে। এখানে দিন কাটিয়েছেন কত বাদশাহ্ আর তাঁদের বংশধররা! তাঁদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনই লোকের মনে ছাপ রেখে গেছেন! আর স্থপতিদের সৃষ্ট স্থাপত্য নিদর্শনগুলি আজও চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, চোখ আর মন দুই-ই জুড়ায় তা দেখে! তাহলে, দেখা যাচ্ছে, শত শত অকর্মণ্য রাজাবাদশার থেকে সুদক্ষ স্থপতির প্রয়োজন অনেক বেশি!

'বেগম! তনবাল আমার শত্রুতা করেছে কেবলমাত্র আপনার কারণেই নয়!... এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না! ও হল সাপ — সাপ কখনও তার স্বভাব ভুলতে পারে না, সে যাই হোক না কেন।'

'আমি তোমার প্রতি... কৃতজ্ঞ, বাবরজান,' খানজাদার গলার স্বর শোনাল তাদের মায়ের মত!

'আজীম মির আলিশের এই বার্তা পাঠিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে আমাদের প্রশংসার যোগ্য কাজের প্রত্যাশায়,' আবার বাবর আধোঠাট্টার সুরে বলতে লাগলেন। 'ঠিক আছে আমরাও এমন সব প্রাসাদ নির্মাণ করব যেগুলো যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে!... যাতে খোরাসান মাভেরান্নহরকে ছাড়িয়ে না যায় সৌন্দর্যে,' তারপর মৃদু হেসে যোগ দিলেন, 'শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের এখানে আমন্ত্রণ জানাতে চাই, বেগম। উপযুক্ত দূত মারফত উত্তর পাঠাব মির আলিশেরকে... যদি ঐ স্থপতি, যাঁর কথা মির আলিশের উল্লেখ করেছেন, আমাদের আন্দিজানের মওলানা ফজলুদ্দিন হন তো দূত তাঁকে সমরখন্দে আমন্ত্রণ জানাবে।'

খানজাদা বেগমের ভিজে চোখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। তারপর হঠাৎ চোখ নামিয়ে লজ্জাজড়িত স্বরে ফিসফিসিয়ে বললেন:

'আপনি মাভেরান্নহরের আকাশে... আমার আশার একমাত্র তারা, ভাইজান।'

'আপাজান, খোদার কাছে দোয়া করুন যে ঐ ক্ষেপা শয়বানীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে দেন আমাদের পথ থেকে। খোদা করুন শিগ্‌গির যেন দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আসে! তখন আমরা স্বস্তিতে কাজে লাগতে পারব, অসম্পূর্ণ গজল ও স্বপ্নের মাদ্রাসা ও মহল তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করতে পারব। ওশে আমরা কেমন নির্মাণকাজ আরম্ভ করেছিলাম মনে আছে?'

মনে নেই আবার! খানজাদা বেগম এখনও সযতনে রক্ষা করছেন মওলানার সেই নকশাগুলি, যেগুলি একসময় তাহির দিয়েছিল তাঁকে। ভাইকে সে কথা জানাতে সংকোচ হল তাঁর। কেবল বললেন :

'খোদা আমাদের স্বপ্ন সফল করতে সাহায্য করুন, ভাইজান! আমাদের সব স্বপ্ন! এ জন্য আমি দিনরাত্রি দোয়া করব!'

বোনের সঙ্গে আলোচনার পর বাবর যে লিপিপুস্তকে লিখে রাখতেন মাথায় আসা বিভিন্ন ভাবের খসড়া, সম্পূর্ণ কবিতাগুলি, সেটি নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। একটি দুই পংক্তির কবিতা মনে হল যেন তার বর্তমান মনের অবস্থা প্রকাশ করবে:

ইমানী ইমান খোঁজে, সেটাই সে পায়,

যে আনে যন্ত্রণা, তার যন্ত্রণাই প্রায়।

এই কবিতাটাই পাঠাবেন নাকি আলিশের নবাইকে? আর একটি পংক্তি যোগ দিলেন তিনি:

সুলোক হবেই সুখী ইমানদারে ঘেরা।

নাঃ বড় সহজ আর সোজাসুজি বলা হচ্ছে (কেটে দিলেন পংক্তিটা)। আবার ভাবনায় ডুবে গেলেন। তাঁর প্রকাশ করতে ইচ্ছে হল এই চিন্তাধারা যে, এই পাপেভরা পৃথিবীতে আলিশের নবাইয়ের মত এমন বিরল ব্যক্তি যাঁরা মানুষের এত উপকার করেন, মৃত্যুর পরে মানুষের স্মৃতিতে স্থান পাওয়াই তাঁদের পুরস্কার নয়, তাঁদের পুরস্কার পাওয়া উচিত এই পৃথিবীতে, এই জীবনে, অন্য সবার চেয়ে তাঁদের বেশি সুখী হওয়া উচিত, আর এই সুখ তাঁদের দিতে পারে তাঁদের চারপাশের মানুষজনের আনুগত্য ও সহৃদয়তা। কিন্তু কেন কে জানে এ চিন্তাধারা তিনি কবিতায় প্রকাশ করতে পারছিলেন না কিছুতেই। আসলে এমনিই কি ঘটে না জীবনে?' নিজেকেই প্রশ্ন করলেন বাবর, তারপর আবার একবার কেটে দিলেন পংক্তিটি। তার ওপরে আর একটি পংক্তি যোগ করলেন:

সুলোক না দেখে যেন কু আর বেইমানি।

আবার থেমে গেল কলম, না, হচ্ছে না!

খাতা বন্ধ করে উঠে পড়লেন বাবর।

অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করলেন।

খুশি-হালকা মনের ভাব কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

যখন তাঁকে খবর দেওয়া হল যে শাহ্‌রিসাবজ থেকে কাসিমবেগ আর মুল্লা বিনই—কবি কামালুদ্দিন বিনই এসে পৌঁছেছেন, তখন বিষণ্ণ চিন্তাধারা থেকে মুক্তি পাবার সম্ভাবনায় খুশিই হলেন তিনি। ওঁরা দু'জনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

'অপেক্ষা করার আর কী আছে? এখনই কথা বলা যাবে,' স্থির করে দেওয়ানখানায় যাবার জন্য নামতে নামতে বাবর মনে করতে লাগলেন বিনইর সঙ্গে আগের বাবরের সাক্ষাৎ পর্বের খুঁটিনাটি।

৪

হীরাটের প্রখ্যাত কবি বিনইর সঙ্গে বাবরের প্রথম পরিচয় হয় তিন বছর আগে যখন প্রথমবার সমরখন্দ দখল করেন। বিনইর ছিল শ্রেষ্ঠ খোশনবীসের নকল করা একটি অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। বাবরের গ্রন্থপ্রীতির কথা শুনে বিনই তাঁকে ঐ মূল্যবান গ্রন্থটি উপহার দিতে মনস্থ করেন। বাবর এদিকে জানতেন যে সমরখন্দে বিনইর ঘরদোর বলতে কিছু নেই থাকেন যেখানে যখন পারেন, দারিদ্র্যে দিন কাটে তাঁর তাই স্থির করেন গ্রন্থটি তিনি কিনে নেবেন বিনইর কাছে। তিনি দুর্লভগ্রন্থ ব্যবসায়ীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কীরকম দাম হতে পারে গ্রন্থটির। উত্তর পাওয়া গেল: 'সর্বোচ্চ মূল্য—পাঁচ হাজার দিরহাম।'

কিন্তু সে অর্থ বাবর তাঁকে পাঠিয়ে উঠতে পারেননি, কারণ সে সময় তিনি রোগে শয্যাগত হয়ে পড়েন এবং দুনিয়া থেকে প্রায় বিদায় নিতে বসেছিলেন।

সুস্থ হয়ে যখন তিনি আন্দিজান যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন তখন সেই গ্রন্থটি তাঁর নজরে আসে (গ্রন্থটির নাম 'মাজমুয়াতে রশীদী'*), তখন তাঁর মনে পড়ে যে বিনইকে গ্রন্থটির জন্য অর্থ প্রেরণ করা হয়নি। তখনই খাজাঞ্চীকে ডেকে পাঠালেন বাবর আর তাঁর বিশ্বস্ত লোকের হাতে কবির জন্য পাঁচ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু লোকটি বিনইকে খুঁজে বার করতে পারেনি: বাউণ্ডুলে কবি কোথায় উধাও হয়ে গেছে কে জানে। এদিকে মা আর মুরীদকে রক্ষা করার জন্য রওনা দেওয়া দরকার বাবরের। বিনইকে খোঁজার সময় নয় তখন, কিন্তু বাবর জিদ ধরে রইলেন:

'এ ঋণ যতক্ষণ না পরিশোধ হয় সমরখন্দ ছেড়ে যাব না কিছুতেই!'

এরপর দূতেরা আর অনুচরেরা শহরের বিভিন্ন অংশে ধাওয়া করল, বিনইকে খুঁজে বার করল, তাঁকে জানান হল কেন এ অর্থ প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় (অভিযান স্থগিত হয়েছে!) শেষে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল ঐ পাঁচ হাজার দিরহাম।

পরের ধন গ্রাস করতে আগ্রহী অনেক রাজাবাদশা দেখেছেন বিনই। ষোলবছর বয়সী বাবর-মির্জার সততা কবির মন ছোঁয়া, এই ঘটনার স্মরণে তিনি এক কবিতা রচনা করেন। সুদক্ষ লিপিকরকে দিয়ে কবিতাটির নকল করিয়ে বাবর সমরখন্দ রওনা দেবার আগে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

চুয়াল্লিশটি পংক্তি ছিল কবিতাটিতে। সেটিতে অবশ্য কাব্যসুলভ অতিশয়োক্তি ছিল :

আপন কর্মেতে তুমি শাহ্ ন্যায়পর,
ধরার গৌরব, জাহিরুদ্দিন বাবর!

উদার হাসি হাসলেন বাবর: ভাব দেখ— 'ধরার গৌরব'। ছোট্ট একটু সহৃদয়তা উপযুক্ত সময়ে দেখানোর ফলে হয়ত, গোটা দুনিয়াটা অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও ন্যায়ের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে!...

তারপর শয়বানী খান দখল করে সমরখন্দ।

খান এক মুশায়রার আয়োজন করে, যাতে বিনইও আমন্ত্রিত হয়। সেই কবির লড়াইতে বিনই একটি কবিতা পড়েন, যেটি শয়বানীর ভালো লাগে। সে তাঁকে প্রচুর ধনসম্পদ দেয়, শাহী শায়রের পদও দেয়। তাঁকে দায়িত্ব দেয় নিজের বিজয়ের ইতিহাস লেখার। ঐতিহ্যমতে যেমন হওয়া উচিত। মুল্লা বিনই 'শয়বানী নামা' লিখতে আরম্ভ করেন, এই সময় সমরখন্দ আবার বাবরের হাতে চলে আসে। যখন শয়বানী সমরখন্দের চারপাশের অঞ্চলগুলি থেকে নিজের সৈন্যদলগুলিকে একে একে নিয়ে

* 'রশীদের সংকলন', এক ঐতিহাসিক পুস্তক।

ক্রমশ শক্তিসঞ্চয়ের জন্য, নতুন করে লড়াইয়ের জন্য বুখারার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিল, তখন মুল্লা বিনই খানের শিবির থেকে পালিয়ে সমরখন্দ এসে পৌঁছান। বাবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান তিনি। কিন্তু কাসিমবেগ তাঁকে শয়বানীর সমর্থক বিবেচনা করে বাবরের কাছে যেতে দেয়নি, শাহ্‌রিসাবজে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। বাবর কিন্তু একথা জানতে পারেননি তখন। সম্প্রতি তিনি কাসিমবেগকে এ ঘটনার জন্য খোঁচা দিয়ে বলেন:

'বৃথাই আপনি এমন করলেন। মুল্লা বিনই বেশ বড় কবি। নিজে থেকে যখন এলেনই তখন দেখা করতে দেওয়া উচিত ছিল আমার সঙ্গে।

ইমানদার কাসিমবেগ বুঝিয়ে দিল:

'আপনার বড় কবি শয়বানী খানের উদ্দেশ্যে প্রশংসা করে কবিতা লিখেছেন, জাঁহাপনা।'

মৃদু হাসি দেখা দিল বাবরের মুখে।

'আপনি জানেন না, উনি আমার উদ্দেশ্যেও প্রশংসাসূচক কবিতা লিখেছেন!... শাসকরা যদি প্রশংসার এতই ভক্ত হয় তো কবি কী করবে?

কাসিমবেগ এবারে গম্ভীর হয়ে বলল:

'জাঁহাপনা, লোকটি শয়বানী খানের গোপন চর হতে পারে।'

একটু চিন্তা করে বাবর বললেন:

'না, তা সম্ভব নয়। হীরাটে তিনি হুসেন বাইকারার চর হননি। শয়বানীর দলে থেকে কেবল কবিতাই রচনা করেছেন... তাও দীর্ঘদিনের জন্য নয়।'

'কিন্তু বিনই খাজা ইয়াহিয়ার বাড়িতে থেকেছেন, তার নুন খেয়েছেন, তারপর যে শয়বানী খাজা ইয়াহিয়াকে খুন করে, খোলাখুলি তারই সেবা করতে থাকেন। চর যদি তিনি নাও হন, এ কি ভাল কাজ?'

'মানছি, ভাল না। কিন্তু আমাদেরই দেখিয়ে দিতে হবে তাঁকে কোন কাজটা ভাল।... মুল্লা বিনইকে জীবিত, অক্ষতদেঁহে সমরখন্দে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠান বেগ!'

এ ছিল আদেশ। আর কাসিমবেগ সে আদেশ পালন করেছে।

...নিচে নেমে বাবর এক বিশেষ দরজা দিয়ে দেওয়ানখানায় এসে প্রবেশ করলেন। একটু পরে বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে কাসিমবেগ আর মুল্লা বিনই এসে প্রবেশ করলেন।

তিনবছর আগে মুল্লা বিনইর চেহারা ছিল শক্তপোক্ত আর ব্যক্তিত্বপূর্ণ। এখন অত্যন্ত রোগা হয়ে গেছেন, যেনগুটিয়ে গেছেন। পরনের পোশাকি আশাকও জীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু বড় বড় চোখগুলিতে আগের মতই ফুটে বেরোচ্ছে আত্মসংযম আর অহঙ্কার।

অভ্যর্থনাকক্ষের মাঝামাঝি বাবর কবির মুখোমুখি হলেন তারপর আসনগ্রহণ

করতে বললেন তাঁদের। নিজের ডানদিকে বসালেন কাসিমবেগকে আর বাঁদিকে বিনইকে, কবির দিকে ফিরে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তাজিক ভাষায় দুই পংক্তির একটি কবিতায় বিনই তাঁর জবাব দিলেন:

খেত থেকে অন্ন আমি কী করে যোগাই,
গাত্রবস্ত্র অন্য হায় কোথা থেকে পাই।

এই পংক্তিগুলোর মধ্যে, বিশেষত 'অন্ন' ও 'অন্য' শব্দটির মধ্যে, শ্লেষের আভাস পেলেন বাবর, খানের খিদমত করার ফলে কবির শোচনীয় ভাগ্যের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মৃদু হাসলেন।

সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়লেন বাবর, তারপর কপালে হাত রেখে নিঃশব্দে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। আচ্ছা! জাঁহাপনা কবিতার উত্তর কবিতায় দেবেন ঠিক করেছেন: কাসিমবেগ ইঙ্গিতে বিনইকে বলল, 'অপেক্ষা করুন!' একটু পরেই বাবর হাত নামিয়ে, উদারভঙ্গিতে বললেন:

তিলমাত্র দেরি না করে ক্ষমতা করব জাহির:
খাওয়াক তোমায় মাভা-মিঠে, কামিজে ঢাকুক শরীর।

মুল্লা বিনই আশা করেননি এত শীঘ্র উত্তর পাবেন, তাজিক ভাষায় 'গদ্যে' জিজ্ঞাসা করলেন (বাবরের কবিতা ছিল তুর্কী ভাষায়):

'আর একবার বলুন তো জাঁহাপনা, ছন্দটা ভালো করে বুঝতে চাই!'

বয়াৎটি সামান্য অদলবদল করলেন বাবর :

ক্ষমতা আমার খাটাব ঠিকই, এইটে আমার ফরমান:
খাওয়াক তোমায় পেট ভরিয়ে, পোশাক করাক পরিধান।

'আপনার প্রতিভায় আমি চমৎকৃত, জাঁহাপনা!' বললেন মুল্লা বিনই, চুপ করে নিজের সাদার ছোঁয়াচ লাগা দাড়ির প্রান্ত টানতে টানতে উত্তর খুঁজতে লাগলেন। তারপর মনের মত উত্তর খুঁজে পেয়ে—চোখ তুলে, সোজা হয়ে বসে তুর্কী ভাষায় বললেন :

এ মহাদানের অযোগ্য আমি, একেবারেই যে আশাতীত,
তবুও বলব, জীবনে কখনো ধন-দৌলত চাই নি তো।

বাবরও বিস্মিত হলেন। বিনই যে ফারসী ছাড়া তুর্কী ভাষায় কবিতা রচনাতেও দক্ষ তা তিনি ভাবেননি। যদিও বিনই যথেষ্ট বিনয়প্রকাশ করেছেন যে তিনি এমনি 'মহাদানের' উপযুক্ত নন, কিন্তু তা বোধহয় কবিতা রচনার সাধারণ প্রণালীর খাতিরে। হায় কবিতা, তুমি একই সঙ্গে চমৎকার চমৎকার কথা দিয়ে যেমন সত্যকে ঢাকতে পার তেমনি আবার মেলে ধরতেও পার তাকে।

মুনশিকে ডেকে বাবর তুর্কী ভাষায় বিনইর বয়াৎটি লিখে ফেলতে আদেশ দিলেন।

বাবর আর বিনইর এই মুশায়রা শুনে কাসিমবেগ অভিভূত হয়ে পড়ল। সেই দিনই কাসিমবেগ কবির বাস করার জন্য খুঁজে দিল চমৎকার উঠানওয়ালা একটি ভাল বাড়ি, বাবরের নির্দেশে ময়দা, চাল, একটি মেষ ও লোমের পোশাক পাঠাল তাঁর জন্য। অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর মত তাঁর জন্যও নির্দিষ্ট হল—বেশ বড় অঙ্কেরই—মাসমাহিনা।

এই সাক্ষাৎকারের পর আরও বেশ কয়েকবার বাবর হীরাটের কবির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন উপরতলায় নিজের মহলের 'একান্ত নির্জনতায়', প্রতিবারই উপাদেয় ভোজ্যবস্তু সামনে সাজিয়ে। প্রথমে বিনই ভেবেছিলেন যে শয়বানীর কাছে তিনি কেমন ছিলেন সেকথা বলতে হবে, তাই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে আর কিছুটা নিজের দুর্বলতাকে তিরস্কার করে সব দিনের কাহিনী বলার জন্য। কিন্তু বাবর জিজ্ঞাসা করতেন একেবারে অন্য কথা—হীরাটের কথা, নবাইয়ের কথা, দু'জন কবির মধ্যে প্রথমে খুব বন্ধুত্ব থাকার পরে তাঁদের যে বিচ্ছেদ ঘটে, সেই সব কথা।

বিনই বলতে থাকেন, 'একবার আলিশের নবাইয়ের কান ব্যথা করছে খুব, ঠাণ্ডা হাওয়া কানে যাতে না লাগে সেজন্য একটা সবুজ রুমাল জড়ালেন মাথায়। একজন রেশমীকাপড় ব্যবসায়ী সে কথা শুনে 'আলিশেরের মত...' এ কথা লেখা সবুজ রুমাল বিক্রী করতে লাগল। নবাইয়ের সামনে আমি মাথা নত করি, তিনি মহান কবি, মহান ব্যক্তি, কিন্তু স্বার্থসন্ধানী লোকেরা যে নবাইয়ের নাম নিয়ে এইভাবে রোজগার করে লাল হয়ে যাবে, ছোটখাট, আজেবাজে জিনিস বিক্রী করবে 'আলিশেরের মত' নাম দিয়ে এতে আপনার অনুগত সেবকের অত্যন্ত দুঃখ হয়। আমি আমার গাধার জিন তৈরি করতে দিই ইচ্ছা করেই হাস্যকর ধরনের, আর সেটির নাম দিই 'আলিশেরের মত'। সে জিনেরও খুব চল হয়ে দাঁড়াল!... নিন্দুক রটাতে লাগল: 'বিনই আলিশেরকে নিয়ে উপহাস করছে,' সেই হল আমাদের দু'জনের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির কারণ, বিশ্বাস করুন, এতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। নবাইয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অসীম! তাঁর বিরহে কাতর হয়ে পড়েছিলাম আমি!'

কথায় কথায় জানা গেল যে বিনই মির আলিশের কে উৎসর্গ করেছেন একটি কাসিদা*। যখন তিনি সেটা বাবরকে পড়ে শোনালেন বাবর চমৎকৃত না হয়ে পারলেন না।

বিনইর অত্যন্ত ইচ্ছা আলিশের জানেন এই কাসিদাটির কথা! বাবর সৌজন্যসহকারে প্রস্তাব করলেন তাঁর যে দূত হীরাট যাবে তার সঙ্গে সেটিও পাঠিয়ে দেবেন।

* এক ধরনের গাথাকাব্য।

বিনইর সঙ্গে আলোচনা বাবরকে বারবার মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল নবাইয়ের কাছে তাঁর নিজের রচিত কবিতা পাঠাবার কথা। যে বিনইকে স্বয়ং নবাই একসময় বলেছিলেন 'সমস্ত দিক থেকেই অতুলনীয়,' তাঁর কবিতার সঙ্গে নিজের ছত্রগুলি তুলনা করে বাবর বুঝলেন যে তিনি এখন পর্যন্ত সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারেননি, যাতে হীরাটের মহান কবির সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ সম্ভব। একটা পর একটা কবিতা বাতিল করলেন তিনি, প্রচুর অদলবদল করলেন। বাবরের কেমন যেন মনে হল আগে যা ভাবতেন সাধারণ, সহজবোধ্য তা ক্রমশ হয়ে উঠছে দুর্বোধ্য — এমন কি মানুষের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করছে। যে কবিতা তিনি এতকাল লিখে এসেছেন তা জীবনের জটিলতাকে মেলে ধরতে পারে না, অনেককিছু প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্রও নেই তাতে। যেমন, চিন্তাভাবনায় অনেক বড় যে মানুষকে ভাগ্য উঁচু আসনে বসিয়ে দিয়েছে, তার চারপাশের আত্মসর্বস্ব, চাটুকারী, খল-বিশ্বাসভঙ্গকারী লোকজনের মধ্যে পড়ে সে যে কষ্ট পায়, সেকথা কি আছে সেখানে? তাঁর কবিতায় কি সেকথার উল্লেখ আছে যে শাসক রাজ্যের কি ক্ষতি করে? সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়ে চিন্তা করে কেবল নিজের কথা, কবি, স্থপতিদের নিজের চারপাশে সমবেত করেও ভাবে নিজের কথাই, নিজের খ্যাতি বিস্তার করার কথাই!... আলিশের নবাই আর মুল্লা বিনই, দু'জনেরই রাজদরবারের লোকজনের প্রতি আর শক্তিমান শাসকদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে।

পেটোয়া দলের কাছে মঙ্গল হে প্রাণ কখনো জানো হে?

পংক্তিটি যেন মেলে ধরেছে তাঁর মর্মবেদনাকে, জোরালো ভাষায় চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে মনের কথাকে। এক অন্তর্ভেদী সর্বজ্ঞতার অনুভূতি আন্দোলন তুলেছে বাবরের মনে। সেই মর্মভেদী দৃষ্টিতে তিনি এখন দেখতে পাচ্ছেন হীরাটে আলিশের নবাইকে, এখন মহান কবিকে কিছু বলার আছে তাঁর!... যে লোক অন্যের কাছে মঙ্গলজনক কাজ আশা করে, যে লোক কেবল নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে, তা সে যত উঁচু স্তরের লোকই হোক না কেন—তাকে প্রতারিত হতে হবে, অবশ্যই হতে হবে।

মির আলিশের লোকের মঙ্গল করেন, সেই কারণে বাদশাহ্‌দের (সত্যি বললে গেলে, তাঁরা সবাই এই নশ্বর জগতে ক্ষণিকের অতিথি!) আর খোদ নবাইয়ের চারপাশ যে 'চাটুকারদের' ভিড়, তাদের থেকে অনেক উঁচুতে তাঁর স্থান। বাবরের মন চাইল তুলে ধরতে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য— জীবনের উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তবেই এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অর্থ আছে!

পেটোয়া দলের কাছে মঙ্গল হে প্রাণ কখনো জানো হে?
দরবারি তোষামুদেদের চেয়ে সৎ শাহ্ কেউ জানো হে?

স্বার্থবুদ্ধি নয় নয়, ওঠো এই পাজিদের উঁচুতে,
শুভের সেবায় আত্মনিয়োগে নিজেকে আদমী চিনো হে!

... এইভাবে একরাতে তিনি শেষ করলেন নবাইয়ের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর কবিতা ও পত্র। দুদিন বাদে এক বিশেষ দূত সমরখন্দ থেকে হীরাট নিয়ে যাবে মহামূল্যবান উপঢৌকনসমেত সেই পত্রটি। বাবর ভাবলেন যে শীতকাল শেষ হবার আগেই তিনি নবাইয়ের কাছ থেকে উত্তর পাবেন। কিন্তু যখন প্রথম বাসন্তী ফুল ফুটল, তখন হীরাট থেকে প্রত্যাশিত প্রত্যুত্তরের পরিবর্তে এসে পৌঁছাল শোকসংবাদ—শীতকালে আলিশের নবাইয়ের ইন্তেকাল হয়েছে। কবির যখন জীবনাবসান হয় দূত তখনও রাস্তায়। কত বছর ধরে বাবর আশাপোষণ করেছেন যে মহান নবাই তাঁর শিক্ষক হবেন! কিন্তু তাঁর সে আশা ধূলিসাৎ করে দিল ভাগ্য।...

এদিকে শয়বানীর সঙ্গে আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

৫

মাটি থেকে সদ্যমাথা তুলেছিল যে ফুলের কলিগুলি দলিত হল অশ্ববাহিনীর পদতলে।

শয়বানী খান পাহাড়ের উপরে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে উঠে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কেমন করে নিচে উপত্যকায় তার অশ্ববাহিনীর স্রোত এসে জড় হচ্ছে।

দেখে আনন্দ পাবার মতই দৃশ্য বটে, যদিও এই সেদিন... সমরখন্দ আর বুখারার মাঝখানে দাবুসিয়া* কেল্লাটা বসন্তকালের নীল আকাশ তলে খানের কাছে এখন মনে হচ্ছে যেন মানুষের হাতে গড়া এক ধ্যানগম্ভীর পাহাড়।

গতবছর শীতের মুখোমুখি এই কেল্লাটা যখন বাবরের দখলে চলে যায় তখন অবশ্য শয়বানী এমন চমৎকার উপমা খুঁজে পায়নি, খুবই সঙ্কটজনক অবস্থা তখন-তার দখলে কেবলমাত্র বুখারা। অবশ্য বলাই বাহুল্য, স্তেপভূমিও। স্তেপভূমি ছিল নিঃসীম, কিন্তু সেখানে জনবল আর সেনাবল ছিল সীমিত। কোনো কোনো সুলতান ইতোমধ্যেই বলাবলি করছিল 'এখনও সময় আছে তুর্কীস্তান স্তেপে পালিয়ে বাঁচার!' কিন্তু শয়বানী শোনেনি সে কথা: নিজের ভাগ্যতারকা আর নিজের স্তেপভূমির উপর বিশ্বাস ছিল তার। সমরখন্দ থেকে গুপ্তচর তাকে খবর এনে দিয়েছিল কবি ও বিদ্বান লোকেদের সঙ্গে আলাপে মগ্ন বাবর যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন না। তাছাড়া গত কয়েক বছরে যে শহর একাধিকবার হাতবদল হয়েছে, উপরি

* 'লোহার কেল্লা'।

উপরি লুণ্ঠিত, নিঃস্ব হয়ে গেছে, বসন্তের মুখে সেখানে মহামারী আর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

শয়বানী এতটুকু ঢিলে না দিয়ে সেনাদল সংগঠন করে তালিম দিয়ে চলল। তারপর যখন তারা অতর্কিতে বুখারা থেকে বেরিয়ে দাবুসিয়া কেল্লার কাজে এসে পড়ল, তখন তার বাহিনী কেল্লার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। তীর আর পাথরবৃষ্টি আর তাদের ওপর ঢেলে দেওয়া ফুটন্ত তেলে বাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তারা কেল্লার প্রাচীর বেয়ে ওপরে উঠেই চলল। আক্রমণ যখন একটু দুর্বল হয়ে পড়ল সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন খান নিজের ভাই মাহ্‌মুদ আর প্রিয়পুত্র তৈমুরের নেতৃত্বে আরও নতুন নতুন সৈন্যদল এগিয়ে দিতে লাগল। সৈন্যরা যখন দেখল যে খান ভাই বা সন্তান কারুর জন্যই মায়া করছে না তখন তারাও আরও দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ চালাল। লোক মরে মরে নিচে পড়তে লাগল যেন গাছ থেকে তুতফল ঝরে পড়ছে। উপরে ওঠার জন্য মইগুলির ওপর থেকে মৃতদেহগুলি সরিয়ে ফেলা হতে লাগল যাতে অন্যরা উপরে উঠতে পারে —এবার কেল্লাপ্রাকারের উপরে হাতাহাতি লড়াই আরম্ভ হল, নিষ্ঠুর মারামারি চলল, প্রাচীরের উঁচু উঁচু বেরিয়ে থাকা অংশগুলির ওপর থরে থরে মৃতদেহ পড়ে থাকার ফলে প্রতিআক্রমণকারীদের পক্ষে নীচে তীর ছোঁড়ায় অসুবিধা হতে লাগল।

কেল্লায় রক্ষীসৈন্যদলের চেয়ে শয়বানীর সৈন্যদল সংখ্যা ও শক্তি দুয়েতেই বেশি। দাবুসিয়া দখল হয়ে গেল, বিপরীতপক্ষের অবশিষ্ট, জীবিত সৈন্যদের গলা কেটে ফেলা হল খানের আদেশে।

কেল্লা থেকে সাহায্য চেয়ে বাবরের কাছে বার্তাবহ যখন ছুটল ততক্ষণে শয়বানী খানের শিবিরে বিজয়ের উৎসব শুরু হয়ে গেছে। গত শরৎকাল আর শীতকাল ধরে যে পরপর পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে—তারপর এমন জয়ে অবশ্যই সাহস, আনন্দ বাড়ে। এবারে দাবুসিয়াকে অবলম্বন করে শয়বানী সেখানেই সমরখন্দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি চালাতে লাগল।...

নিচের ঘোড়ার দৌড়—খানের মনোরঞ্জনের জন্য নয়। এ হল অতি কঠোর যুদ্ধ-প্রস্তুতি। বাবরের সঙ্গে যে চরম যুদ্ধে লড়তে চলেছে শয়বানী তাতে তার প্রয়োজন হবে বেগবান ও কষ্টসহিষ্ণু অশ্ব ও অশ্বারোহী।

গতকাল দরবেশের সাজে চর এসেছে সমরখন্দ থেকে, খবর দিয়েছে যে বাবরের স্ত্রী কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে। তার নাম হয়েছে ফখরুন্নেসা।

শয়বানী খান সপ্রংশ ও ছিদ্রান্বেষী দৃষ্টি নিয়ে নিজের অশ্বারোহী বাহিনীকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবল, 'অহঙ্কার বাড়ল দেখি বাবরের। যাক্, শরৎকালে জয়ের কথা ভেবেই আনন্দ পাক, কবিতা লিখুক, ফখরুন্নেসা ফখরুন্নেসা হয়ে উঠুক! সেই ফাঁকে

আমার বাজপাখীরা উড়তে আর দুশমনকে নখে ছিঁড়তে শিখুক। তাদের আঁচড়ে যে-কোন লোকেরই প্রাণ বেরিয়ে যাবে!'

এর আগে কখনই আর কোন লড়াইয়ের জন্য এমন পাগলের মত প্রস্তুতি চালায় নি শয়বানী। বাবরকে পরাস্ত করা তো খুব সহজ কাজ নয়। অল্পবয়সেই সে অভিজ্ঞ হয়ে গেছে। সফল, নির্ভীক, সাহসী। বেশ বুদ্ধিমানের মত কাজকর্ম চালায়: মাভেরান্নহরের অধিকাংশ শহর ও জনবসতিই তার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করে। বেগরা... আর, বেগরা বেগই। তারা অর্থলোভী, এ মুহূর্তে যে শক্তিশালী তাকেই ভয় পায়। সুলতান আলির অধিকাংশ বেগই গতবছর তার, শয়বানী খানের দলে এসে যোগ দেয়, তারপর আবার যখন বাবর সমরখন্দ দখল করে (দুঃসাহস দেখিয়েছে, কোন সন্দেহ নেই!) তখন পালিয়ে গিয়ে যোগ দেয় বাবরের দলে, যার সৈন্যসংখ্যাও ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এমন কি, আহমদ তনবাল নিজের ছোট ভাই সুলতান খলিলের সঙ্গে দুশ' সৈন্য পাঠিয়েছে বাবরের অধীনে কাজ করার জন্য: যার 'চিরঅনুগত' থাকবে বলে শপথ নিয়েছিল, ভয় পাচ্ছে তাকে। এমন যদি চলতে থাকে তো বাবরকে পরাস্ত করা কঠিন হবে।... কিন্তু এ যে বসন্ত—গ্রীষ্মকাল তো নয়। গতবছরের শরতের আর পুনরাবৃত্তি হবে না। বাবরের শক্তিবৃদ্ধি হবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।...

বুখারা আর দাবুসিয়াতে সৈন্যদল আর বিশ্বস্ত শাসক মোতায়েন রেখে শয়বানী দ্রুত এগিয়ে চলল সমরখন্দের দিকে। খোলাখুলিভাবে। তাছাড়া আগে থাকতেই বাবরকে এক পত্র পাঠিয়েছে যাতে তরুণ সেনানায়ককে খোলাখুলি 'ন্যায়যুদ্ধে' নামতে আহ্বান জানিয়েছে। খান লিখেছে, 'বীররা পরস্পরের শক্তিপরীক্ষা করে রণক্ষেত্রে, কেল্লার ভিতরে বন্ধ থেকে নিরাপদে থাকতে পারে তো শিশুও!'

বাবর সমরখন্দ থেকে বেরিয়ে শয়বানীর সৈন্যদলের মুখোমুখি হবার জন্য এগিয়ে চললেন। কিন্তু ক্রোশ দুয়েক দূরত্বে সারিপুলে এসে থামলেন, জরাফশান নদীর কাছে এসে ছাউনি খাটালেন, ছাউনি ঘিরে গভীর পরিখা কাটালেন, কড়িকাঠ আর গাছের ডালপালা দিয়ে দেয়াল তোলা হল তীর যাতে ভেদ করতে না পারে।

না, তখনি যুদ্ধ আরম্ভ করার পরিকল্পনা ছিল না তাঁর, অপেক্ষা করবেন আরো সাহায্য এসে পৌঁছবার, সেই সৈন্যদলের যারা শয়বানীর দলের পিছনদিকে আঘাত হানবে।

দূর তুর্কীস্তান থেকে সৈন্য এসে পৌঁছানর অপেক্ষায় ভরসা আর নেই। আর বাবরের কাছে যে সাহায্য এসে পৌঁছবে তা জানত শয়বানী। শাহ্‌রিসাবজ থেকে পাওয়া গোপন খবরে জানা গেল যে বাকি তরখান সেখানে দু'হাজার সৈন্য জড় করেছে আরও এক হাজার সংগ্রহ করে যথাসম্ভব দ্রুত এসে পৌঁছবে বাবরের সাহায্যে।

অবিলম্বে লড়াই আরম্ভ করতে হবে, সে যেভাবেই হোক না কেন শয়বানীর দিনরাতের চিন্তা কী করে তা সম্ভব।

ঢাকঢোল আর শিঙ্গার কানফাটান আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তীর বৃষ্টি আরম্ভ হল। তাতে অবশ্য বাবরের বিশেষ কোন ক্ষতি হল না। খানের অশ্ববাহিনী পরিখা পার হতে পারল না। পার হওয়ার কোন উদ্দেশ্যও অবশ্য তাদের ছিল না। সৈন্যরা দারুণ হৈহল্লা আরম্ভ করে দিল, গোলমালের মধ্যে শোনা যেতে লাগল বিভিন্ন অপমানকর মন্তব্য:

'লুকিয়ে পড়লে যে বড়? খোলা ময়দানে লড়তে চাও না বুঝি?'

'ভীরু! কাপুরুষ!'

'বাবর ভয়ে থরথর কাঁপছে, আমাদের খানের সামনে বেরোতে চায় না!'

'এই, যে ভয় পায় না, মুন্ডুটা বার করুক দেখি!'

শয়বানী খান জানত যে রাতের অন্ধকারে এমনি গোলমাল লোকের মনে অত্যন্ত জোরে প্রতিক্রিয়া করে। শতশত, হাজার হাজার অশ্বারোহী ছুটে বেড়াচ্ছে ছাউনির আশেপাশে, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর বন্য চীৎকারে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে, ডালপালা দিয়ে তৈরি করা প্রাচীরের ওপর এসে পড়ছে জ্বলন্ত তীর — এমন হৈহল্লার মাঝে ছোট্ট আগুনের শিখাটাকেও দাবদাহ বলে মনে হয়। এমন সময় সত্যি সত্যি, বাবরের বাহিনীর ঘোড়ার খাবার জন্য জড় করে রাখা বিচালিতে আগুন ধরে গেল, পরিখার অদূরে খাটান তাঁবুর পশমী আচ্ছাদন থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল।

রাতের অন্ধকারে এই ধূর্ত আক্রমণ যদিও প্রতিরোধ করা হল তবুও এতে আক্রমণকারীদের উৎসাহ বেড়ে গেল। আসলে এটা ছিল জ্যোতিষীর উদ্দেশ্যে সঙ্কেত: কাজ আরম্ভ কর, তাড়াতাড়ি।

কাসিমবেগ বারবার বাবরকে বলত, শাহ্‌রিসাবজ থেকে সাহায্য এসে পৌঁছান পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার। কিন্তু বাবর সে কথা আর শুনছেন না। নক্ষত্রের যোগ দ্রুত জয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তাঁকে, কেবল তাঁকেই।

'এই আটটি তারার দিকে দেখুন, জাঁহাপনা!' গূঢ় রহস্য জানানোর ভাবে নীচুস্বরে শাহাবুদ্দিন বোঝাচ্ছিল বাবরকে। 'অতি বিরল ঘটনা: আটটি তারাই এক সারিতে! এ অতি শুভচিহ্ন! তারাগুলো জয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে আপনাকে, কেবল আপনাকেই!.. দেরি করা চলে না। দু'তিন দিন বাদে, এই আটটি তারার কোনটি দ্রুত দিগন্তের ওদিকে চলে যাবে যেখানে আছে প্রতিপক্ষ।...'

সেই রাতেই বাবর তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষদের ডেকে আদেশ দিলেন অবিলম্বে যুদ্ধে নামার প্রস্তুতি নিতে।...

জ্যোতিষী মওলানা শাহাবুদ্দিন সাহায্য করল। আগে সমরখন্দের প্রখ্যাত এই জ্যোতিষী শয়বানীর কাছে কাজ করত। তারপর যখন খান জানতে পারল পলাতক কবি বিনইকে বাবর কী পরম বিশ্বাসে গ্রহণ করেছেন, তখন সে নিজের বাহিনী থেকে

জ্যোতিষীকেও 'পালিয়ে যেতে দিল'। মেরে তার রক্ত বার করে দিল, পোশাক-আশাক ছিঁড়ে দেওয়া হল: সবার প্রতিই বাবরের বিশ্বাস, সহানুভূতি, তা ভাল করেই জানা আছে লোকের। তাই হল। শয়বানীর চর বাবরের অন্তরঙ্গদের একজন হয়ে গেল। তারাভরা রাতে আকাশের চাঁদোয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতেন দু'জনে, আর তখনই মওলানা শাহাবুদ্দিন নিজের উদ্দেশ্য সারত — বাবরকে ভবিষ্যদ্বাণী করত দারুণ জয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

তাদের মধ্যে যোগাযোগরক্ষাকারী দরবেশের মাধ্যমে জ্যোতিষীকে জানান হল খানের আদেশ: এই সপ্তাহেই যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য বোঝাতে হবে বাবরকে। সকালবেলায় উত্তর পাওয়া গেল: শক্তিমান খলিফার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে—কেবল এক শর্তে আগামী কোন এক রাতে খানের সৈন্যদল আক্রমণ করবে বাবরকে, আসল যুদ্ধ নয়, একটুখানি হম্বিতম্বি করতে হবে যাতে তরুণ সেনানায়কের আত্মসম্মানে ঘা লাগে।

সে রাতগুলি ছিল অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষের রাত।

এমনই এক অন্ধকার রাতে খানের অশ্ববাহিনী হুড়মুড় করে এসে পড়ল বাবরের ছাউনির কাছে।

সেই গোলমালভরা রাতে শয়বানী ঘুমোয়নি মোটেই, কেবল ভোরের দিকে ঘণ্টাখানেকের জন্য চোখ বুঁজেছিল। যখন ভোরের আলো ফুটল সে আবার তখন ঘোড়ার পিঠে, আবার সবার চোখে পড়ল উপরে উঁচু জায়গায় তার সাদা তাঁবুটা। সেখান থেকে বাবরের ছাউনি আর সেদিকে যাবার পথ ভাল করে দেখা যায়। প্রতিআক্রমণ আরম্ভ হবার একটু আগে ঐ রাস্তাগুলির একটি দিয়ে বাবরের ছাউনিতে এসে পৌঁছাল—আল্লার দোয়া, শাহ্‌রিসাবজের বাহিনী নয়—তাশকন্দ থেকে মাহমুদ খানের পাঠানো মোগলের দল—তিন-চারশ' জন সৈন্যের একটি দল। এদের কোন ভয় নেই শয়বানীর; সে জানে সমরখন্দবাসীদের সঙ্গে মোগলদের বিশেষ সদ্ভাব নেই, আর বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহকরা এই সৈন্যদলের লোকজনের নিজেদের মধ্যেও খুব মিলমিশ নেই।

নিজের সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত অভিজ্ঞতা নিঃশেষ করে শয়বানী দিনরাত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালাতে লাগল। দিনের বেলা পর্যবেক্ষণ করে বেড়াত ভবিষ্যৎ রণক্ষেত্রের প্রতিটি পাহাড়, প্রতিটি গুহা, ভেবে দেখত কোনদিক থেকে সূর্যের আলো পড়বে, কোনদিকে হাওযা বইবে।

যখন শয়বানী দেখল যে বাবর তার সেনাদল সাজাচ্ছে, অর্ধচন্দ্রশোভিত ঝাণ্ডা তোলা হচ্ছে, তখন সে যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

নিজের প্রিয় ঘোড়ায় চড়ে শয়বানী তার সেনাদলের সারিগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

'শোনো আমার আদরের বাজপাখীরা,' মিষ্টি সুরেলা গলায় বলল সে, 'খোদা

ছাড়া আর কোন ভরসা নেই আমাদের। আমাদের পিতৃভূমি এখান থেকে অনেক দূরে, যদি দুশমন আমাদের হারাতে পারে, তাহলে আমরা সেখানে পৌঁছতে পারব না। তাই দুশমনকে হারাতে হবে আমাদের। খোদাতালার ওপর বিশেষ ভরসা আমার। আমরা—তাঁর লস্কর।... স্বপ্নে আমি জেনেছি—জয় হবে আমাদের!'

'ইনসা-ল্লা! সবই আল্লাহ্‌র হাতে!' হাজার হাজার গলায় এক ধ্বনি উঠল।

যতটা সম্ভব আড়ম্বরে আর ধীর বিশ্বাস নিয়ে শয়বানী কোরানের একটি অনতিদীর্ঘ সুরা পড়ল নিজের সৈন্যদলের সামনে। কোরান পড়া শেষ করল সে পরিষ্কার আর একই সঙ্গে জাদুমাখা স্বরে—প্রকৃত ইমামের মত স্বরে:

'আল্লাহ্‌ আকবর! আমিন!'

'আল্লাহ্‌ আকবর!' হাজার হাজার কণ্ঠের চীৎকারে আকাশবাতাস কেঁপে উঠল।

সৈন্যরা গাজী খলিফার বক্তৃতায়, তার ভবিষ্যদ্বাণীতে উত্তেজিত হয়ে একত্রে, প্রচণ্ড শক্তিতে এগিয়ে চলল শত্রুর দিকে। সে সৈন্যদল একটা দেহ, যেন গুণটানা একটা ধনুক।

নদী রইল বাঁদিকে। বাহিনীর গতি সামান্য রোধ করে শয়বানী ডানদিকের দলকে বাঁদিকের দলের থেকে বেশি দ্রুত চালাল। এখানটায় মাটি ঢালের মত নিচে নেমে গেছে, সৈন্যদের পিঠে হাওয়া লাগছে পিছন দিক থেকে। আরো, আরো দ্রুত, অশ্ববাহিনী আরো দ্রুত ছুটতে সক্ষম! শয়বানী 'তুলগামা' পদ্ধতিতে শত্রুপক্ষকে ঘিরে ফেলতে চায়, তার জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত দ্রুত গতিবিধি। ডানদিকের দলে আগে থেকেই রাখা হয়েছিল বিদ্যুৎগতি অশ্ব আর সবচেয়ে দক্ষ অশ্বারোহীদের।

বাবর দেখলেন শত্রুপক্ষের 'ধনুকের' বাঁদিকের অর্ধেকটা—শয়বানীর কাছে যেটা ডান দিক — বেঁকে এগিয়ে এসেছে। শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য নিজের ডানদিকের হাতার মুখ ফিরিয়ে সামনে এগিয়ে দিলেন এবার, নদীর দিকে পিছন করে দাঁড়াল তাঁর বাহিনী।

খানের সৈন্যদল এগিয়ে আসছে। তাদের সেনানায়ক কয়েকজন বাছা বাছা দেহরক্ষী সিপাহী আর পতাকাবাহীদের নিয়ে রয়ে গেল পাহাড়ে উপরে। ক্রোশখানেক দূরে ঐ রকমই আর একটা পাহাড়ের উপরে বাবর দাঁড়িয়ে। তাঁর পেছনে জরফ্শান নদী ঝলকাচ্ছে সকালের সূর্যের আলোয়।

শয়বানী খানের অশ্বারোহী বাহিনী ছিল বেশি বড়। বাবরের দলে ছিল উঁচু ঢাল, লম্বা বর্শা, আর বড় হাতলওয়ালা কুঠারসজ্জিত বিশালসংখ্যক পদাতিক সৈন্য এমন ঢাল, বর্শা আর কুঠারের দেওয়াল ভেদ করে ছুটে চলা অশ্ববাহিনীর পক্ষে খুব সহজ নয়। কিন্তু অশ্ববাহিনী থাকার সুবিধা হল তার দ্রুত গতি। তুলগামার অর্থ হল শত্রুবাহিনীর পার্শ্বদেশে আক্রমণ করা, শত্রুদলের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে যে অংশগুলি দুর্বল সেখানে প্রাণঘাতী বর্শা আর তীক্ষ্ণ তীর ছুঁড়তে থাকা।

বাবরের পদাতিক বাহিনী তখনও সিকি ক্রোশখানেক দূরে—এমন সময় খানের আদেশানুসারে মাহমুদ সুলতান, জানিবেগ সুলতান, তৈমুর সুলতান অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের অশ্বারোহীবাহিনীর মুখ ঘোরাল ডানদিকে, আরও ডানদিকে, পেরিয়ে গেল বাবরের সেনাদলের মধ্যভাগ ও বাম দিকের অংশ। শয়বানীর 'ধনুর' বাম অংশে অভিজ্ঞ হামজা সুলতান ও মাহ্‌দি সুলতানও বামদিক থেকে তাই-ই করল একটু ধীরগতিতে কেন্দ্রস্থলকে না ছুঁয়ে, শত্রুসেনাদলের বামদিক পেরিয়ে তাদের পশ্চাদ্দেশের দিকে এগিয়ে চলল।

বাবর তাঁর বাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী অংশকে রেখেছিলেন কেন্দ্রস্থলে, এখন অত্যন্ত দ্রুত তাদের কিছু কিছু অংশ নিয়ে আসতে হল বামপাশে আর ডানপাশে। তুলগামার একটি অসুবিধাও আছে: ধনুর দুই অর্ধভাগ পরস্পর থেকে অনেক দূরে যাবার সম্ভাবনা থাকে, যার ফলে তার মধ্যভাগ ভেঙে যেতে পারে, শত্রু প্রচণ্ড শক্তিতে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মধ্যভাগ ভেঙে দিলেই ধনুক ভেঙে যায়, থাকে কেবল দুটি বিচ্ছিন্ন অর্ধাংশ। ঝাঁপিয়ে পড়! শয়বানী বাহিনীর দুর্বল মধ্যভাগে আঘাত করল বাবরের সৈন্যদল। সবকিছু এখন নির্ভর করছে অত্যন্ত দ্রুত গতির উপর!

খানের বাহিনী এগিয়ে গেল! বাবরের অশ্বারোহীবাহিনী ডান বা বাঁ কোন দিক থেকেই তাদের পথরোধ করতে পারল না। মাহমুদ সুলতান পৌঁছে গেল বাবরের বাহিনীর পেছনে। হামজা সুলতানের বাহিনীও বাবরের বাহিনীর পাশ কাটিয়ে এসে মিলিত হল মাহমুদ সুলতানের বাহিনীর সঙ্গে। পিছনদিক থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল বাবরের বাহিনী। শত্রুপক্ষের তাড়া খেয়ে মধ্যভাগে অবস্থিত পদাতিক বাহিনীর উপর চাপ সৃষ্টি করল নিজেদেরই অশ্বারোহী বাহিনী।

বাবর তাঁর নিজস্ব ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সেরা শতখানেক সৈন্যকে একটি মুঠিতে একত্রিত করলেন। রণক্ষেত্রের এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে তারা অগ্নিশিখার মত শত্রুপক্ষের দুর্বল মধ্যভাগ ভেদ করে সোজা ছুটে চলল সেই দিকে যেখানে শয়বানী দাঁড়িয়েছিল। শতখানেকের দলের এই আক্রমণ ছিল ভয়ংকর। কুপাকবির দল তাদের পিছনে ধাওয়া করল কিন্তু আবার লড়াইতে জড়িয়ে তারা—কুপাকবি যতক্ষণে এগিয়ে আসবে ততক্ষণে ঐ 'মুঠি' শয়বানী খানকে ঘিরে থাকা সৈন্যদের বিনাশ করবে। শয়বানীর দলের মধ্যে সাড়া জাগল। মুল্লা আবদুররহিম যেন বিকাগ্রস্তের মত নিজের বাধ্য ঘোড়াটির ঘাড় জড়িয়ে ধরে কাকুতিমিনতি করতে লাগল:

'হুজুরে আলি, আমাদের মুকদ্দম ইমাম, নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়া উচিত আপনার! নাহলে আর রক্ষে থাকবে না...'

শয়বানীর মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নিরাপদ জায়গায় সে নিজেই সরে যেত, কিন্তু এই পাহাড়ের উপর তার পতাকা উড়ছে। সে যদি পাহাড়ের ওপাশে নেমে

যায় তো সৈন্যরা খলিফা বা তার পতাকা কিছুই দেখতে পাবে না। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে তাদের মধ্যে যা ডেকে আনবে পরাজয়।

শয়বানী চীৎকার করে বলল:

'মরে গেলেও পিছু হঠব না!'

তার নিজের বাছাবাছা সৈন্যদের (খলিফার ব্যক্তিগত একশজন রক্ষী) আদেশ দিল কঠোরসুরে :

'লড় সবাই! ধর ওদের, জান দিতে হলেও ধর!'

খানের শেষ ভরসা, একশ'জন সৈন্য যাদের তাকে রক্ষা করার, যেকোন বিপদ থেকে আড়াল করার কথা। মরণপণ শক্তিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল আক্রমণ রুখবার জন্য। তাদের অনেক লোক মরল কিন্তু বাবরের 'মুঠির' জোরও কমে এল, শিথিল হয়ে এলো! ততক্ষণে কুপাকবিও এসে পড়েছে, তার চারশ অশ্বারোহী সৈন্য বাবরের দলকে ঘিরে ফেলল। কিন্তু বাবরের জনা দশ-বারো অতি চটপটে যোদ্ধা কুপাকবির সৈন্যদের হাত এড়িয়ে আবার এগিয়ে চলল যেখানে শয়বানী ছিল সেইদিকে। খানের লোকেদের কিছু অংশ পিছিয়ে গেল। খান নিজে কিন্তু রয়ে গেল, একটা তীর ছুড়ল সে, যদিও তীরটা কারুর গায়েই লাগল না তবুও কুপাকবির সাঙ্গোপাঙ্গ দূর থেকে আনন্দ-উল্লাস করে উঠল, বাবরের দলের লোকদের এক এক ক'রে ধরে কেটে ফেলল তারা সবাইকে।

ওদিকে লড়াইয়ের প্রধান অংশ বিশৃঙ্খলায় তুলগামার সাফল্যও অনুভব করা যাচ্ছে। পদাতিক সৈন্যরা আর বাবরের আদেশ পালন করতে পারছে না। তাশখন্দ থেকে সম্প্রতি যে মোগলরা এসে যোগ দিয়েছিল বাবর হেরে যেতে বসেছেন দেখে তারা পালিয়ে যেতে লাগল আর চলে যাবার সময়ে লুঠ করে নিয়ে যেতে লাগল সওয়ারী ছাড়া ঘোড়াগুলোকে। কোন কোন মোগল ঘোড়সওয়ার আবার এই তালে গোলে আন্দিজান আর সমরখন্দের যে সৈন্যদের সঙ্গে মিলে এতক্ষণ লড়াই করছিল তাদেরই ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিতে লাগল ঘোড়াগুলো নিয়ে নেবার জন্য।

মাহমুদ সুলতানের অগ্রণীদলগুলি ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল বাবরের দিকে।

অবশেষে বাবর তাঁর দেহরক্ষীপরিবৃত হয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নামতে লাগলেন নদীর দিকে। শয়বানী দেখল তাঁর এই পিছু হঠে যাওয়া। কিন্তু বাবরকে ধাওয়া করার আদেশ দিল না—ফাঁদে পড়ার ভয় হল তার। আসলে কিন্তু বাবরের কোন কৌশলই ছিল না। নদীর স্রোতে ঘোড়া ছেড়ে দিলেন বাবর। তাঁর কয়েকশত বীর সৈন্য তীরে প্রাচীর সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে রইল, আক্রমণকারীদের রুখবার জন্য।

শয়বানী দু'হাত তুলল আকাশের দিকে :

'তোমার দোয়া কোনদিন ভুবল না, খোদা!'

বাবর নদীর দিকে পিছিয়ে গেছে দেখে নিজের হতবুদ্ধিভাব ঝেড়ে ফেলে শয়বানী একজন অনুচরকে বলল :

'শীগগীরি ঘোড়া ছুটিয়ে যা, আমার বাজপাখীদের বল গিয়ে যে বাবরের মাথা এনে দিতে পারবে আমায় সেই মাথার সমান ওজনের সোনা পাবে সে!'

ঘোড়া ছোটাল অনুচরটি কিন্তু শয়বানী আবার থামাল তাকে:

'না বল্ গিয়ে... বাবরকে জীবিত ধরে আনতে; যে তা পারবে সে বাবরের সমান উঁচু সোনার পাহাড় পাবে। যা শীগগীরি। ওকে আমার পায়ের তলায় দেখতে চাই— জীবিত বা মৃত যেভাবেই হোক।' শয়বানী আবার হাত তুলল আকাশের দিকে। এমনিভাবেই স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখের পাতা ভিজে অনুভব করল— এ হল আনন্দাশ্রু। মৃদু হেসে হাত নামিয়ে নিল আর সেই সঙ্গে দ্রুত চোখ মুছল হাত দিয়ে।

৬

গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে গরমমাস সারাতান শেষ হয়ে আসাদমাস পড়েছে।

শহরপ্রাচীরের ওপাশে গাছগুলি ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে, যেন অন্নদাত্রী মাটিতে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। এদিকে শহরের মধ্যে বাগান বা আঙুরখেত সব শূন্য হয়ে গেছে: যে সব গাছপালা হলুদ হয়ে যায় নি, সেখানে দেখা যায় না একটিও পাকা আপেল বা মিষ্টিরসেভরা পীচফল বা একগুচ্ছ আঙুর। পাঁচমাস ধরে অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে সমরখন্দবাসীরা : অবরোধ ক্রমশ কঠিন, নিষ্ঠুর, নির্দয় হয়ে উঠেছে। শহরের সব প্রবেশপথই বন্ধ, শহরের একেবারে কাছেই শয়বানীর সৈন্যদল অবস্থান করছে। কেউ শহর থেকে বেরোতে পারছে না, ঢুকতেও পারছে না কেউ।

উলুগবেগের মাদ্রাসার ছাতের ওপর সমান জায়গায় বাবরের সাদা ছাউনি খাটান হয়েছে। এখান থেকে ভাল করে দেখা যায় প্রবেশপথসমেত প্রাচীর ও তার আশপাশ। বাবরের নজর নিজের অজান্তেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে ক্ষুধার্ত লোকেদের উপর—হায় আল্লাহ্, কার্ণিশের নিচে বাসা গেড়েছে যে পায়রাগুলো ওরা তাদের ধরার চেষ্টা করছে। পাখীরাও সাবধান হয়ে গেছে: শহরের রাস্তায় এখন আর পড়ে থাকে না রুটির টুকরো বা খাবারের উচ্ছিষ্ট—তাই পাখীদেরও খাবার কিছু নেই। কিন্তু পাখী উড়ে যেতে পারে প্রাচীরের ওপাশে। আর লোকেরা কী করবে? কেউ যদি কুকুর বা বিড়াল ধরতে পারে তো দাঙ্গা বেঁধে যায়: তার কাছ থেকে শিকারটা কেড়ে নিতে চায় সবাই।

মাদ্রাসার পিছনেই বিরাট আস্তাবল। আগে সেখানে থাকত প্রাসাদের শতশত ঘোড়া। এখন সেখানে আছে মাত্র গোটাদশে—তার বেশি নয়। সারিপুলের লড়াইতে বিরাট ক্ষতি হয়েছে, তার থেকে আরও বড় ক্ষতি হয়েছে—এই আকালে: প্রাসাদের

লোকেদের খাওয়ানোর জন্য কাটা হয়েছে একটার পর একটা ঘোড়া। এখন এই যে গোটা কয়েক ঘোড়া অবশিষ্ট আছে এগুলিরও প্রায় দানা জোটে না। ঘাস খাওয়ানো হয়েছে কিছুদিন — তাও আর নেই। এমনকি গাছের পাতা খাওয়ানো হয়েছে ঘোড়া, উটদের। গাছের ছালভিজানোও।

ওপর থেকে, মাদ্রাসার ছাদ থেকে বাবর দেখতে পাচ্ছেন তাহির আর হলুদগোঁফ মামাত আস্তাবলে ঘোড়াদের খেতে দেবার যোগাড় করছে এই সব ধরনের খাদ্য। বেশ সাহসী এই তাহির। সারিপুলের লড়াইতে সেই সব বাছাবাছা সৈন্যরা, যারা লড়াইয়ের শেষে প্রাণ দিয়েছে বাবরকে নিরাপদ জরাফশান নদী পেরিয়ে যেতে দেবার জন্য, এমনকি তাদের মধ্যেও কৃতিত্ব লক্ষ্য করার মতো। সম্প্রতি বাবর ওর বিবাহের কাহিনী শুনেছেন। অনেক দুঃখকষ্টের পর আবার ফিরে পাওয়া তার স্ত্রী রাবিয়া যাতে অনাহারে না মরে সেজন্য তাকে বাবরের মা কুতলুগ নিগর-খানুমের পরিচারিকা নিযুক্ত করা হয়েছে।

মামাতও বাবরের অনুচর হয়েছে। গত সপ্তাহে সে জলের নালী দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল শহরের বাইরের বাগানের ফল পেটভরে খাবার জন্য, সেখানে খানের সৈন্যদের হাতে পড়ে সে, ক্ষুধার্ত কারিগর বলে নিজের পরিচয় দেয়—ছাড়া পায় সে, কিন্তু তাকে একটু 'শিক্ষা দেবার' জন্য একটা কান কেটে দেয় তার। ভাগ্য কখন যে সহায় আর কখন যে বিরুদ্ধে তা বোঝার উপায় নেই। অন্য যারা সাহস দেখিয়ে বাইরে গিয়েছিল কুপাকবির লোকরা তাদের নাক কেটে দিয়েছে।

এখন মামাত টুপিটা কান পর্যন্ত টেনে নামিয়ে চলাফেরা করে। কখনও কখনও নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়:

'কাটাকান তো তবু চাপা দেওয়া যায়, কিন্তু কাটানাক কী করে ঢাকতাম?'

হায় আল্লাহ্, বাবর নিজে সাতমাস সমরখন্দ অবরোধ করে মামাতের মত এমন সাধারণ সমরখন্দবাসীদের কত দুঃখের কারণ হয়েছে! বাবর ভুলে যাননি বাইরের বাজারে সেই বৃদ্ধাটির কথা, যার ছেলে খইল খেয়ে সারা শরীর ফুলে মারা যায়, তার ফলে বৃদ্ধার মাথার গোলমাল হয়ে যায়। এখন প্রতিশোধ গ্রহণকারিণী নিয়তির রায় দেবার মত করে বাবরের বুকে বাজল সেই বৃদ্ধার কথা: 'আপনারও কপালে এমনি ঘটুক!'

দরিদ্রের কুটির থেকে দুর্ভিক্ষ এবার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলল বেগদের বাড়ির দিকে, তারপর বাদশাহের মহলের দিকেও। দশদিন হল বাবর নিজেও রুটি দেখেননি চোখে। আটা ফুরিয়ে গেছে। সোনার থালিতে করে তাঁর সামনে রাখা হয় সকালে — একমুঠো শুকনো আঙুর আর চা, সন্ধ্যাবেলায় — এক বাটি পুরনো, শক্ত উটের মাংসের ঝোল। রুটিই যদি নেই তো দামী বাসনপত্র দিয়ে কি হবে? অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে সোনার ছলনাময় প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিক্ততা ভরা কয়েকটি পংক্তি — কিন্তু এখন কবিতা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই বাবরের।

কেঁদে কেঁদে গলা বসে গেছে ছ'মাসের ফখরুন্নেসার: অত্যন্ত রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে আয়ষা বেগম, তার বুকে দুধ নেই। তাই ফখরুন্নেসাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য খুঁজে বার করা হল সদ্য মা হওয়া এক মহিলাকে। এইভাবে বিপদ ডেকে আনলেন তাঁরা নিজেরাই। স্তন্যদাত্রী মহিলাটির পরিবার ছিল বিসূচিকাগ্রস্ত। দু'দিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল!

সাদা কাফনে জড়ানো ছোট্ট দেহটি হাতে করে নিয়ে চললেন বাবর সমাধি দেবার জন্য। কাঁদছেন, 'বিসূচিকা আমাকেও ধরুক, তাহলেই সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়োবে'—এই তিক্ত আশা নিয়ে বাবর শিশুকন্যার হিমঅধরে চুমো দিলেন। তাঁর গর্ব, জয়ের প্রতীক ফখরুন্নেসাকে সমাধি দেওয়া হল। সারা দেহমন দিয়ে বাবর অনুভব করলেন যে সমাধি দেওয়া হচ্ছে তাঁর জীবনের এক অংশকে আর গত বিজয়ের গর্বকে।

অবরুদ্ধ শহরের দুঃখকষ্ট যত বাড়ছে, শত্রুদের আনন্দ-উৎসবও ততই বাড়ছে। পাঁচমাস ধরে সমরখন্দ অপেক্ষা করে আছে কবে হীরাট থেকে বাবরের চাচা—শক্তিশালী হুসেন বাইকারা, তাশখন্দ থেকে চাচা মাহমুদ খান সাহায্য পাঠাবেন। তাঁদের চিঠি লিখেছেন বাবর, কাকুতিমিনতি করে। কিন্তু কোন সাহায্য আসেনি। এখন কেবল নিজের ওপর ভরসা করতে পারেন বাবর। সাহায্য আগেও কখনও পাননি আর পাবেন না। শয়বানী খানও তা বুঝেছে: প্রতি রাতে ঢাক আর শিঙা বাজিয়ে সে সমরখন্দবাসীদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। ঘোষকরা দেয়ালের কাছে উঁচু টিপির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে শহরবাসীদের আহ্বান জানায় শয়বানীর দলে যোগ দিতে, পেটভরে খেতে দেবার প্রলোভন দেখায়। বেগদের আর সৈন্যদের ভালো কাজ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কোন কোন বেগ অবশ্যই ছেড়ে যায় বাবরকে, গোপনে প্রাচীর পার হয়ে বা নালী দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বাবরের ব্যক্তিগত রক্ষীদলের প্রধানও একদিন পালাল চুপিচুপি। এখন আর কার ওপর বিশ্বাস রাখা যায়?... এক রাতে তাহিরকে কাছে ডাকলেন বাবর।

'তাহিরবেগ, গোর-এ-আমীরের দেওয়ালে আরবীভাষায় লেখা আছে: 'দুনিয়া তোমার থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নেবার আগে তুমি নিজেই দুনিয়া ছেড়ে যাও।' এবার সে সময় এসেছে।... বিসূচিকা যদি নিত আমায় তো সবারই মঙ্গল হত। কিন্তু নিল না আমায়...'

'খোদা আপনাকে রক্ষা করুন, জাঁহাপনা! আপনিই আমাদের একমাত্র আশাভরসা!' এমন রোগা হয়ে গেছে তাহির যে মনে হয় তার খোঁচা হয়ে বেরিয়ে থাকা কাঁধের হাড় যেন তার চোগা ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়বে। মুখের ওপরে পুরানো ক্ষতচিহ্নটা ফুলে উঠেছে, চোখ কোটরে বসে গেছে, তবুও ঝলক দিচ্ছে!

'আশাভরসা ধ্বংস হয়ে গেছে তাহিরবেগ! গতকাল দুই পংক্তির এক কবিতা লিখেছি :

পরলোকে যেতে বাবরের যদি সাধ হয়, তবে দুষোনা যেন,
যন্ত্রণা ছাড়া আর কিবা আছে ইহ দেশে সেটা দ্যাখো না কেন।

তাহির মাথা নাড়িয়ে বলল :

'এ—সত্যি, জাঁহাপনা; আজকের দিনে আমাদের জন্য আছে—কেবল বিষাদ! কিন্তু প্রতিমাসের অর্ধেক কৃষ্ণপক্ষ, অর্ধেক শুক্লপক্ষ। আমাদের বাহুতে এখনো আছে শক্তি, কোমরবন্ধে তরবারি...'

'কি করা যায় তাহলে?'

মনিব-গোলাম, দুই যোদ্ধা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দু'জনের হয়ে বাবর বললেন:

'শেষ পথ বেছে নিতে হবে।... যত শক্তি আছে তা সংগ্রহ করতে হবে এক মুঠিতে, উপযুক্ত মুহূর্ত যেই আসবে অমনি অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে! আমাদের শেষ দিন যদি এসে না থাকে তো, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, বেরিয়ে যাব, আর যদি এসে গিয়ে থাকে তো তরবারি হাতে নিয়েই মরব!...'

'আল্লাহ্ দিন যেন এ অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে যাই আমরা, জাঁহাপনা!'

'আপাতত এই গোপন পরিকল্পনার কথা জানেন কেবল কাসিমবেগ। তুমিও এ কথা গোপন রেখো।... তৈরি হও, বন্ধুরা, তৈরি হও!'

রাতের বেলায় তাহির মিলিত হল কাসিমবেগের সঙ্গে। প্রাচীরের ছিদ্র দিয়ে তারা অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করতে লাগল শয়বানীর ছাউনির মশালগুলির অবস্থিতি : ভাল করে দেখে তারা বুঝল শত্রুদলের শক্তির বেশিটাই নিযুক্ত করা হয়েছে ফিরোজাদরওয়াজা আর চাররাহ— দরওয়াজা এই দুই প্রবেশপথের কাছে, ওদিকে শেখজাদা প্রবেশপথের কাছে ছড়ানছিটান জ্বলছে কয়েকটি মাত্র মশাল। সৈন্য আর সবচেয়ে সক্ষম ঘোড়া প্রস্তুত রাখতে হবে, প্রস্তুত হবে হবে।...

৭

তাঁর নিজের হাতে নিহত শত্রুসৈন্যের স্তূপের ওপর পড়ে তরবারি হাতে মরা বাবরের ভাগ্যে লেখা ছিল না। দুর্গ থেকে বেরোবার প্রস্তুতি চলছে যখন খুব জোর, তখন বাবরের বিশ্রামকক্ষে কোনো খবর না দিয়েই এসে ঢুকলেন তাঁর মা আর দাদী, তাঁদের পিছন পিছন হতবুদ্ধি কাসিমবেগ।

'নাতি আমার, জাঁহাপনা', গত কয়েক মাসে এসান দৌলত বেগম একেবারে ঝুঁকে পড়েছেন, তাঁর কথাগুলো বাবরের কাছে ভেসে আসছে যেন নিচের দিক থেকে, 'সন্ধিপ্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠিয়েছে শয়বানী খান!'

'সন্ধি' এই কথায় যেন বেজে উঠল বাঁচার মন্ত্র। কিন্তু সেই রক্ষাকর্তা শয়বানী, শয়বানী খান শান্তিস্থাপনকারী? অবিশ্বাস নিয়ে তাকালেন বাবর প্রথমে দাদী, তারপর মা'র দিকে। কুতলুগ নিগর-খানুমের মুখচোখ বিমর্ষ, যেন কেঁদেছেন একটু আগে। কিন্তু এসান দৌলত বেগমের হাতে গোটান চিঠিটা, সোনালী ফুৎনা ঝুলছে পাকানো দড়িটা থেকে।

'এই যে খানের বার্তা,' বলে দাদী কেমন এক বিশেষ দৃষ্টিতে হাতে ধরা কাগজটির দিকে তাকালেন!

খানের বার্তা এসান দৌলত বেগমের হাতে পড়ল কেন? বাবর জিজ্ঞাসা করলেন:

'কে এনেছে?'

'এক খোদাবন্দ দরবেশ। নক্‌শাবন্দীদের একজন, এক বুড়ো। খাজা ইয়াহিয়া ছিলেন তার মুরশিদ।'

'মার দিকে তাকালেন বাবর:

'আপনাকে এনে দিয়েছে?'

'না,' বিমর্ষমুখে মাথা নাড়লেন কুতলুগ নিগর-খানুম।

এসান দৌলত বেগম চিঠিটা বাবরের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ইতস্তত করে বললেন:

'এটি পাঠিয়েছে খানজাদা বেগমের নামে।'

'আজব কথা!' সাবধানে চিঠিটা হাতে নিয়ে বাবর ঘৃণাভরা চোখে লক্ষ্য করতে লাগলেন সেটি, খুললেন না তখনও চিঠিটা।

'বলা অত্যন্ত কঠিন হলেও বলা আমার প্রয়োজন,' থেমে গেলেন এসান দৌলত বেগম। '...শয়বানী খান অনেক শুনেছে আমাদের খানজাদার রূপের কথা। ওকে পেতে চায়। এই চিঠিতে সে সম্বন্ধে কবিতাও লিখেছে সে।'

শয়বানীর পঞ্চাশবছর বয়স হল, ছেলেদের বিয়ে দিয়েছে বহুদিনই, নাতিনাতনী আছে। ক্রুদ্ধভাবে চিঠিটা খুললেন বাবর। তখনই তাঁর দৃষ্টি পড়ল দুই ছত্র কবিতার উপর।

মুগ্ধ তোমায়, বিরহ জ্বালায় মরণ ঘনায়,
দগ্ধ এখন হৃদয়াবেগের অগ্নিকণায়।

চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাবর গালিচার উপর:

'আপনারা ভুলে গেছেন, গতবছর খান এমনি ছড়া দিয়েই প্রলুব্ধ করেছিলেন সুলতান আলি মির্জার মাতৃদেবী জোহরা বেগমকে? শয়বানীর চিঠিতে কি করে বিশ্বাস করেন আপনারা?'

কুতলুগ নিগর-খানুম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ওদিকে এসান দৌলত বেগম ঠাণ্ডা মাথায় বলে চললেন যে 'অন্য সময় হলে এমন চিঠি পড়তে আমাদেরও ঘৃণা হত কিন্তু এখন সবার সামনে যখন এমনি বিপদ, আমার আর কি, বুড়ো হয়েছি, আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার কাছে একই কথা এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া পাঁচ দিন আগে বা পরে, কিন্তু তোমাদের বয়স কম, জাঁহাপানা, তুমি আমার একমাত্র নাতি, আমাদের চোখের মণি...'

প্রতিবাদ করছেন বাবর, কখনও বা ধীরস্থিরভাবে, কখনও বা দারুণ রাগে, ওদিকে বৃদ্ধা কিন্তু নিজের কথা বলেই চললেন যে তাদের বয়স কম, এমনি করে সবাই মিলে মরার কোন অর্থ হয় না, আর খানজাদা বেগম সবার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী, দয়াময়ী, সব বুঝেছে সে, রাজী হয়েছে।

চীৎকার করে উঠলেন বাবর:

'বিশ্বাস হয় না। আমার বোন সুন্দর মনোমুগ্ধকর কুসুম যাবে স্তেপের ঐ নোংরা বুড়োটার হারেমে!... না, না! এ বেইজ্জতি! এ হবে না!'

এবার কাসিমবেগ যোগ দিল:

'জাঁহাপনা, আমরা অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করব, ভেঙে বেরিয়ে যাব।... নয় মরব। সে যাই হোক না কেন শয়বানী সমরখন্দ দখল করবেই তখন যে করেই হোক নিজের উদ্দেশ্যসাধন করবে।'

কুতলুগ নিগর-খানুম এতক্ষণ নিজেকে সংযত করে রেখেছিলেন। বাবর তাঁর দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাতে আর ধরে রাখতে পারলেন না নিজেকে, হু-হু করে কেঁদে ফেললেন:

'কোথায় যাবে তোমরা? নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে?... ও দয়াময় আল্লাহ্, এমন দুঃখ দেওয়ার চেয়ে আমার জীবন নিলে না কেন তুমি! খানজাদা বেগম—আমার প্রথম, আমার প্রিয় সন্তান, তার সঙ্গেই আমি মন খুলে কথা বলি, আমার বিধবা একাকিনী জীবনে সেই আমার সান্ত্বনা! তাকে ছেড়ে বাঁচব কী করে আমি, হায় খোদা?! নিজের মেয়েকে দুশমনের হাতে ছেড়ে দেব কী বলে?!'

দাদী আরও অনেকক্ষণ ধরে কী সব বললেন, মা কাঁদলেন অনেকক্ষণ, বিশ্বস্ত কাসিমবেগ সন্দেহের দোলায় অস্বস্তিবোধ করল।

'হয়েছে,' বললেন বাবর, 'বেগমের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

অধৈর্য হয়ে তিনি বোনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। বোন এল যখন বাবর তার দিকে তাকিয়ে বুঝলেন এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে সে...

বোনকে নিজের সামনে বসিয়ে বাবর নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। গাল বসে গেছে খানজাদা বেগমের, ম্লান অধর। কিন্তু বড় বড় চোখগুলি আগের মতই সুন্দর, উজ্জ্বল আর সে চোখে পড়া যাচ্ছে দৃঢ়সঙ্কল্প।

'আপাজান, শয়বানী খানের প্রস্তাবে আপনি সম্মতি জানিয়েছেন? দাদী কি ঠিক খবরই দিয়েছেন আমায়?'

'আর কী করার আছে আমার?'

'জানি, জানি... আমার পরাজয়ই আমাদের সবাইকে এমন নিরুপায় অবস্থায় ফেলেছে। কিন্তু আপনার ভাই তো এখনও মরেনি। ওদের হাতে বন্দী হব না আমি কিছুতেই। মৃত্যু জীবনে একবারই আসে, তাঁর হাত এড়ান যাবে না।... যদি আমরা অবরোধ ভেঙে বেরোতে পারি, যদি বেঁচে থাকি, তো ফিরে এসে নিয়ে যাব আপনাকে। আর যদি আমার দিন শেষ হয়েই থাকে তাহলে তরবারি হাতে নিয়েই মরব।... তখন রাজী হবেন... তখন কেউ বলতে পারবে না, 'দেখেছ বাবর কেমন স্বার্থপর: নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য বোনকে বলি দিল।' এমন লজ্জার থেকে মৃত্যুই ভাল!.. সম্মতি জানাবেন না বেগম!'

খানজাদা বেগমের চোখে আঁধার নামল, জলে ভরে গেল চোখদুটি! যতই সাহসী হোন না কেন বাবর এই অবরোধ ভেদ করার মত শক্তি তাঁর নেই তা জানেন তিনি। বাবর নিজেও তা জানেন। অবরোধভেদ করার এই যে সংকল্প এ হল মৃত্যুবরণ করার সংকল্প। সে কারণেই তিনি বোনকে আহ্বান জানাচ্ছেন না যুদ্ধসাজ করে তাঁদের সঙ্গে যেতে।... সাহসী, মনখোলা এই ভাইকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন — সেজন্যই স্থির করেছেন নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে ভাইকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবেন।

কিন্তু যা ভাবছেন তা কি সোজাসুজি বলা যায় তাঁকে? সিদ্ধান্ত শুদ্ধ অন্তঃকরণে মেনে নিতে না পেরে বাবর যে নিজের বোঝা হালকা করার জন্য যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করার সংকল্প নিয়েছেন সে কথা তাঁর বোন অনুমান করতে পেরেছেন — এটা যদি বাবর জানতে পারেন, তাহলে যেকোন উপায়ে তিনি তাঁর বোনকে আত্মবলি দেওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করবেন। তাহলে তাঁদের সবারই বিপদ। আর যদি বাবরের মৃত্যু হয় তাহলে তাঁর কপালে জুটবে হয তরবারি নয় বিষ।

'বাবরজান, আমার জন্য অসময়ে নিজেকে মৃত্যুপথে এগিয়ে দেবেন না। আহমদ তনবালের যে অত্যাচার আমাদের সইতে হয়েছে তাই যথেষ্ট।' হাত দিয়ে চোখের জল মুছে খানজাদা আবেগাপ্লুতস্বরে জোরে জোরে বললেন, 'আমি আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাস করি, জাঁহাপনা! অন্যেরা জানে না, কিন্তু আমি তো জানি এমন বিরল প্রতিভা পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্ম নেয়! আপনার বেঁচে থাকা দরকার! মহান কাজের জন্য! মহান কাব্যের জন্য! অভাগা বোনের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়াবেন না!'

'এমন কথা বলছেন কেন, আপা? আমরা, আমরা সবাই...' থেমে থেমে বললেন বাবর, 'এই ছলনাময় পৃথিবীতে কয়েকদিনের অতিথি! আপনি, আমি — এক মায়ের পেটের সন্তান!'

'কিন্তু আমি জন্মেছি মেয়ে হয়ে!... তাছাড়া, আমার বয়স হল পঁচিশবছর, এখনও বিয়ে হল না। যাকে ভালবাসলাম তাকে পাওয়া আমার কপালে নেই। সব আশার মৃত্যু হয়েছে। কোন কিছুতেই আমার আর সুখ নেই। আর কতদিন আমি আপনার কাছে পড়ে থাকব, জাঁহাপনা, আইবুড়ো হয়ে? যথেষ্ট হয়েছে, এবার আমারও একটু পরখ করা দরকার নারীজন্ম।'

'তাই নাকি... নাতিনাতনীতে ঘরভরা ঐ বৃদ্ধের স্ত্রী হবার উপযুক্ত মনে করেন নাকি নিজেকে?...'

'খুঁজে খুঁজে নিরাশ হয়ে পড়েছি আমি, বাবরজান! বৃদ্ধ কি যুবক তা বিচার করে আমার আর লাভ কী?'

'কিন্তু আপনি... আমাকে সেবার কী বলেছিলেন ওশে মনে আছে? 'নিজের অন্তরের কথা শোন!' নিজের হৃদয়ের সঙ্গে কি ছলনা চলে, খানজাদা? ঐ নিষ্ঠুর, ধূর্ত শয়বানী খান আমাদের যে দুঃখকষ্টের কারণ হয়েছে তা আপনার হৃদয় ভুলতে পারল কী করে? অন্তত জোহরা বেগমের সঙ্গে তার খলতা ও শয়বানীর কথা কি ভোলা যায়?'

হু-হু করে কেঁদে ফেললেন খানজাদা। বাবর বলে চললেন:

'একই মায়ের সন্তান আমরা। আমাদের দু'জনের ভাগ্যও একই সূত্রে বাঁধা থাক! আপনি জানেন যে আজ রাতে আমরা অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করব। আপনিও প্রস্তুত হন আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য। হয়ত আমরা সফল হব!'

ভীষণ ইচ্ছা হল খানজাদা বেগমের আবার পুরুষের পোশাক পরতে, হালকা বর্ম গায়ে চড়িয়ে ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে লড়াইতে নামতে। বৃদ্ধ কামুকের হারেমে পড়ে পচে মরার চাইতে রণক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করা শ্রেয় তা ঠিক। হঠাৎ খানজাদা বেগম আবেগকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন:

'কখন যাবেন? কখন?'

'আজ রাতে!' শান্ত দৃঢ়স্বরে বললেন বাবর।

তাঁর ভাই যে আজ রাতেই মারা পড়বে, তার কবিতার সূত্র, তার আলাপ আলোচনার, খানজাদার প্রতি তাঁর ভালবাসার সূত্র ছিঁড়ে যাবে এই চিন্তা তাঁর অন্তর বিদ্ধ করল, চীৎকার করে উঠলেন তিনি:

'আজ নয়! না, না!'

এবার উঠে দাঁড়ালেন বাবর:

'যদি ভাইয়ের কথা আপনি না শোনেন, তাহলে আপনার বাদশাহের হুকুম অন্তত তামিল করুন! আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে! এখনও যথেষ্ট সময় আছে—নিজের ঘরে গিয়ে প্রস্তুত হন!'

উঠলেন খানজাদা বেগম আসন ছেড়ে, নীরবে বাবরের কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখ রাখলেন তাঁর বুকে। এভাবে বিদায় নিলেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

মাঝরাতে শেখজাদাদরওয়াজার কাছে সমবেত হলেন বাবর, কাসিমবেগ, কুতলুগ নিগর-খানুম, আয়ষা বেগম, তাহির আর তার স্ত্রী রাবিয়া। কুতলুগ নিগর-খানুম, আয়ষা বেগম ও আরও কিছু স্ত্রীলোক বসেছেন শক্তিশালী ঘোড়াজোতা এক গাড়িতে, গাড়িটি রাখা হয়েছে দলের ঠিক মাঝখানে। গাড়িতে বা অশ্বারোহীদের মধ্যে কোথাওই দেখতে পাওয়া গেল না খানজাদা বেগমকে।

জিজ্ঞাসাবাদের ফলে জানা গেল তাঁরা এখানে মিলিত হবার এক ঘণ্টা আগেই খানজাদা বেগম দাদীর সঙ্গে রওনা দিয়েছেন শহরপ্রাচীরের বিপরীত দিকে অবস্থিত প্রবেশপথ চাররাহের দিকে। কুতলুগ নিগর-খানুম অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন যে তিনি মেয়েকে বারবার বুঝিয়েছেন এমন না করতে, কিন্তু দাদী ঠিক ততই জোর দিয়ে বরাবরা বলছিলেন যে খানজাদা যেন নিজের উদ্দেশ্য পালন করে।...

বাবর তাঁর অনুচরদের দিকে ফিরলেন। দৃষ্টি দিয়ে খুঁজলেন তাহিরকে;

'চাররাহ্‌দরওয়াজার দিকে যাও! খানজাদা বেগমকে খুঁজে বার করে আমার আদেশ জানিও তাঁকে। অবিলম্বে এখানে আসেন যেন তিনি! বলো যতক্ষণ তিনি না এসে পৌঁছবেন ততক্ষণ আমরা কোথাও যাব না!'

'জাঁহাপনা...' কী যেন বলতে চাইল কাসিমবেগ, কিন্তু সেকথায় কান না দিয়ে চীৎকার করে বাবর বললেন:

'জলদি যাও, তাহির!'

ছুটে চলল তাহিরের ঘোড়া শহর পেরিয়ে। পাথরে বাঁধান পথে ঘোড়ার খুরের ধাক্কায় আগুনের ফুলকি ছুটতে লাগল। চাররাহ্‌দরওয়াজার কাছে পৌঁছে তাহির দেখল খানজাদা বেগমকে নিয়ে চমৎকার করে সাজান শকটটি পরিখার উপর ফেলা সেতু পেরিয়ে যাচ্ছে, মশালধারী অশ্বারোহীরা চারদিক থেকে ঘিরে আছে শকটটি।

কয়েকমাস ধরে অবরোধের ফলে খানের সৈন্যদলও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তারাও অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে সন্ধির, আর অনেকেই জানে যে বাবরের ভগ্নী খানের স্ত্রী হলেই সন্ধি স্থাপিত হবে। শয়বানীও জানত যে এবার সে জোহরা বেগমের সঙ্গে যেমন করেছে তেমন করবে না, এবারে জমকাল গাড়িতে তার কাছে আসছে একেবারে অন্য ধরনের এক নারী। পবিত্র স্ত্রীলোক আর বহুপ্রতীক্ষিত সন্ধির মাধ্যমেই সে মাভেরান্নহরকে নিজের অধীনে রাখবে, নতুন করে রক্ত বহানোর প্রয়োজন নেই।... তাছাড়া শোনা যায় যে খানজাদা নাকি প্রকৃতই অপূর্ব সুন্দরী।

শয়বানীর আদেশে সুন্দরীর সম্মানে ঢাকঢোল, কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল। শয়বানীর বিশাল সৈন্যবাহিনী সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানাল খানজাদা বেগমকে।

প্রথমে তাহির এ সব দেখল খোলা প্রবেশপথ দিয়ে, তারপর প্রাচীরের উপর থেকে। তারপর প্রাচীরের উপর থেকে নেমে আবার ঘোড়ায় উঠে শহরের মধ্যে ছুটে চলল শেখজাদাদরওয়াজার দিকে।

শয়বানীর শিবির থেকে হর্ষধ্বনি এখান পর্যন্ত এসে পৌঁছচ্ছিল। বাবর যে কেবল দুঃখিত বোধ করলেন তাই নয় — এই ঘটনায় কেমন যেন অভিভূত বোধ করলেনও। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর একথাও মনে হল যে খানজাদা বেগম চিরজীবন কুমারী থেকে যাবার ভয়ে ভাইয়ের বিষাদজনক অসাফল্যে তিক্ত হয়ে নিজে থেকেই গিয়েছেন শয়বানীর কাছে। পরিপূর্ণ জীবন হয়ত বা সুখী জীবনের জন্যও।

'এ দুনিয়ায় বিশ্বাস বলে কিছু নেই!' বিষণ্ণ, নিচু স্বরে নিজেকেই নিজে বললেন বাবর, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে আদেশ দিলেন, 'ফটক খোল!'

সতর্কভাবে ফটক খোলা হল। রাতের অন্ধকারে প্রায় নিঃশব্দে পরিখার ওপর সেতু নামান হল। অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনী তাদের মাঝে শকটটি নিয়ে সাবধানে সেতু পেরিয়ে গেল। চারদিকে বিপদ ওৎ পেতে আছে। মনে হচ্ছে যেন প্রতিটি গাছের আড়ালে মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্য। খানের প্রহরীদের অবস্থিতি ভালো করেই পর্যবেক্ষণ করেছে কাসিমবেগ, দুর্গম পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে বাহিনীকে, প্রায়ই খানাখোঁদল নালা পার হতে হচ্ছে, শকটটিকে প্রায় হাতে করে বইতে হচ্ছে।

পরে অজ্ঞ লোকে যেমন বলতে লাগল যে জাদুমন্ত্রবলে, নাকি এসান দৌলত বেগমের সমরখন্দের দানিশমন্দ লোকেরা আগে থাকতেই শর্ত রেখেছিল যে খানজাদাকে তুলে দেওয়ার বদলে বাবর সমরখন্দ থেকে চলে যাবার সুযোগ পাবেন, ধূর্ত খান প্রহরীদের 'গোপন' আদেশ দিয়েছিল বাবরের চলে যাবার পথে বাধা সৃষ্টি না করতে। সে যে কারণেই হোক তাঁরা নিরাপদে শত্রু অবরোধ পেরিয়ে গেলেন।

খানজাদা বেগম যে দুঃখের জীবন বরণ করে নিলেন ভাইকে মৃত্যুর হাত থেকে আর মাকে লজ্জাজনক বন্দীদশা থেকে বাঁচাবার জন্য — তা বাবর জানতেন না, কিন্তু কুতলুগ নিগর-খানুম তা জানতেন। তাই যতই জোরে জোরে বাজছে বাঁশী, কাড়ানাকাড়া বিজয় ও বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে বিরাট ভোজের বার্তা জানিয়ে, ততই বেশি করে চোখে জল ভরে উঠছে তাঁর।

তাশখন্দ, ওরা-তেপা, ইসফরা

১

তাশখন্দ।... গত পনেরবছর ধরে এই শহরকে যুদ্ধের কবলে পড়তে হয়নি, শহরের বারটি প্রবেশপথই সর্বদা খোলা; যে-কোনো সময়েই শহরে এসে প্রবেশ করা যায় বা বেরিয়ে যাওয়া যায় শহর থেকে।

শরৎকাল, শান্তির, আরামের সময়।... বজসুব আর সালার খালের তীরবর্তী

বাগানগুলিকে স্নান করিয়ে দিয়েছে উষ্ণ বৃষ্টিধারা। খুবানী আর আলুবখরা গাছের পাতাগুলি গাছ থেকে বিদায় নেবার আগে লালরঙে রাঙিয়ে উঠেছে। দূরে দৃশ্যমান চাত্‌কাল পাহাড়ের উপরে জমে থাকা তুষারও চোখকে আনন্দ দেয়।

তাশখন্দের ফলেভরা শরৎ ঋতু, এখানের উর্বরা মাটি, এর উপত্যকার সৌন্দর্য, পাহাড় থেকে বয়ে আসা মিষ্টি হাওয়া—এ সব বাবরকে মনে করিয়ে দিল তাঁর তরুণবয়সের দিনগুলির কথা। ষোলবছর বয়সে প্রথমবার তিনি এখানে আসেন, খাদরার নীচে পবিত্র উকাশ জলধারার জল পান করেন প্রাণভরে, উকচি মহল্লার প্রখ্যাত কারিগরদের কাছে তীর, ধনুক, ছিলা তৈরির ফরমাশ দেন। তখনই শাইখানতাউরে নিজের পিতামহ ইয়ুনুস খানের সমাধি প্রদর্শন করেন।

মেঘহীন সেই দিনগুলি এখন কত দূরের বলে মনে হচ্ছে। ধূলিভরা দেহ, ক্লান্তিতে অর্ধমৃত, বুকে পাকাপাকিভাবে বাসাবাঁধা ব্যথা নিয়ে বাবর চল্লিশজন বেগ ও অনুচর সমেত (বাকীদের তিনি তেপাতে তাঁর অপেক্ষায় থাকতে বলেছেন) বেশ-আগাচ দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করে কারাতাশ মহল্লা পেরিয়ে চললেন তাঁর মামা মাহ্‌মুদ খানের প্রাসাদের দিকে। মামার সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাল সম্পর্ক ছিল না, তবু গতবার বাবর যখন আসেন মাহ্‌মুদ খান আদেশ দিয়েছিল যাতে নগররক্ষক শহরের একেবারে প্রবেশপথেই বাবরকে অভ্যর্থনা জানায়।

একবার কাসিমবেগ হতাশা, উদ্বিগ্নস্বরে জানালেন দারোগা আসেনি।

তিক্ত হাসি ফুটল বাবরের মুখে:

'কাসিমবেগ, এবার আমরা এসেছি সবকিছু হারিয়ে ফকির হয়, ভিক্ষার আশায়! বিশেষ সম্মান বা এমন কি আতিথ্যলাভেরও আশাও করবেন না।'

প্রকৃতই মাহ্‌মুদ খানের প্রাসাদে বাবরকে অত্যন্ত সৌজন্যহীন অভ্যর্থনা জানান হল। তাঁর অনুচরদের প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। কাসিমবেগের মুখ আরও অন্ধকার হয়ে গেল।

'সমরখন্দে আমরা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গিয়েছিলাম, মৃত্যুতেই আমরা দুঃখকষ্টের শেষ খুঁজেছিলাম। তার সঙ্গে কি তুলনা করা চলে এই ছোটখাট খোঁচার, যা আমাদের অহঙ্কারে ঘা দেয়? তার তুলনায় এ একেবারেই তুচ্ছ, হে বন্ধু। কাল্কি পথে আমি একটি বয়েৎ রচনা করি, শুনুন:

অলীক একটা ক্ষমতার ঘোরে জ্বালা রেখো নাকো কিছু,
অনিত্য এক সম্মান তরে মাথা কোরো নাকো নিচু।

'ঠিক তাই, জাঁহাপনা। এই নশ্বর দুনিয়ায় কোন কিছু নিয়েই দুঃখ করা উচিত নয়!'

খানের দেওয়ানখানায় অপেক্ষা করতে হল বাবরকে। জরির চোগা পরা একজন মোটা চেহারার লোক, হাতে সোনাবাঁধান হাতলওয়ালা লম্বা লাঠি — সে উৎসব-

আড়ম্বরের তদারককারী কর্মচারী, উদ্ধতভাবে জানাল যে 'শাহানশাহ্ মাবদৌলত মাহ্মুদ খান গাজী, খলিফা মাবদৌলত শয়বানী খানের দূতের সঙ্গে আলাপে নিযুক্ত।' উৎকণ্ঠা বোধ করলেন বাবর। সমরখন্দ হারাবার পরে তিনি যে মাস দুই ওরা-তেপাতে নিজের খালাজানের কাছে ছিলেন তখন যেসব অপ্রীতিকর গুজব তাঁর কানে এসেছে সে কি সত্যি তাহলে? তখন তিনি জানতে পারেন যে শয়বানী খান তাঁর মামার কাছে এক দূত পাঠিয়েছে দামী দামী উপহারসমেত, মাভেরান্নহরকে ভাগ করার প্রস্তাব দিয়ে: ফরগানা উপত্যকা সে ছেড়ে দেবে মাহ্মুদ খানকে, তার পরিবর্তে সে ওরা-তেপা দখল করতে চেয়ে। যদি এ গুজব সত্যি হয় তাহলে বাবরের পা রাখার জায়গা নেই কোথাও। মাভেরান্নহর ছেড়ে চলে যেতে হবে চিরকালের জন্য।

তিনি এদিকে আশা পোষণ করছিলেন মাহ্মুদ খানকে বুঝিয়ে বলবেন ধূর্ত শয়বানীর উচ্চাকাঙ্খার কথা, ভিন্নগোত্রীয় ঐ দখলদারের বিরুদ্ধে যৌথ লড়াইতে নামতে রাজী করাবেন!...

শেষে সোনার হাতলওয়ালা লাঠিহাতে কর্মচারীটি মাহ্মুদ খানের কাছ থেকে আদেশ পেল বাবরকে তাঁর কাছে যেতে দিতে, শয়বানীর দূত কিন্তু তখনও সেই ঘরেই রয়েছে। ঘরে ঢুকেই বাবর দেখলেন দাবার ছক সামনে সাজিয়ে বসে আছে বিশালকায়, স্থূলদেহ জানিবেগ সুলতান। দেহসৌষ্ঠবসম্পন্ন গোঁফদাড়ি আঁচড়ান আহ্মুদ খানের মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি, আর জানিবেগ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ছে: তাশখন্দের শাসক জিতে নিয়েছেন দানটি। আরও লাল হয়ে উঠল বাবরের মুখচোখ। তিনি মাহ্মুদ খানের ভাগিনেয় এতক্ষণ ধরে বসে রইলেন দেওয়ানখাসে। চারবছর তাঁদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ নেই, দুর্দশায় পড়ে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন আত্মীয়ের কাছে, আর আত্মীয়টি এদিকে তাঁরই শত্রুর দূতের সঙ্গে দাবাখেলায় মত্ত!... বুঝলেন বাবর — না বোঝারই বা কী আছে এ ঘটনার গূঢ় অর্থের কথা? 'মাবদৌলত' মাহ্মুদ খান দূতকে দেখিয়ে দিলেন যে 'মাবদৌলত' শয়বানী খানকে বিজেতা হিসেবে তিনি নিজের ব্যর্থ ভাগ্নের থেকেও বেশি সম্মান করেন।

সব বুঝলেন বাবর কিন্তু আত্মসংবরণ করলেন, এমন ভাব দেখালেন যেন এতে অপমানের কিছুই দেখছেন না তিনি: দূতের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন কেউ নেই সেখানে।

'মাবদৌলত খান, মামুজান! আপনাকে সুস্থ দেখে আমি খুব খুশি। আপনার শত্রুও যেন আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে না পারে!'

জানিবেগ সুলতানের চলে যাবার অপেক্ষায় রইলেন বাবর আর কোন কথা না বলে। মাহ্মুদ খান দূতকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিশেষ সম্মান দেখালেন। তারপর বাবরকে নিজের ডানদিকে জরির আসনে বসতে আহ্বান জানালেন।

'খুশ আমদীদ, মির্জা!.. দুঃখ কোরো না এখন তোমার যে অবস্থা তাতে ভেঙে পড়া উচিত নয় তোমার। এ দুঃখের দিন কেটে যাবে। তোমার বয়স কম, বাছা আমার, তোমার জীবনের ফুলবাগিচা দশটি ফুলের একটিও এখনও ফোটেনি।'

'আমার ফুলবাগিচার অনেক ফুলই ফুটে ওঠার আগেই ঝরে গেছে, মামুজান। আহমদ তনবালের জ্বালানো আগুনে আমার একটা পাখনা জ্বলে গেছে আর অন্যটি জ্বালিয়ে দিয়েছে শয়বানী। আল্লাহ্ না করেন যে আপনিও ঐ দুই সর্বধ্বংসী আগুনের মাঝে না পড়েন!'

মাহ্মুদ খান এ কথার অর্থ ধরলেন নিজের মত করে:

'ঠিক, একই সময়ে দু'জন শাসকের সঙ্গে শত্রুতা করা বিপজ্জনক। সেইজন্যই তনবালের দূতকে গ্রহণ করিনি আমরা, গ্রহণ করেছি শয়বানী খানের দূতকে।'

'কিন্তু শয়বানী আপনার পক্ষে তনবালের চেয়ে শতগুণ বেশি বিপজ্জনক। তনবাল একটা ছোট জানোয়ার, ফরগানা উপত্যকাটা নিয়ে পালিয়ে গিয়েই খুশি। এদিকে শয়বানী হাত বাড়িয়ে আছে গোটা মাভেরান্নহরকে দখল করার জন্য। আর শুধু তাই নয় সে আরো দখল করতে চাচ্ছে খোরাসান আর গোটা ইরানও। আপনি কখনও ভেবে দেখেছেন ওর খেতাবটা — 'গাজী খলিফা', 'পয়গম্বর' — কেমন? ওকে 'দ্বিতীয় সিকান্দর' বললে খুশি হয়। সিকান্দর জুলকারনাইনের মত সারা দুনিয়ার ওপর হাত বাড়িয়েছে! আর দখল নিয়েছে সব মুসলমানের মনেরও — হবে না, উনি যে খলিফা, ধর্মীয় নেতা!'

যে আবেগ আর যুক্তি নিয়ে বলছিলেন বাবর মাহ্মুদ খানের উপর তার প্রভাব পড়ল। কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না তিনি, গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন যেন... শয়বানীর দূত যা বলেছে তাঁকে, তা মনে করলেন।

'ধরলাম, শয়বানী খান আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে না। সবদিক বিচার করে মনে হয় যে তার নজর পড়ে আছে দক্ষিণদিকে, হিসার তারপর খোরাসান আর ইরানের দিকে।'

'জাঁহাপনা, মামুজান ঐ সব গাঁজাখুরি গল্প দিয়ে দূত আপনার সতর্কতাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। ইতিহাস মনে করে দেখুন: কোন্ সেনানায়ক তাশখন্দ ও ফরগানা দখল করার আগে খোরাসান, ইরান অভিযানে গিয়েছে? চেঙ্গিজ খান? না! আমীর তৈমুর? না! সমরখন্দ, তাশখন্দ, আন্দিজান দখল করে, শক্তি বাড়িয়ে নিয়ে তারপরই কেবল খোরাসান, ইরানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। শয়বানী কি তা বোঝে না নাকি?'

শয়বানীর তাশখন্দ আক্রমণের সম্ভাবনার ভয় মাহ্মুদ খানেরও ছিল। সেই জন্যই তিনি ইসিককুলের ওপারের এলাকাগুলির শাসক, নিজের ছোট ভাই আলাচা খানকে ডেকে পাঠিয়েছেন। পনের হাজার সৈন্যের দল ইতোমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে পথে,

মাসখানেকের মধ্যেই আলাচা খান পৌঁছে যাবে তাশখন্দে। শয়বানীর লোকেরা অবশ্যই ভাইদের এই চুক্তির কথা জানতে পেরেছে। সেজন্যই শয়বানীর দূত এসেছে তাশখন্দ, যুদ্ধ এড়াতে চায়, এটা পরিষ্কার। এ দিকে মাহ্‌মুদ খানও জানেন শয়বানী খানের সৈন্য পরিচালন ক্ষমতা, তাই তার সঙ্গে যুদ্ধ তিনিও চান না। কিন্তু বাবরের ধারণায় যুদ্ধ অনিবার্য। এর কারণ কী? শয়বানী তাকে হারিয়ে দিয়েছে তাই সেই প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষাতেই কি বাবর এমন ভাবছেন?

ভাগিনার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে জানার জন্য মাহ্‌মুদ খান জিজ্ঞাসা করলেন:

'ঠিক আছে, মির্জা, ধরলাম শয়বানী আমাদের আক্রমণ করবেই। তখন আমাদের কী কর্তব্য?'

'আমরা সবাই, যারা তার বিরুদ্ধে, এককাট্টা হয়ে আপসে সমঝোতা করব! যাতে এক হাতের মুঠি দিয়ে তাকে আঘাত করা যায়।'

ধূর্ত কটা চোখ দিয়ে মাহ্‌মুদ খান বাবরকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেন:

'তোমার সঙ্গে আমার চুক্তি করতে হবে, তাই তো মির্জা?'

'কেবল আমার সঙ্গেই নয়। আমার আর একজন মামাও আছেন, আপনার ভাই আলাচা খান!

'আচ্ছা, আলাচা খানের ফৌজের সঙ্গে যোগ হবে আমার ফৌজ — সব মিলে দাঁড়াবে ত্রিশ হাজার সৈন্য। তারপর, তোমার ফৌজ যোগ হলে — কততে গিয়ে দাঁড়াবে সৈন্যসংখ্যা?'

বাবরের আছে মাত্র দুশ' পঞ্চাশজন লোক, মাহ্‌মুদ খান তা জানেন। বাবরের যুদ্ধের আগ্রহ ঠাণ্ডা করে দিতে চাইলেন তিনি, চাইলেন প্রকৃত খানদের মাঝে ভাগিনার জায়গা কোথায় তা দেখিয়ে দিতে।

আবার বাবরের মুখ লাল হয়ে উঠল: মামার দেওয়া আঘাতটা ঠিক জায়গাতেই বাজল। কিন্তু আত্মমর্যাদা হারাতে চাইলেন না বাবর।

'জাঁহাপানা! ভাগ্য আমার সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করায় আমার জীবনে এই দুর্দিন এসেছে। কিন্তু মনে করুন: পরাজয়ের বিষপান করার আগে আমরা জয়ের সুমিষ্ট পানীয়ও উপভোগ করেছি। সে কারণেই আমি আপনার সামনে মন খুলে কথা বলতে, আপনার সঙ্গে চুক্তির প্রস্তাব করতে সাহস করেছি!'

'তুমি যে মন খুলে কথা বলেছ সে খুবই ভাল কথা। আচ্ছা বলতো, যদি তেমন সম্ভাবনা আসে তুমি শয়বানীর সঙ্গে আবার নামবে নাকি লড়াইতে?'

এই প্রশ্নের সাহায্যে মাহ্‌মুদ খান পরীক্ষা করতে চাইলেন ভাগিনাকে, তাছাড়া এর মধ্যে তার প্রতি বিদ্রূপও ছিল। কথায় বলে, 'কুস্তিতে ক্লান্ত হয় না কেবল সেই যে বারবার মাটিতে পড়ে।'

'তার সঙ্গে আবার যুদ্ধে নামার কারণ আছে আমার, অবশ্যই আছে,' দৃঢ়স্বরে

বললেন বাবর। 'আর যদি বলতে হয়... কুস্তি কথা তো প্রচলন আছে 'যদি একবার মাটিতে পড়, ত পরের বার তুমি মাটিতে ফেল!'

'ঠিক, ঠিক!' খুশি হয়ে উত্তর দিলেন মাহ্‌মুদ খান।

মনে মনে ভাবলেন, 'যদি আমাদের ত্রিশ হাজার সৈন্যর নেতৃত্বে শৌর্যবান বাবরকে রাখা যায় তো শয়বানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের তার যে অভিজ্ঞতা তার সাহায্য আমরা হয়ত জয়লাভ করতে পারি। অবশ্য একথা ঠিক যে যদি বাবর শয়বানীকে পরাস্ত করে তো লোকেরা পরে বাবরকেই জয়গান গাইবে, মাহ্‌মুদ খানের নয়। তখন বাবর তাশখন্দে ক্ষমতাদখল করবে না তো? যার অধীনে সেনাদল তারই জয়জয়কার, আর যার জয়জয়কার তারই হাতে ক্ষমতা এ কথা আর কে না জানে।'

এই সব ভেবে ধূর্ত ও সাবধানী মাহ্‌মুদ খান ভাগিনাকে সেনাদলের নেতৃত্বে বসালেন না।

'হায়, হতভাগিনী খানজাদা বেগম!... কী দুঃখে দিন কাটাচ্ছে সে এখন!' পারিবারিক সমস্যার দিকে কথা ঘোরালেন মাহ্‌মুদ খান। 'শয়বানী খানটা একেবারে ধূর্ত শিয়াল, ঠিক কিনা? খানজাদা বেগম মায়ের দিক থেকে আমাদের বংশধর, আর ওয়ালিদের দিক থেকে তৈমুরের বংশের। জানে যে সত্যি সত্যি যদি বিয়ে করে, তাকে তো কত আত্মীয় পরিজন হবে তার।... শুনলাম, বিয়ে করেছে নাকি যেমনটি হওয়া দরকার, সমরখন্দে এক বিরাট ভোজও দিয়েছে!'

বাবর বুঝিয়ে বলতে চাইলেন সব ঘটনাটা, কিন্তু মাহ্‌মুদ খান ভাগিনার কথার গুরুত্ব দেবেন না বলে স্থির করেছেন, এবার একটি নিষ্ঠুর আঘাত হানলেন তিনি তার উপর।

'লজ্জার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল, এ আমাদের সবার কলঙ্ক!'

তারপর সেই আঘাতটা একটু ঠাণ্ডা করার জন্য বলতে লাগলেন যে বাবর, তাঁর মা ও তাঁর দুর্বল হয়ে পড়া পত্নী আয়ষা বেগম (তাঁরা আগেই এসে পৌঁছেছেন) — 'আমাদের অত্যন্ত প্রিয় অতিথি।' যা দুর্ভোগ তাঁদের ভোগ করতে হয়েছে তার পরে তাঁদের বিশ্রাম প্রয়োজন। আমোদ আহ্লাদ করতেও কোন বাধা নেই। এই তো কালকেই শয়বানী খানের দূতের সম্মানে ভোজোৎসব হবে, তোমরাও তাতে যোগ দাও।...

বাবরের এত যুক্তি দেখান সবই বিফলে গেল। বোঝাই যাচ্ছে যে মাহ্‌মুদ খান ভয় পাচ্ছেন শয়বানীকে, তাকে তোয়াজ করে 'গাজী—খলিফার' মতে মত দিয়ে শান্তি কিনতে চাচ্ছেন। কিন্তু হায়, ভীষণ ভুল করছেন মামা, মস্ত বড় ভুল!... এখন তাশখন্দে যে শান্তি বিরাজ করছে তা মনে করিয়ে দেয় সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ঝড়ের আগের নিস্তব্ধতা। সেই ঝড় এগিয়ে আসার আগেই মা আর স্ত্রীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবেন?

২

ইতোমধ্যে দু'মাস হল আয়ষা বেগম তাশখন্দে আছেন।

সন্তান হারিয়ে, সমরখন্দের অবরোধের সময়ের দুঃখকষ্ট ভোগ করে তিনি একেবারেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আয়ষা বেগমের ভগিনী, মাহ্‌মুদ খানের প্রিয় স্ত্রী, রাজিয়া সুলতান তাঁকে প্রাসাদে নিজের কাছে রেখেছে। ভাল ভাল হাকিম তাঁর চিকিৎসা করছে, ভাল ভাল ওষুধ দিচ্ছে। এর ফলে শেষে আয়ষা বেগম উঠে দাঁড়ালেন।

বাবর খানের স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য গেলেন, নিজের স্ত্রীর কাছে যাবার আগেই। কথায় কথায় বললেন শীঘ্রই স্ত্রীকে ওরা-তেপাতে নিয়ে চলে যাবার পরিকল্পনার কথা। রাজিয়া তার ঘন কালো চোখে চমৎকার ঝলক তুলে হাত নাড়িয়ে বলল:

'আরে না, না, মির্জা, অনেক কষ্ট ভোগ করেছে আয়ষা বেগম। ওকে কোন গ্রামে গঞ্জে যেতে দেব না আমরা!'

'যদি আমাদের ভাগ্যে এই লেখা থাকে, তো কী করা যাবে, বেগম?'

'মাফ করবেন মির্জা, প্রত্যেকের ভাগ্য তার নিজের কপালে লেখা থাকে।'

'কিন্তু এক নৌকায় পার হতে থাকা যাত্রীদের ভাগ্যও একসঙ্গে বাঁধা থাকে, তাই নয় কি?'

'চমৎকার আপনাদের 'একসঙ্গে বাঁধা ভাগ্য...' বেচারী বোনটিকে আমার এত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে... আর ঐ যে 'একসঙ্গে বাঁধা ভাগ্য' এ আপনি ওর দশা করেছেন। যথেষ্ট হয়েছে, অনাহারক্লিষ্ট সমরখন্দ থেকে এসে পৌঁছল কাঠির মত রোগা চেহারা নিয়ে। সেরে উঠল—আবার সেই পথে নামা, কী দরকারে?'

বিভিন্ন ধরনের খোঁচা সহ্য করার জন্য আগে থাকতে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন বাবর। কিন্তু শ্যালিকা মধুর সৌজন্য প্রকাশের :পরেই অপ্রত্যাশিত তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা আরম্ভ করল—ঠিক যেমন খান সম্প্রতি বিদ্রূপ মিশ্রিত ইঙ্গিতে বলেছিলেন। বাবরের ধৈর্যচ্যুতি হল।

'সোজাসুজি বলুন বেগম, আপনার ইচ্ছা, আপনার বোনের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটাতে?'

'তা বলিনি আমি! কিন্তু... যথেষ্ট হয়েছে আপনারও কষ্টভোগ করা। তাশখন্দে আমাদের কাছেই থেকে যান! বরাবরের মত, শান্তিতে।'

'গলগ্রহ হয়ে থাকা মানেই গলগ্রহের মত আচরণ করা। নিজের ওজন বুঝে চলা।'

'এই প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ! কিন্তু আমার নিজের ও আমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিন।'

নিভৃতে আয়ষা বেগমের কাছে দুঃখ জানালেন:

'কথায় বলে: কোন্ জিনিস কোথায় থাকবে মালিকই জানে ভাল। রাজিয়া সুলতান বেগম আমাদের চেয়ে বেশি জানেন না আমাদের সম্পর্কে, তিনি আমার আপনার ব্যাপারে মাথা না ঘামালেই ভাল হয়।'

'মির্জা, আমি বোনকে আমার সব দুঃখের কথা জানিয়েছি।'

'স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথাও কি কিছু থাকতে নেই?'

স্ত্রীর আগেকার সেই ভীরুতা কোথায় গেল? রাজিয়ার মতই হঠাৎ উদ্ধতভাবে উত্তর দিলেন:

'আপন বোনের কাছ থেকে লুকাবার কিছুই নেই আমার! লুকাবার কোন কারণই দেখি না!'

বাবরের মনে পড়ল স্ত্রীর আগের সেই আদর-প্রশংসা মাখান ডাক 'আমার আজীম শাহ'। এখন তিনি খানের মত নিস্পৃহ সৌজন্য দেখিয়ে কেবল 'মির্জা' বলে ডাকছেন। এত দ্রুত সময় বদলায়, বদলায় লোকেও।

'তার মানে স্বামীর চেয়েও বোনকে তোমার বেশি প্রয়োজন?' তিক্ত বিদ্রুপ মিশিয়ে বলতে চাইলেন বাবর কিন্তু বেরোল না সে সুর!

'আপনি আমার স্বামী, মির্জা!'

'তাই যদি হয়... আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাব। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।'

ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন আয়ষা বেগম:

'আবার ওরা-তেপায় যেতে হবে? সে পথের কথা মনে করলেই আমার শরীর কেমন করে! পথে পথে ঘুরে ঝালাপালা হয়ে গেছি আমি একেবারে। আর আপনিও তা জানেন। জানেন তবুও নিজের কথা বলে চলেছেন! যদি সমরখন্দে যাত্রার ফলে আর লড়াইয়ের ফলে অসুস্থ হয়ে না পড়তাম, হয়... আমার মেয়ে, মানিক আমার মারা পড়ত না! এখন তার এক বছর বয়স হত, হেঁটে চলে বেড়াত!'

সন্তানশোক কোন মাই ভুলতে পারে না। কিন্তু আয়ষা সত্য বলছেন না। মনে করলেন বাবর শিশুসন্তানের কাছে বিদায় নেবার সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি, মৃত্যুর হিমনিঃশ্বাস মনে হল যেন তাঁর মুখের ওপর পড়ল। তর্ক মন্তব্য সবকিছু শুনতে শুনতে ফিরে আসতে হয়েছিল তখন। প্রতারণা করবেন না কি? বলবেন এ মিথ্যা?

'মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার নেই, বেগম,' কঠোরস্বরে বললেন তিনি। 'যতদিন মৃত্যু মানুষের নাগাল পাবে, ততদিনে বহুবার সূর্য তার দিকে হাসিমুখে তাকাবে, বহুবার দুঃখ ভেঙে পড়বে তার মাথায়। আমাদের বয়স কম, কিন্তু এ দুই-ই আমরা যথেষ্ট ভোগ করেছি।' নরম হয়ে এল তাঁর স্বর। 'আমরা সুখের দিন দেখবই, দেখো বেগম, খোদা আমাদের সন্তান উপহার দেবেন।... আর বিশেষ করে দুঃখের দিনে পরস্পরকে ছেড়ে থাকা উচিত নয়। চল আমাদের সঙ্গে আমার অনুরোধ...'

'আমি আপনার সঙ্গে ঘুরেছি এখান থেকে ওখান, ওখান থেকে সেখান, তাতে হয়েছে কী? সে সময় আপনার আমার কথা মনে থাকত, আমার দিকে তাকাতেন আপনি, মির্জা? না! রাজ্যের চিন্তা; অভিযান, যুদ্ধ... মাসের পর মাস আপনি আমাকে দেখেননি — মনে করেননি। উপযুক্ত নই! যে স্ত্রী ভালবাসা পায় না তেমন স্ত্রী থাকার দরকার কী?'

...সত্যি আমি স্ত্রীর প্রতি উদাসীন ছিলাম। কিন্তু আমার চিন্তাভাবনার জন্য তো তার কোন মাথাব্যথা ছিল না? ও কি সেইসব চিন্তাভাবনার কথা জানত?... এখনও যে ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি তাও বোধহয় এই কারণে নয় যে ওকে ভালবাসি, ওকে ছেড়ে থাকতে পারি না। কিন্তু স্বামীছাড়া স্ত্রীলোকের থাকা কি ভাল দেখায়?

নিজেকে আরও একটি যুক্তি দেখালেন বাবর: যে শহর আর কিছুদিন বাদেই তাঁর চরম শত্রু শয়বানীর হাতে পড়বে, সেখানে স্ত্রীকে রেখে যাওয়া উচিত নয়।

'ভাগ্য নিষ্ঠুর আমাদের ওপর। খানজাদা বেগমকে রক্ষা করতে পারিনি আমরা। তার কুরবানী ঘটনায় আমার বিবেক অহরহ কষ্ট পাচ্ছে।... যে বিপদ এগিয়ে আসছে তা থেকে, শয়বানী খানের কাছ থেকে অনেক দূরে তোমায় নিয়ে চলে যেতে চাই আমি।'

'আমার কাছে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হল তাশখন্দ।'

'এ সাময়িক বেগম! বিশ্বাস কর, শয়বানী এ শহরের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত!'

'বোনের আশ্রয়ে আমি কোন কিছুকেই ভয় পাই না! আপনার কাছ থেকে এসে পৌঁছেছিলাম অর্ধমৃত অবস্থায়, এখানে আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছি!'

'স্বীকার করছি, তা সত্যি। কিন্তু... আমাদের সুখের দিনও তো গেছে। মনে নেই? কোন ভাল কিছুই আর তার মনে নেই এখন।

'সুখের দিন? আপনার, মির্জা?... অভিযান, বিপদ, পরাজয়—এই ছিল কেবল। আর — আমার প্রতি আপনার চিরকালের হৃদয়হীনতা!'

এমন অসত্য অপমান বলে মনে হল বাবরের কাছে।... প্রথমবার যখন তিনি সমরখন্দ দখল করেন হীরাসমেত থলিটির গায়ে সূচীশিল্প দিয়ে ও-ই কি লেখেনি 'রক্ষাকর্তাকে'? আর দ্বিতীয় জয়ের পর কে ফিসফিস করে বলছিল 'শাহিনশাহ, আমার গর্ব হয়...' মনে করিয়ে দেবেন নাকি? নাঃ তাতে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

'তুমি সব ভুলে গেছ, বেগম?'

'না, দুঃখযন্ত্রণা আমি সারা জীবনেও ভুলে যাব না।'

'কেবল দুঃখযন্ত্রণাই কি ছিল আমাদের মিলিত জীবনে?

'আর কী?.. আর হ্যাঁ, আমার চোখের তিক্ত জল, আপনার প্রত্যাখান আমার

অনুরোধের! এখন আমি আমার বোনের দয়ায় জীবিত! হয়েছে যথেষ্ট কষ্টভোগ! অপমানভোগ! আমিও শাহ্‌জাদী!'

কাঁপা কাঁপা হাতে বাবর কোমরবন্ধে ঝোলান চামড়ার থলিটি খুলে কী যেন খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু খুঁজে না পেয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তাঁর অনুচরদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে ঢুকে দেখলেন তাঁর পোশাক আশাক তদারককারী সিন্দুক থেকে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক বের করে ঝাড়ছে, ইস্ত্রি করছে। রেশমী পোশাক, সোনা মণিমানিক গাঁথা... বাবর আন্দাজ করলেন—কালকের ভোজের জন্য। শয়বানীর ঐ ভুঁড়িওয়ালা দূতের সঙ্গে একসঙ্গে ভোজে থাকতে হবে আর অবহেলাপূর্ণ ইঙ্গিত আর অন্যায়-অপমানকর খোঁচা সহ্য করতে হবে, যেমন বলেছে স্ত্রী আর শ্যালিকা।

বাবর শুনতে পেলেন বিশ্বস্ত কাসিমবেগের গলা, 'আগামীকাল যে ভোজ হবে তাতে স্তেপের ঐ দূত জানিবেগ সুলতানকে আপনার চেয়ে উচ্চস্থানে বসান হবে! কী করে এদের এমন সাহস হয়, জাঁহাপনা?'

আরে কাসিমবেগ! এখনও সে নিজেকে বাদশাহ্‌ বাবরের সলতানতের উজীরে আজম বলে মনে করে, আর উজীর হিসাবে সে কেবল বাবরের প্রধান পরামর্শদাতাই নয় জাহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবরের মহান নামের প্রধান রক্ষাকর্তা। কিন্তু... কিন্তু বাবরের তো আর নিজের রাজ্যই নেই। উজীরও নেই।

বাবর গলগ্রহও হয়ে থাকবেন না, শাহ্‌ ও আর নন তিনি!

'হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে!' ক্ষিপ্ত হয়ে বাবর চীৎকার করে উঠলেন হঠাৎ। 'সবকিছু থেকে সরে আসতে চাই আমি! কাসিমবেগ সাহেব, আমি আর শাহ্‌ নই। এ সবকিছু দূর করে দিতে হবে, দূর করে দিতে হবে...'

ভৃত্যের হাত থেকে জরির কাজ করা চোগাটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে, টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলেন দামী পাথর বসান মহামূল্য উষ্ণীষটি, কোন এক সময় আয়শা বেগমের দেওয়া উপহার হীরাদুটি খুলে নিলেন তার থেকে তারপর উষ্ণীষটি দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। উষ্ণীষটির পাক খুলে গিয়ে দোরগোড়ায় পড়ে রইল সাদাসাপের মত।

হতবুদ্ধি কাসিমবেগ বাবরের কাঁধে হাত রাখল।

'জাঁহাপনা, কী হয়েছে আপনার?.. জাঁহাপনা, স্থির হোন!'

মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, হাঁপাতে হাঁপাতে চীৎকার করতে লাগলেন বাবর:

'সব শেষ! চিরকালের জন্য! দরবেশের জীবনযাপন করতে চাই!.. কাসিমবেগ আমার ওয়ালিদা সাহেবাকে এ সংবাদ জানাবেন! এখুনি রওনা দিতে চাই ওরা-তেপাতে।! তখ্‌তের দাবি অস্বীকার করছি আমি! কে আমার সঙ্গে যেতে রাজী—চল, অবিলম্বে রওনা দেব! বাকীদের আমি ধরে রাখব না!'

হীরাদুটি মুঠিতে চেপে ধরে বাবর প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন দুর্গের উঠানে।

তাঁর কানে বাজছে কেবল সেই কথাগুলি 'যে স্ত্রী ভালবাসা পায় না তেমন স্ত্রী থাকার দরকার কী?!' ঠিক! ঠিক! তিনিও আয়ষাকে ভালবাসেন না, আয়ষাও তাঁকে ভালবাসেন না। বেগমকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এই স্ত্রীলোকের অন্যায় নিষ্ঠুরতা, তার আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁর মন বিষিয়ে দিয়েছে। বাঁক নিয়ে ঘুরে বাবর তেমনি দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, যে সিন্দুকে তাঁর কবিতার খাতাগুলি রাখতেন, তার তলা থেকে আয়ষার উপহার দেওয়া ছোট্ট থলিটি তুলে নিলেন। থলিটির সাদা কাপড়ে সময়ের প্রকোপে হলুদ ছোপ ধরেছে — যেন নোংরা হয়ে গেছে কিন্তু তাতে অলঙ্করণের মাধ্যমে লেখা — 'আমার রক্ষাকর্তাকে' — পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে।

আয়ষা বেগমের আছে আবার এখন এলেন বাবর প্রায় শান্ত হয়ে এসেছেন তিনি:

'এক সময় তুমি আমাকে রক্ষাকর্তা বলে মনে করতে, আর দুটো হীরা উপহার দিয়েছিলে। তোমার ইচ্ছা জানিয়েছিলে যে আমি তখ্‌তে বসে হীরাদুটো তাজে লাগিয়ে পরি। এখন আমার তখ্‌তও নেই, তাজও নেই... দরবেশের মত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে চাই আমি। তুমি—শাহজাদী... হীরাগুলো ফেরত নাও।... ওগুলো উপহার দিতে পার... কোন নতুন রক্ষাকর্তাকে!'

আয়ষা বেগম কিন্তু অপ্রস্তুত হলেন না একটুও, থলিটি নিয়ে ইচ্ছাকৃত ঠাণ্ডা কুটিল স্বরে আবার আঘাত হানলেন:

'দেখছি আপনি আবারও আমায় ছেড়ে যাচ্ছেন, তাহলে আমায় বরং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে যান!'

'তাই নাকি? তালাক চাও তুমি? ঠিক আছে তোমার ওপর অধিকার ত্যাগ করলাম আমি। আজ থেকে তুমি আর আমার স্ত্রী নও! তোমায় তিনতালাক দিলাম আমি!'

ওরা-তেপার দক্ষিণে গিরিমালার পাদদেশে বসন্ত দেরি করে আসে। কেবলমাত্র হমল মাসের শেষ দিকে বলদ নিয়ে চাষ আরম্ভ হয় সেখানে। দহকত গ্রামটি চারদিক থেকে পাহাড় ঘেরা, তাই হাওয়ায় তার তেমন ক্ষতি হয় না, গ্রামটিতে খুবানী ফলতে আরম্ভ করে সত্র মাসের কাছাকাছি। এই পাহাড়ের বেড়ের ওপর দেখা যায় চিরতুষারে আবৃত অপূর্ব পিরিয়াখের চূড়া।

গ্রামের প্রান্তে পশ্চিমদিকে খাড়া চড়াই উঠে গেছে, সেই চড়াইয়ের একেবারে উপর প্রান্ত থেকে গ্রামটির দিকে তাকালে মনে হয় সেটি অবস্থিত খাদের একেবারে গভীরে।

ঐ চড়াইয়ের ওপাশে পাহাড়ের ঢালেও কাজ চলছে। তাহির অন্য কৃষকদের মতই খালিপায়ে একজোড়া বলদ তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তার পিছনে চলেছে এককানওয়ালা মামাত, পোশাকটা উঁচু করে গুটিয়ে ডান হাত ঘুরিয়ে বীজ ছড়াতে ছড়াতে। বাবরের সিপাহী হওয়ার পর থেকে সে তাহিরের সঙ্গে রয়ে গেছে। সামান্য দূরে দহকত গ্রামের

চাষীরাও চাষ করছে। নরম জমি, পরিষ্কার আবহাওয়া, কাজ করা সহজ। মনমেজাজ ভাল সবারই। গত কয়েক বছর ধরে তাহির কেবল দেখেছে যুদ্ধ আর অভিযান। মাটির জন্য মন কেমন করত তার। মনের আনন্দে চাষ করছে সে, মাঝে মাঝে গুনগুন করে কি সুর ভাঁজে।

খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে এলেন বাবরও। দেখলেন খালিপা যুবকের দল গোরুভেড়ার পাল চরাচ্ছে, জমি চাষ করছে। গরিব মানুষ জুতো সবসময় পরে না, এখানকার পাথুরে পথে মুহূর্তে জুতোজোড়া ক্ষয়ে যাবে। পোশাক আশাক অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু হাসিখুশি স্বভাব। আর যখন পেটভরে খাওয়া জোটে তখন তাদের দারুণ ফুর্তি।

তাদের সঙ্গে নিজের তুলনা করেন বাবর: তিনিও সুস্থ, শক্তসমর্থ বিশবছর বয়সী যুবক কিসে তিনি এই গ্রাম্যযুবকদের চেয়ে খাটো? মনে শান্তি নেই তাঁর, তাই এমন চমৎকার পর্বতমালার মাঝে প্রকৃতির অংশ হয়ে জীবন উপভোগ করতে পারছেন না তিনি।

হায়, খালিপায়ে চলতে পারলেই যদি সবকিছু মিটে যেত!

পায়ের জুতো খুলে ফেলে কর্ষিত জমির ওপর দিয়ে খালিপায়ে হাঁটতে লাগলেন বাবর।

মাটি মখমলের মত নরম, তা থেকে বেরোচ্ছে বসন্ত আর যৌবনের সুবাস। পৃথিবীর ধূলিকণা থেকেই খোদাতালা মানুষের সৃষ্টি করেছেন—বোধহয় এমনি বাসন্তী, প্রত্যাশায় পূর্ণ নরম জমি থেকে।

অনুচররা, চাষীরা খুশিমনে দেখতে লাগল শাহ্‌র সরল তামাশা—খালিপায়ে মাটির উপর দিয়ে চলা। কিন্তু বাবর জুতো ফেলে রেখে নেমে চললেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। ধারাল পাথরে পা পড়ে ব্যথা লাগছে। পথ কমাবার জন্য তিনি লাফ দিলেন নিচে — রক্ত বেরিয়ে এল পায়ের তলায়। 'কী দরকার এর?' অবাক হয়ে ভাবল চাষীরা। দাঁতে দাঁত চেপে নেমেই চললেন বাবর খালি পায়ে। তাহির বাবরের জুতোটা হাতে নিয়ে দৌড়ল তাঁকে ধরার জন্য। ঢালের মাঝামাঝি পৌঁছে তাঁর নাগাল পেল।

'জুতো পরে নিন, জাঁহাপনা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল তাহির। 'থামুন। পাথরে পা জখম হবে যে!'

থেমে পড়ে বাবর তাহিরের চওড়া পায়ের গোছের দিকে তাকালেন। মাটিতে কালো হয় গেছে সে পা, বললেন:

'তোমার পায়ে তো কাটাছড়া কিছুই নেই?'

'খালি পায়ে চলা আমাদের অভ্যাস, জাঁহাপনা।'

'আমিও অভ্যাস করে নিতে চাই।'

'কেন?'

'যাতে তোমাদের দেখে ঈর্ষা না বোধহয়,' বলে আবার এগিয়ে চললেন বাবর। তাঁর পিছন পিছন চলতে চলতে মৃদু হেসে তাহির বলল:

'বাদশাহ্ সামান্য চাষীকে ঈর্ষা করেন না।'

বাবর প্রতিবাদ করলেন:

'তার মানে তুমিও আমায় বিশ্বাস করলে না? আমি তো তোমাদের বলেছি যে এখন আমি আর বাদশাহ্ নই, আগের সবকিছু থেকে আমি সরে এসেছি।' তিনি অবশ্যই জানেন কাসিমবেগ আর অন্যান্য যে সব বেগ তাঁর সঙ্গে আছেন আর ভৃত্য, অনুচররা তো বটেই — ধরে নিয়েছে যে তাশখন্দে সেই দিন বলা কথাগুলি উত্তেজনাবশে বলা, তাই দুশ পঞ্চাশ জন লোকই আর তাঁর মা কুতলুগ নিগর-খানুমও সবাই এখন আছেন তাঁর সঙ্গে এই গ্রামে। কিন্তু দেখিয়ে দেবেন তিনি তাদের সবাইকে, দেখিয়ে দেবেন...

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাহির বলল:

'জাঁহাপনা, আপনাকে আমি নিজের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করি। কিন্তু শাসকের দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবেন না আপনি।'

'কেন? এমন কেউ নেই যার রাজবংশে জন্ম অথচ সিংহাসনে না বসেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছে? এমন কোন শাহ্‌র কথা কি শোনা যায়নি যিনি সিংহাসনের দাবি ছেড়ে দিয়েছেন?'

'জানি না, হয়ত ছিলেন এমন শাহ্... কিন্তু আপনি সে দলের নন।'

'আমি সেই দলের একজন যারা চিনেছে ক্ষমতার ছলনাময়, প্রলোভনকারী রূপ, জেনেছে শাসকের জীবনের ব্যর্থতা ও ব্যস্ততা।... যদি জামশেদ আর সিকান্দর-জুলকারনাইনের মত বাদশাহ্‌রাও যদি দু'দিনের বাদশাহ মাত্র হয়ে থাকে, যদি তাদেরও অগাধ ধনসম্পত্তি ছেড়ে শুধু এক টুকরো সাদা কাপড় নিয়ে কবরে যেতে হয়েছে...' অসাবধানে পা ফেলে টলে উঠলেন বাবর। তাহির তাঁকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু বাবর নিজেই সামলে নিলেন।

যে পাহাড়টা দহকত গ্রামটাকে আড়াল করে রেখেছে হালে তার অপরদিকে এসেছিলেন বাবর, অববুরদান গ্রামে পৌঁছেছিলেন। তখনও তিনি জামশেদের কথা বলেছিলেন, আদেশ দিয়েছিলেন নদীর কাছে পাথরে যেন জামশেদের পক্ষ থেকে খোদাই করে লেখা হয় তাজিক ভাষায় এক কবিতা। কবিতাটি রচনা করেন তিনি নিজে।

কবিতার দুটি পংক্তি মনে থেকে যায় তাহিরের:

পরাজিত ধরা পদানত হল মোর মহা রণরঙ্গে

বৃথাই! দুনিয়া কবরেতে যেতে পারে কভু মোর সঙ্গে।

একটু থামলেন বাবর, বিশ্রাম নেবার জন্য, কথা বলেই চলেছেন ওদিকে—যতটা না তাহিরের উদ্দেশ্যে তার চেয়ে বেশি নিজেকে:

'সবই নশ্বর, বড় বড় রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় যেই তার প্রতিষ্ঠাতা মারা যায়। কিন্তু কবিদের সৃষ্টি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে।'

'বুঝলাম, হুজুর, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে বেগরা রয়েছে...'

'ছেড়ে দেব বেগদের, নিজেদের প্রয়োজনে লড়াই করতে যাবে ওরা...'

বাবর যেন প্রমাণ করে দিতে চাইলেন যে বেগদের ছেড়ে দেবার মত মনের জোর তাঁর আছে, তাই এবার পথ খুঁজে চলবার চেষ্টা না করে ধারাল পাথরগুলির উপর দিয়েই চলতে লাগলেন। ব্যথা লাগছে তাঁর, তা বোঝা যায় হাঁটার ধরনে আর মুখভঙ্গিতে। আবার তাঁর পিছু ধরল তাহির, আবার অনুরোধ করতে লাগল জুতো পরবার জন্য।

'হায় আলমপনা! খালি পায়ে চলা লোকদের ঈর্ষা করবেন না। খোদা যেন কোনোদিনই তাদের অবস্থায় না ফেলেন আপনাকে।'

'তাদের অবস্থা কি আমার চেয়ে ভাল নয়?'

'আবার বলি হুজুর, আল্লাহ্ না করেন আপনাকে যেন ভোগ করতে না হয় ঐ নাঙ্গা লোকগুলোর জীবন...'

'আশ্চর্য কথা! ওই লোকগুলো কি মানুষ না?'

'মানুষ। কিন্তু আপনি তো জন্মেছেন বাদশাহ্ হয়ে...'

'তাহলে আবার বলি বাদশাহ কি মানুষ নয়?'

কেমন করে এসব আলোচনা চালাতে হয় তা জানে না তাহির কিন্তু জানে যে সাধারণ সৈন্য বা চাষি আর বাদশাহ্‌র মাঝখানে আছে এক উঁচু দেওয়াল এই পাহাড়ের চেয়েও উঁচু দেওয়াল। এক লাফে এই পাহাড় পেরিয়ে যেতে চাচ্ছেন বাবর। তা কী করে হবে? কী কারণে বাবরের হঠাৎ এ ইচ্ছা দেখা দিয়েছে তাও তো পরিষ্কার, মাভেরান্নহরের শাসক হবার আশা হারিয়েছেন বলেই তো। এর থেকে অন্য কিছু আর এল না তাহিরের মাথায়।

যাই হোক, অন্যান্য শাসকদের থেকে বাবর আলাদা ধরনের অনেক কিছুতেই...

'হুজুর', বাবরের উদ্দেশ্যে বলল তাহির, 'যদি আপনি সত্যিই... রাজ্য শাসন করার চেয়ে কবিতা লেখাই বেশি পছন্দ করেন, তাহলে আমার... আমারই বা সিপাহী হবার দরকার কি?... আমি পরিবার নিয়ে চাষবাসের কাজ করতে পারি, সারাজীবন তাহলে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।... কিন্তু তা বোধহয় হবার নয়?'

শেষ পর্যন্ত বাবর তাহিরের হাত থেকে জুতোজোড়া নিলেন।

'এ সম্ভব।... তুমিও চাষবাসের কাজে লাগবে।' অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন বাবর, 'পরে বলব কবে কেমন করে আমাদের পরিকল্পনা কার্যকরী করব। এবার যাও—বলদগুলোর কাছে, যাও, একটু একা থাকতে দাও আমাকে।'

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগল তাহির বেশ খুশি মেজাজে। বাবর তাঁর

সঙ্গে অন্তরঙ্গের মত কথা বলেছেন, যদিও সামান্য অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা সে সব। না, বাদশাহ্ কখনও চাষি হতে পারেন না, কবি হওয়া হয়ত বা সম্ভব, কিন্তু তাতেও সন্দেহ হয় তার। প্রত্যেকের নিজস্ব পথ আছে। বাবরের তেমন শান্ত স্বভাব নয় যে এক কোনায় বসে সারা জীবন কাটিয়ে দেবেন। আর পায়ে হাঁটা শাসকের পক্ষে ছেলেমানুষি। কবিদের অনেকরকম ছেলেমানুষিই থাকে।

নিচের দিকে তাকাল তাহির।

বাবর তখনও জুতোজোড়া হাতে ধরে খালিপায়ে চলেছেন।

পায়ের ব্যথাটা বেড়েই চলেছে, তা সত্ত্বেও বাবর ঝরনাটা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন জুতো না পরেই। এর পরে আরম্ভ হয়েছে নরম মাটির পায়েচলা পথ, পথটা গ্রাম পর্যন্ত চলে গেছে।

জুতো পরে নিলেন বাবর এবার। হঠাৎ বাবর বুঝতে পারলেন এই অদ্ভুত আচরণ করা তাঁর নিজের পক্ষেই ভাল নয়। গ্রামের মোড়ল তাঁর জন্য নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, বেগরা, ভৃত্যরা তাঁকে 'জাঁহাপনা', 'মির্জা' বলে সম্বোধন করে, কুর্নিশ করে, তাঁকে নিজেদের থেকে অনেক উঁচুতে মনে করে, তিনি যে নিজেকে তাদের সমান করে তোলার চেষ্টা করছেন তাতে তারা বিশেষ গুরুত্ব দেয় না।

ভাল শাসক হোন, চাষিদের দলে একজন লোক বাড়ার চেয়ে তা আরও বেশি দরকার—এই ইঙ্গিত করেছিল তাহির। বাবর যদি ঐ গরিব লোকগুলির মত খালি পায়ে হাঁটতে থাকেন তাহলে বেগদের মনে হবে তারা কোন গরিব মানুষকে কুর্নিশ করছে—তাহলে কুর্নিশ করার দরকার কি? তাঁর এই খেলায় বেগদের সম্মান ও অহঙ্কারেও আঘাত লাগবে।

পরস্পর বিরোধী এই সব চিন্তাধারায় বাবরের মাথা গুলিয়ে গেল। ওদিকে পায়ের ব্যথাটা কমে আসছে আস্তে আস্তে।

দিন যায়। খালিপায়ে চলেন বাবর পাহাড়ে পাহাড়ে, ক্রমশ তাঁর পাগুলিও অভ্যস্ত হয়ে উঠল পাহাড়ি পথে চলার জন্য।

৩

দহকত থেকে ক্রোশখানেক দূরে খাড়া পাহাড়ের নিচে লোকে যার নাম দিয়েছে কালাখাত—বয়ে যাচ্ছে আক্‌সুব যার অর্থ হল সাদা নদী। নদী জলে পরিপূর্ণ, এমন স্রোত তাতে যে কোনো লোক যদি অসাবধানে তার স্রোতে পড়ে তো টেনে নিয়ে চলে যেতে পারে অতি সহজেই। তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়েছে নদীটা, সেখানে তার ধারা আরও বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে। সেখানে এক মোটামুটি শান্ত জায়গা দিয়ে হেঁটে পার হওয়া যায় নদী।

পাইনবন পার হয়ে, পাহাড়ের গা দিয়ে নিচে চলে গেছে পায়েচলা পথ। সেই পথ ধরে বাবর দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন নদীর সেই অংশের কাছে—আর তখনই দেখতে পেলেন নদীর যেখানে কম জল সেখান দিয়ে আসছে জনাকুড়ি অশ্বারোহী। যেজন সামনে ছিল তার লাল চামড়ার মস্তকাবরণ দেখে নিজের বিশ্বস্ত কাসিমবেগকে চিনলেন।

কাসিমবেগ আর তার অনুচররা যে বাবরকে খালিপায়ে দেখে তা চাইলেন না বাবর, তাই পথ থেকে একটু সরে গিয়ে একটা গাছের ছায়ায় বসলেন তিনি।

কিন্তু কাসিমবেগ ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছে তার মির্জাকে। ঘোড়া থামিয়ে নামল, লাগামটা ধরিয়ে দিল কাছের অনুচরটির হাতে, এগিয়ে চলল বাবরের দিকে। অন্যান্য সৈন্যরাও নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। কাসিমবেগের চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি। নিচু হয়ে কুর্ণিশ করে মৃদু স্বরে বাবরকে বলল :

'গোলামের অপরাধ, মার্জনা করবেন হুজুর। আপনার জন্য দুঃখের খবর নিয়ে এসেছি তাশখন্দ থেকে!'

বাবর তাশখন্দ ছেড়ে আসার পরে সেখানে যা ঘটেছে তা কল্পনা করলেন তিনি। বাবরের মামা মাহমুদ খান শয়বানীর দূতের সম্মানে ঘন ঘন জাঁকজমকপূর্ণ ভোজের আয়োজন করে শেষে নিজের উদ্দেশ্য সফল করলেন—গাজী খলিফার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি হল। ওরা-তেপাতে মাহমুদের অধিকার স্বীকার করে নিল শয়বানী, আর নিজে সৈন্যসামন্ত নিয়ে হিসারের দিকে রওনা দিল। মাহমুদ কিন্তু ওরা-তেপাতে ঢুকতে চাইলেন না শক্তি প্রয়োগ করে (সেখানে শাসন করছেন তাঁরই আত্মীয়া), ভাব দেখালেন যে জায়গাটি এমনিতেই তাঁর অথবা তাঁর বংশের, নিজের ভাই আলাচা খানের সঙ্গে মিলে আহমদ তনবালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলেন। তনবালের কাছ থেকে 'পৃথিবীর স্বর্গ', ফরগানা উপত্যকা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। তাশখন্দ রাজ্য প্রসারে বিরোধিতা করেনি শয়বানী।

প্রায় মাসতিনেক কাসিমবেগ বাবরের কাছে ছিল না—সংবাদাদি আনতে গিয়েছিল।

'কী ঘটেছে? বলুন বেগ!'

'শয়বানী প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছে, জাঁহাপনা! প্রায় ছ'মাস ধরে আপনার মামা ফরগানাতে লড়েছে তনবালের সঙ্গে, কাবু করতে পারেনি তাকে, আর সৈন্যদলের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এমন সময় হঠাৎ শয়বানী তাকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসে। তনবালের সঙ্গে গোপন চুক্তি ছিল শয়বানীর। দু'জন শত্রুর সঙ্গে একসঙ্গে পারবেন কী করে আপনার মামা? ধ্বংস হয়ে গেল তাঁর সৈন্যদল! শয়বানীর হাতে বন্দী হলেন তিনি।'

লাফিয়ে উঠলেন বাবর :

'হায় আল্লাহ্! তাশখন্দের পতন হল?'

'আর বলবেন না, হুজুর! তাশখন্দে ছিল দু'হাজার সৈন্য, গোলাবারুদ অস্ত্রশস্ত্র, আর অন্তত ছ'মাসের মত খাবারদাবার। শহর বাঁচান যেত। কিন্তু বন্দী মাহমুদ খান লজ্জার কাজ করে বসে। শয়বানী খানের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে নিজের জীবন বাঁচায়: তাশখন্দের প্রতিরক্ষায় যে বাহিনী ছিল চিঠি লিখে তাদের হুকুম দেয় তারা যেন বিনাযুদ্ধে কেল্লা ছেড়ে চলে যায় আর কোষাগার আর খানের হারেম কেল্লায় রেখে যায়—যারা জিতেছে তাদের জন্য।

'গোটা হারেম শয়বানীর হাতে পড়ল?'

'ঠিক তাই, জাঁহাপনা! শয়বানীর ফৌজ তিনদিন ধরে শহর লুঠ করল। সুন্দরী দৌলত বেগম—আপনার মামার ছোট বোন—মনে হয়, শয়বানীর ছেলে তৈমুর সুলতানের হারেমে তার তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে স্থান পেয়েছে। শয়বানী নিজে নিয়েছে মাহমুদ খানের ষোলবছরবয়সী মেয়ে মুগল-খানুমকে। এই তিপ্পান্ন বছর বয়সে! আর রাজিয়া সুলতান বেগম ঐ মোটা জানিবেগ সুলতানের স্ত্রী হয়েছে!'

হায় আল্লাহ্! ঐ লোকটা ধূর্ত, নিজেকেই নিজে ধোঁকা দিল। গত বছর আমার বোনের ব্যাপারে, অমন করে ভর্ৎসনা করল, আর এখন একবার চাইতেই মেয়ে, স্ত্রী, বোন সব সঁপে দিল। আপন শহর আজীম শাশও* দিয়ে দিল। 'নিজের নামে যে কালি লেপেছে সে তার জন্য সারা তাশখন্দ তাকে অভিশাপ দিচ্ছে', আবার কাসিমবেগের গলা শুনতে পেলেন বাবর।

কাসিমবেগ এতক্ষণ আয়ষা বেগমের কথা কিছু বলল না কেন? বাবর তাঁর প্রতি উদাসীন এখন, তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তবুও যৌবনের প্রথম নারী, তাঁর স্ত্রী ছিলেন একসময় তাঁর বিরহে কষ্ট পেয়েছেন তিনিও খানজাদার মত শয়বানীর হারেমে গেলেই হল! আশঙ্কাপূর্ণ চোখে বাবর কাসিমবেগের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন:

'আয়ষা বেগমও কি... সেও আমার বোনের সঙ্গে?'

'না, মালিক!' কাসিমবেগ বুঝল কী কারণে কষ্ট পাচ্ছেন বাবর, 'না... কিন্তু বলতে জিভ সরে না... আয়ষার নিকাহ্ হয় খানের পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক চাচা কুচকিনচির সঙ্গে।'

মুখে হাতচাপা দিলেন বাবর :

'হায় কী নীচতা!'

রাগ হচ্ছে না তাঁর, কষ্ট হচ্ছে আয়ষার কথা ভেবে, এমনকি ঐ বোকা কারাকুজ রাজিয়ার জন্য, মোটা জানিবেগ যার ওপর অত্যাচার করছে। কে জানে : হয়ত ওই ভুঁড়িওয়ালা দূত যখন মাহমুদ খানের কাছে দাবাখেলায় হেরে গিয়েছিল তখনই খানের প্রিয় স্ত্রীকে দেখে হয়ত ভেবেছিল অন্যভাবে এ হারের শোধ নেবার কথা।

* তাশখন্দের প্রাচীন নাম।

কাসিমবেগ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল :

'নিজের বন্দীজীবন রক্ষা করার জন্য এমন লজ্জাজনক কাজ করে বসা... তা সত্ত্বেও তার জীবনরক্ষা হল না!'

'মেরে ফেলেছে মামাকে?'

'প্রথমবার যখন তিনি বন্দী হন তখন শয়বানী খান তাঁকে মেরে ফেলেনি। নানারকম অপমান-অত্যাচার মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর রকম, তারপর তাঁকে তাড়িয়ে দেয় মাভেরান্নহরের বাইরে—পূর্বদিকে। মাহমুদ খান সেখানে কিছু লোক সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। সেই সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি উপস্থিত হন সির-দরিয়ার তীরে। খজেন্তের কাছে দ্বিতীয় লড়াই হয়। এবারও পরাজিত ও বন্দী হন মাহমুদ খান, তার দুই ছেলেও বন্দী হয় সেই সঙ্গে। শয়বানী খান তাদেরও দয়া করেনি, তাদের হতভাগা বাপকেও নয়।'

'হায় কপাল!...'

একটুও রাগ হল না বাবরের মনে এবারও, যদিও তিনি ভাবতে পারতেন যে তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর ভাগ্য, যারা তাঁর সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করেছে, তাদের প্রতিও নিষ্ঠুর। যা শুনলেন তা তাঁর কাছে মনে হল ভয়ঙ্কর, বিশ্রী। যারা তাঁর মন্দ চেয়েছে তাদের কারুর জীবনেই এমন দিন আসুক তা তিনি চাননি।

কাসিমবেগ দেখল বাবরের মুখমণ্ডল একবার রক্তিমাভা ধারণ করছে, একবার মৃতের মত পাণ্ডুর দেখাচ্ছে, কাঁপছে গালের পেশি, হাতের আঙুলগুলি। উঠে দাঁড়িয়ে শূন্যচোখে তাকিয়ে রইলেন বাবর। কাসিমবেগ বলল :

'বসুন, হুজুর, যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের জন্য মোনাজাত করি আল্লাহ্‌র কাছে।'

বাবরের হাঁটুগুলি যেন কাঁপতে লাগল, আগের জায়গায় বসে পড়লেন তিনি, মাথা হেলান দিলেন পাইনগাছের গুঁড়িতে। কাসিমবেগ পা মুড়ে বসল তাঁর বিপরীত দিকে। অন্যান্য অনুচররাও এগিয়ে এসে অর্ধবৃত্তাকারে বসল। কাসিমবেগ উপরদিকে হাত তুলে সুরেলাকণ্ঠে অনেকক্ষণ ধরে পড়ল কোরানের সুরা। সামান্য আত্মস্থ হয়ে বাবর হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন পাগুলি চোগার প্রান্ত দিয়ে ঢাকলেন। কোরান পড়া শেষ হলে অনুচররা আবার সরে গেল যাতে বাবর আর কাসিমবেগ কথা বলতে পারেন একান্তে। কাসিমবেগ বাবরের কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বলল :

'শয়বানী খান, তার ছেলে আর সিপাহসালাররা এবার এক যুদ্ধে গোটা মাভেরান্নহরকে দখল করতে চায়। এখন তাদের নজর আন্দিজানের উপর। সেইসঙ্গে আজ হোক কাল হোক সে ওরা-তেপাতেও এসে হাজির হবে। এখানে আর থাকা বিপজ্জনক। পাহাড় পেরিয়ে হিসার চলে যেতে হবে।'

হিসারের শাসক খুসরো-শাহ্ একসময় বাবরের জ্ঞাতিভাই বাইসুনকুর মির্জার

তখ্‌ত কেড়ে নেয়, আর তৈমুরের অন্য এক বংশধরের চোখ জ্বলন্ত অগ্নিশলাকা দিয়ে ফুঁড়ে অন্ধ করে দেয়, যাতে তখ্‌তের ওপর সে আর নজর না দিতে পারে। সেকথা মনে আছে বাবরের।

'কাসিমবেগ, চোরের হাত থেকে পালিয়ে ডাকাতের হাতে পড়ার আমার দরকার কি বলুন তো?'

'না, জাঁহাপনা, খুসরো-শাহের কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা আমি বলছি না। আপনার ফরমানবরদার খাদিম গতবছর থেকেই গোপনে আলোচনা চালিয়েছে হিসারের বেগদের সঙ্গে। তাদের বেশির ভাগই সন্তুষ্ট নয় খুসরো-শাহের উপর। তারা বলে : ও হল নীচ বংশের, এক ধূর্ত নোকরের বংশধর, হিসার শাসন করার অধিকার তার নেই। আমরা যদি সেখানে যাই তো বেগরা আপনার পক্ষ নেবে।'

'আবার তখ্‌ত নিয়ে কামড়াকামড়ি? নাঃ কাসিমবেগ! যথেষ্ট হয়েছে। আমার প্রয়োজন নির্জন কোনো জায়গা, যেখানে গুহাবাসীর মতো একান্তে বসে কাব্যরচনা করতে পারি। আর কিছু চাই না আমি!'

বাবরের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় থেকেই কাসিমবেগ চেষ্টা করছিল বাবরের নগ্ন পায়ের দিকে না তাকাতে। বাদশাহ, যাঁর উদ্দেশ্যে লোকে মাথা নোয়ায়, তিনি খালি পায়ে চলছেন—এ কী আশ্চর্য ব্যবহার?

'জাঁহাপনা, আমাদের কথা কি আপনি ভেবে দেখেছেন? আপনার অনুগত দু'শ পঞ্চাশজন বেগ, সৈন্য ও দাসেরা আপনার সাফল্য কামনা করে দোয়া করছে খোদাতালার কাছে, আশা করছে যে আপনি আবার তখ্‌তে বসবেন, আগের চেয়েও বেশি ক্ষমতা হবে আপনার। এই আশাতেই তারা আপনার সঙ্গে পাহাড়ে, মরুভূমিতে ঘুরে কষ্ট ভোগ করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সে সবের কোনো অর্থই নেই?'

অকপট কাসিমবেগ বাবরকে বুঝতে দিল যে যদি তিনি সত্যি সত্যিই দরবেশ হতে চান তো পাশে এত বেগ আর সেনার ভিড় রেখে লাভ কি? তাদের ছেড়ে দিলে হয় না কি?

মাথা নামিয়ে নীরব হয়ে রইলেন বাবর অনেকক্ষণ।

'আমার এমন হৃদয়হীনতা মাফ করবেন, জাঁহাপনা, বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হল!'

'আপনি... ঠিকই বলেছেন। আমার যারা অনুগত, তাদের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় আমার। বলুন দেখি খুসরো-শাহ আপনাকে ডেকেছে নাকি তার কাছে কাজ করার জন্য?'

'দু'বার ডেকেছে।'

অপলক, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বাবর কাসিমবেগের সাহসেভরা মুখের

দিকে। তাঁর উজীর আজম, তাঁর অবলম্বন কাসিমবেগের দাঁড়িতে ইতোমধ্যেই সাদার ছোঁয়া লেগেছে, বয়স তো চল্লিশও পূর্ণ হয়নি এখনও!

'জানেন কাসিমবেগ আপনার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার আমার পক্ষে। যে দিন থেকে আমি পিতৃহারা হয়েছি সেদিন থেকেই পিতৃস্নেহে আপনি আমাকে দেখাশোনা করেছেন। আমার সব অন্তরঙ্গ জনের মধ্যে আপনিই আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী ও সবচেযে অন্তরঙ্গ!'

'আপনাকে সম্মান দেখিয়ে আমি ছেড়ে দিচ্ছি... আমাদের প্রত্যেকেই যার যার নিজের পথে চলে যাক। আপনার পথ গেছে হিসারের দিকে।'

'এ সব কথা শুনতে কষ্ট হয় আমার।... কষ্ট হয় আপনাকে ছেড়ে যেতে, হুজুর! চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক!'

'না, না, কাসিমবেগ, এখনি আমাকে শাহ্‌র জীবনের শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এখনই, পরে আর হবে না। প্রকৃত শাহ্‌র জীবন যেমন আমার কল্পনায় ছিল—মাভেরান্‌নহরে এক বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ, শক্তিশালী, প্রতিপত্তিসম্পন্ন রাজ্য স্থাপনের যে স্বপ্ন আমার ছিল, তেমনটি গড়ে তুলতে পারলাম না আমি। আর এই তখ্‌ত নিয়ে কামড়াকামড়ি, পরস্পরকে পায়ে দলা, এ চাই না আমি। কাসিমবেগ, চুনোপুঁটির জীবন চাই না আমি! আমি জানি শৃঙ্খলের এক দিক লাগান আমার উপর নির্ভরশীল লোকেদের সঙ্গে, আর অন্যদিকটি—আমি নিজেই, আমার আগের অভ্যাসগুলি, আমার অহঙ্কার। যারা আমার উপর নির্ভরশীল শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তি না দিলে আমি নিজেই শৃঙ্খলে বাঁধা থেকে যাব। আর নিজের থেকে মুক্তি কী করে পাব জানি না। এখন আমি চাই প্রকৃতির কোলে শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে বাঁচতে, কাসিমবেগ।'

চোখে অন্ধকার দেখলেন বাবর, টলে গেলেন তিনি। কাসিমবেগ ধরল তাঁকে, আলিঙ্গন করে বিদায় নেবার সময় কেঁদে ফেলল।

কাসিমবেগও যে চোখের জল ফেলতে পারে এই প্রথম দেখলেন বাবর...

৪

এই উঁচু পাহাড়গুলির মধ্যে দিয়ে অবিরাম ঘুরে ঘুরে সকালসন্ধ্যে যে চিন্তা তাঁর মন কুরে কুরে খাচ্ছে তা যদি নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতেন অথবা ছড়িয়ে দিতে পারতেন ঐ সীমাহীন আকাশের মধ্যে... কিন্তু মনের যন্ত্রণাকে তিনি নিজের থেকে আলাদা করতে পারেন না, যেমন পারেন শৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে—তিনি নিজেই তো সেই শৃঙ্খল। যন্ত্রণা হাওয়ায় মিলিয়ে দেওয়া যা ছুঁড়ে ফেলা নয়... সেগুলি প্রকাশ করতে হবে কবিতার মধ্যে। একমাত্র কবিতাই পারে তাঁকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে যাতে তাঁর অন্তরের একগুঁয়ে কান্নার বহিঃপ্রকাশ হয়।

শুধিও না দোস্ত কী হল আমার, আমি কাহিল,
প্রাণ থেকে দেহ দুর্বল, আর অসুস্থ দিল।
নিজেই জানি না কী যে লিখে চলি ব্যথার গান,
শতেক লোহার বেড়ি থেকে ভারী এ বোঝা পাষাণ।

একের পরে এক রচিত হতে থাকে গজলের পরে রুবাইয়াৎ।

কোথায় শরাব যাতে হতে পারি ঘোর মাতাল?
সাধু-মন্ত্রের পথটা আমার জন্যে নয়!
নেই কিছু যাতে ধরা যাবে উচ্ছন্নের খাল,
ইচ্ছাশক্তি নেইকো, পুণ্য কী করে হয়।

প্রায়ই তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিত, তিনি কি প্রকৃতই দরবেশ হতে পারবেন, খাদ্যপানীয়, পোশাক আশাকের বাহ্যিক প্রলোভন পরিত্যাগ করাই শুধু নয়, জীবনের স্বাদ ভোগ করা, রূপের অনুভূতি, ক্ষমতা ও খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা ইত্যাদি আন্তরিক প্রলোভন কাটিয়ে ওঠা কি সম্ভব তাঁর পক্ষে!

দীন দরবেশ আমি, চুপচাপ থাকি কোনো এক কোণে,
স্বপ্নের পথ নেই, উদ্ধার নেই কোনো প্রলোভনে,
কী যে করি আমি? কোথায় বা যাই? ধর্মের নীড় কিসে?
পথহারা আমি, দুই দরজার মাঝে পাই নাকো দিশে।

দ্রুত জন্ম নেওয়া পংক্তিগুলির মধ্যে তিনি অনুভব করেন কবিতার উত্তাপ। তাঁর মনে হতে থাকে যদি দুনিয়ার সব দরজাও তাঁর সামনে বন্ধ হয়ে যায়, একটি দরজা অন্তত খোলা থাকবে—কবিতার দেশে, অর্থাৎ সৌন্দর্য, সম্মান, খ্যাতির দেশে। নিজের মধ্যে জাগতিক সমস্ত কিছুকে লোপ করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো কোনো ক্ষয় না হওয়া শক্তি লক্ষ্য করে আনন্দও হয়, সেই সব মুহূর্তগুলিতে মনে পড়ে বিদায় নেওয়ার কালে খানজাদা বেগম বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি আপনার মহান ভবিষ্যতে, অন্যেরা জানে না কিন্তু আমি জানি, আপনার মতো এমন বড়ো প্রতিভা ক্কচিৎ জন্ম নেয় পৃথিবীতে!'

গতকাল আকসুব নদীর তীরের একটি গ্রামে ভোজ চলছিল। সেখানে সাধারণ একজন পথচারীর মতো রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বাবর হঠাৎ শোনেন এক যুবক গায়ক সুরেলা গলায় গাইছে তাঁর রচিত গজল : 'নিজেকে ছাড়া তো তুমি প্রাণের সখা

তো কোনো পেলে না...' হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল বুকের মধ্যে, সেই শক্তি, যাকে তিনি ভয় পান আবার যাতে খুশিও হন তা যেন প্রকাশ হবার আকুলিবিকুলিতে বিদীর্ণ করে দেবে তাঁর বুক।

দহকত গ্রাম থেকে সামান্য দূরে 'আসমান গোচারণ' পাহাড়ের চূড়া থেকে যে ঝরনাধারাটা নেমেছে তা দেখতে ভাল লাগে তাঁর। পাহাড়গুলিতে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে অনেক প্রস্রবণ। কিন্তু বাবর এখানে প্রথম দেখতে পেলেন এমন এক প্রস্রবণ যা বাজপাখীর মতো তীক্ষ্ণ ডাক ছেড়ে সোজা চূড়া থেকে বেরোচ্ছে।

দক্ষিণে ঝলকায় চিরতুষারাবৃত মহামহিম পিরিয়াখ পর্বত। পিরিয়াখ আর আসমান পাহাড়ের মাঝে—গভীর গিরিখাত, উঁচু উঁচু টিলার সারি। বাবর ভাবলেন তাঁর প্রিয় ঝরনা জল পায় পিরিয়াখের তুষার থেকেই। তার মানে পিরিয়াখের উপর থেকে জলকে নিচে নেমে আবার উপরে 'আসমান গোচারণে' ওঠার জন্য গভীরে ঢুকতে হয়, পাহাড়গুলির মাঝের খাদের থেকেও আরো গভীরে। এর জন্য অত শক্তি কোথা থেকে পায় ঝরনাটি? নিজের ওজনেই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে যায় সে, কিন্তু পাহাড়, পাথরের চাঁই ভেঙে অত উঁচুতে উঠাচ্ছে তাকে কে? হয়ত আগে সেটিও বইত পাহাড়ের পাদদেশে কিন্তু কোনো এক ভূমিকম্পে ধস নেমে আগের সে পথ বন্ধ হয়ে যায়? আর তখন নতুন শক্তিতে...

নিজের জীবনটাকে এইরকম ঝরনাধারার সঙ্গে তুলনা করতে ভাল লাগে বাবরের। ধসের নিচে পড়েছেন তিনি। আখসির খাড়া পাড়ের সেই ধস নামার মতো, ঝরনাধারার উৎস বন্ধ হয়ে গেল। শয়বানীর জয়লাভ—আরও এক ধস। আরো কত ধস নেমেছে! কিন্তু ঝনার অন্তর্নিহিত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি, আবার সে পাথর ভেদ করে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে। কুলকুল করে সে পাথরের মাঝে নিজের পথ খুঁজে চলে।

ঝরনাটি যদি পাহাড়ের উপরে উঠতে পেরে থাকে তো তার মানে বাবরেরও ভেঙে পড়া উচিত নয়, উচিত নয় আশা হারান। তাঁর জীবন, তাঁর শক্তিও ফুটে বেরোবে এই ঝরনাটির মতন! হয়ত কবিখ্যাতির চূড়ায় উঠবেন? নাকি কেবল কবিখ্যাতিই নয়?

...একদিন দুপুর গড়িয়ে গেছে, বাবর 'আসমান গোচারণ' পাহাড়ের চূড়ায় ঝরনার কাছে বসে এই সব চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক মেষপালক, সঙ্গে দুটি নেকড়েশিকারী কুকুর। পায়ে চারিক* পরা, মাথায় সাদা গরমকাপড়ের তেকোণা টুপি, তাতে লাল পাড় দেওয়া। তার কোমরবন্ধে ঝুলছে একটা বড়ো ছুরি,

* কাঁচা চামড়ার তৈরি জুতো। পাহাড়ী পথে হাঁটতে আরামদায়ক।

হাতে শক্ত লাঠি। কোনো কথা না বলে সে তাকাল বাবরের দিকে, ঝরনার কাছে বসে আঁজলা করে জল খেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, হাতগুলো বগলে ঢুকিয়ে ঘরে তৈরি মোটাকাপড়ের আলখাল্লায় মুছে নিল।

'কি ভাই, এমন কিপটে হয়ে গেছে তোর বাদশাহ্ যে পাহাড়ে পাহাড়ে খালিপায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?'

মেষপালকের এই 'তুই তোকারি' যেন কেটে বসল বাবরের গায়ে, কিন্তু আত্মসংযম বজায় রেখে তিনি বললেন :

'কে সে, আমার বাদশাহ?'

'শুনলাম দহকতে বাবর এসে আছে। তুই তার দলের লোক?'

পাহাড় উপত্যকায় ঘুরে বেড়ান বাবর পুরোন পোশাকে, রোদের তাপে মুখের রং জ্বলে গেছে, কিন্তু মুখচোখ দেখে বোঝা যায় যে তিনি উঁচুবংশের লোক। সেই কারণেই মেষপালকটি ধরে নিয়েছে যে তিনি বাবরের অন্তরঙ্গদের একজন। এলোমেলো কিছু বলে ফেলার ভয়ে বাবর কেবল বললেন :

'সেইরকমই...'

লাঠিতে চওড়াবুক ভর দিয়ে মেষপালকটি সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাবরের দিকে, আর একের পর এক প্রশ্ন করেই চলল :

'তুমি বোধহয় তোমার বাদশাহের খুবই ভক্ত, তাই না?'

মৃদু হাসলেন বাবর।

'যদি আমার নিজের ওপরে ভক্তি থাকে তাই যথেষ্ট।'

'কিন্তু তুমি এমন দৈন্যদশায় পড়েছ যে তোমার বাদশাহ তোমাকে আর বিশেষ দয়া দেখাচ্ছে না।'

এবার বাবরও ভালো করে লক্ষ্য করলেন মেষপালককে। অন্য যে-কোনো বিশবছরবয়সী যুবকের মতই সে, গালে তখনও ভালো করে খুরের ছোঁয়া পড়েনি। কিন্তু গর্তে ঢোকা চোখগুলি বিষাদপূর্ণ। এমন দেখেছেন বাবর কেবল পঞ্চাশবছরবয়সী লোকদের, যারা জীবনে অনেক কিছু দেখেছে।

'তুমি বাদশাহ্ সম্বন্ধে এত কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? তোমার কোনো প্রয়োজন আছে তাঁর কাছে?'

'এইখানে, পাহাড়ে তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হতো যদি...'

'যদি দেখা হতো... কী জিজ্ঞাসা করতে?'

রাগে চোখ কুঁচকে মেষপালকটি বলল :

'জিজ্ঞাসা করতাম, সে আমার বড়ো ভাইয়ের আর বাপের মুণ্ডুটা নিয়ে কী করেছে?'

'মুণ্ডু নিয়ে? বাবর? তুমি... তুমি কোথাকার লোক?'

'আমি চাগ্রাক।'

বাবরের মনে পড়ল আন্দিজানের পাহাড়ে বসবাসকারী তুর্কী উপজাতির চাগ্রাক রাখালদের কথা। বিস্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :

'এখানেও চাগ্রাকরা আছে নাকি?'

'ওশের ওদিক থেকে এখানে পালিয়ে আসি আমরা। তখন আমার বয়স চোদ্দবছরও হয়নি। বাবর এসে একদিন ভেড়া আর ঘোড়ার পাল নিয়ে নিতে চাইল। রাখালরা উত্তরে বলেছিল, 'দেব না!' তখন... সবাইকে মেরে ফেলল বাবর আর তাদের কাটা মুণ্ডুগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গেল। মা আর আমি এসে দেখি—বিশটা লাশ পড়ে আছে। মাথাকাটা... মাথাকাটা দেহ দেখে মানুষকে চেনা মুশকিল। কাঁদতে কাঁদতে মা একবার একটা তারপর অন্য আরেকটা লাশ জড়িয়ে ধরছেন...'

ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য যা একসময় বাবরকে তাড়া করে বেড়াত, স্বপ্নে দেখা দিত, আবার জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর সামনে। আহমদ তনবালের হাতে ধরা রক্তমাখা থলি, লাল ঘণ্টাফুলগুলির উপর গড়িয়ে পড়ছে মানুষের কাটামাথাগুলি...

আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলেন বাবর। তাড়াতাড়ি বললেন :

'আহমদ তনবাল মেরেছে তোমাদের লোকদের! আহমদ তনবাল!'

বুকের কাছ থেকে লাঠিটা সরিয়ে নিয়ে মেষপালকটি তাঁর কাছে এগিয়ে এল :

'তুমি... কী করে জানলে... দেখেছ মাথাগুলো?'

'হ্যাঁ... পাহাড়ে চারণভূমিতে আহমদ তনবাল দেখিয়েছিল। ছ'বছর কাটল তারপর।... চাগ্রাকরা বিদ্রোহ করেছিল, তিন-চারজন সেপাইকে মেরে ফেলে। তারই প্রতিশোধ নেয় তনবাল।'

'না তনবাল নয়, লোকেরা দেখেছে, আমাকে বলছে! আমার বাবার মাথা কেটে নিয়ে গিয়েছে বাবর!'

'তোমায় মিথ্যা বলেছে লোকে। আমি... ঠিক জানি। আমারও বয়স তখন ছিল তোমারই মতন। আহমদ তনবাল পাহাড়ে গিয়েছিল আর আমি ছিলাম ওশে,' তাড়াহুড়ো করে যেন দোষস্খালন করার জন্য বলতে লাগলেন বাবর। তাঁর এই ব্যস্ততা কেমন যেন সন্দেহ জাগায়।

মেষপালক ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করল:

'তুমিই কে? বাবর নাকি?'

মালিকের কথা বলার ধরনে কুকুরদুটি বুঝল যে এই অপরিচিত লোকটি বিপজ্জনক। গরগর করে উঠে তারা বাবরের উপর লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। আপনা থেকে বাবরের হাতটা গেল কোমরে কাছে, কিন্তু কোমরবন্ধে এখন ছোরা, তরবারি কিছুই নেই। নিরস্ত্র হয়ে ঘুরে বেড়ান তিনি।

মনে হল কুকুরগুলো এখুনি তাঁর খালি পাগুলি কামড়ে ধরবে। ভয়ে তাঁর মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল, কিন্তু মেষপালকের দিকে গর্বিতভাবে সোজাসুজি তাকিয়ে

বললেন, 'আমি বাবর।'

মেষপালকটি তাঁর খালি পায়ের দিকে তাকাল, বিশ্বাস করল না।

'তুমি, ... এমনি? ... বাদশাহরা এমনি হন না...'

'ঠিক, এখন আমি আর বাদশাহ্ নই। সে জীবন শেষ করে দিয়েছি। এখন আমি—শায়ের বাবর।'

গতকাল গ্রামের এক ভোজ-উৎসবে মেষপালকটি বেশ উপভোগ করেছিল বাবরের গজল। গজলের শেষে সাধারণত কবি নিজের নাম উল্লেখ করেন :

নিজেকে ছাড়া তো তুমি প্রাণের সখা তো কোনো পেলে না বাবর
নিজেতে ব্যস্ত থেকে খাঁটি পীরিতের দেখা মেলে না বাবর।

এই লোকটি একা একা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সত্যিই কেউ ওর বন্ধু নেই! কুকুরদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে উঠল লোকটি : 'শুয়ে থাক! বুইনাক, তুর্তকুজ শুয়ে থাক!'

কুকুরদের শান্ত করে আবার বাবরের উদ্দেশ্যে বলল:

'যদি তুমি সত্যি সত্যিই শায়ের বাবর হও, নিজের গজলের একটি অন্তত বল দেখি... আমি বাবরের অনেক গজল জানি, ধরতে পারব ঠিক।'

মুখ নিচু করে এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন বাবর তারপর মাথা তুলে বললেন:

'এটা জান? শোন দেখি:

আপনেরা চেনে না আমায়, পরজন করছে তাড়না,
হিংসুকেরা পিছে লাগে শুধু, প্রিয়তমা বিমুখবদনা।
চেয়েছিলে ভালো করতে কিছু, হতে শুচি শান্ত সদয়,
লোকের স্মৃতিতে তুমি শুধু হীন পশু, শুনে কষ্ট হয়।

যে উত্তপ্ত আবেগে আর বেদনা নিয়ে বাবর এই ছত্র কটি পড়লেন তা সঞ্চারিত হল মেষপালকের মধ্যেও, প্রতিফলিত হল তার চোখে।

'হ্যাঁ... দেখছি... তোমারও জীবন খুব সহজ নয়, শায়ের... যাক গে... তুমি যখন সত্যি বলছ যে আমার বাবাকে বাবর মারেনি, মেরেছে তনবাল।'

'তনবাল মেরেছে... কিন্তু আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে আমারই আগের বেগদের কাজকর্মের জন্য। তাই... এখন প্রায়শ্চিত্ত করছি।'

'তোমার এ কথাগুলোও বিশ্বাস করতে চাই। বিশ্বাস যদি না করতাম তো আমার বাবা-ভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ নেবার জন্য কুকুরদুটোকে লেলিয়ে দিতাম, তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলত! বিদায়... শায়ের বাবর।...

বাবরের মনে নেই কেমন করে ঐ দিন তিনি 'আসমান গোচারণ' পাহাড় থেকে দহ্‌কত গ্রামে নেমে এসেছিলেন। অতীত, শাসকের জীবনের দুর্ভাগ্যগ্রস্ত অতীত, তার সমস্ত অন্যায়, রক্ত, নোংরা নিয়ে তাড়া করে ফিরছে তাঁকে। বেগরা নিষ্ঠুর কাজ করেছে আর লোকে বলে তাঁর নামে। মেষপালকের ঐ ভয়ঙ্কর কুকুর দুটির মতই বিবেক গরগর করছে বাবরকে, কামড়াচ্ছে তাঁর হৃদয়কে।

বিবেককে শান্ত করবেন কী করে?

দহ্‌কতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিল আরও ভয়ঙ্কর খবর।

শয়বানী সৈন্যদল ইতোমধ্যেই ওরা-তেপাতে এসে পৌঁছেছে। গ্রামের মোড়ল শহরে গিয়েছিল বাজারে কেনাকাটি করতে, তাকে ধরে সৈন্যরা বাবর কোথায় লুকিয়ে আছে দেখিয়ে দেবার জন্য জোরজবরদস্তি মারধোর করতে থাকে।

মুখময় চাবুকের রক্তাক্ত ডোরা ডোরা দাগ নিয়ে তাজিক মোড়লটি বাবরকে বলল:

'এমন হীন নই আমি যে নিজের মেহমানকে ধরিয়ে দেব। আপনার দুশমনদের অকতাংগি পাহাড়ী খাতে নিয়ে গিয়ে ঝোপেঝাড়ে গা ঢাকা দিলাম নিজে। ওখান থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ হবে না ওদের পক্ষে, আমি উঁচু উঁচু পাহাড়ী পথ বেয়ে এসে পৌঁছেছি!'

অকতাংগি—দহ্‌কত থেকে ক্রোশ আষ্টেক পুবে। একথা পরিষ্কার যে কালপরশুর মধ্যেই খানের লোকেরা দহ্‌কতে এসে পড়বে। শয়বানী তাঁর মাথার বদলে বিরাট পরিমাণ সোনা দেবে ঘোষণা করেছে।... পালাতে হবে।

সে কথা বলতে লাগলেন বাবরের মা কুতলুগ নিগর-খানুমও।

'বাবরজান, এখন আমাদের সবার ভরসা কেবল তুমিই! এখন দরবেশ হওয়া চলে না, বাছা।... সবাই তোমাকে রাজ্যছাড়া বাদশাহ্‌ বলেই মনে করে, অন্য কিছুতে তারা বিশ্বাস করেন না, বড় বড় বেগরা হিসারে আর অন্যান্য জায়গায় তোমার অপেক্ষা করছেন। শয়বানীর লোকেরা তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে তখ্‌তে তোমার হক আছে বলেই।... দহ্‌কত এতদিন আশ্রয় দিয়েছে আমাদের, তাই তোমার কর্তব্য এই গ্রামটিকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুর্দশা থেকে রক্ষা করা।'

সবই ঠিক, যুক্তিযুক্ত। তাঁকে আবার নেতৃত্ব দিতে হবে তাদের, যারা তাঁর ক্ষমতায় বিশ্বাস করে, অস্ত্র তুলে নিতে হবে হাতে।

খালিপায়ে ঘুরে ঘুরে তিনি ভাগ্যের হাত থেকে রেহাই পাবেন না।...

'শেরিমবেগ! আপনাকে আমার উজীরে আজম করলাম। (এত বছরের বিশ্বস্ত সেবার পরে অবশেষে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আনন্দে দরবারী প্রথা অনুযায়ী নিচু হয়ে কুর্নিশ ক'রে ধন্যবাদ জানাল) সমস্ত বেগ আর নোকরদের আমাদের ইচ্ছা জানাবেন। অবিলম্বে রওনা দেবার আয়োজন করা হোক। আজ রাতেই দহ্‌কত ছেড়ে যেতে হবে।...'

আবার বর্ম পরেছেন বাবর, অস্ত্র ঝুলিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের। সেই রাতেই তাঁর দল রওনা দিল যেদিক থেকে সূর্য ওঠে সেদিকে। ইসফরার দিকে।

৫

নিচে পাথরে ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ করতে করতে কলকল করে ছুটে চলেছে ইসফরা নদী।

উঁচু একটা পাহাড়ের ঢালে বসে বাবর তাকিয়ে আছেন সুদূরের দিকে। ধূসর রঙের মেঘগুলি খজেন্তের ওদিকে কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছে, পাহাড়ের চূড়া আর ঢালে পড়ছে তাদের ছায়া। তুষারাবৃত পর্বতচূড়া থেকে হিম নেমে আসছে। বসন্তকালীন উপত্যকা উষ্ণ সবুজ চাদরে ঢাকা।

দিগন্তের বিছান আকাশের নীল রেশমী পর্দার ওপাশে কোথায় যেন অনেক দূরে আছে চাতকাল পর্বতমালা আর এক সময়ের জমকালো, বর্তমান লুণ্ঠিত, নিস্তব্ধ তাশখন্দ শহর। বাবরের মনের চোখে এরপর ভেসে ওঠে জিজ্জাখ, সমরখন্দ, মার্গিলান ও আন্দিজানের ছবি। একসময় এই সমস্ত এলাকা দিয়ে তিনি ইচ্ছামত ভ্রমণ করেছেন।

কিন্তু এখন মাভেরান্নহরের কোথাও তাঁর আশ্রয় নেই , এমন একটুও জায়গা নেই যেখানে তিনি শান্তিতে কটা দিন কাটাতে পারেন। তনবাল আর শয়বানীর হাতে চলে গেছে গোটা মাভেরান্নহর। শেরিমবেগ বৃথাই বলছেন না বাবরকে খোরাসানে চলে যেতে।

রাজী হচ্ছেন না বাবর: আগে থাকতেই বুঝতে পারছেন তিনি মাভেরান্নহর ছেড়ে গেলে তিনি জন্মের মত মাতৃভূমিহারা হবেন, আর কোনদিনই ফিরে আসা হবে না। মাতৃভূমির প্রতি এমন অনুভূতি এর আগে কখনও হয়নি তাঁর।

'মাভেরান্নহর! তোমার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চষে বেড়িয়েছি আমি, তোমার বুকের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া প্রতিটি পথে ঢেলে দিয়েছি আমি অন্তরের আলো, ছড়িয়েছি আমার ইচ্ছা বীজ। আমার মূল—তোমার দেহের মধ্যে, আমার প্রিয় মাতৃভূমি! সেই মূলকে উপড়ে ফেলার মত শক্তি কোথায়? তোমার বিরহ কি আমি সহ্য করতে পারব?'

আহমদ তনবাল ও শয়বানী খান — 'মিত্রবাহিনী' এখন পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরতে চায়। ক্ষমতালোভীরা শান্তিতে বাঁচতে পারে না কিছুতেই, মাভেরান্নহরে আবার যুদ্ধের উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। ওরা দু'জনেই যদি মরত, ওই লোভী কুকুর দুটো, তাহলে বাবরের পথ খুলে যেত হয়ত...

বাবরের মনে তখনও ক্ষীণ আশা রয়েছে যে হয়ত থেকে যাবেন মাভেরান্নহরে,

তাই আন্দিজানে লোক পাঠিয়েছেন যুদ্ধের গতি কোনদিকে জানার জন্য। এখন অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছেন ইসফরাতে ফিরে আসার।

দেড়মাস কাটল চরেরা ফিরে আসেনি এখনও। কী অসম্ভব ধীর গতিতে কাটছে দিনগুলি!—মনে হল বাবরের। সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান বাবর।... কী করবেন? কী করবেন? কী করারই বা আছে? বুদ্ধিমান কাসিমবেগ হিসার চলে না গেলে হয়ত কোন ভাল পরামর্শ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এখানে নেই। সাহসী যোদ্ধা ও সঙ্গী নুয়ান কুকলদাসও নেই—গতবছর আহনগরানে তনবালের সৈন্যদের হাতে মৃত্যু হয় তার, তারা খাদে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাকে।

কতজনই তো আজ কাছে নেই — মারা পড়েছে, চলে গেছে বা দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে শত্রুদলে গিয়ে যোগ দিয়েছে। প্রথম দলের লোকদের জন্য হয় দুঃখ আর দ্বিতীয় দলের জন্য রাগ।

এখন কাব্যপ্রতিভাও তাঁকে বঞ্চনা না করলে হয়! চেষ্টা করছেন কবিতারচনার কিন্তু হচ্ছে না কিছুতেই, ছন্দ মেলাবার মত মনের অবস্থা নেই।

সন্ধ্যার সময় পাহাড়গুলো কুয়াশায় ঢেকে গেল। কুয়াশাভরা পায়ে চলাপথ দিয়ে বাবর উপত্যকায় নদীর তীরের কাছে নেমে এলেন। সেখানটা কেমন ঠাণ্ডাবিষণ্ণ, আর ঘন কুয়াশার এমন দেয়াল তৈরি হয়েছে যে নদীর স্রোত দেখা যাচ্ছে না, কেবল নদীর প্রচণ্ড আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে যে ইসফরা নদী এখানে, অদৃশ্য হয়ে যায়নি, পাথর ঠেলতে ঠেলতে বয়ে নিয়ে চলেছে জল।

নদীতীরে একটা খোলা প্রশস্ত জায়গায় তাঁরা ছাউনি গেড়েছেন। মাঝখানে সামান্য উঁচু যে জায়গাটা আছে সেখানে খাটন হয়েছে লাল দামী কাপড়ে তৈরি বাবরের তাঁবুটি। কাছেই আটকোণা সাদা তাঁবুটি কুতলুগ নিগর-খানুমের। এই প্রধান ছাউনিগুলি থেকে সামান্য তফাতে বাকী ছাউনিগুলি।

বাবরের মনে হল তাঁবুগুলি যেন পরস্পরের থেকে দূরে সরে গেছে; কুয়াশা একেবারে ঢেকে ফেলেছে সেগুলিকে।

লোকদের মুখোমুখি হচ্ছেন তিনি, তারা তাঁকে অভিবাদন জানাচ্ছে, যেমন জানান হয়, উত্তরে বাবর সামান্য মাথা হেলাচ্ছেন দরবারী প্রথা অনুযায়ী।

বাবর চললেন তাঁর কিতাবখানার তদারককারী মামদ আলির তাঁবুর দিকে। বিরল হাতে লেখা অনেক বই রাখা আছে চামড়ামোড়া বিশেষ ধরনের সিন্দুকে যাতে ভিজে না যায়। পাঁচটা ছটা উটের পিঠে এই সিন্দুকগুলি বওয়া হয়। মামদ আলি সব অভিযানেই থাকে বাবরের সঙ্গে। মুখেচোখে অসুস্থতার ছাপ তার। মা যেমন করে তার শিশুর তদারক করে তেমনিভাবেই বৃদ্ধ বইগুলির যত্ন করে।

কী ধরনের বই পড়তে চান বাবর এখন? আচ্ছা, ইতিহাসের ওপর কিছু।

মামদ আলির অভ্যাস ছিল বইতে হাত দেবার আগে হাত ধুয়ে নেওয়া।

'আপনার খাদিম আপনার তাঁবুতে অবিলম্বে পৌঁছে দেবে বইগুলি, জাঁহাপনা।'

প্রখ্যাত সেনানায়ক ও দক্ষ শাসকদের জীবন নিয়ে লেখা বইগুলির পাতা উলটাচ্ছিলেন বাবর। অলঙ্কারবহুল বাক্যগুলি, উপমাগুলি পড়তে পড়তে মুখ কুঁচকে যাচ্ছিল বাবরের সত্য ঘটনাকে তার সঙ্গে জড়িত গল্পকথা থেকে বিছিন্ন করে দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

সর্বত্রই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে বিজয়ের চিত্র, কেবলমাত্র সফল শাসকদের বিজয়লাভের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

শয়বানী খানের সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই এখন লেখা হচ্ছে এমনি ফোলানো ফাঁপানো প্রশংসা ভরিয়ে। বাবর জানতে পেরেছেন বিনই আবার শয়বানীর দলে যোগ দিয়েছেন; বিনই আর মুহম্মদ সালেহ্ দু'জনেই আলাদা আলাদাভাবে লিখছে 'শয়বানী নামা'। বাবর আর শয়বানীর মধ্যে যে লড়াই হয় সে সম্বন্ধে তারা কী লিখবে? বিজেতাকে প্রশংসায় ভরিয়ে আকাশে তুলবে আর বাবরকে সব দিক থেকে সমালোচনা করবে, অতীত ও কল্পিত অপরাধের বোঝা চাপাবে বাবরের কাঁধে— কোথা থেকে প্রকৃত ঘটনা জানবে লোকে?

বিজেতাদের জয়োৎসবের আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া বইগুলি সরিয়ে রাখলেন। যে রেশমী রুমাল দিয়ে মামদ আলি সযতনে মুড়েছিল বইগুলি, সেটিকে, গুটিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। উঠে এগিয়ে গেলেন যে সিন্দুকে নিজের কাগজপত্র রাখতেন সেটির কাছে। দাঁড়িয়ে ভাবলেন খানিকক্ষণ। 'অতীত' নাম দেওয়া খাতাটি বার করলেন।

দেখ কাণ্ড, সে খাতাতেও বাবর লিখেছেন কেবল কেমন করে তিনি শয়বানীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন সমরখন্দ, তারপরে আর একবারও ছোঁননি খাতাটি। অর্থাৎ তিনি নিজেই কাউকে এমনকি নিজেকেও জানাতে চাননি তাঁর পরবর্তী পরাজয়গুলি আর দুর্দশা সম্বন্ধে। সেসব কাগজকলমে লেখা নেই ঠিকই কিন্তু তাদের থেকে পালাবার উপায় নেই, সেগুলি ঘুরছে আর যন্ত্রণা দিচ্ছে। কথায় বলে 'রোগ লুকোবার চেষ্টা করলে কী হবে জ্বর উঠে রোগ ঠিকই প্রকাশ হয়ে পড়বে।' এই খাতায় সমস্ত ঘটনা খুঁটিনাটি যথাযথ লিখে রাখলে ভাল হয় না কি? তাহলে হয়ত মনের জ্বালাটা বাইরে বেরিয়ে এসে মনটা হালকা হবে।

বাবর তাড়াতাড়ি করে লিখতে লাগলেন সারিপুলের লড়াইয়ের কথা, সেই পরাজয়ের পরে কত অপমান, গ্লানি সইতে হয়েছে তাঁকে, সে কথা।

লিখছেন তিনি নিজের জন্য, নিজের বিবেকের কাছে জবাব দেওয়ার জন্য। সহজভাষায় সত্যঘটনা লিখছেন, কারণ জানেন এখুনি ঐ বইগুলিতে যেমন দেখেছেন সেই অলঙ্কারবহুল ফোলান ফাঁপান ভাষায় তাঁর মনোভাবে প্রকাশ করা যাবে না। কোন অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে নিজে সম্বন্ধে সব বলছেন যেন এমনিভাবে লিখছেন। তাঁর

জীবনের গোপন কথা এখন জানল এই খাতাটি। অর্থাৎ তিনি নিজে। অকারণে তিনি তাঁর গজলে লেখেননি 'নিজেকে ছাড়া তো তুমি প্রাণের সখা তো কোন পেলে না...'

খোলাখুলিভাবে আর নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে নিজেকে সব ঘটনা জানাতে থাকলেন।

তনবালকে তাঁর উপহার দেওয়া তরবারিটি সম্বন্ধেও... দুর্ভাগা চাগ্রাকদের সম্বন্ধেও... তাঁর জুতোহীন পাগুলি কেমন ধারাল পাথরে ভর্তি পাহাড়ী পথে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সেকথাও।... সব কিছুই স্থান পেল খাতাটিতে, লিখতে লিখতে বাবর অনুভব করলেন কী অনুপ্রেণার জোয়ার লেগেছে তাঁর মনে, যেন মত্ত হয়েছেন কবিতা রচনায়।

শাসনকর্তার বংশে জন্মলাভ করার কারণে শাসনকর্তার ভাগ্য থেকে রেহাই যখন পেলেনই না তখন তাঁর সমস্ত দুঃখকষ্ট যন্ত্রণার সত্যনিষ্ঠ বর্ণনাই দেবেন তিনি! যে সব শাসককে জানেন বাবর তাদের কেউই খোলাখুলিভাবে এসব কথা বলেননি কখনও। কিন্তু সত্যকথা জানার জন্য লোকে সর্বদাই আগ্রহী। আর যদি সে আগ্রহ সামান্য একটুখানিও মিটাতে পেরে থাকেন তাহলে খোদাতালা তাঁকে যে প্রতিভা দিয়েছেন তা বৃথা যাবে না আর লোকেও শিক্ষা নিতে পারবে তাঁর অসফল জীবন থেকে।

লোকেরা, অন্যরা... কিন্তু তাহলে কেবল নিজের জন্যই নিজের বিবেককে শান্ত করার জন্যই লিখছেন না তিনি? তাহলে এও হল কবিতা, কবিতাও রচনা করা হয় নিজের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটানর জন্য, যা অন্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করে, যা গান হয়ে দাঁড়ায় সবার জন্য এই কি সুখ নয়? তরবারির ভয় দেখিয়ে দখল করলে তরবারির ভয়ে ছেড়ে দিতেও হয়। কিন্তু কবি বা সত্যসন্ধানী ইতিহাসকারের কলমের লেখা কিছুতেই ছিনিয়ে নেওয়া যায় না।...

ভৃত্যেরা কখন বাতি জ্বালিয়ে এনে রেখে গেছে তা লক্ষ্যই করেননি বাবর। প্রায় সারারাত খাবারজল কিছু ছুঁলেন না, লিখে চললেন।....

৬

ভোর হবার আগে এসে পৌঁছল তাহির।

বাবর তখুনি ডেকে পাঠালেন তাকে আন্দিজানের ঘটনাবলী জানার জন্য।

বাবরের তাঁবুতে বসে বাতির আলোয় তাহির অনেকক্ষণ ধরে বলতে লাগল। প্রধান খবর হল — আন্দিজান শয়বানীর দখলে। শহর লুণ্ঠিত। শহর পুরোপুরি দখলে চলে যাওয়ার পরে মারা পড়ে অনেক আন্দিজানবাসী। বাবরের দ্বিতীয় চরও মারা পড়ে তখন।

তাহির এত ক্লান্ত যে টলছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বাবর বসে তাকেও বসতে বললেন।

সব ঘটনা এমনভাবে জানল কি করে তাহির? আন্দিজানের কাছে খাজাকাত্তা গ্রামে এক জমিদারের কাছে গাড়োয়ানের কাজ নিয়েছিল সে। সে যে আসলে কে তা বুঝতে পারেনি জমিদার। সব কথাবার্তা মন দিয়ে শুনত তাহির, সতর্কভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করত সবাইকে। আর যখন শহরে জমিদারের দোকানে মাল নিয়ে গেল, তখন নিজের চোখেই দেখল অনেক কিছু।

আন্দিজানের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে হারস্বীকার করে তনবাল দুর্গের মধ্যে বন্ধ হয়ে বসে থাকে। আরম্ভ হল অবরোধ। দুর্গে দেখা দেয় খাদ্যাভাব, রোগের প্রকোপ, মতবিরোধ। ('যেমন দেখা দেয় সমরখন্দে,' ভাবলেন বাবর।) যে বেগরা একসময় বাবরকে ছেড়ে তনবালের কাছে গিয়ে যোগ দিয়েছিল, তারাই এখন তনবালকে ফেলে পালিয়েছে শয়বানী খানের কাছে। খানের সেনাদল শেষপর্যন্ত ঢোকে শহরে। আহ্মদ তনবাল তার ভাইদের আর অন্তরঙ্গদের নিয়ে দুর্গে লুকিয়ে থাকেন, আন্দিজানের দুর্গ শহরের বাড়িগুলি থেকে বেশি দূরে নয়, আশেপাশের বাড়িগুলির ছাত থেকে দুর্গকে আক্রমণ করা সহজ। শয়বানীর মত আহ্মদ তনবালও তা জানে। এক বৃদ্ধকে খানের কাছে পাঠায় এই কথা বলতে আদেশ দিয়ে : 'গাজী খালিফা আর মোকাদ্দম ইমামকে আমি দিয়ে দেব আমার সঞ্চিত সমস্ত ধনসম্পদ, গোটা হারেম, তাঁর খিদমতগার হব, আমার জীবন রাখুন!' বৃদ্ধ ফিরে এল না। আরম্ভ হল আক্রমণ... আতঙ্কে তনবাল ও তার ভাইয়েরা দুর্গের ফটক খুলে বাইরে এল, তরবারিগুলি কাঁধে ঝুলছে—অর্থাৎ তারা আত্মসমর্পণ করছে। তৈমুর সুলতান অনুচরদের আদেশ দিল : 'বন্দী করে নিয়ে যাবার দরকার নেই, মাথা কেটে ফেল!' তনবাল আর তার ভাইদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হল। কাটামাথাগুলো বস্তায় ভরা হল।

'হয়ত শয়বানীকে দেখাবার জন্য', বলে শেষ করল।

'খোদাতালা সত্যদ্রষ্টা!' বেরিয়ে এল বাবরের মুখ থেকে।

কেমন প্রতিশোধ! বিশ্বাসঘাতক তাঁর ওপর, বাবরের ওপর, তরবারি তুলেছিল, আর এখন নিজেই কাটা পড়ল তরবারির ঘায়ে।... নিষ্ঠুর তনবাল খাজা আবদুল্লাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ঐ দুর্গের ফটকেই, তার শোধ, সেই ফটকের কাছেই তাকেও যন্ত্রণাকর মৃত্যু বরণ করতে হল।... বেচারী চাগ্রাকদের মাথাগুলোর শোধ উঠল—বস্তা থেকে গড়িয়ে পড়ল তনবাল ও তার ভাইদের মাথাগুলো। আর শয়বানী—কল্পনা করলেন বাবর—ঘৃণাভরে সেগুলোকে দেখছে, জুতোর ডগা দিয়ে ঘুরিয়ে।... কোনটা এদের মধ্যে সেই হোঁৎকা, আহ্মদ তনবাল, যাকে নিয়ে এত ঝামেলা, দেখাও তো, তার মুখ দেখিনি তো কখনও, সুযোগ হয়নি। কিন্তু ঘৃণা হচ্ছে শয়বানীর সে মুণ্ডুটা হাতে নিতে—হনুর হাড়দুটো অসম্ভব উঁচু, সামান্য কয়েকগাছি দাড়ি।

এই দৃশ্য কল্পনা করে এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে বারবার বলতে লাগলেন: 'সত্যদ্রষ্টা খোদাতালা!'

নিষ্ঠুর ন্যায়বিচার? প্রতিশোধ? কিন্তু নিষ্ঠুরতায় শয়বানী আহ্‌মদ তনবালকেও ছাড়িয়ে গেছে! প্রতিশোধের তরবারি এমন রক্তপিপাসু খানের হাতে কেন তুলে দিলেন খোদা?

আবার অন্যদিক থেকে ভাবলে—বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত মাভেরান্নহরকে একত্রিত করার যে মহান উদ্দেশ্য ছিল বাবরের, অবিভক্ত, শক্তিশালী মাভেরান্নহর, তাঁর, বাবরের—তা কি এখন করতে পারল শয়বানী খান? তাহলে কেন তিনি পারলেন না, বাবর? কিসে শয়বানী খান বেশি শক্তিশালী? খলতা, নিষ্ঠুরতায়?

ঠিক, এই নশ্বর দুনিয়ায়—বিজেতা হতে গেলে এখন শয়বানীর মতো অমনই হতে হবে। আর তিনি, বাবর, হতে চেয়েছিলেন জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত শাসক, অনেক সময় ও শক্তিব্যয় করেছেন কাব্য, শিল্প ও স্থাপত্যের পিছনে, চিন্তা করেছেন মানবতার কথা,—এই সব কারণেই তিনি হেরে গেছেন শয়বানীর কাছে। কিন্তু কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ—মানবতা না ক্ষমতাদখল সে যদি ঐক্যবদ্ধ মাভেরান্নহরেও হয় তাহলে? এ তো পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে।

'জাঁহাপনা', তাহিরের ডাকে ছিন্ন হল তাঁর চিন্তাসূত্র। 'শুনেছি, খানের লোকরা আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে। হয়ত তারা ইতোমধ্যেই ইসফরা এসে পৌঁছেছে!'

হ্যাঁ, জীবন বাঁচাবার কথা ভাবতে হবে। আর ভাবতে হবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথাও! তনবালের পরাজয় তাঁর স্বপ্নের ঝরনাধারার ওপর নামা আর একটি ধস। ঝরনার বাইরে বেরিয়ে আসার সব পথই বন্ধ হল... এখানে, তাঁর স্বদেশে। এই পর্বতশ্রেণী পার হয়ে অবিলম্বে খোরাসান পৌঁছাতে না পারলে শয়বানী শেষ সম্ভব পথটাও বন্ধ করে দেবে।

বাবর ভুলে গেলেন যে তাঁর সামনে বসে এক সামান্য নোকর। হতাশসুরে বললেন:

'কম কষ্ট সহ্য করেছি নাকি এখন আবার স্বদেশ ছেড়েও চলে যেতে হবে?'

বাবরের চোখে জল দেখে তাহির কষ্টে আত্মসংবরণ করল, কাঁপা ঠোঁটে বলল :

'আলমপনা, বিদেশে জীবনধারণ করা যে-কোনো লোকের পক্ষেই কষ্টকর, সে শাহ্‌ই হোক, সৈন্যই হোক বা চাষিই হোক।... আমি আর ফিরতে পারব না কুভাতে, ফিরতে পারব না আমার জন্মস্থানে। কারণ আপনার কাছে কাজ করার জন্য প্রতিশোধ নেবে আমার উপর। আর তাছাড়া আরও এই কারণে... আপনাকে ছেড়ে যেতে পারব না... আন্দিজান থেকে এখানে আসার পথে আমি অনেক ভেবেছি। আপনার সঙ্গে থাকব আমি, সর্বত্র, সর্বদা।'

বাবর বহুদিনই জানেন যে তাহির সৎ, সাহসী, খোলা আর সরল, বিশ্বাসপ্রবণ কৃষক। সে এমন লোক যার দৃঢ় বিশ্বাস যে সমস্ত হিংসা ও অন্যায়ের অবসান ঘটাতে পারে একমাত্র ন্যায়পরায়ণ শাসক।

'কিন্তু আমি তো তোমাদের সবার মনোমত শাসক হতে পারিনি!' হঠাৎ বললেন বাবর যেন নিজের চিন্তাধারার উত্তরেই। 'ভবিষ্যতেও আমি তা হতে পারব কি না—তাও জানা নেই।...'

চুপ করে রইল তাহির। বাবরও নীরব হয়ে গেলেন। এইভাবে পরস্পরের মুখোমুখি তাঁরা বসে রইলেন—বিতাড়িত শাসক ও তাঁর ভৃত্য। তাঁবুর মোটা কাপড় ভেদ করে শোনা যাচ্ছে প্রস্থানোদ্যত রাতের নীরবতায় ক্রুদ্ধ ইসফরা নদীর গর্জন-ক্রন্দন।

তাদের দুজনের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও দুর্ভাগ্য কাছে টেনেছে তাদের। এতবছর ধরে একসঙ্গে লড়েছে তারা বিভিন্ন যুদ্ধে, কখনও এমন অকপটভাবে মনের কথা খুলে বলেনি পরস্পরের কাছে। যেকথা অন্যসময়ে বাবরকে বলতে পারত না তাহির, তা এখন সে বলতে লাগল বাদশাহের আধোঅন্ধকার তাঁবুতে বসে :

'হুজুর, আমি একজন সামান্য নোকর, কিন্তু আপনার কাছে কেমন যেন বাঁধা পড়ে গেছি। আপনার কবিতা, সাহস, দয়ায়... আমি... জানি আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল! যারা আপনার ক্ষতি করেছে, রক্ষা পেয়েছেন—এও বড়ো ভাগ্যের কথা!'

তাহির যেন এখন বড় ভাইয়ের ভূমিকা নিয়েছে, বিপদের সময়ে ছোট ভাইকে চাঙা করে তোলার চেষ্টা করছে। সত্যিই বাবরের চেয়ে সে সাতবছরের বড়।

'ভাগ্য আপনার সঙ্গে সৎমায়ের মতোই ব্যবহার করেছে। নিষ্ঠুর লোকেদের জয় হয়েছে। তাদের দিন শেষ হবে, এমন দিন আসবে যখন আপনার মূল্য বুঝবে সবাই, জাঁহাপনা! আর এখন', বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসফরা ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার। হীরাটও আপনার পর নয়। হুসেন বাইকারা আপনার আত্মীয়। হীরাটে আমার মামা মুল্লা ফজলুদ্দিনেরও থাকার কথা।'

যে পাহাড়গুলি পেরিয়ে যাবার দরকার, তাদের তুষারাবৃত চূড়াগুলি আকাশের নীল ঝলক দিয়ে মুগ্ধ করে চোখকে; সমতলের নিরাপদ দূরত্ব থেকে দেখলে বোঝা যাবে না সেই খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠা কত কঠিন! উপরে উঠলে চূড়ায় সাদা তুষার মানুষের কাছে মনে হবে যেন কাফন আর বিশাল বিশাল হিমবাহগুলি যেন মৃত্যুর চিরআশ্রয়।'

'এই বিপজ্জনক পথে যাত্রার সময় নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রথমে খোদার ওপর, তারপর তোমার ওপর, তাহিরবেগ...'

তুষারাবৃত ধারাল চূড়াসমেত বিশাল কালো কালো পাহাড়গুলির দিকে তাকিয়ে বাবরের আবার মনে পড়ল ধসে চাপা পড়া ঝরনার কথা। এই পাহাড়ের সারি পেরিয়ে ওপাশে পৌঁছতে পারবেন কি? সারি তো একটা নয়! এই বিশাল পর্বতমালার পিছনে পামির। পামিরের পরে হিমালয় আর হিন্দুকুশ।...

ভাগ্যের আবর্ত্তন

হীরাট। মার্ভ।

১

হীরাটের বাগানগুলিকে জলদানকারী স্বচ্ছতোয়া ইন্দ্‌জিল আর হিরিইরুদ নদীগুলির দুই তীর ও জলের ওপর পড়েছে হলুদ পাতার আচ্ছাদন; হীরাটের প্রখ্যাত আঙুর ও বেদানার খেতের জলুস নেই, আঙুরলতার ও গাছের ন্যাড়া ডালপালায় গ্রীষ্মের সবুজের অবশেষ।

কিন্তু এই শহরে সবকিছু শরৎঋতুর ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না। কান্দাহারের দিক থেকে হীরাটে প্রবেশ করার পথের ধার বরাবর যে হাজার হাজার নীলচেরুপালী পাইনগাছ আছে সেগুলি আগের মতই তাজা, উজ্জ্বল।

পাথরবাঁধান বিরাট জলাশয়—লোক যার নাম দিয়েছে হুসেন বাইকারার হ্রদ—তার চারদিকে আছে 'পাখির জিভ' গাছগুলি, সরু লম্বা পাতাওয়ালা এই গাছগুলি পাতাপড়াঋতুর কবলে পড়ে না. . .

তাহির শুনেছে যে এই গাছের পাতাগুলি ক্ষত-ব্যথাবেদনা সারাতে পারে। জলাশয় থেকে সামান্য দূরে ঘোড়া থামিয়ে সে নামল, ঘোড়ার লাগামটা ধরিয়ে দিল কাছেই একজন তরুণ নোকরের হাতে। তারপর এগিয়ে চলল জলাশয়ের তীর ধরে ঐ গাছের পাতা ছিঁড়ে নেবার উদ্দেশ্যে। এমন সময় কে যেন সামনে থেকে ডাক দিল তাকে :

'একটু দাঁড়ান, বেগ!'

একটা গাছের মোটা গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে একজন লোক। ভাল করে দেখল তাহির—ফজলুদ্দিনমামা নাকি? কিন্তু এ লোকটির দাড়িও মামার দাড়ির চেয়ে অনেক লম্বা আর মুখেও বার্ধ্যক্যের ছাপ।

'বলুন,' থেমে পড়ে সসম্মানে বলল তাহির।

লোকটিও তাকিয়ে রইল তাহিরের ক্ষতচিহ্নাঙ্কিত মুখের দিকে, এবার বোধহয় গলাও চিনতে পারল সে।

'তাহির! ভাগিনা আমার!'

মামাকে আলিঙ্গন করার জন্য হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল তাহির। হ্রদের স্বচ্ছজলে তাদের ছায়াগুলি মিলিত হল।

'ভাগিনা রে, তুই মাতৃভূমির সুগন্ধ বয়ে এনেছিস আমার জন্য। আল্লহ্‌র দোয়ায় তুই বেঁচে আছিস, ভাল আছিস!'

তাহিরের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন কিন্তু একহাতে তার হাতটা ধরে রইলেন আর অন্যহাতে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া আনন্দাশ্রু মুছে নিলেন, ভাল করে দেখলেন ভাগিনার মজবুত, সুন্দর চেহারার দিকে। রুপোর কোমরবন্ধ, দামী তরবারি, সাধারণত বেগরা এমন পরে থাকে, তাছাড়া চেকমেনটাও চমৎকার! আর বেগরা সাধারণত যেমন পরে থাকে তেমন লোহার মস্তকাবরণ, তার ওপরে তাহির লাগিয়েছে ছোট্ট রূপালী পতাকা। আহারে তাহির।

'ভাগিনা রে, তুই দেখি এখন শক্তিশালী বেগদের একজন হয়ে উঠেছিস. . .'

'হ্যাঁ, আমি কুরচিবেগ—বাবরের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের নেতা।'

'ভাল, ভাল. . . তোর ওপর যেন বদমাশ বেগদের প্রভাব না পড়ে!'

'হুজুর সেজন্যই আমাকে নিয়েছেন কারণ আগের অনেক বেগরাই বিশ্বাসভঙ্গ করেছে. . . যাক, সেসব কথা। আপনার খবর কি, মামা? কত খুঁজেছি আপনাকে. . . কাউকে যে জিজ্ঞাসা করব, জানব—তা আমার জানাশোনা কেউ নেইও এখানে।'

সবেমাত্র চল্লিশ পেরিয়েছেন মুল্লা ফজলুদ্দিন কিন্তু বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল, বিষণ্নভাবে সাদাছোঁয়া লাগা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন:

'বেঁচে আছি. . . কবরে যাবার ডাক আসেনি এখনও। খোদা আমাকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাহির। মহান নবাইয়ের সাহায্য পাব এই আশায় হীরাট পৌঁছলাম, কিন্তু তিনিও শীঘ্রই বিদায় নিলেন নশ্বর দুনিয়া থেকে। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পরেও এখানে কিছু নির্মাণকার্য চলেছে। কিন্তু এ বছর হুসেন বাইকারা নিজেই চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। সব নির্মাণকার্য স্থগিত রইল। স্থপতিদের কোন কাজ নেই এখন। আমি এখন বই বাঁধাইয়ের কাজ করি. . .'

'মির্জা বাবরের সঙ্গে দেখা করতে পারেন তো?'

'মির্জা বাবর নিজেই এখানে অতিথি. . . তাছাড়া, তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা করবেন?'

মামা আর খানজাদা বেগমকে নিয়ে কি ছু গুজব তাহিরেরও কানে এসেছে।

'মামা, যদি আমি একান্তে তাঁকে বলি আপনার কথা? স্থপতিদের পছন্দ করেন তিনি।'

'পরে এসব কথা আলোচনা করা যাবে'খন. . . ওঃ ভাগিনা রে! যেদিন থেকে শুনেছি যে মির্জা বাবর হীরাটে এসেছেন, সেদিন থেকেই ভাবছি ওঁর সেনাদলের মধ্যে তুইও আছিস না কি! রাস্তাঘাটে বাবরের সৈন্যদের দেখলেই তাকিয়ে থেকেছি তাদের মুখের দিকে. . . চল্, আমার বাড়িতে যাওয়া যাক! এই রোগসারান গাছের পাতা চাই তোর? আমার বাড়িতে আছে। আমাদের বাগানে এই গাছ আছে।'

'বাগানে?. . . আপনি বিয়ে করেছেন নাকি, মামা?'

'করেছি রে। মহান নবাইয়ের উপদেশে বিয়ে করি। তাঁর বাগানের তদারক করতেন সদগুণসম্পন্ন একজন মালী, তাঁরই মেয়েকে. . .'

'অভিনন্দন জানাই!. . . ছেলেমেয়ে?'

'আছে। এক ছেলে, এক মেয়ে।'

'দারুণ ব্যাপার! তাহলে তো আপনার বাড়ি খালি হাতে আসা যাবে না!'

'তোর সঙ্গে যে দেখা হল, এর চেয়ে বড় উপহার আর কি হতে পারে আমার কাছে, তাহিরজান! চল্ আমার বাড়ি!'

আকাশের দিকে চাইল তাহির। সূর্য ডুবতে বসেছে।

'মামা, আপনার বাড়ি কি বেশ দূর?'

'হ্যাঁ, বেশ দূর। শহরের প্রান্তে নাজারগহ মহল্লায়। কেন রে?'

'খানিক বাদেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। মির্জা বাবরের সেরকম আদেশ।'

'আচ্ছা. . . তাহলে. . . এখানেই খানিক বসা যাক, কেমন। তোকে চোখ ভরে দেখে নিই!. . আর তুই, ভাগিনা? . . বিয়েসাদী করেছিস?'

জলাশয়ের ধারে পাথরের তৈরি বসার জায়গায় বসল তারা। রাবিয়াকে কেমন করে খুঁজে পায় সেকথা বলল তাহির, শেষে বলল:

'কাবুলে আমাদের ভাগ্য খোলে, ছেলের মুখ দেখি আমরা। নাম রাখা হল সফরবেগ। সফরে সফরেই কেটেছে দিনের পর দিন, সফরে কেটেছে. . .'

'আল্লার রহমত!. . আমি, তাহিরজান, একসময় খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ভাবতাম তোকেও আর দেখতে পাব না। সব দেখি উল্টো হয়ে গেল এখন। বেঁচে থাকাটাই হল আসল কথা। আর দুর্দিন কেটে যাবে, তোর দুঃখের দিনও শেষ হয়েছে. . . আন্দিজানের কি খবর?'

'সেকথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না, মামা! কত লোককে যে মেরেছে শয়বানীর দল. . . স্বপ্নে দেখে আঁতকে উঠি. . .'

'সে নরক থেকে তোরা কি ভাবে পালিয়ে বাঁচলি?'

কি ভাবে? সত্যিই তো কি ভাবে তারা শয়বানীর হাত থেকে রক্ষা পায়?

দিনরাত পথ চলেছে তারা ক্লান্ত নির্জীব হয়ে পড়েছে। খাবার কিছু ছিল না। ঘোড়া, উট মেরে খিদে মিটিয়েছে। বাবর নিজের ঘোড়া তাঁর মাকে দিয়ে নিজে হেঁটে চলেছেন। খাড়া পাহাড় খাড়া পথ। মাথা গুঁজবার এতটুকু জায়গা নেই।

কেউ কেউ বাবরের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করতে থাকে, 'এখানে বসে থাকার দরকার নেই, তাড়াতাড়ি হীসার পেরিয়ে যান।' তাহির হয়ত তলোয়ার তুলে নিয়ে এগিয়েছে তাদের দিকে কিন্তু বাবর তাকে বুঝিয়েছেন। বলেছেন, 'শান্ত হও। ওরা তো ঠিকই বলেছে—ওদের কাছে কে আমরা?. . চল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমু-দরিয়া নদী পেরিয়ে যাওয়া দরকার আমাদের।' পরে তাহির বুঝেছে ঠিকই বলেছিলেন বাবর। আমু-দরিয়া পেরিয়ে এসেই তারা জানতে পারে যে শয়বানী হীসার আক্রমণ করেছে। হীসারের শাসক খুসরু ছিল ভীরু স্বভাবের, খানের সঙ্গে যুদ্ধে নামার ইচ্ছা ছিল না তার, নিজের সৈন্যদল ছেড়ে পালায় সে। তার দলের অধিকাংশ বেগরাই গোপনে লোক পাঠায় বাবরের কাছে এই কথা জানিয়ে, 'আমরা আপনার হাতে হীসার তুলে দেব আসুন।' কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন বাবর : কি করে তারা প্রমাণ করবে তাদের বিশ্বস্ততা? উত্তরে তিনি জানান : 'যদি তোমরা প্রকৃতই আমাকে সমর্থন কর, আমাকে যদি তোমাদের প্রয়োজন হয় তো এখানে চলে এস তোমরা।'

হীসার দখল করে শয়বানী, খুসরুর ত্রিশ হাজার সেনার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে এমনি বিশৃঙ্খল অবস্থায় সাধারণত সম্ভ্রান্তবংশীয় ও শক্তিশালী বেগরা যাদের এতখানি শক্তি ও আভিজাত্য নেই যে শাসকের আসনে বসে, তারা সন্ধান করতে থাকে অভিজাত-সম্ভ্রান্তবংশীয় শক্তিশালী শাসকের। কিছুটা সেই কারণে, আর কিছুটা তখনও বাবরের প্রতি অনুগত কাসিমবেগের প্রচেষ্টায় হীসারের বেগদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল শৌর্যবান এই শাসকের দিকে। বেগরা তাদের সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে চলল আমু-দরিয়ার দিকে বাবরের দলে যোগ দেবার জন্য। সবার আগে চারশত সৈন্য নিয়ে এসে পৌঁছাল বকিবেগ চাগনিয়ানি। সে যতখানি প্রত্যাশা করেছিল তার চেয়েও অনেক বেশি সম্মান দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন বাবর তাকে, তাকে নিজের উজীরে আজম করলেন।

আমু-দরিয়া পার হয়ে এসেছিলেন বাবর কেবলমাত্র দু'শ চল্লিশজন সৈন্য নিয়ে। একমাসের মধ্যে তাঁর সৈন্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার হাজারে. . .

তাহিরের কথা শুনতে শুনতে মুল্লা ফজলুদ্দিন ভাবতে লাগলেন যে এই ক'বছরে সে কেমন বদলে গেছে। আগে তাহির এমন করে চমৎকারিত্বে মন ভরিয়ে কথাবার্তা বলতে পারত না। অভিজাতবংশীয় লোকেদের সংস্পর্শে নিশ্চয়ই এমন জটিল বাক্য, শব্দ ব্যবহার করতে শিখেছে।

'তারপর কাবুল এসে পৌঁছলাম আমরা,' বলে চলে তাহির, 'তখন সেখানে শাসন

করছিলেন তুর্ক আর্গিনবংশের এক মুকিম বেগ। তখ্‌তে তার কোন অধিকার ছিল না নাকি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার শক্তি ছিল না কে জানে। বাবর তার সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বললেন যে শেষে মুকিম বেগ বিনাযুদ্ধে কাবুল ছেড়ে দিল। কিছুদিন বাদে হুসেন বাইকারার কাছ থেকে দূত এসে পৌঁছল। হীরাটের শাসক বাবরকে স্বীকৃতি জানাচ্ছেন কাবুলের শাসক হিসাবে আর অনুরোধ জানাচ্ছেন তাঁকে সৈন্যদল নিয়ে মুরগাব নদীর তীরে উপস্থিত হতে, তাঁর সঙ্গে মিলে শয়বানীকে রোখার জন্য। এমন চুক্তির প্রস্তাবের প্রত্যাশায় ছিলাম আমরা বহুদিনই, চল্লিশদিন, চল্লিশরাত হাওয়ার বেগে ছুটে অতদূর থেকে এসে পৌঁছলাম, এদিকে, হুসেন বাইকারা. . . আর বেঁচে নেই. . . এমনি অদৃষ্ট।' হঠাৎ আগেকার মত একটা সাধারণ শব্দ বলে বসল তাহির আর কেন কে জানে মৃদু হাসল।

'তোমরা যে শক্তিশালী শাসকদের উপযুক্ত আড়ম্বরসহকারে এসে পৌঁছেছ এ ভাল কথা। নাহলে হুসেন বাইকারার—তার আত্মার শান্তি হোক—উদ্ধত ছেলেরা মির্জা বাবরকে যথাযথ সম্মান দিত না।'

'হ্যাঁ মামা, এখন আমাদের দারুণ সম্মান এখানে. . . যেখানেই আমরা যাই শহরশাসক আমাদের সঙ্গে থাকে: হীরাটের যত দর্শনীয় বস্তু আছে, তা প্রাণভরে দেখেছি আমরা। আর সন্ধ্যাবেলাগুলিতে বিভিন্ন অভিজাতের বাড়িতে নিমন্ত্রণ, আজ স্বয়ং মুজাফফর মির্জা বাবরকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন শ্বেত প্রাসাদে... আরে মামা,' আকাশের দিকে তাকাল তাহির, 'দেখুন তো সূর্যটা কোথায়। দেরি করা চলবে না আমার। কাল আপনার সঙ্গে দেখা করা যাবে? কোথায় আপনাকে খুঁজে পাব, বলুন!'

তাহিরের ঘোড়া ধরে থাকা নোকরটির কাছে যতক্ষণে পৌঁছাল তারা ততক্ষণে মুল্লা ফজলুদ্দিন ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় তাঁর বাড়িটা। নোকরের হাত থেকে লাগামটা নিয়ে তাহির হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল:

'মামা, আপনার ঘোড়া কোথায়?'

'আমি হেঁটে যাই. . . অভ্যাস হয়ে গেছে. . .'

লজ্জা হল তাহিরের: অবস্থা পড়ে গেছে মামার, আর সে এতক্ষণে তা বুঝতে পারল। মুল্লা ফজলুদ্দিনের দিকে এগিয়ে দিল রুপোর লাগামটা:

'তাহলে এ ঘোড়া আপনার।'

'আর তুই?'

'আস্তাবলে আরও দুটো ঘোড়া আছে আমার। বসুন।'

রুপোবাঁধান হাতলওয়ালা চাবুকটাও কোমরবন্ধ থেকে খুলে নিয়ে মামার হাতে ধরিয়ে দিল।

'এ হল সেই ঘোড়াটার বাচ্চা, মনে আছে, ওশে যার পিঠে আপনি আমাকে বসিয়েছিলেন?'

'আরে, ভাগনে, মাথাটা ঠিক জায়গায় থাকলে তার টুপিও পাওয়া যাবে। সেসব দিনের কথা মনে করে আর লাভ কি?'

'কাল মামার গোটা পরিবারের জন্য উপহার নিয়ে আসব,' মনে মনে ভাবল তাহির।

অল্পবয়সী নোকরটি বসেছিল দ্বিতীয় ঘোড়াটির পিঠে, কে এই লোকটি কি ব্যাপার কিছুই বুঝল না সে, মুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।

বিদায় নিলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন ('কাল দেখা হবে, আল্লাহের রহমতে') ঘোড়া ছোটালেন। সেদিকে তাকিয়ে তাহির নীচুস্বরে নোকরকে বলল:

'তোর বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছু আছে, নাকি?. . তুই বসে আছিস ঘোড়ার উপরে আর তোর বেগ নিচে দাঁড়িয়ে?'

নোকরটি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে।

ফজলুদ্দিন পিছন ফিরে দেখলেন তাহির ঘোড়ার পিঠে বসে, অহঙ্কার আর গাম্ভীর্যে পূর্ণ ('বেগ হয়েছে, সত্যিকারের বেগ')। আর তার নোকরটি মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে। 'তাহির যেন ঐ আত্মাভিমানী বেগগুলোর মত না হয়,' উদ্বিগ্ন মনে ভাবলেন তিনি।

২

. . . সতের দিন হল বাবর আছেন সুশোভিত উনসিয়া ভবনে—যেখানে নবাই বাস করতেন। উঁচু উঁচু প্রবেশদ্বার, নীল গম্বুজগুলি, সূর্যের আলোয় ঝকঝক করতে থাকা রঙিন টালিগুলি মনে করিয়ে দেয় সময়খন্দে উলুগবেগের মাদ্রাসার কথা, কিন্তু চারকোণের চারটি মিনার এখানে আরো বেশি উঁচু আর ভবনটির নির্মাণকার্য যদিও সমাপ্ত হয় পনর বছর আগে সেটি দেখায় কিন্তু নতুনের মত।

উনসিয়ার একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে নবাইয়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার।

এই গ্রন্থাগারে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেন বাবর, গ্রন্থগুলি নাড়াচাড়া করেন। কোন কোন পাতায় মহান কবির দেওয়া দাগ; সময়খন্দে মির আলিশেরের কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিলেন সেকথা বারবার মনে পড়ে: হায়, তারপরে যে বয়ে গেছে কত জল আর. . . কত রক্ত!

গ্রন্থাগারের দরজার কাছে মেঝেতে দাঁড় করান আছে সুন্দর সরু আলমারীর আকারের একটা বড় ঘড়ি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আলমারীর মাথায় রাখা একটা কাঠের ছেলেপুতুল নড়ে ওঠে আর সোনার হাতুড়ি থালার উপর ঠুকে সুরেলা ঘণ্টায় আওয়াজ তোলে। মির আলিশেরের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি করা হয় এই ঘড়িটি, তারপরে এই বিশেষ ধরনের ঘণ্টাবাজান ঘড়িটির বিশেষ চল হয় হীরাটে আর এর নাম হয়ে দাঁড়ায় 'আলিশেরের ঘড়ি।'

. . . গ্রন্থাগারের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাবর আরও একবার তাকালেন ঘণ্টাবাজান ঘড়িটির দিকে। আবার ভাবলেন, 'কেমন অবাককাণ্ড—মানুষটি আর নেই, কিন্তু তাঁর ধ্যানধারণা আজও বেঁচে আছে। দ্বিতীয় জীবনও সম্ভব—সেকথাই কি জানাচ্ছে না এই ঘড়ির ঘণ্টা ধ্বনি?'

উনসিয়া ভবনের সর্বত্র, প্রতিটি কক্ষে বিচরণ করছে তার স্রষ্টার আত্মা। যে দরজাগুলি ছুঁয়েছে নবাইয়ের হাত, সেগুলি অতি সাবধানে খোলেন বাবর, দালানে সিঁড়িতে যতটা সম্ভব সতর্কভাবে পা ফেলেন, মনে হয় এই সেদিন এখান দিয়ে হেঁটে বেড়ান মানুষের পায়ের অদৃশ্যছাপের ওপর পা ফেলছেন।

জলাশয়ের চারপাশের চিনারগাছগুলির নিচে ঝরাপাতাগুলি ঝাঁট দিয়ে জড় করছিল একজন ভৃত্য। 'আমাদের জীবনটাও ঐ ঝরাপাতার মত নাকি,—এরপর কেউ ঝাঁট দিয়ে সেগুলোকে জড় করে আগুন লাগিয়ে দেবে, আর হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাদের ছাই?' ঘন-সবুজ গাছের মাঝের সুন্দর রাস্তার দিকে ঘুরলেন বাবর। সেই রাস্তার প্রান্তে কবির অপেক্ষায় ছিলেন নবাইয়ের ছাত্র ঐতিহাসিক খন্দামির আর মহান কবির অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের একজন বুড়ো সাহিব দারো যিনি বহুদিনই লাঠিতে ভর দিয়ে চলেন, এঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে বিশেষ আনন্দ পেতেন নবাই।

সাহিব দারো বাবরকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন:

'জাঁহাপনা, অতুলনীয় প্রতিভা মির আলিশের উনসিয়া ছেড়ে যাবার পর উনসিয়া হয়ে দাঁড়ায় প্রাণহীন দেহের মত। আপনি সেই দেহে প্রাণ ফিরিয়ে এনেছেন!' বলে আবার নত হয়ে সম্মান জানালেন।

ত্রিশবছরবয়সী খন্দামিরের চোখে ধারাল, গভীর দৃষ্টি, মৃদু হেসে পরীক্ষা করার ভাবে তিনি তাকিয়ে রইলেন বাবরের দিকে: পঁচিশবছরবয়সী বাবর কি উত্তর দেবেন এই সূক্ষ্ম প্রশংসার? তাঁর বয়সের উপযোগী বিনয় প্রকাশ করে নাকি প্রশংসা স্তুতি গ্রহণে অভ্যস্ত শাসকদের মত?

বিষণ্ণতা আর সবকিছু হারাবার দুঃখভরা বাবরের হৃদয়। তাই আড়ম্বরপূর্ণ, কাব্যিক শব্দব্যবহার করবার ইচ্ছা হল না, সহজভাষায় বললেন:

'না মওলানা, মহান কবির এই বাসভবনটি আমার দেহে নতুন প্রাণ এনে দিয়েছে। এর কথা আমি আগে স্বপ্নে দেখেছি. . . স্বপ্নেই দেখেছি কেবল।'

খুশিভাবে মাথা নাড়লেন খন্দামির। সাহিব দারোও খুশি হলেন:

'আপনি যথার্থই বলেছেন, জাঁহাপনা,' আবার মাথা নিচু করে সম্মান জানালেন তিনি, 'সেই মহান প্রাণ যা কিছুই ছুঁয়েছেন সবেতেই তাঁর ছাপ রয়ে গেছে। অনুগ্রহ

* গওহরশাদ বেগম—উলুগবেগের মাতৃদেবী

করে দেখুন এই মিনারগুলির দিকে,' বলে বৃদ্ধ প্রথমে ডানদিকে তারপরে বাঁদিকে হাত তুলে দেখালেন। সেদিকে তাকিয়ে বাবর দেখলেন: নীল আকাশ আর সাদা মেঘের মাঝে শোভা পাচ্ছে রঙিন টালি দিয়ে তৈরি মিনারগুলি।

এমনি ধরনের মিনারের উপর সাধারণত থাকে গম্বুজঘর, যেখান থেকে আজানের ডাক দেওয়া হয়, তাছাড়া চারপাশের দৃশ্যও দেখা যায় ভাল করে। উনসিয়ার মিনারগুলিতে গম্বুজঘর ছাড়াও মিনারের মাঝে মাঝে গোল ঘেরা বারান্দা আছে। সেগুলির কথাই বলতে চেয়েছিলেন সাহিব দারো:

'উপর থেকে হীরাটের শোভা দেখে প্রাণ জুড়াত মির আলিশেরের। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে, জাঁহাপনা, অত উঁচুতে ওঠা অত্যন্ত কষ্টকর। তার মির আলিশেরের নির্দেশে স্থপতিরা মিনারের উচ্চতার মাঝামাঝি মিনারকে বেড় দিয়ে ঐ বারান্দাগুলি নির্মাণ করেন।

'আমরা ওখানে যেতে পারি না?'

'সানন্দে নিয়ে যাব ওখানে আপনাকে!. . পশ্চিমের মিনারটিতে চলুন, যাওয়া যাক. . .'

সাহিব দারো নিজে অবশ্য রয়ে গেলেন মিনারের পাদদেশে আর যুবক বাবর ও খন্দামির মিনারের ভিতরের ঘোরান, খাড়া সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে গেলেন উপরে, তারপর বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়ালেন।

চোখের সামনে ধরা দিল কি অপূর্ব শোভা! দূরে—তুষারাচ্ছাদিত মুখতার ও ইসকান্দজা পর্বতমালা। নিচে—সরু রুপালী তরবারির মত ইন্দজিল নদী। নদীর বামতীরে শোভা পাচ্ছে গওহরশাদ বেগমের প্রখ্যাত মাদ্রাসা (যেটি নির্মিত হয় নবাইয়ের ও পূর্বে), ঐ মাদ্রাসার বিপরীতে নদীর ডানতীরে অবস্থিত প্রায় সেই একইরকম প্রখ্যাত ইখলসিয়ার মাদ্রাসা, যেটি নির্মিত হয় নবাইয়ের জীবিতকালে। তার সামান্য দূরে শিফোইয়ার চিকিৎসালয়, সেটি একই সঙ্গে মাদ্রাসাও: সেখানে রোগীর চিকিৎসাও চলে আবার ছাত্রেরা চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নও করে। তার থেকে আরো খানিক দূরে আগন্তুক ও গৃহহারাদের থাকার জন্য—খালোসিয়া ভবন, যার উপর আছে এক বিরাট গম্বুজ।

কি অপূর্ব সুন্দর হীরাট শহর! ধন্য নবাইয়ের পরিকল্পনা!

অন্য দিকগুলিতেও শহরের উপর নীল নীল পাহাড়ের মত মাথা তুলে আছে গম্বুজ ও মিনার। অনেক, অনেক মিনার আর গম্বুজ। হঠাৎ বাবরের মনে হল সমরখন্দ যাবার ইচ্ছা, ভালবাসা আর বিচ্ছেদের বেদনায় ভেঙে যেতে লাগল বুক।

'মওলানা,' খন্দামিরকে উদ্দেশ্য করে বাবর বললেন, 'এমন অপূর্ব নির্মাণকার্য যারা সম্পন্ন করেছেন তাদের মধ্যে মাভেরান্‌হরের* কোন স্থপতি ছিলেন নাকি?'

* মাভেরান্—আমু-দরিয়া ও সির-দরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম। —সম্পাঃ

'জাঁহাপনা, হীরাটের সৌন্দর্যে আপনি বোধহয় সমরখন্দের সৌন্দর্যের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, সেই কারণেই জিজ্ঞাসা করছি।'

'হীরাটের অনেক স্থপতি সমরখন্দে শিক্ষালাভ করেছে। তারা সমরখন্দ থেকে বুকে করে নিয়ে এসেছে ধ্যানধারণা. . . তা'ছাড়া অনেক প্রতিভাবান ব্যাক্তি. . . আপনি জানেন . . . মাভেরান্নহর ছেড়ে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন, মির আলিশের নবাইয়ের কাছে. . . আমাদের অতুলনীয় মির আলিশের নবাই কত গুণের অধিকারীই যে ছিলেন! কিন্তু আপনার অনুগত দাসের মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল প্রকৃতিদত্ত প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিকে খুঁজে বার করে তার প্রতিভাকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা। মির আলিশেরে চেয়ে বেশি করে কেউ একথা বুঝতে পারত না যে মহান প্রতিভা ব্যতীত মহান কার্য সম্পন্ন করা যায় না। নিজের অন্তরঙ্গদের এবং আমার মত ছাত্রদের মির আলিশের বারবার বলেছেন : মনে রেখো—হিংসা স্বার্থপরতা অধিকাংশক্ষেত্রে বাসা বাঁধে অজ্ঞ প্রতিভাহীন, মানসশক্তিহীন ব্যক্তির মনে। শিল্পের উচ্চস্তরে বিশেষত অকর্মণ্যেরা প্রতিভাবানদের জায়গা দখল করে। তাদের প্রতিভাকে প্রকাশ হতে দেয় না, নিধন করে তাদের প্রতিভাকে। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে যা অমঙ্গলকর তা হল প্রতিভাহীনদের হিংসা। আর সর্ব্বোচ্চ সদ্গুণ—সেই সব লোকদের সদ্গুণ যারা বিরল প্রতিভার উন্মোচন ও বিকাশ করতে সাহায্য করেন।'

'যথার্থ কথাই বলেছেন!' উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন বাবর।

বাবরের উচ্ছ্বাস আরও উৎসাহিত করল খন্দামিরকে :

'আমরা, তাঁর ছাত্রেরা যখন ভ্রমণ করে ফিরতাম বা বেশ কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকার পরে আসতাম তো মির আলিশের প্রথমেই প্রশ্ন করতেন, 'ফিরে এসেছ, ভাল কথা, কিন্তু কোন বিরল প্রতিভার সন্ধান এনেছ তুমি?' কখনও কখনও আমরা নিয়ে আসতাম পনর-ষোলবছর বয়সী তরুণদের, কখনও বা তার চেয়েও ছোটবয়সীদের। এমন 'আবিষ্কারের' কথা বলতে লজ্জা পেতাম, কিন্তু মির আলিশের বলতেন, 'প্রতিভার প্রকাশ হয় পনরবছর বয়সেও আর বুদ্ধিহীন চল্লিশবছরবয়সেও বুদ্ধিহীনই থেকে যায়. . . কই দেখি তো তোমার অজ্ঞান প্রতিভাকে!' সাহিব দারা মির আলিশেরের কাছে নিয়ে এলেন তাজিক জয়নুদ্দিন ওয়াসিফিকে—তখন তার ঠিক পনরবছর বয়স। সেই জয়নুদ্দিন নবাইয়ের জ্ঞানের অবারিত উৎস থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে করে শীঘ্রই সারা হীরাটে প্রখ্যাত হয়ে উঠল মুয়াম্মিছন্দের দক্ষ রচনাকার হিসাবে... প্রখ্যাত চিত্রকর কামালুদ্দিন বেখজাদও শিশুবয়স থেকেই মির আলিশেরের কাছে পাঠগ্রহণ করেন। কবি হিলোলী ও লিপিকর সুলতান আলি মাশহাদির প্রতিভার বিকাশ ও উন্মোচন করেন মির আলিশেরই . . . এই সব কারণেই হীরাট গত ত্রিশবছরে আগের থেকেও আরো বেশি উজ্জ্বল, সুন্দর হয়ে উঠেছে। তাই নয় কি?'

'ঠিকই বলেছেন মওলানা। মুসলিম দুনিয়ার যত শহর আমি এ পর্যন্ত দেখেছি সেগুলির মধ্যে হীরাট সবচেয়ে সুন্দর!'

'জনগণের মধ্যে জাত প্রতিভাই কি আজকের হীরাটকে এমন মহান, সুন্দর করে তোলেনি?'

'এও যথার্থ বলেছেন! যে সব বিরল সুন্দর ভবনগুলি শোভা পাচ্ছে হীরাটে তা হল প্রতিভাবান লোকেদের অন্তরের গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে তুলে আনা মুক্তো।'

'মির আলিশেরের অপূর্ব ক্ষমতা ছিল এমন সব গুপ্ত উৎসের মুখ খুলে দেওয়ার এবং তাদের প্রতিভাকে সঠিক পথে চালনা করার। সেকথা স্বীকার করতেন স্বয়ং হুসেন বাইকারাও। আপনি হয়ত শুনে থাকবেন, আলমপনা, যে বেশ কিছু স্বার্থসন্ধানী লোক চেষ্টা করছিল মির আলিশের আর হুসেন বাইকারার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে . . . কি আর বলব,' গলা কেঁপে গেল খন্দামিরের, 'মির আলিশের নির্মল চরিত্র, সংযমী, ভ্রষ্টচরিত্র হুসেন বাইকারা, মত্ত অবস্থায় কত অপ্রিয় কাজ করেছেন . . . কিন্তু যখন তিনি সুস্থমস্তিষ্ক থাকতেন তখন মির আলিশেরকে এমন সম্মান দেখাতেন যে সবাই বিস্মিত হয়ে যেতেন . . .'

আর যেন কোন আগ্রহজনক ঘটনা মনে পড়ায় খন্দামিরের মুখে ফুটল রহস্যমাখান মৃদু হাসি। বাবর মুখে অসীম আগ্রহ ফুটিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন।

খন্দামির বয়সে যুবক, মাঝারি লম্বা, কিন্তু এই বয়সেই দেহে অতিরিক্ত মেদ জমে গেছে। মাংসল আঙুলগুলি কপালের ওপর বুলিয়ে তিনি গম্ভীরভাবে বলতে আরম্ভ করলেন :

'মির আলিশের তাঁর 'খামসা' শেষ করেছেন তখন, আমরা সবাই খুব খুশি, বইটি মির আলিশের পড়ার জন্য দেন হুসেন বাইকারাকে, তিনি, আপনি জানেন, কবিতার গুণগ্রাহী ছিলেন। 'খামসা' পড়ে সুলতান মির আলিশেরকে ডেকে পাঠালেন দরবারে আর সর্বসমক্ষে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। হুসেন বাইকারার. . . ছিল এক অত্যন্ত দামী ঘোড়া, যেটিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। আদেশ দিলেন তিনি, 'আমার সাদা ঘোড়াটি এখানে নিয়ে এস!' মির আলিশের বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, 'আমাকে ওই ঘোড়াটি দেবার কথা ভাবছেন নাকি?' সুলতান হুসেন মির আলিশেরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন থেকে আপনাকে আমার শিক্ষক বলে মেনে নিলাম।' বিহুল মির আলিশের বললেন : 'জাঁহাপনা, শিক্ষক হলেন আপনি, আমি আপনার মুরিদ!' এমন সময় সোনার জিন-লাগাম পরান সাদা ঘোড়াটি আনা হল। হুসেন বাইকারা মৃদু হেসে বললেন, 'মুরিদ তার মুরশিদের আদেশ মানতে বাধ্য তো?' মির আলিশের জানালেন, বাধ্য। তখন সুলতান আদেশ দিলেন, 'বসুন এই ঘোড়াটির ওপর!' বাদশাহের ইচ্ছার বিরোধিতা করা চলে না। ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেলেন মির আলিশের। ঐ সাদা ঘোড়াটির কিন্তু ভীষণ বদমেজাজ—সুলতান ছাড়া কাউকে বসতে দেয় না পিঠে, ছুঁড়ে

ফেলে দেয় জিন থেকে। মির আলিশের তার কাছে এগোনোমাত্রই ঘোড়াটি ঘড়ঘড় আওয়াজ বার করতে লাগল নাক দিয়ে, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে লাগল আর ঘুরপাক খেতে লাগল। সুলতান হুসেন লাগামটা হাতে পাক দিয়ে নিয়ে ঘোড়াকে চীৎকার করে বললেন, 'চুপ করে দাঁড়া!' যখন ঘোড়া শান্ত হয়ে দাঁড়াল মির আলিশের ঘোড়ায় উঠে বসলেন। দরবারের লোকেরা স্তব্ধ হয়ে রইল—ভাবল এইবার আরম্ভ হবে নাচানাচি। কিন্তু সুলতান হুসেন লাগামটা ছেড়ে দিলেন না, লাগাম হাতে ধরে তিনি ঘোড়াটার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। সবাই অবাক হয়ে গেল, সুলতান এদিকে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'আমাদের তুর্কীভাষায় লেখা মহান 'খামসা'র প্রতিদানে আমি আপনার ঘোড়ার লাগামধারী হব!' বোবা হয়ে গেছে সবাই, মির আলিশের নিজে বিস্ময়ে অজ্ঞান প্রায়. . . এমন দিনও গেছে, জাঁহাপনা. . .'

'মনে হয়, আপনার কথা বুঝতে পেরেছি আমি,' খানিক চুপ করে থেকে চিন্তাচ্ছন্নভাবে বললেন বাবর 'যেখানে প্রতিভাহীনেরা হিংসা ধ্বংস করতে পারে না প্রতিভাকে, বরং উদারমনা ব্যাক্তিরা প্রতিভা বিকাশের পথ খুলে দেন সেখানে সর্বোচ্চ উৎকর্ষলাভ করা সম্ভব হয়, তাই নয় কি?'

খন্দামিরের মনের গুপ্ত কথাকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন বাবর; ঐতিহাসিক বুঝলেন যে আন্দিজানের এই শাহ্‌র মধ্যে তিনি তাঁর সমদর্শীকে খুঁজে পেয়েছেন; খুশি হয়ে তিনি বললেন:

'ধন্য হলাম, জাঁহাপনা! অতুলনীয় মির আলিশের ও মহান সুলতান হুসেনের সময় সূর্য অস্ত যেত না হীরাটে! কিন্তু হায়, এখন সূর্য উপত্যকার দিকে ঢলতে আরম্ভ করেছে। বিপদের আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে আমার বুক: হীরাট এগিয়ে চলেছে এক গভীর খাদের দিকে. . . কি করতে পারি আমরা? আমাদের দিকে এগিয়ে আসা ঐ অন্ধকারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি করে?'

খন্দামির বুঝেছেন মাভেরান্নহর থেকে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের আগুন শয়বানী খানের সৈন্যদের সঙ্গে এসে পৌঁছাবে খোরাসানেও, তারপর হীরাটে। বিভিন্ন আশঙ্কামিশ্রিত প্রশ্নের জবাব বাবরই তো ভাল করে দিতে পারবেন নাকি?

'আপনার আশঙ্কা মিথ্যা নয় মওলানা,' সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন বাবর। 'হীরাটের এই শান্তি ঝড় ওঠার আগের স্তব্ধতার কথা মনে করিয়ে দেয়। শেষবার যখন আমি তাশখন্দ যাই, তখন তাশখন্দের অবস্থা ছিল আজকের হীরাটের মতই। হাজার বিপদ এড়িয়ে, জাহান্নমের দ্বার থেকে বলা চলে, পৌঁছলাম তাশখন্দ। যখন আমার মরহুম মামা মাহমুদ খানকে বললাম: 'এ বিপদ যাতে আপনারও না হয়, তার জন্য জোট বাঁধা দরকার,' তখন তিনি অবিবেকীর মত ব্যঙ্গ করেছিলেন আমাকে। আপনি তো জানেন, মাহমুদ খানকে কেমন করে পিষে ফেলে শয়বানী।'

'এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি কি হীরাটেও হবে বলে আপনার ধারণা, জাঁহাপনা?'

উত্তর দিলেন না বাবর—তাকিয়ে রইলেন দূরের দিকে, হাওয়ায় বালি মিশান ঘোলাটে দিগন্তের দিকে, হীরাটের উত্তর-পশ্চিম দিকে যেখানে সকা সলমান মরুভূমির বালি ছড়িয়ে আছে।

খন্দামির জানেন যে হীরাটে বাবরের প্রধান কাজ হল তৈমুরের বংশধরদের যতজন অবশিষ্ট আছে তাদের একত্রিত করা, শয়বানী খানের বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় সংঘবদ্ধ করা। এ সম্পর্কে দরবারে আলোচনা চলছে ইতিমধ্যে প্রায় দিনবিশেক হল। আলোচনা চলছে অবশ্যই গোপনে।

খন্দামির কৌশলের আশ্রয় নিলেন:

'জাঁহাপনা, রাষ্ট্রের গোপনকথা জানার অধিকার আমার নেই যে জানব কি বিষয় নিয়ে শাসকদের মধ্যে আলোচনা চলছে। কেবল বিপদ তো সবারই. . .'

'মওলানা, এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই,' কথার মাঝখানেই বাবর বাধা দিলেন ঐতিহাসিককে, 'আপনার কাছে গোপন করার কিছু নেই।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনি জানেন হীরাটের সিংহাসন এখন দখল করে আছেন একই সঙ্গে দু'জন—দু'ভাই।'

'জানি। আইন অনুযায়ী সিংহাসনের অধিকারী বাদিউজ্জামান, কিন্তু খাদিচা বেগমের সমর্থনকারীরা মুজাফফর-মির্জাকে দ্বিতীয় শাসক বলে ঘোষণা করেছেন। এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল।'

বোঝা গেল এমন সব ঘটনায় অসন্তুষ্ট খন্দামির। এবার সংযতস্বরে বাবর বললেন:

'আর. . . আপনাদের এই শাহ্‌দের দু'জনেই অপরিসীম অতিথিপরায়ণ, চমৎকার আলাপ আলোচনা চালাতে আর জাঁকজমকপূর্ণ ভোজসভার আয়োজন করতে তাঁদের জুড়ি নেই। কিন্তু যুদ্ধে নামতে মন চায় না তাদের! নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি এ কথা। মুরগাবে তাদের সঙ্গে দেখা হয় আমার, তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে. . . খবর এল যে শয়বানীর দল চেচেক্তু উপত্যকায় ঢুকে পড়েছে—চেচেক্তু তো আপনাদের খোরাসানের ভাগ। খান নিজে তার সৈন্যদলের প্রধান অংশ নিয়ে অবস্থান করছিল আমু-দরিয়ার ওপারে। খানের চেয়ে আমরাই চেচেক্তুর বেশি কাছে ছিলাম। আমি বললাম—যদি চেচেক্তুতে পাঁচ-ছ'শ শত্রুসৈন্য থাকে তো দেরি না করে চলুন ওদের ধরে ফেলা যাবে—তাহলে দস্যু-খানের অন্য দলগুলিও শিক্ষা পাবে—খোরাসানে আসার আর চেষ্টা করবে না। কিন্তু. . . বাদিউজ্জামান মির্জা বললেন চেচেক্তু যাক ছোট ভাই মুজাফফর মির্জা। আপনি জানেন তাঁদের দু'জনেরই আছে নিজস্ব উজীর, দাসদাসী, নিজের সৈন্যদল, সেনাপতি। ওদিকে মুজাফফর মির্জা কখনও যুদ্ধে যাননি, ভয় হল তাঁর, চেচেক্তু গেলেন না, বললেন, 'বড় ভাই যাক চেচেক্তু, আমরা অন্যান্য সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব নেব।' বাদিউজ্জামান মির্জা এদিকে ভাবলেন, আমার ধারণায়, 'যদি আমি যাই তো মরে যেতেও তো পারি, তাহলে ভাই একা

সিংহাসন দখল করবে!' এই কারণে তিনিও গেলেন না চেচেক্তু। তাঁদের এই বাগবিতণ্ডায় আমি আর থাকতে না পেরে বললাম: 'মহামান্য শাহ্‌গণ, যদি অনুমতি দেন তো আমি আমার লোকদের নিয়ে গিয়ে শত্রুপক্ষকে হঠিয়ে দিতে পারি।' ভাইয়েরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করলেন, ভাবলেন লোকে কি বলবে। 'আপনি অতিথি', বললেন তাঁরা, 'আমরা বরং একসঙ্গে হীরাট যাব।' আমার প্রতি এমনি আতিথ্য প্রদর্শন করলেন ওদিকে চেচেক্তু শয়বানীর হাতে রয়ে গেল। এ কি অদ্ভুত নয়, মওলানা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন খন্দামির:

'ভাগ্য হীরাট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, জাঁহাপনা. . . আমাদের মাথার ওপর কেমন মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে তা আপনিই ভাল জানেন। মওলানা বেখজাদেরও তাই ধারণা। হীরাটের সমস্ত মান্যগণ্য ব্যক্তিরা যাঁদের প্রাণ কাঁদে হীরাটের জন্য, তাঁরা সবাই আশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন আপনার দিকে। হয়ত আমাদের শাহ্‌দের বোঝাতে পারবেন আপনি যে কি ভয়ঙ্কর বিপদ গ্রাস করতে আসছে আমাদের, তাহলে হয়ত সমস্ত শক্তি একত্রিত করে বিপদ আটকানো যাবে।'

'জানি না, মওলানা, জানি না,' মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন বাবর। 'শীঘ্রই আমার দেখা হবার কথা আপনাদের দু'জন শাহ্‌রই সঙ্গে।'

'সফল হোক আপনার প্রচেষ্টা, জাঁহাপনা!'

'ধন্যবাদ. . . কিন্তু কে জানে, কে জানে. . .'

মিনার থেকে নামার সময় টিলার উপর নির্মিত হীরাটের শাহ্‌দের বাসস্থান বিরাট প্রাসাদের দিকে বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি হানলেন বাবর।

৩

শহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সাহিবকিরণ শাহ্‌রুখের সময় থেকেই প্রখ্যাত বগি সাফিদ নামে যে শ্বেতমর্মরের প্রাসাদ—যাকে বলা হত শ্বেতবাগিচা—সেই প্রাসাদে মুজাফফর মির্জা বাবরের সম্মানে এক জাঁকজমকপূর্ণ ভোজসভার আয়োজন করেন। হীরাটের দক্ষ পাচকরা সুস্বাদু কাবাব তৈরিতে ব্যস্ত। বিভিন্ন মশলার সুগন্ধবিশিষ্ট সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য একের পর এক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সোনালী অলঙ্করণে বিশেষভাবে সজ্জিত প্রাসাদের দ্বিতলে। প্রবেশপথের অনতিদূরে বাদ্যকররা বসে মৃদু সুর তুলেছে যাতে প্রাণ গলে যায়; হীরাটের প্রখ্যাত গায়করা নিচু স্বরে অন্তর্ভেদী, বিষণ্ণসুরের গান গাইছে।

ভোজসভা খুব জমে উঠেছে। বাবরের কাছে এগিয়ে এল একজন সাকী পেয়ালভর্তি করে ঢেলে দিল ময়নাব সরাব, কুড়ি বছরের পুরান কড়া সরাব মাতালকরা গন্ধ ছড়াচ্ছে। এর আগে কখনও বাবর সুরাপান করেননি। কিন্তু এখন

গান-বাজনার সুরে নাকি বিষণ্ণ-হতাশ মনোভাবের কারণে হঠাৎ তাঁর মনে হল তাঁর দিকে এগিয়ে ধরা পেয়ালা শূন্য করে দিতে; অভ্যাসবশে কাছে বসে থাকা কাসিমবেগের দিকে তাকালেন তিনি।

কাসিমবেগ বাবরের অনুমতিক্রমে হীসার চলে গিয়েছিল, গতবছর সে আবার নিজের দলবল নিয়ে এসে বাবরের সেবায় নিযুক্ত হয়েছে। কাবুলে সে আবার বাবরের বিশ্বাসী পরামর্শদাতা হয়। কাসিমবেগ নিজে ধর্মভীরু, জীবনে কখনও সুরা ছোঁয়নি আর চেষ্টা করেছে বরাবর বাবরকেও তার থেকে দূরে রাখতে।

'জাঁহাপনা,' ফিসফিস করে বলল কাসিমবেগ, 'বাদিউজজামান-মির্জার ভোজসভাতেও আপনাকে ময়নাব এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আপনি তা পান করেননি, মনে আছে? আর এখন যদি আপনি এখানে তা পান করেন তো বড় ভাই জানতে পারলে অপমানিত বোধ করবে।'

এই কথাগুলি বাবরকে আবার মনে করিয়ে দিল হীরাটের এই দুই শাহ্‌র গোলমেলে ঘটনাবলী, যার মিটমাট হবার কোন সম্ভাবনাও দেখা যায় না। ময়নাব পানের ইচ্ছা সংযত করে মুজাফফরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন:

'মহামান্য মির্জা, মাফ করবেন আমায়, জীবনে কখনও মদ্যপান করিনি আমি।'

ময়নাব পান করতে ভয় পাচ্ছেন বাবর? অর্ধমত্ত মুজাফফর মির্জা অভদ্রভাবে জোরে হেসে উঠল:

'সম্মানিত অতিথিমহাশয়, আপনাদের আন্দিজানে বা সমরখন্দে মদ্যপানের আনন্দ উপভোগ করেনা না কি কেউ? আনন্দউৎসব কি করে করা হয় সেখানে?'

'মহামান্য মির্জা, এ ধরনের আনন্দ উপভোগের সুযোগ যথেষ্ট আছে আন্দিজানেও, সমরখন্দেও। কিন্তু আপনার দাসের অন্যান্য অনেক চিন্তাভাবনা. . . আর আনন্দও আছে. . . আপনার ভাই বাদিউজজামান মির্জাকেও আমি এই কথাই বলেছিলাম, আমি যে শরীয়ত মেনে চলি তাতে তিনি বিস্মিত হননি. . .'

বাদিউজজামানের নাম উল্লেখ করায় মুজাফর আত্মসংযম করলেন. . . সেও তো শরীয়ত মেনে চলে! বাবর মদ্যপান করতে চাচ্ছেন না, এ বোকামি—যাক জোরাজুরি করব না—মির্জার ইঙ্গিতে পরিচারকটি এবার বাবরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে ধরা পেয়ালাটি এগিয়ে দিল বাদিউজজামান মির্জার উজীর জুনুনবেগ আরগুনের দিকে, যাকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে যাতে লোকে না ভাবে যে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোন ফন্দী আঁটছে!

আমোদ-আহ্লাদ চলতে লাগল খুব জোরে। প্রায়ই মত্ত বেগেরা সেই বিশাল ঘরের মাঝখানে গিয়ে নাচছিল। প্রখ্যাত রসিক মির সারবুরহেনা ও বুরখান গুঙের মধ্যে রসাল কথাবার্তার আদানপ্রদানের ফলে সবাই এমন অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছে যে মনে হচ্ছে যেন ঘরের ছাদে লেপা সুন্দর নক্সার কাজটা খসে পড়বে তখুনি।

হুসেন বাইকারা মারা গেছেন খুব বেশি দিন হয়নি, বলা চলে—সামান্য কয়েক দিন হল, আর তার ছেলেরা ইতোমধ্যেই এমনি হালকা আমোদ-প্রমোদে ডুবে গেছে। আর শয়বানী ওদিকে খোরাসানের সীমান্তে পৌঁছে গেছে ইতোমধ্যেই।

কাসিমবেগ মনের রাগ চাপার চেষ্টা করতে লাগল যাতে ঐ বোকা মত্ত লোকগুলি কিছু বুঝতে না পারে, ফিসফিস করে বাবরকে বলল:

'এই মত্ত যুবকের সঙ্গে কথা বলে আর কোন লাভ নেই জাঁহাপনা। তাছাড়া নিজের ক্ষমতা খাটানর কোন অধিকারও ওর নেই। চলুন ওর মাতৃদেবীর সঙ্গে দেখা করা যাক।'

'ভোজ শেষ হবার আগেই চলে যাওয়া কি খারাপ দেখায় না?'

'আপনার গোলাম সব ঠিকঠাক করে রেখেছে, বেগম অধৈর্য হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন. . .'

সভায় রসাল কথাবার্তা শেষ হলে হুল্লোড় যখন একটু কমল তখন বাবর মুজাফফর মির্জার অনুমতি চাইলেন বেগমের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

শ্বেতমর্মরের তৈরি বিরাট প্রাসাদের তিনটি তলাতেই বাতি জ্বলছে। বাবর, কাসিমবেগ, জুনুনবেগ ও তাঁদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা বুরুন্দুক বেগ (মুজাফফর মির্জার অন্তরঙ্গদের একজন) নরম সুন্দর গালিচার উপর দিয়ে একেবারে উপরে উঠে গেলেন। যদিও বাবর মগ্ন ছিলেন বেগমের সঙ্গে কি আলোচনা হবে সে চিন্তায়, তবুও তিনি মন দিয়ে দেখতে লাগলেন দেওয়ালের সূক্ষ্ম অলঙ্করণগুলি—সেগুলি করা হয় শাহ্‌রুখের আদেশে তার ছেলে বাইসুনকুরের জন্য যিনি রেখা ও রঙের সৌন্দর্যের গুণগ্রাহী ছিলেন।

খাদিচা বেগম তার সর্বশ্রেষ্ঠ অভ্যর্থনাকক্ষে অভ্যর্থনা জানাল বাবরকে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বাবরকে বসতে আদেশ দিল নিজের থেকে দূরে—একটা ছোট ছপায়া চৌকির সামনে, যেটির ছটি পায়া সোনায় মোড়া (আসল সোনা!) আর তার চকচকে মসৃণ উপরাংশে মুক্তা বসান। সোজা হয়ে বসে আছে বেগম—এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও তার চেহারা চমৎকার দেখাচ্ছে। তার পিছনে—অভ্যর্থনাকক্ষের সব দিকথেকেই দেখা যায় এমন একটা জায়গায় ঝলক দিচ্ছে এক অদ্ভুত গোলাপের ঝাড় যার ডালপালাগুলো সোনার, পাতাগুলো পান্নার আর গোলাপগুলো চুনীর। একটা সোনার বুলবুলি ডালে বসে আছে তার মুখে ধরা দারুণ ঝলক ছিটান একটা হীরা। দরজা জানলার রেশমী পর্দাগুলোতেও ছোট ছোট মণিমাণিক্য ঝলমল করছে।

খাদিচার পরনে রুপোলীঝলক তোলা কালো পোশাক, দেহে কোন অলঙ্কার নেই, কেবল উঁচু মস্তকাবরণটি যেই বেগমের দিকে সোজাসুজি তাকাবে তারই চোখ ঝলসে দেবে বিরল মুক্তার ঝলকে। চমৎকার, ঐশ্বর্যময় কিন্তু জাঁকহীন! মেয়েদের

দলটি পোশাক আশাকের জাঁক জমকে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু কর্ত্রী বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে তাঁর রুচি অন্যরকম, জাঁকজমকের চেয়ে বুদ্ধিযুক্তির দাম বেশি তাঁর কাছে।

কেমন যেন হতবাক হয়ে গেছেন বাবর, কথা আরম্ভ করতে পারছেন না আর এইসব. . . মেয়ের দলের সামনে রাজ্যের গোপন জটিল সমস্যাগুলির কথা বলেনই বা কি করে। ধীর-প্রশ্রয়ের হাসি ফুটল খাদিচা বেগমের মুখে।

'মির্জা, আপনি আমাদের আত্মীয়। আর এরা আমার পুত্রবধূরা, এরা আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে।' তারপর কেমন যেন চপলসুরে বলল, 'আরম্ভ করুন কি বলতে চান, লজ্জা করবেন না।'

'ধন্যবাদ,' অনুজ্জ্বল আলোয় মেয়েদের পাতলা সাদা ওড়নায় আধোঢাকা মুখ ও চোখগুলি আলাদা করে লক্ষ্য করা কষ্টকর। কিন্তু তাদের হেনারাঙান কোমল হাতগুলি, রেশমী পোশাক চেপে বসা উঁচু বক্ষদেশ ও সরু কোমর বলছিল যে তারা যুবতী। শোনা যায় মুজাফফর মির্জার স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ও প্রেমময়ী কারাকুজ বেগম—সে খাদিচা বেগমের কানের কাছে মুখে নিয়ে এসে কি একটা বলে আস্তে করে হেসে উঠল। খাদিচা বেগমও হেসে ফেলল, কিন্তু বেশ জোরে ও চপলভাবে, তারপর মাথা পিছনদিকে হেলিয়ে বাবরকে বলল:

'জনাব, শুনছি হীরাটের সম্ভ্রান্ত এমনকি শাহবংশের সুন্দরীদেরও চোখ পড়ছে আপনার ওপর। কিন্তু এমন শৌর্যবান শাহ্, এমন সুন্দর বীরপুরুষ, এমন প্রতিভাবান কবি নারীহীন, হারেমহীন জীবনযাপন করেন। এ কি সত্যি?'

রাঙা হয়ে উঠলেন বাবর, চোখ সরিয়ে নিলেন: এ সব কথা উঠছে কেন সবই তো উনি জানেন।

'মহামান্য বেগম, এ সত্যি,' অস্বস্তি চেপে বললেন বাবর। 'এই বোধহয় লেখা ছিল আমার ভাগ্যে।'

'মির্জা, আমার মনে হয় ভাগ্য আপনার প্রতি সদয় হবে এবার। হীরাটে থেকে যান মুজাফফর বংশধর মির্জার ভাই হয়ে। আপনি ও সে দু'জনেই তৈমুরের বংশধর। আপনার উপযুক্ত সুন্দরী বুদ্ধিমতী খুঁজে দেখা হবে হীরাটে। বিবাহ হবে. . . আর সে উপলক্ষে হবে বিরাট ভোজসভা!'

এই চাপল্যভরা ঠাট্টাতামাসার গূঢ় অর্থ আছে, বাবর! সহজেই বুঝলেন বাবর ধূর্ত ও সাবধানী হাদিচা আপাতদৃষ্টিতে এমন সব সাধারণ কথাবার্তার মাধ্যমে কোনদিকে নিয়ে যেতে চান। মুজাফফর মির্জার ভাই হওয়া মানে কেবলমাত্র তারই সমর্থক হওয়া। একসময় হাদিচা সুলতান হুসেনের পৌত্র মির্জা মুমিনের খুনীদের উৎসাহ জুগিয়েছিল। এখন বোধহয় সে বাদিউজজামানের হাত থেকে রেহাই পেতে চাচ্ছে যাতে তার ছেলে হীরাটের সিংহাসনের একচ্ছত্র অধিপতি হতে পারে। যদি বাবর

মুজাফফরের ভাই হন তো বাবর ছাড়া আর কে সাহায্য করতে পারে তার এ উদ্দেশ্যসাধনে?

'ধন্যবাদ, মহামান্যা বেগম,' চেষ্টাকৃত ধীরস্বরে বললেন বাবর, 'কিন্তু সে পথে একটা বাধা আছে. . .'

'কি সে বাধা?'

'অতিথিকে মাফ করবেন, সে সব কথা মেয়েদের শোনার উপযুক্ত নয়. . .'

মাথা নিচু করলেন বাবর। খাদিচা বেগম সোজা হয়ে বসল কেদারাতে, চোখের ইঙ্গিতে যেতে বলল মেয়েদের, তারা কুর্ণিশ করতে করতে চলে গেল।

এরপর বাবর বলতে আরম্ভ করলেন যে শয়বানীর হীরাট আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী, যে ভোজউৎসব, বিবাহাদির কথা চিন্তা করার সময় এখন নয়, মরণপণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার এখন।

'আন্দিজান থেকে খরেজম্, মার্ভ থেকে তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিশাল এলাকা শয়বানীর দখলে, অগণনীয় সৈন্যসংখ্যা সংগ্রহ করেছে সে। প্রতিটি যুদ্ধের জন্য কি প্রচণ্ড প্রস্তুতি সে চালায় তা জানি আমি। তারপর যখন তার দল নামে যুদ্ধক্ষেত্রে তখন অতি সাহসী বীর যোদ্ধাও পারে না তার সঙ্গে. . . এ আমি নিজের চোখে দেখেছি!'

নতুন নতুন যুক্তি দেখিয়ে বাবর বোঝাতে লাগলেন শয়বানী খানের যুদ্ধক্ষমতা আর নিষ্ঠুরতার কথা। শেষে খাদিচা বেগমের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল:

'সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় কি করে সে কথা বলুন, মির্জা?'

'পথ আছে কেবলমাত্র একটিই—তৈমুরের বংশোদ্ভুতদের সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে! যেখানেই আমাদের কেউ শাসন করছে তাদের সবার সৈন্যদল একত্র করে, একত্রে যুদ্ধশিক্ষা দিতে হবে তাদের যাতে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ-ষাট হাজার সৈন্যের একদল হয়। সারা শীতকাল ধরে তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে তারপর 'এক নেতৃত্বে' যুদ্ধে নামা দরকার।'

'সেই এক নেতৃত্ব দেবে কে?' সতর্ক প্রশ্ন খাদিচা বেগমের।

কাসিমবেগের দ্রুত দৃষ্টি ছুঁয়েগেল বাবরকে। তার কাছে পরিষ্কার যে এই সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠ নেতা হতে পারেন কেবল বাবরই। বাবর নিজেও তা জানেন আর চাইছেনও তা। কিন্তু যার হাতে সৈন্য, তার হাতেই তো ক্ষমতা। তাই একত্রিত সৈন্যদলের নেতৃত্ব কেউ দেবে না তাঁকে, খাদিচা বেগম ক্ষমতার ধারেকাছে ঘেঁষতে দেবে না নিজের ছেলেকে ছাড়া আর কাউকে।

তাকে খুশি করার জন্য বাবর হয়ত বলতেন: 'সে সৈন্যদলের নেতা হবেন মুজাফফর মির্জা!' (আর নিজে হবেন তার প্রধান উপদেষ্টা) কিন্তু দ্বিতীয় শাহ্ বাদিউজজামানের উজীরও সেখানে উপস্থিত। দুই ভাইয়ের বিরোধ ইতোমধ্যেই বহুদূরে গিয়ে পৌঁছেছে!

'কে সেই 'এক নেতৃত্বের' দায়িত্ব নেবে তা স্থির করবেন শাহ্ ভাইরা। ভোজউৎসব বন্ধ করা দরকার বেগম, রাজ্য প্রতিরক্ষার প্রতি সব মনোযোগ দেওয়া দরকার এখন। প্রতিটি দিন এখন মূল্যবান, মহামান্য বেগম।'

খাদিচা বেগম ফিরল হীরাটের বেগদের দিকে তাদের মতামত জানার জন্য।

জুনুনবেগ তার ঝোপড়া ভ্রূ কুঁচকিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাবরের দিকে:

'আমাদের অতিথি, মহামান্য মির্জা যে শয়বানী খানের ফন্দি-ফিকির আর তার শক্তির কথা আমাদের জানিয়েছেন এ ভাল কথা। কিন্তু আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে মাভেরান্নহরে শয়বানী জয়লাভ করলেও খোরাসানে পা দেবার সাহস যদি তার হয় তো এখানে সে বিধ্বংস হবে ঠিকই। আবার বলি, মহামান্য বেগম, আমি নিশ্চিত অকারণ দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই!'

জুনুনবেগের এই কথাগুলি খাদিচা বেগমের বেশ মনে ধরেছে বোঝা গেল।

'শয়বানীর বিধ্বংস হওয়া সম্পর্কে আপনার ভবিষ্যৎবাণী সফল হোক, মহামান্য বেগ। কিন্তু এমন কথা বলার পিছনে কোন যুক্তি আছে কি?' জিজ্ঞাসা করলেন বাবর আর বিস্মিত হয়ে ভাবলেন কত নির্বুদ্ধি আর আত্মাভিমানী হতে পারে লোকে।

'একথা আমি বলছি না মির্জা, একথা বলেছেন হীরাটের সর্বজনসম্মানিত ভবিষ্যদ্বক্তারা আর পবিত্র শেখরা।'

চোখে ভীরু অনুরোধের দৃষ্টি নিয়ে জুনুনবেগে তাকাল খাদিচা বেগমের দিকে। খাদিচা বেগম একটু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলল:

'মহামান্য অতিথিবর্গ, আমাদের হীরাটে আছেন এক প্রখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা, তাঁর নাম কুত্‌ব। এ পর্যন্ত কুত্‌ব যত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সব ফলেছে। মাননীয় জুনুনবেগ উজীর হবার পরে স্বপ্নে কুত্‌ব দেখেছেন যে শয়বানী খানের তরোয়াল ভাঙবেন আমীর জুনুনবেগ। আমাদের মাননীয় জ্যোতির্বিদরা গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান পরিমাপ করে এই ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য ঘোষণা করেছেন. . .' হাসিতে ভরে গেল খাদিচা বেগমের মুখ, বাবরের এমনকি মনে হল যে খাদিচা বেগম সোজাসুজি ব্যঙ্গ করছে 'জ্ঞানী' উজীরকে। 'এর পর আমাদের শেখরা জুনুনবেগের কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছেন প্রার্থনার মাধ্যমে পবিত্র করা এক টুকরো ফিতে, আর এখন সবাই তাঁর নামের সঙ্গে 'হিজাব্রুল্লা' কথাটি যোগ দিয়ে ডাকে।'

আরবী ভাষায় 'হিজাব্রুল্লা' কথার অর্থ হল 'আল্লাহ্‌র বাঘ' 'আল্লাহ্‌র সিংহ' অর্থাৎ 'অজেয়,' 'সদাবিজয়ী'। সমধ্বনিবিশিষ্ট আরবী শব্দের বিভিন্ন অর্থ যে হতে পারে তা ভালই জানতেন বাবর। এই উপাধিগুলিও তো সম্পূর্ণ অন্য অর্থই বলছে! বাবর তিক্ত ব্যঙ্গের সুর ধরে রাখতে পারলেন না।

'মহামান্য জুনুনবেগ যে প্রকৃতই হিজাব্রুল্লা তাতে অবিশ্বাস করার মত সাহস হবে কার! মাননীয়া বেগমও যথার্থই উল্লেখ করেছেন পবিত্র মুল্লা ও জ্ঞানী ভবিষ্যদ্বক্তাদের

কথা। সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল আমার যখন সারিপুলে আমি একা শয়বানীর বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধে নেমেছিলাম। মাননীয় কাসিমবেগও সেখানে উপস্থিত ছিলেন—মুল্লারা আর জ্যোতির্বিদরা তখন আমাদের বলতে লাগলেন: 'এই যে আটটি তারার মিলন হয়েছে এখন এ আপনার সৌভাগ্যের প্রতীক, যদি কাল যুদ্ধ আরম্ভ করেন তো আপনার জয় অবশ্যম্ভাবী!' আমাদের তাঁরা হিজাব্রুল্লা উপাধি দেননি, এমনিতেই তাঁদের কথায় বিশ্বাস করেছিলাম সাহায্য এসে পৌঁছবার অপেক্ষা না করেই যুদ্ধে নামলাম আমরা. . . হেরে গেলাম সে যুদ্ধে কারণ কেউ আমাদের সঙ্গে ছিল না,' এবার আর ব্যঙ্গের সুর নেই তাঁর গলায়। 'সেই ভুলের ফল ভোগ করে চলেছি আজ পর্যন্তও।'

খাদিচা বেগমের মুখ অন্ধকার, ঠোঁটদুটি শক্ত করে চাপা। জুনুনবেগ উদ্ধতভাবে প্রতিবাদ করল:

'মির্জা, হীরাটের ভবিষ্যদ্বক্তারা সমরখন্দের জ্যোতির্বিদের মত নয়!' হীরাটের মত এমন মহান শহরে সারিপুলের মত ভুল কেউ করবে না!'

'এ দেখি একেবারেই নির্বোধ!' ভাবলেন বাবর।

ক্রুদ্ধ উজীরকে শান্ত করার চেষ্টা করল বুরুন্দুক:

'মহামান্য জুনুনবেগ, আমাদের উচ্চসম্মানিত অতিথি কাবুলের মত অত দূর দেশের থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মঙ্গল করার জন্যই। পরিস্থিতি এখন সত্যিই বিপজ্জনক, এখন আমাদের প্রকৃতই চিন্তা করা উচিত কি করে শয়বানীর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়, দেরি করা চলে না আর।'

খাদিচা বেগম ভাবল, এখন কোন একজন উজীরের পক্ষ নেওয়া ঠিক নয়, মিষ্টি কথায় দু'জনকেই বোঝাতে লাগল:

'শ্রদ্ধেয় জুনুনবেগ, আপনার বোঝা উচিত নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয় কিছুতেই। আর আমাদের বুরুন্দুকবেগেরও ভোলা উচিত নয় যে মানুষ একের পর এক পরাজয় সহ্য করে সে বিপদকে একটু বাড়িয়ে দেখবেই। এমনি অবস্থা আমাদের প্রিয় অতিথির. . . মির্জা, অপ্রয়োজনে বেশি উৎকণ্ঠিত হবেন না: যদি শয়বানী হীরাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস করে তাহলে তার নিজের মৃত্যুই ডেকে আনবে তাতে!'

'খাদিচা বেগমের এত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও যে কি করে তোবামোদের উদ্দেশ্যে শেখদের করা ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করেন ভেবে অবাক লাগে,' পরের দিন বাদিউজ্জামানকে বললেন বাবর।

মির্জা বাদিউজজামানের হাবভাব, চোখ কুঁচকে তাকাবার ভঙ্গি মনে করিয়ে দেয় তার পিতা হুসেন বাইকারার কথা, বাদিউজজামান অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল:

'অবাক হবেন না। যাই বলুন না কেন মেয়েছেলে মেয়েছেলেই থেকে যাবে! চুলের বোঝা থাকলে কি হয়, বুদ্ধি নেই।'

'কিন্তু এই অদূরদর্শীতা বিরাট বিপদ ডেকে আনতে পারে. . .'

'কি আর করা যাবে? তাঁর ক্রুর স্বভাবের জন্যই মরতে হল আমার আদরের ছেলে মির্জা মুমিনকে!'

'সেই প্রচণ্ড ভুলের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল, জনাব,—কারণ শুনেছি সে সময় আপনার পিতা মত্ত অবস্থায় ছিলেন!'

'ভুলতে পারি না আমি, কিছুতেই পারি না. . . আমার পরলোকগত পিতার কোন অপরাধই নেই! পৌত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি, তার লেখা কবিতা কণ্ঠস্থ ছিল তাঁর. . . প্রথম প্রথম তিনি আমাকেও অত্যন্ত ভালবাসতেন! আমাকেই, একমাত্র আমাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ভাবতেন তিনি! খাদিচা বেগম সদাই পন্থা খুঁজেছেন আমাদের মধ্যে বিরোধ বাধানর। আর যখন মির্জা মুমিন তার ছেলের অর্থাৎ আমার আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল আর বন্দী হল তার হাতে. . .তখন সেই পন্থাটি খুঁজে পেলেন তিনি. . . মত্ত শাহের আদেশে তিনি তাকে বধ করেন, এর ফলে পিতার আর আমার মধ্যে সৃষ্টি করেন শত্রুতা। এর পরেই খাদিচা বেগমের ছেলে আমার ভাই মুজাফফর মির্জা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হল, আমার পরিবর্তে!. . আজকের এই পরিস্থিতিও ঐ ধূর্ত নারীরই সৃষ্টি! আমি জানি বেগম আপাতত আমাকে সহ্য করে চলেছেন, কোন সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষায় আছেন যখন আমাকে হত্যা করে মুজাফফর মির্জাকে হীরাটের একছত্র শাহ্ করবেন!'

বাবর ভাবলেন বাদিউজজামানকে জিজ্ঞাসা করবেন শয়বানী খানের কথা, কোন নতুন খবর আছে নাকি?

'খরেজম দখল করে খান ফিরে গেছে সমরখন্দ. . .'

'তার মানে এবার খোরাসানের পালা। খান এদিকে আসবে এবার,' নিশ্চিতভাবে বললেন বাবর।

'এত শীঘ্র এসে পড়বে নাকি?. . খরেজম অভিযানের পর দু'এক বছর বিশ্রাম করবে না নাকি?'

হীরাটের শাসকরা দেখছি কোন খবরই জানেন না, শত্রুপক্ষের থেকে সংবাদ এনে দেওয়ার জন্য ওঁর কি কোন চরও নেই নাকি। দুই শাহ্র অসংখ্য চর নিযুক্ত পরস্পরের বিরুদ্ধে। তৈমুরের বংশধরদের ধ্বংসকারী শয়বানী খানের সম্বন্ধে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। এই অজ্ঞানতায় আবারও বিস্মিত না হয়ে পারেন না বাবর, আবার চেষ্টা করলেন যুক্তি দিয়ে বোঝাতে বাদিউজজামানকে:

'আমি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি, জাঁহাপনা, শয়বানী খান কত সতর্ক, চতুর। খানেরচররা যে দরবেশ বা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে হীরাটে আসছে আর এখান থেকে প্রয়োজনীয় খবরাখবর যে সমরখন্দে খানকে পাঠাচ্ছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই।'

বাদিউজজামান অনুভব করল তাঁরা যে এমন নিশ্চিন্ত রয়েছেন তার প্রতি খোঁচা রয়েছে বাবরের কথায়। ঠাট্টার মাধ্যমে উত্তর দিল:

'আচ্ছা মির্জা, আপনার চররা সমরখন্দ থেকে আরো তাজা কোন খবর এনেছে নাকি?'

'বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে পিতার সমান জ্ঞান করি। আমি আপনার অতিথি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি জানি যে যারা শয়বানীর বিপক্ষে. . . তাদের নিশ্চিন্ততার সুযোগ নিতে হয় কেমন করে তা সে জানে। যখন কেউ আশংকা করে না যে সে এসে পড়বে তখন সে একটি অভিযানের পরে ক্লান্ত সৈন্যদলকে সেই দখল করা অঞ্চলে বহাল রেখে সঙ্গে সঙ্গেই অভিযানে বেরিয়ে পড়বে অন্য এক সৈন্যদল নিয়ে, যারা এতদিন বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য শক্তি সংগ্রহ করে ওঠা সম্ভব হয় না শত্রুর পক্ষে। শয়বানীর দলের এমন শক্তিশালী হওয়ার কারণ হল যে সে নিজের সব ভাইদের, সব পরিজনদের, যারা কোন না কোনভাবে তাকে সাহায্য করতে পারে, তাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছে. . . এমন বিপজ্জনক শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে আমাদের, তৈমুরের বংশধরদের সব বিবাদ ভুলে যেতে হবে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ না হই, এক সেনানায়কের অধীনে যুদ্ধ করবার জন্য প্রকৃত প্রস্তুতি যদি না নিই, তো বিপদ ঘটবে!'

'এক সেনানায়কের অধীনে? কে তা হবে, জনাব?'

এবার বাবর বুঝতে পারলেন—দুই ভাই-ই মনে মনে বলছেন, 'আমি যদি শাসক না হই তো ওকেও হতে দেব না!' আর এই যে রাজ্য যার জন্য তারা দু'ভাই কামড়াকামড়ি করছে, তা যেন না পড়ে তাদের দু'জনের বা বাবরের হাতে, যদি নিয়তির বিধান তাই হয় তো রাজ্য চলে যাক সম্পূর্ণ অন্য কোন লোকের হাতে।

'আপনারা কি যুদ্ধযাত্রা করবেনও পৃথক পৃথকভাবে?'

'তা নয় তো কি? আমাদের দু'জনেরই আলাদা আলাদা সৈন্যদল, নিজস্ব সেনানায়ক। মুজাফফর মির্জাকে বিশ্বাস করি না আমি। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে কোন রণাঙ্গণে যেতে প্রস্তুত আছি। আপনি হীরাটে থেকে যান, আমার সেনানায়ক হয়ে। যা করতে বলবেন তাই করব।'

এক্ষেত্রে দুই ভাইয়ের খুব মিল: দু'জনেই চায় যে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাবর তাঁর সৈন্যসামন্ত দলবল নিয়ে হীরাটে থেকে যান আর যখন বিপদ আসবে তখন শয়বানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন কেবল তার সঙ্গেই, ভাইয়ের সঙ্গে নয়।

হুসেন বাইকারার ছেলেদের মধ্যে এই ক্ষমতাভোগ বাবরকে মনে করিয়ে দেয় ওলাফুটো জাহাজের কথা। এমন ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজে থাকার দরকার কি তাঁর?

৪

মুল্লা ফজলুদ্দিন শেষ পর্যন্ত মনে জোর নিয়ে উনসিয়া প্রাসাদে এলেন বাবরের সঙ্গে দেখা করতে। সাধারণত দুপুরবেলার নামাজের পরে দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততায় ঢিলা পড়ে, কিন্তু আজ দেখা গেল অন্যরকম। বোঝা যাচ্ছে সৈন্যরা, দাসেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে দূরের পথে রওনা দেবার জন্য জোগাড়যন্ত্র করছে।

একটা ঢাকা বারান্দায় তাহিরের সঙ্গে দেখা হল, চিন্তিত, ব্যস্তভাব:

'আল্লাহ্‌র দোয়া আপনি এসেছেন মামা!'

'ব্যাপার কি, তাহির?'

'আপনাকে বলতে পারি: কাল ভোরবেলায় হীরাট ছেড়ে যাচ্ছি আমরা।'

'কাবুল যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু শাহ্ ভাইদের তা জানার কথা নয়,' গলা নামিয়ে বলল তাহির। 'তারা জানে. . . আমরা শীতকাল কাটাব শহরের বাইরে।'

ফজলুদ্দিন কেমন যেন চুপসে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভিযোগ করলেন:

'আবার আমাদের, অসহায়-অনাথদের ফেলে যাচ্ছ. . .'

'শীতকাল চলে গেলে, আপনিও কাবুল চলে আসুন। গতবার আপনি যখন বাবরের সঙ্গে দেখা করেন তিনি নিজেই তো আপনাকে আমন্ত্রণ জানান।'

'যাওয়া কি অতই সহজ, রে? তিরিশ-চল্লিশ দিন লাগে পথে। ছেলেবউ নিয়ে. .

বিষণ্ণমনে ফজলুদ্দিন বাবরের কাছে চললেন। প্রশস্ত বিশাল কক্ষটি যেটি আগে নবাইয়ের অভ্যার্থনাকক্ষ ছিল, তার সোনার নকশা করা দরজার কাছে প্রহরী দাঁড়িয়েছিল। তাকে বোধহয় বলা ছিল মওলানার আসার কথা। সে ভিতরে গিয়ে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে এল, তারপর দরজা খুলে ধরল ফজলুদ্দিনের সামনে।

যাঁরা সেখানে বসে বাবরের সঙ্গে আলাপরত ছিলেন তাদের মওলানা চিনতে পারলেন সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁদের মধ্যে একজন—কবি মুহম্মদ সুলতান, বছর পঁয়তাল্লিশ হবে বয়স, দাড়িগোঁফহীন মুখমণ্ডল: নবাইয়ের সঙ্গে তিনি ভালই পরিচিত ছিলেন। তাঁর একটু কাছে পায়ের ওপর পা রেখে বসে আছেন প্রখ্যাত লিপিকার সুলতান আলি মাশহাদি। বাবরের ডান দিকে বসে আছেন কামালুদ্দিন বেহজাদ ও খন্দামির।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মওলানাকে অভ্যর্থনা জানালেন বাবর। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাকীরাও উঠে দাঁড়ালেন। অর্ধচন্দ্রাকারে বসে থাকা কবিজ্ঞানীদের মাঝে একটি জায়গায় বসতে যাচ্ছিলেন স্থপতি, কিন্তু সেখানে উপস্থিত সবার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, বাবরকে বাদ দিয়ে, খন্দামির বললেন:

'আপনি আমাদের মহামান্য অতিথির দেশের লোক,' বলে তাঁকে বসিয়ে দিলেন নিজের আর বেখজাদের মাঝে, বাবরের কাছে।

খন্দামির বলতে লাগল, বোধহয় স্থপতি এসে পড়ায় সে কথা থামিয়েছিল:

'ভাগ্যের এ কি পরিহাস! জাঁহাপনা, হীরাটের শিল্পকলার এমন উন্নতি দেখে, তার প্রতিভাবান শাহ্ লোকেদের প্রশংসায় মুখর আপনি আর আমাদের দুঃখ এই কারণে যে আজকের হীরাটে আপনার মত শিক্ষিত, প্রতিভাবান শহি নেই!'

শাহ্ ভাইদের মর্যাদায় আঘাত দিতে চাইলেন না বাবর, তারা তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেছে।

'মওলানা, আমার ধারণা আজকের হীরাটের শাসকরাও আলোকপ্রাপ্ত।'

বেখজাদের রোগা, তীক্ষ্ম মুখচোখ, ছোট ছোট কোঁকড়ান দাড়ি তাঁর মুখে বেশ মানিয়েছে, একটু বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল তাঁর মুখে:

'হ্যাঁ জাঁহাপনা, এখন হীরাটে অনেক আলো,' বাবরের দিকে তাকালেন শিল্পী। 'জানেন কেন? যদি আমাদের একজন শাসক সূর্য হন তো অন্যজন তাহলে চাঁদ। হীরাটবাসীরা এখন একটি কবিতা বলে, যার মূলকথা হল: হুসেন বাইকারা ছিলেন প্রকৃত শাহ্ বহু যুদ্ধজয় করেছেন তিনি। তাঁর দুই ছেলে বসেছে দুটি সিংহাসনে। 'আমি চাঁদ,' বলে তাদের একজন, 'আমি সূর্য,' বলে অন্যজন, রাতদিন তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তাঁদের এই লড়াই দাবাখেলার লড়াইয়ের মত, তাঁরা তাঁদের পিতার মত প্রকৃত শাহ্ নন, দাবাখেলার ঘুঁটিমাত্র. . .'

'দুই ভাইয়ের শত্রুতা দাবাখেলার কথা মনে করিয়ে দেয় ঠিকই।' হাসি চেপে রাখতে পারলেন না বাবর:

'আসল বিপদ হল এই' খন্দামির, কিন্তু একটুও হাসেননি এতক্ষণ, 'এই খেলায় তাঁরা খোরাসান হারাতে বসেছেন। কিন্তু একথা তাঁদের বোঝান যাবে না কিছুতেই!'

কবি মুহম্মদ সুলতানের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল রাগে:

'বোঝান যাবে কথায় নয়—তরোয়াল দিয়ে!'

খন্দামির সন্ত্রস্ত চোখের দৃষ্টি ঘুরল দরজার দিকে। হীরাটের শাসকদের চররা একসময় নজর রাখত নবাইয়ে ওপর, হয়ত এখন তারা বাবরের কথাবার্তাও শোনার জন্য কান পাতছে।

কথাবার্তা অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য সুলতান আলি মাশ্‌হাদি তাঁর সঙ্গের চামড়ার থলিটির থেকে বার করে আনলেন একগোছা পাতা।

'আপনার দাস তার হাতের লেখায় আপনার কয়েকটি গজল এনেছে সঙ্গে।'

রেশমের মত মোলায়েম পাতাগুলি হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। প্রকৃতই তিনি অত্যন্ত দক্ষ লিপিকর: সূক্ষ্ম অক্ষরগুলিতে ফুটে উঠেছে আবেগ আর চমৎকারিত্ব। প্রথম গজলটিতে চোখ বুলালেন খন্দামির:

'দেখুন তো!' বিস্ময়োচ্ছ্বাসে বললেন তিনি, 'কি সাধারণ অথচ সুন্দর! অনেক কবিই তাঁদের ভালবাসার পাত্রীকে দেবীতে পরিণত করেন, অস্বাভাবিক কতকগুলি গুণ দেখতে পান তার মধ্যে: সে—গল্পকথার পরীও আবার প্রাণরক্ষাকারী আর হৃদয়যন্ত্রণামুক্তিদাত্রীও। আমাদের মির্জা এমন কোন অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেননি:

সারা দুনিয়ায় নিজেকে ছাড়া তো প্রাণের দোস্তকে পেলে না।
নিজের সঙ্গে মানিয়েই নাও, অনুরাগী প্রেম পেল না
নিজের গোপন ভবিষ্যতেও নিজের কাছেই রেখে যাও. . .
দুনিয়া ঘুরলে প্রিয়তমা নেই। প্রাণেশ্বরীকে পেলে না।'

'নির্ভীক কবিতা!' সপ্রশংসচোখে বেখজাদ তাকালেন বাবরের দিকে। 'ঠিক বলেছেন, জাঁহাপনা! মানুষ কেবল নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারে, নিজের ওপর নির্ভর করতে পারে!'

কবি মুহম্মদ সুলতানের ভাল লাগল অন্য একটি কবিতার বয়েৎ। আবেগ নিয়ে আবৃত্তি করলেন তিনি:

'প্রিয়ার প্রতি আমার মতো দ্বিতীয় হিয়া নেইকো।
আমার সাথে সমব্যথিনী দ্বিতীয় হিয়া নেই কো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিচুস্বরে ফজলুদ্দিন বললেন:

'আমার মনের বেদনাও তুলে ধরেছে এই বয়েৎটি. . .'

অস্বস্তি হল বাবরের এইসব প্রশংসা শুনতে:

'বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌র দোয়ায় আপনাদের মত কাব্যের গুণগ্রাহী ব্যক্তিদের সঙ্গে বসে আলাপ করতে পারলাম,' অতি কষ্টে তাঁর গলা দিয়ে বেরোল, 'যে পংক্তিগুলি আমি কোনরকমে লিখেছি সেগুলি আপনাদের ভাল লেগেছে দক্ষ লিপিকর মওলানা মাশহাদির অতুলনীয় শিল্পপ্রতিভার কারণে। যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় আপনাদের প্রত্যেককে আমি উপহার দেব বিশেষভাবে নকল করা একটি করে গজল।'

'প্রকৃত শাহর উপযুক্ত উপহার! খুশি গোপন থাকল না খন্দামিরের স্বরে।

উপহার গ্রহণ করে খন্দামির, বেখজাদ, মুহম্মদ সুলতান সকলেই কবি ও লিপিকরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য পাতাটি চোখে ছোঁয়াল যেন সেটি কোন কিছু পবিত্র, প্রিয় জিনিস। ফজলুদ্দিনের দিকে বাবর এগিয়ে গজলটি এগিয়ে ধরলেন সব শেষে:

'মওলানা, আমাদের দেশই কেবল এক নয়, আমাদের ব্যথাও এক।'

মওলানা ফজলুদ্দিন গজলটি নিয়ে চোখের কাছে ধরে আবেগাপ্লুত স্বরে বললেন:

'আমার বিশ্বাস হীরাটে লেখা এই গজলটি অতি শীঘ্রই সমরখন্দ ও আন্দিজান পর্যন্ত পৌঁছাবে। আল্লাহ্ করুন যেন আমাদের মালিক আর যারা মাতৃভূমি থেকে দূরে আছে তারা সবাই এই গজলের মাধ্যমে অনুভব করে মাতৃভূমিকে!'

'আপনার কথা যেন সত্যি হয়, মওলানা!'

কাসিমবেগকে ডাকলেন বাবর, সে সুলতান আলি মাশহাদিকে পরিয়ে দিল সোনার বোতামওয়ালা জরির চাপান।

'জাঁহাপনা,' খন্দামির বললেন, 'আপনার মহান, মঙ্গল আনয়নকারী পরিকল্পনাগুলি সফল হোক, মহান মির আলিশেরের আত্মা যেন আপনাকে চিরকাল প্রেরণা যোগান।'

সবাই যোগ দিলেন এই শুভকামনায়, তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত বুলালেন মুখে।

সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেলে স্থপতিকে সামান্যক্ষণের জন্য ধরে রাখলেন বাবর:

'হয়ত আগামী বছরে কাবুলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, মওলানা. . . যদিও একথা ঠিক যে বড় বড় নির্মাণকার্য চালানো সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে—হীরাটের তুলনায় কাবুল এখন গ্রামাঞ্চল মাত্র। কিন্তু আশা রাখি ভাগ্য আমাদের প্রতি সহায় হবে. . .'

'আপনার আমন্ত্রণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করলাম!' কুর্নিশ করলেন মুল্লা ফজলুদ্দিন।

বাবর যখন তাঁর লোকলশকর নিয়ে হীরাট শহরের বাইরের একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সূর্য পাটে বসেছে। রাস্তাটির দুধারেই চমৎকার চমৎকার বাগান। সেই সব বাগানগুলির সবুজের আড়ালে কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে টালির গম্বুজওয়ালা প্রাসাদ, কিন্তু বেশি দেখা যাচ্ছে হীরাটের অভিজাতবংশীয়দের বিশ্রাম নেবার জন্য গ্রীষ্মাবাস। হঠাৎ উঁচু দেওয়ালের ওপাশ থেকে কে যেন ছুঁড়ে দিল গোলাপফুলের একটি ছোট গোছা। একটি লাল গোলাপ এসে পড়ল তাঁর ঘোড়ার ঘাড়ের উপর, আটকে রইল সেখানে ফুলটির কাঁটাগুলি। মাথা তুলে দেখতে পেলেন বাবর দেওয়ালের ওপর দেখা দিল অল্প বয়সী একটি মেয়ের সুন্দর মুখ, উড়ন্ত পাখীর ডানার মত তার ভ্রুদুটি, মাথায় ফুলতোলা, উঁচু মস্তকাবরণ। বাবর ঝুঁকে পড়ে ঘোড়ার ঘন কেশর থেকে সাবধানে তুলে নিলেন ফুলটি, নিয়ে এলেন ঠোঁটের কাছে. . .

শরৎ গতপ্রায়: দূরে জান্দজিরগাহ পর্বতমালার চূড়াগুলিতে ইতিমধ্যেই প্রচুর পরিমাণে বরফ জমে গেছে। কিন্তু গোলাপটি এমন সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। এমন সময় এই ফুলটি ফুটে উঠেছে — এ কি অদ্ভুত নয়? ঘোড়া থামিয়ে বাবর রেকাবে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, ঘাড় উঁচু করে প্রাচীরের উপর দিকে তাকালেন। ঐ আবার দেখা

গেল মেয়েটির মুখ, এবার বাবর লক্ষ্য করলেন তার চোখদুটি কাল আর কি চঞ্চল, বুদ্ধিদীপ্ত!

এর আগেও তিনি এই রাস্তা দিয়ে গেছেন, মেয়েটি নিশ্চয়ই তাঁকে দেখে থাকবে। এবার তার দীর্ঘ আঁখিপল্লবগুলি উঠানামা করতে লাগল, লালের ছোঁয়া লাগল গালে, অদৃশ্য হয়ে গেল মুখটি, এক মুহূর্ত বাদে আবার দেখা দিল লজ্জারাঙা মুখটি — মুখে লজ্জার ছোপ লেগে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। মেয়েটি তাঁকে অভিবাদন জানাল নাকি বিদায়? কত বয়স ওর — আঠারো বোধহয়, তার বেশি নয়। কি অপূর্ব মেয়েটি!

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বাবর প্রাচীরের কাছে, কি করবেন বুঝতে পারলেন না। বাবরের দলের সঙ্গে যাচ্ছিলেন হীরাটের শহরশাসক ইউসুফ খান। সে মেয়েটিকে চিনতে পেরে বিস্ময় প্রকাশ করল:

'আরে, মহিম যে, কত বড় হয়ে গেছিস!'

এবার যেন সম্বিৎ ফিরল মেয়েটির — মুখচোখ আরো বেশি রাঙিয়ে উঠল তার, বাবরকে আর একবার দৃষ্টিশরে বিদ্ধ করে অদৃশ্য হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

বাবরের মুখচোখও রাঙিয়ে উঠল, চোখে অদ্ভুত দ্যুতি, ইউসুফ আলিবেগকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তিনি:

'কে? কে ও? বলুন, কার মেয়ে?'

'জাঁহাপনা, এটি হল সুলতান হুসেনের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি। এই মেয়েটির পিতা হুসেন বাইকারার অন্তরঙ্গ ছিলেন, আমাদের মধ্যেও বন্ধুসম্পর্ক ছিল।'

'এখন বেঁচে আছেন তিনি?'

'আছেন, কিন্তু. . . সরকারী দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয় তাঁকে।'

'কি কারণে?'

'জানি না, কিন্তু. . . শাহ্ ভাইরা ওঁর প্রতি বিশেষ সদয় নন. . . আমার তাই ধারণা। যতদূর জানি তাতে মনে হয় ওঁরা হীরাট ছেড়ে চলে যাবার আয়োজন করছেন, কান্দাহার নাকি গজনী, কোথায় যেন. . .'

আবার ঘোড়া চালালেন তাঁরা। মহিম নামে মেয়েটির থেকে ক্রমশ দূরে চলে যেতে লাগলেন বাবর। হঠাৎ ভীষণ মনখারাপ লাগল বাবরের। বিশদিন কাটালেন তিনি হীরাটে, কেন যে কেবল আজই হীরাট ছেড়ে যাবার সময় মহিমের দেখা পেলেন?

হাতে তখনও ধরা ফুলটির দিকে তাকালেন বাবর। মনে হল হাতটা যেন আপনা থেকেই চলে গেল ঠোঁটের কাছে, তারপর মাথায় রেশমী উষ্ণীষের কাছে, ফুলের সরু কিন্তু মজবুত ডাঁটিটা সেখানে জায়গা করে নিল। সাদা উষ্ণীষের উপর লাল ফুলটি সুন্দর দেখাতে লাগল।

শীতকাল কাটল ভালয় ভালয়। কিন্তু বসন্তের মাঝামাঝি শয়বানী খান তার পঞ্চাশহাজার সৈন্য মুরগাব পেরিয়ে খোরাসানের সীমান্তে এসে পড়ল। সেসময় বাদিউজজামান মির্জা ও মুজাফ্ফর মির্জা প্রত্যেকে যার যার সৈন্য আর সৈন্যাধ্যক্ষকে নিয়ে হীরাটের উত্তরে কোরাবাত আর তারনোরে দিন কাটাচ্ছিল।

উবাইদুল্লা সুলতান আর তৈমুর সুলতানের নেতৃত্বে শয়বানীর অশ্বারোহীদল হীরাটের সৈন্যদলের একেবারে কেন্দ্রস্থলে গিয়ে আঘাত করল। বাদিউজজামান আর তার ভাই তাদের অধিকাংশ বেগদের নিয়ে পালাতে লাগল কোন চিন্তাভাবনা না করেই। কেবলমাত্রই জুনুনবেগ আর্গুন একহাজার সৈন্য নিয়ে শয়বানীর বিরুদ্ধে লড়ে গেল শেষ নিঃশ্বাস পড়া পর্যন্ত যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েই, কারণ তার বিশ্বাস ছিল যে হিজাব্রুল্লা, শয়বানী খানের শেষ হবে তার হাতেই। কিন্তু খানিক পরেই উবাইদুল্লা সুলতানেরই জয় হল। জুনুনবেগকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল ঘোড়া থেকে অন্যান্য কাটামাথার সঙ্গে তার কাটামাথাটাও পৌঁছাল শয়বানীর তাঁবুতে, আর খানের ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি খেল সেটা।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে হীরাটে প্রথম এসে পৌঁছাল বাদিউজজামান, কিন্তু শহরে ঢুকল না। শহরের সামান্য দূরে একটি বাগানে থেমে ঘোড়াদের বিশ্রাম নিতে দিল তারপর সোনারূপা মণিমাণিক্য ঘোড়াগুলির পিঠে বোঝাই করে নিল। স্ত্রীপুত্ররা তার অপেক্ষা করছিল শহরের ভিতরের প্রাসাদদুর্গে। কিন্তু শত্রুর ভয়ে এমন ভীত হয়ে পড়েছিল বাদিউজজামান মির্জা যে পরিবারের লোকদের সঙ্গে নেবার কথাও ভাবল না। আদেশ দিল হীরাট যেন শহরদ্বার বন্ধ করে দেয়, হীরাট অবরোধ হোক, সে শীঘ্র ফিরে আসবে সাহায্য নিয়ে, বাঁচাবে সবাইকে। আর নিজে দক্ষিণে কান্দাহার পালিয়ে গেল।

মুজাফ্ফর মির্জা হীরাট পৌঁছাল রাত্রিবেলায় আর ভাই যা করেছিল সেও ঠিক তাই করল। বিশ্রাম করল খানিক। বাদিউজজামানের মত সেও ধনসম্পদ বোঝাই করে নিল। প্রাসাদে গেল না। প্রায় একই আদেশ দিল হীরাট শহরের দ্বার বন্ধ করে, শহরের ভিতরের দুর্গ প্রাসাদে কড়া পাহারা বসাতে আর তার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে। নিজে এদিকে পালাল পশ্চিমে আস্ত্রাবাদে।

শয়বানী যতটা প্রত্যাশা করেছিল তার চেয়েও সহজে জয়লাভ করে দ্রুত এগিয়ে চলল হীরাটের দিকে। শহরের পূর্বে প্রায় চারক্রোশ দূরে কাহ্‌দিস্তান নামে সবুজ সমতল জায়গায় ছাউনি খাটাল সে। হীরাটের শেখ-উল-ইসলাম বৃদ্ধ তাফতাজানি অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে স্থির করল যে অবরোধে আটকা পড়ে থেকে কষ্ট পাওয়ার কোন অর্থ হয় না, তাই তারা শহরদ্বারের চাবি অন্যান্য উপহারসমেত তুলে দিল শয়বানীর হাতে।

বসন্তের কাহ্‌দিস্তানের উদার প্রকৃতির কোলে বসে শয়বানী আর একটি জয়ের আনন্দে আরামে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। নতুন কোন সুন্দরীর আলিঙ্গনসুখ উপভোগ করার ইচ্ছা জাগল মনে। সবচেয়ে বেশি করে মনে হতে লাগল কারাকুজ বেগমের কথা— মুজাফফর মির্জার প্রাণ প্রিয়া বেগম হীরাটের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মেয়ে। তাশখন্দে আর আন্দিজানে যাদের ডাকা হত কারাকুজ বেগম তাদের রূপের প্রমাণ পেয়েছে খান; হীরাটের এই কালো আঁখি মেয়েটি কেমন হতে পারে?

খলিফা ও ইমাম শয়বানী খান কোনরকম বলপ্রয়োগ করতে চায় না, আল্লাহ্ সহায় হোন! তার বরাবরের অভ্যাসমত বিশবছরের বেগমের প্রতি তার প্রেমের কথা প্রকাশ করে একটি ছোট্ট গজল লিখল; খানের চর কবি মুহম্মদ সালেহ্ সেটি পৌঁছে দিল বেগমের হাতে। কারাকুজ বেগম মুজাফফর মির্জার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ছিল তার ভীরুতার জন্য, খানের গজল সে বেশ খুশিমনেই গ্রহণ করল। সে আর খাদিচা বেগমের অন্যান্য পুত্রবধূরা হীরাটের সবচেয়ে সুরক্ষিত প্রাসাদ ইখতিয়ারউদ্দিনে আশ্রয় নিয়েছিল। কারাকুজ সেখান থেকে পালিয়ে শহরের বাইরে তার পিতার কাছে গিয়ে পৌঁছল সেখানে তাকে স্নান করিয়ে, বিবাহের সাজে সাজিয়ে খানের পাঠান চমৎকার গাড়িতে বসিয়ে কাহ্‌দিস্তানে নিয়ে যাওয়া হল।

সন্ধ্যার সময় হীরাটের শেখ-উল-ইসলাম আর প্রধান কাজীকে ডেকে পাঠান হল শয়বানীর ছাউনিতে।

ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন পংক্তি লেখা রেশমী গালিচাপাতা একটি ঘরে তাদের সঙ্গে দেখা করল খান, আজ তাকে অন্য দিনের চেয়ে বয়স কম দেখাচ্ছে। মুল্লা আবদুরহিম হীরাটের অতিথি দু'জনকে জানাল যে আজ খানের সঙ্গে কারাকুজ বেগমের বিবাহ স্থির হয়েছে।

'আজই?' হতবুদ্ধি হয়ে শেখ-উল-ইসলাম কাজীর দিকে তাকাল।

আইনত কারাকুজ বেগম এখনও মুজাফফর মির্জার স্ত্রী। তার স্বামী তাকে ফেলে গেছে পাঁচদিনও হয়নি। সবাই ভাল করেই জানে যে মুসলমান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের পরে তিনমাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আবার বিবাহ করতে পারে না। শরীয়তের এই আইন অত্যন্ত কঠোর!

শেখ-উল-ইসলাম নিচু হল, যে গালিচার উপর খান দাঁড়িয়েছিল চুম্বন করল সেখানে, শরীয়তের আইনের কথা বলতে যাবে, এমন সময় খান তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল:

'আমাদের শরীয়ত শেখাতে আসবেন না। বেগমের কাপুরুষ স্বামী চার মাস আগেই তাকে তিন তালাক দিয়েছে। আর আপনি বলছেন তিন মাস! আপনারা সর্বজ্ঞানী, একথা জানেন না নাকি?'

খানকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখে শেখ-উল-ইসলাম ভয়ে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল

গালিচার উপর, নিজের লম্বা সাদা দাড়িতে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে গিয়ে আবার চুম্বন করল গালিচাটি:

'জানি, মহান খান।'

'জানি!' কাজীও গালিচা চুম্বন করে বলল।

তারা সত্যিই জানত যে চার মাস আগে মুজাফফর মির্জা স্ত্রীর উপর রাগ করে কোন চিন্তাভাবনা না করে চীৎকার করে তিন তালাক দেয় তাকে। কিন্তু তিন মাস পরে কারাকুজের সঙ্গে মিটমাট হয়ে যায় তার, সে উপলক্ষে শেখ-উল-ইসলাম ও কাজী স্বামী-স্ত্রীর দোয়াকামনা করে প্রার্থনা করেন। কিন্তু ক্ষিপ্ত খানকে সে কথা বলা মৃত্যুরই শামিল।

সেইজন্য খান ও কারাকুজ বেগমের আইনসম্মত নিকাহ্ উপলক্ষে তাদের দোয়াকামনা করে প্রার্থনা করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল শরীয়তবিদরা. . .

. . . পরদিন সকালবেলায়ই তার ছাউনিতে ডাক পড়ল সেনাপতি উবাইদুল্লা সুলতানের, মনসুর বখশির আর সভাকবি মুহম্মদ সালিহ্ ও মুল্লা বিনইর।

প্রথমেই ভ্রাতুষ্পুত্র উবাইদুল্লাকে কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করল:

'ইখতিয়ারউদ্দিন দুর্গ দখল হয়েছে কিনা?'

'শীঘ্রই দখল হবে মহামান্য খান!'

'তোকে এত বড় একটা সৈন্যদল দিয়েছি তাও তুই দখল করতে পারছিস না ঐ দুর্গটা যেখানে লুকিয়েছে ঐ ভ্রষ্টা মেয়েছেলেটা? নাকি আমাকে নিজেকেই যেতে হবে দুর্গদখলে?'

সবাই বুঝল যে কিছু একটা ঘটেছে রাতের বেলায়। বিশবছরবয়সী উবাইদুল্লা সুলতান তার বিশাল দেহটার আধখানা নুইয়ে দিল।

'মাননীয় খান, দুর্গ দখল করব আজই! এখনই ঝটিকা আক্রমণ আরম্ভ করব!'

'ঝটিকা আক্রমণ!' ভেংচি কেটে বলল শয়বানী, 'তোর সৈন্যদল ইতোমধ্যেই সব ফসল মাড়িয়ে নষ্ট করেছে। হীরাটে আমরা অতিথি হয়ে আসিনি! আমাদের নিজেদেরই কাজে লাগবে ফসল। বাগানগুলোকেও বাঁচাতে হবে! নিজেই তো খাবি ফলগুলো!' একথার সঙ্গে কোন যোগসূত্র নেই এমন একটা কথা বলে চেঁচিয়ে উঠল খান আবার: 'তৈমুরের বংশধরদের মূল পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতে হবে আমাদের!'

'যো হুকুম, জনাব!'

উবাইদুল্লা সুলতান চলে যাবার সময় শয়বানী বলল:

'যদি আজ দুর্গ দখল করার মনস্থ করিস তো মনসুর বখশিকে সঙ্গে নিয়ে যা। বেচারা আবার বউহারা হয়েছে। দুর্গ দখল করলে দুর্গের মালকানীকে তুলে দিবি মনসুর বখশির হাতে।'

আরো মোটা হয়েছে মনসুর বখশি, অতিকষ্টে নীচু হয়ে কুর্নিশ করে বলল:

'আপনার সেবায় লাগলে ধন্য হব, জাঁহাপনা। আপনি ঠিকই বলেছেন: সমরখন্দের মেয়ে জুখরা বেগম মারা যাওয়ার পর থেকেই একা একা কষ্ট পাচ্ছি আমি!'

'তুই বখশি কেবল নিজের লাভের কথাই চিন্তা করিস না যেন! হীরাটে সবচেয়ে বেশি ধনসম্পত্তির অধিকারিনী হলেন খাদিচা বেগম। শুনেছি যে তাঁর আদেশ মত তৈরি করা হয় একটা সোনার ফুল, তার ডাঁটাটা পেটাইকরা সোনা দিয়ে তৈরি আর পাতাগুলো পান্নার। ফুলটির উপর বসে আছে একটা বুলবুলি, সেটিও সোনার তৈরী আর তার ঠোঁটে ধরা একটা বড় হীরার টুকরো।'

'মহামান্য খান, ধরে নিন ওটি আপনার!' বলে মনসুর বখশি নিজের বুকে একটা ঘুঁষি মারল। 'বেগমের যত ধনসম্পত্তিও — আপনার! আর আমার কেবল তাকে পেলেই চলে যাবে!'

খানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বেশ খুশি মনে যেতে বলল উবাইদুল্লা সুলতান আর মনসুর বখশিকে।

ওদিকে মুহম্মদ সালিহ্ আর মুল্লা বিনই তখনও নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। খান জরির লাল আসনে পায়ের উপর পা রেখে বসে আছে নীরবে। তারপর মৃদু হেসে রাগতভাবে মুহম্মদ সালিহ্‌কে বলল:

'তুমি, কবি, হীরাটের প্রশংসা করতে অর্নগল। তোমার হীরাট দেখছি যতসব চরিত্রহীন, লম্পটের জায়গা, লজ্জাবিবেক সব জলাঞ্জলি দিয়েছে!'

মুহম্মদ সালিহ্ অনেকক্ষণই আন্দাজ করেছেন গতকাল রাতে খানের কি অভিজ্ঞতা হয়েছে। নিজের অক্ষম পৌরুষের জন্য নিজের ওপরই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে শয়বানী আর সেই রাগটা মিটাতে চাচ্ছে অন্যের উপর দিয়ে। কে আর খানের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবে? আল্লাহ্ রক্ষা করুন! কবি অন্য কথা আরম্ভ করল:

'মহান খলিফ! ঐ ঘৃণ্য তৈমুরের বংশধররা হীরাটকে পাপে ভরিয়ে দিয়েছে। আপনি. . . আপনিই তো যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেছেন আর তাদের সত্তা জয় করেছেন আপনার ধর্মবিশ্বাস আর সততা দিয়ে, যা হীরাটবাসীদের কাছে মশাল হয়ে আলোকিত করবে জীবনের প্রকৃত পথ।'

'কথায় তুমি দেখি খুব দক্ষ! তবে একথা বলছ না কেন যে হীরাটবাসীদের চরিত্র নষ্ট করেছে কবিরাও? তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি ছিল না যে তৈমুরের বংশধরদের গুণগান করেছে আর তার জন্য থালাভর্তি সোনার মোহর উপহার পেয়েছে?'

'ছিল, সর্বজ্ঞানী আলমপনা, ছিল. . . এমন ধরনের কবিরাই মওলানা বিনইকে হীরাট থেকে বিতাড়িত করেছে!'

বিনইর দিকে তাকাল শয়বানী:

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, জাঁহাপনা!' কেমন যেন সতর্কভাবে কুর্ণিশ করল বিনই, মনে হল খানের।

'তাহলে,' গলা তুলে বলল খান, 'তাহলে মওলানা বিনই হাতে তুলে নিন ন্যায় আর যথার্থ প্রতিশোধের তরবারি! আমার বীর সৈন্যদের থেকে একশত জন সৈন্য নিন। মুসোদারা* হবে! ঐ নাকউঁচু সোনার লোভে পাগল তৈমুরের বংশধরদের প্রশংসা করেছে যে সব কবিরা তাদের ধনসম্পত্তি দখল করা হবে। তাদের সমস্ত সোনা দখল করে নিয়ে কোষাগারে জমা দিতে হবে! এর পরে হয়ত বুদ্ধি খুলবে ওদের, পাপের পথ থেকে ফেরা সহজ হবে তাদের পক্ষে!'

হতবুদ্ধি হয়ে গেল মওলানা বিনই। হীরাটের কোন কোন কবি একসময় তাকে সহ্য করতে পারত না, কিন্তু তা বলে সে সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে তাদের বাড়ীতে তল্লাশি চালাতে চায় না। এমন কাজ — তার জন্য নয়, তার বিবেক সায় দেয় না। কিন্তু নিজের অনিচ্ছার কথা খানকে জানাবেই বা কি করে?

মুল্লা বিনই নম্র হলেও ভীরু ছিল না।

'মহামান্য খান, এত বড় দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ!. . কিন্তু, কিন্তু ভয় হয়. . .'

'কি?'

'. . . ভয় হয় পারব না, আলমপনা, জীবনে কখনও তরবারি হাতে ধরিনি। পঞ্চাশের ওপর বয়স হয়েছে. . . আপনার হুকুম আপনার দাসের চেয়ে শতগুণ ভাল করে পালন করতে পারবেন যুদ্ধবাজ, অত্যুৎসাহী মুহম্মদ সালিহ্! আমি যতটা শক্তি আছে তা নিয়ে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত!'

কিন্তু মুহম্মদ সালিহ ও এমনধরনের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে বিশেষ আগ্রহী ছিল না আর চালাকিতে সেও কম যায় না:

'মওলানা, সানন্দে এ দায়িত্ব আপনার হাত থেকে নিতাম যদি হীরাটের কবিদের তেমন ভালো করে জানতাম যেমন আপনি জানেন!'

শয়বানী এক চীৎকারে থামিয়ে দিল তাদের এই চালাকির লড়াই, চোখ জ্বলজ্বল করছে তার, বলল:

'আপনার নিজের আচরণের কথা চিন্তা করে দেখুন মওলানা বিনই! ছ'বছর ধরে কে আপনাকে খাইয়েছে, পরিয়েছে? আমরা আপনাকে ঘোড়া দিয়েছি — নিয়েছেন! চাপান উপহার দিয়েছি, তা পরেছেন। অর্থ ও বাসগৃহ দেওয়া হয়েছে — তাও প্রত্যাখ্যান করেননি। আর যখন এক কাজের ভার দেওয়া হল তখন প্রত্যাখ্যান করছেন?'

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে খান। মওলানা বিনই বুঝল প্রত্যাখ্যান করে আর একটি কথা

* মুসোদারা — বাজেয়াপ্ত করা।

বললেই তক্ষুনি খান জল্লাদ ডেকে অকৃতজ্ঞের মাথাটা কেটে ফেলতে আদেশ দেবেন। ভাল ভালয় কাজটি করার দায়িত্ব মাথা পেতে নেওয়াই ভাল. . .

শীঘ্রই হীরাটবাসীরা পরস্পরকে বলতে লাগল যে প্রখ্যাত কবি বিনই অস্ত্রসাজে সজ্জিত সৈন্যসামন্ত নিয়ে অন্যান্য কবিদের বাড়ি ঘুরছে, আর সৈন্যরা সোনার খোঁজে তছনছ করছে সে সব বাড়িঘর, যে সোনা পাচ্ছে তা জমা দিচ্ছে খানের কোষাগারে নিজেরাও যথেষ্ট নিচ্ছে।

শয়বানী খানের ডানহাত তার পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক উজীর মুল্লা আবদুরহিম হীরাটের শিক্ষিতসমাজের লোকদের কোষ খালি করার অন্য এক উপায় খুঁজে বার করল। হীরাটের সীমান্তে যে সব জিনিস বিজয়ীদের হাতে পড়ে তার মধ্যে ছিল কিছু ভেড়ার পাল। মুল্লা আবদুরহিম আদেশ দিল প্রতিটি পালের থেকে ষাটটি করে ভেড়া তাড়িয়ে হীরাটের কিপচাক প্রবেশপথের কাছের বাজারে নিয়ে যেতে। তারপর শহরে পাঠাল কিছু সৈন্যকে যারা জনাদশেক কবি ও জ্ঞানী লোককে জড় করে সেই বাজারে আসতে বাধ্য করল, তাদের মধ্যে ছিল ঐতিহাসিক খন্দামির যিনি তৈমুরের বংশধরদের শাসনকালের গুণগান করেছেন, মওলানা ফজলুদ্দিন — বাবরের অন্তরঙ্গ বলে যিনি পরিচিত, কবি সুলতান মুহম্মদ — যিনি হুসেন বাইকারার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছেন। দ্রুতগতি ঘোড়ায় চড়ে উজীর মুল্লা আবদুরহিম নিজেই এসে হাজির হল বাজারে। তার অন্তরঙ্গদের মধ্যে একজন খন্দামির ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বলল:

'মহান উজীর, মুল্লা নিজামুদ্দিন আবদুরহিম এই ভেড়াগুলিকে বিক্রী করতে চাচ্ছেন কেবল আপনাদের কাছেই!'

সঙ্গীদের দিকে তাকালেন খন্দামির ('আরে এতেই যদি ব্যাপারটা মিটে যেত!') তারপর উজিরকে কুর্নিশ করে উপস্থিত সবার পক্ষ থেকে বললেন:

'কিনব, কিনব আমরা সানন্দে। দাম বলুন।'

লোকটি সাড়ম্বড়ে বলতে আরম্ভ করল:

'এই ভেড়াগুলি পবিত্র হয়েছে মহান উজীরের নিশ্বাসে যিনি বহুবার এদের কাছে এসেছেন — তার মানে এগুলি পবিত্র ভেড়া। তোমরা তৈমুরের বংশধরদের সেবা করে ধর্মের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছ। আশা করি: এই ভেড়াগুলির মাংস খেয়ে তোমরা পাপের পথ থেকে ফিরে আসবে! তাই প্রতিটি ভেড়ার দাম ছশো' দিনার!'

ছশো' দিনার দিয়ে কেনা যায় দশটি ভেড়া। কিন্তু মহান উজীরের নির্দিষ্ট দামে ভেড়া না কিনলে উজীর ক্ষিপ্ত হবেন এবং তার জন্য নিষ্ঠুর শাস্তি পেতে হবে।

মুল্লা ফজলুদ্দিনের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল না, তিনি এই অত্যাচারীদের বিবেকবুদ্ধি জাগাবার চেষ্টায় বললেন:

'হুজুর, আমরা এই সেদিন দিলাম সাধারণ কর আর পরাজিতদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ কর. . .'

কবি সুলতান মুহম্মদের মুখে ফুটল ব্যঙ্গের হাসি:

'আরে মওলানা, শুনলেন তো — এ হল বিশেষ ধরনের ভেড়া, মহান উজীরের পবিত্র চোখের দৃষ্টি পড়েছে এদের উপর! আর যা পবিত্র, তার দামও দশগুণ বেশি!'

এই কথায় সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের ছোঁয়া ধরতে পারল মুল্লা আবদুরহিম, ক্ষিপ্ত হয়ে সৈন্যদের আদেশ দিল: 'এদের প্রত্যেককে দশটা করে ভেড়া দাও! . . উদ্ধত! নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে সব! প্রাচুর্য আর বিলাসে ভেসে গেছে. . . আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে আনতে হবে এদের. . . নিজেরাই ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে যাক, সাহায্য করার দরকার নেই! আর তোমরা — ওদের সঙ্গে সঙ্গে যাও ওদের বাড়ি, ভেড়াগুলোর দাম নিয়ে আসবে ওদের থেকে। যদি না দেয় দাম তো মুসোদারা হবে ওদের ধনসম্পত্তি আর ওদের নিজেদের জিন্দান (কয়েদ) হবে!'

উবাইদুল্লা সুলতানের দেড়হাজার সৈন্য ইখতিয়ারউদ্দিন দুর্গ ঘিরে বসে আছে দশদিন হল ইতোমধ্যে। কিন্তু দুর্গ দখল করা অসম্ভব — দুর্গের প্রাচীরের উপর পর্যন্ত তীর গিয়ে পৌঁছচ্ছে না আর মই তো দূরের কথা লোহার ফটকে কামানের গোলা ছোঁড়া হল তাতেও কিছু হল না। তখন সুড়ঙ্গ খোঁড়া আরম্ভ হল. . .

এদিকে সারা হীরাট শহরে নামল স্তব্ধতা (যা কিছু লুঠ করা যায় দক্ষহাতে দ্রুত লুঠ করা হয়ে গেল)।

শয়বানী খান কাহ্‌দিস্তান থেকে বোগি জাহানোরোতে এসে উঠেছে, হীরাটের প্রখ্যাত শিল্পী, কবি ও জ্ঞানীদের ডেকে পাঠাল সে নিজের কাছে। মুহম্মদ সালিহ্‌ শিল্পকলা বিষয়ে পরামর্শ দিত খানকে, কয়েকবার খানের কাছে ডেকে পাঠিয়েছে বেখজাদকে। বেখজাদের আঁকা হুসেন বাইকারার প্রতিকৃতিগুলি তাঁকে কত মহিমান্বিত করেছে। এখন নিজের মহিমা বাড়ানোর জন্য শিল্পীর প্রতিভার সদ্ব্যবহার করতে চাইছে সে।

শিল্পীর অনুরোধে খানকে বসান হয়েছে উজ্জ্বল লাল রংয়ের জরির আসনে, পিঠ ঠেসে দিয়েছে খান কালো মখমলের বালিশে। তার কোমরে বেঁধে দেওয়া হয়েছে সোনার তৈরি সরু কোমরবন্ধ আর তার সামনে রাখা হয়েছে সোনার মলাট বাঁধা একটি ছোট্ট খাতা, কালি ও কলম। আর তার কাছেই — খানের ভয়ঙ্কর চাবুকটা।

বেখজাদ তাঁর ত্রিশবছরের শিল্পীজীবনে কম দেখেননি রাজা — বাদশাহ্‌, তাই ভালো করেই জানেন যে তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কেবল প্রশংসা আর স্তুতিবাক্য বলতে হয়। তাই বললেন:

'এই দাস আপনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারত রণাঙ্গনে খোলা তরবারি হাতে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু আপনি যে দক্ষ সৈন্যপরিচালক তা সবাই জানে। এখন দুনিয়ার সবার জানা উচিত আপনাকে মহান খলিফ হিসাবে যিনি বহুবছর মাদ্রাসাতে কাটিয়ে

জ্ঞানে এযুগের অন্যান্য সব ইমামকে ছাড়িয়ে গেছেন। সেই কারণেই আপনার গোলাম আপনার প্রতিকৃতি আঁকতে চাচ্ছে পবিত্র কোরান আর সোনার কলম হাতে!'

'ঠিক আছে, আমি রাজী,' উত্তর দিল খান।

বেখজাদ যখন প্রতিকৃতি আঁকা শেষ করলেন শয়বানী তখন তার অন্তরঙ্গদের ডাকল সেটি দেখাবার জন্য। মুল্লা আবদুরহিম ছবিটি দেখে খানের দিকে তাকাল, অপরিসীম বিস্ময়ের ছাপ ফুটল তার মুখে:

'ঠিক হুবহু আপনার মত, জাঁহাপনা!'

হ্যাঁ প্রতিকৃতিটি দেখলে বোঝা যায় শয়বানী অনেক কিছু দেখেছে জীবনে, অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ মুখে। অজ্ঞ লোকের কাছে মনে হতে পারে যে প্রতিকৃতির লোকটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর শিল্পী শ্রদ্ধাপোষণ করে তার প্রতি। কিন্তু মুহম্মদ সালিহের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল যে আসনটির ওপর বসে আছে খান সেটির রঙ যেন রক্তছোপান লাল আর মনে হচ্ছে যেন কানায় কানায় রক্তভরা একটা গর্তের ওপর বসে আছে খান। সোনার সরু কোমরবন্ধের প্রান্তটি নেমে এসেছে যেন ঘনখয়েরী রংয়ের মাথাওয়ালা হলুদ রংয়ের একটা সাপ, খানের পায়ের উপর দিয়ে উঠে গেছে, যেন এখুনি ছোবল বসাবে বলে প্রস্তুত। পিঠের বড় কালো বালিশটা যেন অশুভ শক্তির প্রতিমূর্তি।

সত্যি, রঙ বেছে নেওয়া হয়েছে অত্যন্ত দক্ষতায়। সে রঙগুলি অনেক কিছুই জানাচ্ছে, কিন্তু মুহম্মদ সালিহ্ ঠিক বুঝল তাদের গোপন কথা, বুঝে ভয় পেয়ে গেল। যদি এই রংগুলির লাল, কালো, হলুদ-খয়েরী রংয়ের প্রকৃত তাৎপর্য ধরে ফেলে খান? তাহলে বেখজাদকে আর সে নিজে বেখজাদকে এনেছে বলে তাকেও আর আস্ত থাকতে হবে না!

মুহম্মদ সাহিল্ ব্যস্ত হয়ে উঠল:

'পয়গম্বর মুহম্মদ সবুজ রং ভালবাসতেন। শিল্পী তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছে যে আমাদের মহান খলিফও সবুজ রঙ ভালবাসেন দেখুন, মহান খানের অঙ্গে সবুজ রঙয়ের পোশাক। যে দেওয়ালে খলিফ পিঠ রেখেছেন সে দেওয়ালটিও সবুজ রঙয়ের।'

'এ. . . হুম. . . ভাল কথা,' শেষে গম্ভীরভাবে বলল খান। 'কিন্তু মওলানা বেখজাদের আঁকা অন্যান্য প্রতিকৃতি আমরা দেখেছি. . .'

শয়বানী খান বলতে চাচ্ছে হুসেন বাইকারার সেই প্রতিকৃতিটির কথা যেখানে সিংহের মত করে দেখান হয়েছে তাকে। বেখজাদের আর একটি ছবিতে আছে হুসেন বাইকারা অভিযানে রওনা হচ্ছেন আর যেন আকাশ, মেঘ, পাহাড় সবকিছু তাঁর সঙ্গে যেতে চাচ্ছে। প্রতিকৃতিতে যাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার বিশেষত্বের বিশেষ দিকটিই তুলে ধরা হয়েছে সেখানে! আর এটি? বেখজাদ তৈমুরের বংশধরদের এত

উঁচুতে তুলে তাকে শয়বানীকে, কেমন যেন. . . কেমন যেন সাধারণ করে এঁকেছে।

খানের মনের ভিতরে এই জটিল চিন্তাধারাগুলি ফুটে বেরোবার জন্য আকুলিবিকুলি করছে।

'তুলি দেখি!' শিল্পীকে বলল খান, সবাই এবার বুঝল যে খান কোন কারণে অসন্তুষ্ট।

বেখজাদ এগিয়ে দিল একটি ছোট বাক্স যাতে ছোট ছোট পেয়ালায় ঢালা বিভিন্ন রঙয়ের মধ্যে ডুবান রয়েছে তুলিগুলি। শয়বানী তাড়াতাড়ি করে তুলে নিল ঘন খয়েরী রঙমাখান তুলিটি। বুখারার মাদ্রাসাতে থাকার সময় অঙ্কনবিদ্যা সামান্য শিখেছিল সে, তুলি ধরতে জানে।

মন দিয়ে নিজের ছবিটা দেখতে লাগল খান — কোনখানটা ঠিক করে দেওয়া দরকার? আরে, হ্যাঁ — এই যে দাড়িগোঁফ বড় পাতলা দেখাচ্ছে, এজন্যই তাকে এমন ফালতু, সাধারণ লোক মনে হচ্ছে।

'দাড়িটা আরো ভালো করে আঁকতে হবে!' বলে শয়বানী দাড়িটা রঙ করতে লাগল।

কিন্তু তুলিতে বড় বেশি রঙ মাখা ছিল, তাই দাড়িটা মনে হতে লাগল যেন এক টুকরো পশমী কাপড়। বেখজাদের মুখ থেকে তার অজান্তেই বেরিয়ে এল একটা যন্ত্রণার চীৎকার যেন তার একটা দাঁত উপড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিল্পীর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে মুহম্মদ সালিহ্ তক্ষুনি বলে উঠল:

'অহো! মহান খানের তুলির ছোঁয়া পেয়ে প্রতিকৃতিটি আরও সুন্দর হয়ে উঠল!' তারপর বেখজাদের দিকে ফিরে যোগ দিল, 'মওলানা, এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: আপনার আঁকা প্রতিকৃতিটি ছুঁয়েছেন স্বয়ং মহান খলিফ, দ্বিতীয় সিকান্দর, আর দেখুন কেমন ঝলক ফুটল! এ সম্বন্ধে যুগের পর যুগ ধরে বলতে থাকবে লোকে!'

'কিছু-ছু হয়নি! সব নষ্ট করে দিল. . . অত্যাচার,' ভাবলেন বেখজাদ, কিন্তু কবির ফোলান ফাঁপান স্তুতিবাক্য শুনতে শুনতে তাঁর মাথায় অন্য এক চিন্তাধারা খেলে গেল, 'ঠিকই. . . লোকে ভুলে যাবে না খানের কথা, তারা হাসাহাসি করে পরস্পরকে বলবে খান কেমন করে নিজের কানের কাছে পশমীকাপড়ের টুকরো লাগিয়েছে. . . যথেষ্ট হয়েছে, আগুন নিয়ে খেলা করা আর উচিত নয়! মুহম্মদ সালিহ্ ছাড়া আর কেউ যে অমন সব রঙ বেছে নেওয়ার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি এই রক্ষা!'

বেখজাদ খানকে কুর্নিশ করে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন:

'শিল্পীর আঁকা, আপনার দাসের আঁকা এই প্রতিকৃতিটি কোন শিল্পীর হাত ছোঁয়নি, ছুঁয়েছেন স্বয়ং খলিফ আমাদের পয়গম্বরের স্থানাধিকারী তাতে আমার আনন্দ আকাশ ছুঁয়েছে।'

'ধন্য আপনি!' শিল্পীর প্রতি খানের করুণাবর্ষিত হল।

'বেশ হয়েছে!' মুখের ওপর লাগান পশমী কাপড়ের টুকরোটার দিকে আর একবার তাকিয়ে মনে মনে বললেন বেখজাদ।

৬

খাদিচা বেগম সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিল যাতে সমরখন্দের শাসক সুলতান আলি মির্জার মাতৃদেবী জুখরা বেগমের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা যেন না ঘটে তার ভাগ্যেও, স্ত্রীজাতির প্রতি শয়বানীর নিষ্ঠুরতা ও ধূর্ততা জানা আছে খাদিচা বেগমের। সেইজন্যই সে এমন মজবুত ইখতিয়ারউদ্দিন দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু শয়বানীর সৈন্যদলের সঙ্গে পারবে কি করে। ষোলদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পর পতন ঘটল দুর্গের।

উবাইদুল্লা সুলতানের দলের সৈন্যেরা দরজাগুলি ভাঙতে ভাঙতে অন্দরমহলে গিয়ে পৌঁছাল, হঠাৎ সেখানে বেরিয়ে এল স্বয়ং খাদিচা বেগম, চমৎকার সাজে সজ্জিতা, উঁচু মস্তকাবরণ আর তার উপরে জ্বলজ্বল করছে একটি বিরাট মুক্তা। এমন রাজকীয় আভিজাত্যে ভরা মহিলাকে সামনে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল ঘর্মাক্ত সৈন্যেরা, তরবারি নামিয়ে নিল তারা। ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে গেল খাদিচা বেগম, সৈন্যরা সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল, খাদিচা বেগম জানাল যে সে সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

সৈন্যরা তাকে বাইরে নিয়ে গেল যেখানে ঘোড়ার পিঠে বসেছিল উবাইদুল্লা সুলতান। দাসীপরিবৃতা খাদিচা বেগম সামান্য নিচু হয়ে অভিবাদন জানাল তাকে, ধীরে ধীরে বলল:

'ভাগ্যের নির্দেশে আমরা আপনার হাতে বন্দী, আমার অনুরোধ আমাকে বাদশাহ্ শয়বানী খানের কাছে নিয়ে যাওয়া হোক!'

উবাইদুল্লা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল মনসুর বখশির দিকে, বিদ্রূপের হাসি ফুটল তার মুখে:

'আমাদের বাদশাহ্ আপনাকে কিছু বলতে আদেশ দিয়েছেন।'

'বলুন, সুলতান!'

উবাইদুল্লা সুলতানের লোকদের মধ্যে ছিল মাথায় সাদা পাগড়ীবাঁধা এক ইশান। উবাইদুল্লা ইঙ্গিতে মনসুর বখশি ও ইশান ঘোড়া থেকে নামল। মনসুর বখশির মাথায় পাগড়ী, জামার গলার কছে জরির কাজ, পায়ে লালরংয়ের উঁচু জুতো, চমৎকার বরের বেশ। সাত-আটজন জোয়ান পুরুষ যেন বরের বন্ধু এমনিভাবে তাকে ঘিরে ধরল।

এবার উবাইদুল্লা সুলতান সাড়ম্বরে বলল খাদিচা বেগমের উদ্দেশ্যে:

'মহান ইমামের আদেশে মনসুরবেগের সঙ্গে আপনার নিকাহ্ দেব আমরা!'

'বেগম যেন জানতেন, তাই এমন সাজগোজ!' বন্ধুদের মধ্যে একজন জোরে হেসে উঠল।

মনসুর বখশির কালো দাগেভরা মুখ, তার মোটা কুৎসিত চেহারার দিকে তাকিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠল খাদিচা বেগম।

'আমি. . . আমি নিজে কথা বলতে চাই্ বাদশাহ্র সঙ্গে. . .'

'আরে, অত সময় নেই তাঁর. . .'

'কিন্তু আমিও রাজবংশের মেয়ে, আমাকে অপমান করতে পারেন না আপনারা।'

'ভ্রষ্টচরিত্র লোকদের শাস্তি শুভ কাজ!'

'সুলতান, আপনারও নিশ্চয়ই মা আছেন। মায়ের বয়সী বলেও অন্তত প্রয়োজনীয় সম্মান দেখান আমাকে. . .'

'আমার মা এমন নীচ পাপকাজ করেননি আপনার মত। কোন ঠাকুর্মাই বা নিজের নাতিকে মেরে ফেলতে পারে? রক্তপিপাসু খাদিচা বেগম মুমিন মির্জার রক্ত বইয়েছে!'

খাদিচা বেগমের গর্বিত টানটানভাব উধাও হয়ে গেল, ঝুঁকে পড়ল, হাতগুলি নির্জীব হয়ে ঝুলতে থাকল।

তখন উবাইদুল্লা সৈন্যদের আদেশ দিল:

'একে অন্দরমহলে নিয়ে যাও. . '

. . . বিবাহের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পরেই মনসুর বখশি হারেম থেকে দাসীদের চলে যেতে বলল, কেবলমাত্র সেই রইল খাদিচা বেগমের কাছে।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে, গভীর রাত পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল বেগমের আকাশভেদী চীৎকার, কান্না. . .

মাঝরাতে খাদিচা বেগমকে ঠেলে নিয়ে চলতে চলতে হারেম থেকে বেরিয়ে এল মনসুর বখশি। অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে বেগম। চাঁদের আলো ভরা দুর্গের উঠান দিয়ে চলল তারা।

চলতে চলতে খাদিচা বেগমকে ফিসফিস করে বলতে লাগল মনসুর বখশি, 'সোনার ফুল। তার উপর বসে সোনার বুলবুল পাখী। পাখীর ঠোঁটে ধরা হীরা। যদি খুঁজে বার না করিস. তো আরও খারাপ অবস্থা করে ছাড়ব তোর! খোঁজ! তাড়াতাড়ি!'

খাদিচা বেগম এখন ভাবছে কেবল কি করে প্রাণ বাঁচানো যায়। তাই মনসুর বখশিকে সে নিয়ে গেল কেল্লার যেখানে মাটির নিচে লুকানো আছে ধনসম্পদ। খাবার জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য জলাশয়টির আড়ালে লুকানো এক দেওয়ালে গুপ্ত একটি দরজা।

গুপ্তকক্ষের মধ্যে মনসুর বখশি মশাল জ্বালাল, কয়েকসারি সিন্দুকের ওপর পড়ল

সে আলো। নির্জীব খাদিচা বেগম অতি কষ্টে সিন্দুকগুলি খুলতে লাগল নিজের চাবি দিয়ে। দুটো সিন্দুকে রূপোর মোহর ভর্তি কানায় কানায়, আর একটা সিন্দুকভর্তি সোনার মোহর। অন্য একটিতে রাখা ছিল ছোরা, তরবারি রূপোর হাতলগুলি। অন্যগুলিতে বহুমূল্য অলঙ্কারভর্তি, মনসুর বখশির চোখ জ্বলে উঠল, যত পারল নিল সে দু'হাত ভরে, তারপর শান্ত হল এক মুহূর্ত চিন্তা করল।

'সোনার ফুল কোথায়? কোথায় সেই পান্নাবসান গোলাপফুল?' হুঙ্কার দিল সে।

সবকিছু তছনছ করা হল, কিন্তু ফুলটি পাওয়া গেল না 'হায় কপাল হাহাকার করে উঠলো খাদিচা বেগম। 'চুরি হয়ে গেছে সেটা। শেষ ভরসাও গেল আমার। মরণ আমার! হায়, হায়!'

'চুপ কর! অমনি করে হুসেন বাইকারাকে ঠকাতিস। আমাকে ঠকাতে পারবি না। ফুলটা খুঁজে বার কর! কোথায় লুকিয়েছিস, অ্যাঁ?'

'এই সিন্দুকটায় ছিল. . .'

'মিথ্যা বলছিস! আর কোন জায়গায় লুকিয়েছিস বোধহয়। বার কর এখুনি!'

খাদিচা বেগমকে গুপ্তকক্ষের ভিতর থেকে টানতে টানতে বাইরে জলাশয়ের কাছে নিয়ে এল মনসুর বখশি।

'বার কর খুঁজে! আমায় ঠকাতে পারবি না তুই!'

'আমি আপনাকে ঠকাচ্ছি না, হুজুর। আমাকেই ঠকিয়েছে! আমার পাপের ফলভোগ করার সময় এবার এসেছি দেখি। মুজাফফর মির্জার জন্য কিনা করেছি আমি! আর সেও পালায় আমায় ঠকিয়ে! আমার নিজের ছেলের জন্য আর এমন যন্ত্রণাভোগ করতে হচ্ছে আমাকে! নিজের ছেলের জন্যই!'

'সোনার ফুলটা, কিন্তু তুই দিসনি ছেলেকে! তুই লুকিয়ে রেখেছিস সেটাকে। জাঁহাপনা নিজে আমায় বলেছেন, 'মুখে হীরা ধরা বুলবুলি আছে।' আমি কথা দিয়েছি যে সোনার বুলবুলি সমেত ফুলটি এনে দেব খানকে। এখুনি খুঁজে বার কর বলছি!'

'যদি সেটা চুরি হয়ে গিয়ে থাকে তো কি করে খুঁজে পাব আমি?'

'খুঁজে পাবি না? খুঁজতে চাস না? তবে দেখ্ মজা!'

খাদিচা বেগমকে ধাক্কা দিয়ে কনকনে ঠান্ডা জলভরা জলাশয়ে ফেলে দিল মনসুর বখশি ক্রুদ্ধ চোখে দেখতে থাকে কেমন করে সে হাবু ডুবু খেতে থাকে, ডুবতে থাকে। তারপর হাত বাড়িয়ে তার চুলের মুঠিটা ধরে টেনে তুলে আনে জল থেকে। তারপর তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল হারেমের দিকে।

তিনদিন ধরে অত্যাচার চলল, কিন্তু ফুলটা পাওয়া গেল না কিছুতেই। চতুর্থদিন রাতের বেলায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলল খাদিচা বেগম।

পূর্ববর্তী বিজেতাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা হল না শক্তিশালী বুদ্ধিমান ধূর্ত

শয়বানী খানের। মুরগাবের তীরে ইরানের শাহ্‌ ইসমাইলের ত্রিশহাজার সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হল সে।

শীতকালের এক মেঘলা দিনে শাহ্‌ ইসমাইলের বিরুদ্ধে পাঠাল নিজের সৈন্যদের, মনে তার দৃঢ় বিশ্বাস যে এখুনি আর একটি বিজয় লাভ করবে সে। একঘণ্টা আগেও, মাত্র একঘণ্টা আগে শয়বানীর দল সৈন্যসংখ্যায় আর যুদ্ধক্ষমতায় শত্রুদের চেয়ে বেশি ছিল। চরেদের আনা সঠিক সংবাদ অনুযায়ী — যেমন শয়বানী বরাবরই পেত — মার্ভের কাছে শাহ্‌ ইসমাইল রেখেছিল প্রায় বারোহাজার সৈন্য, এই বারোহাজার সৈন্য একমাস ধরে শীতে কেঁপেছে। এদিকে শয়বানী খান মার্ভ দুর্গে পনর হাজার সৈন্য নিয়ে বসে আছে, যাদের ভোগ করতে হচ্ছে না ক্ষুধা বা শীতের তাড়না, যারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। শয়বানী অপেক্ষায় আছে ইসমাইলের শক্তিহারা, অর্ধমৃত সৈন্যদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার।

কিন্তু দেখা গেল তার থেকেওধূর্ত লোক আছে।

যদি শয়বানী জানত যে কত শক্তিশালী আর ধূর্ত শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে তাকে এবার তবে এমন অবিবেচকের মত দুর্গের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসত না। কিন্তু একের পর এক যুদ্ধজয় করার ফলে সে আগের সতর্কতা হারায়। আগের বছর শাহ্‌ ইস্‌মাইলকে দুর্বল, ভীরু মনে হয়েছিল, যখন শয়বানী হীরাট দখল করার পর পঞ্চাশহাজার সৈন্য নিয়ে ইরানে প্রবেশ করে, পথে দখল করে আস্রাবাদ, গুরগান ও কেরমান শহর। তখন শাহ্‌ ইসমাইল পশ্চিমে তুর্ক সুলতান দ্বিতীয় বাইয়াজেদের সঙ্গে লড়াইতে ব্যস্ত ছিল, তাই উত্তর দিক থেকে আসা অর্ন্তপ্রবেশকারীকে বাধা দিতে পারেনি। অর্ন্তপ্রবেশকারী ঝড় বইয়ে দিল শহরগুলিতে। গুরুগানে আর বিশেষ করে কেরমানে লুঠপাঠ চালিয়ে নিঃশেষ করে দিতে বলল নিজের সৈন্যদের। হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাল, শহরগুলি ধ্বংস হয়ে গেল. . .

. . . মার্ভের মজবুত দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে আগ্রহসহকারে লক্ষ্য করা হচ্ছে কেমন করে শাহ্‌র সৈন্যরা ছাউনি গুটাচ্ছে, ঠেলাগাড়িগুলিতে মালবোঝাই করা হচ্ছে, সারি বেঁধে দাঁড়াচ্ছে সবাই, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওনা দিল তারা।

শয়বানী খান তার অশ্ববাহিনীকে আদেশ দিল রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে। দুর্গের প্রবেশদ্বার খোলার আগে একটি মিনার থেকে সে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখল আমু-দরিয়ার দিকে — আরো সৈন্য এসে পৌঁছবার আশায় আছে সে। তার তীক্ষ্ম দৃষ্টি জানাল চরেদের কথাই ঠিক — মাভেরান্‌নহর থেকে আসা ত্রিশহাজার সৈন্য তখনও নদীর ওপারে রয়েছে। তখন সিদ্ধান্ত নিল খান। কোষাগার আর হারেম প্রহরা দেবার জন্য পাঁচশত সৈন্য রেখে বাকী সব সৈন্য সঙ্গে নিয়ে গেল শয়বানী।

শাহ্‌ ইসমাইল দ্রুত হঠে যেতে লাগল মার্ভ থেকে। শয়বানী তার সবচেয়ে বড় শত্রুকে অমনি পালিয়ে যেতে দেবে নাকি? তারপর তার সম্বন্ধে লোকে কি বলবে?

বলবে শাহ্ ইস্‌মাইলের মত সেও ভীরু? না, সে, শয়বানী, খান আর খালিফও কখনও সে ভীরুতা প্রদর্শন করেনি। সবাইকে দেখিয়ে দেবে সে এ যুদ্ধে জয় লাভ করেছে সে নিজেই! আজ যদি ভাগ্য সদয় হয় তার প্রতি. . .

হুকুম পালন করা হয়েছে: অশ্ববাহিনী শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। এমনি সময় মুল্লা আবদুরহিম এসে পৌঁছাল। হিম হাওয়ায় নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁটগুলিকে কোনক্রমে নাড়িয়ে খানকে অনুরোধ করতে লাগল কেল্লা থেকে আপাতত না বেরনর জন্য:

'জাঁহাপনা, এমন বিপদের মধ্যে আপনার অমূল্য জীবনকে এগিয়ে দিতে পারি না আমরা। মাভেরান্‌নহর থেকে সৈন্য এসে পৌঁছান পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার!'

'কিন্তু কোথায় সে সৈন্যদল, আর কত অপেক্ষা করা যায় ঐ. . . কুত্তাগুলোর জন্য?।' ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে উঠল খান।

'শীতকালে আমুর মত নদী পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আমার বিশ্বাস উবাইদুল্লা সুলতান ও তৈমুর সুলতান শীঘ্রই এসে পৌঁছবেন!'

'এসে পৌঁছাবে যখন এই হাওয়া শাহ্ ইমসমাইলের সৈন্যদলের পায়ের চিহ্ন উড়িয়ে নিয়ে যাবে? যদি ঐ কুত্তা-সুলতানগুলো চাইত তো এসে পৌঁছতে পারত অনেক আগেই! ইচ্ছে করেই ওরা আমাকে একা ফেলে রেখেছে। ওরা ভাবছে ওদের ছাড়া যুদ্ধে নামতে ভয় পাব আমি। অহঙ্কার হয়েছে যে সব লড়াইতে জিতেছে তারা! আমি দেখিয়ে দেব যে সব লড়াইতেই জিতেছি আমি নিজে! আমি নিজে. . . আমার এই বাজপাখীগুলোর সাহায্যে!'

অশ্ববাহিনীর কাছে এগিয়ে গিয়ে শয়বানী সুরেলা কণ্ঠে বলল:

'বাজপাখীরা আমার, তোমরা দেখেছ কি বিশৃঙ্খল অবস্থায় পিছু হঠে যাচ্ছে শত্রুরা? আমাদের চেয়ে ওদের সংখ্যা কম! শীতে কাতর হয়ে পড়েছে ওরা। আমার বিশ্বাস: খোদা আমাদের জিতিয়ে দেবেন, পয়গম্বর আমাদের সহায়! শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড় বাজপাখীরা আমার। ওরা দলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারার আগেই ঝাঁপিয়ে পড় ওদের ওপর কেটে ফেল! . . খোদা, বিজয় এনে দাও আমাদের, আর একটি বিজয়! আমিন! আল্লাহো আকবর!'

'আমিন! আল্লাহো আকবর!' হুঙ্কার প্রতিধ্বনি উঠল সৈন্যদলের মধ্যে এই প্রার্থনার।

অশ্ববাহিনী খানের নেতৃত্বে প্রচন্ড গতিতে ধেয়ে চলল পিছু হঠতে থাকা শত্রুবাহিনীর দিকে। শত্রুর পিছু হঠা কিন্তু একটা ফাঁদ মাত্র। অন্যান্যবার খানের চররা যেমন তাকে ঠিক ঠিক খবর এনে দিয়েছে শত্রুবাহিনীর সম্বন্ধে এবার তার ব্যর্থ হয়েছে। তারা জানত না যে মার্ভের দুর্গের কাছে শাহ্ রেখেছিল তারা সৈন্যদলের মাত্র একটি ছোট অংশকে। আর বিশহাজার বাছাই করা সৈন্যকে রেখেছে সে মার্ভের

সামান্য দূরে, মুরগাবের ওপারে মরুভূমিতে বালির পাহাড়গুলির আড়ালে আড়ালে তারা লুকিয়ে আছে।

এই কৌশলেই বারো বছর আগে শয়বানী খান নিজে বুখারা কারাকুল শহরের বিদ্রোহীদের পরাজিত করেছিল, ছল করে হঠে যাবার ভান করে কেল্লা থেকে বিদ্রোহীদের বার করে এনে, মরুভূমিতে তাদের ঘিরে ফেলে, ধ্বংস করে ফেলে দুর্গের অধিবাসীদের প্রত্যেকের মাথা কেটে ফেলে সেগুলি দিয়ে বাজারে একটা মিনার তৈরি করা হয়।

নিজের ক্ষমতায় অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শয়বানীর, তার মাথাতেও আসে নি যে অন্য কেউও অমনি কৌশল খাটাতে পারে। শাহ্ ইসমাইলের বারো হাজার সৈন্য পিছু হঠছে মার্ভ থেকে, তাড়া করো ওদের পিছনে! ঐ যে মাহ্মুদির কাছে মুরগাবের ওপর তৈরি করা পুলের ওপর দিয়ে চলে গেল ওরা — পিছিয়ে পড়ো না, চলো পিছন পিছন! পুলের কাছে প্রায় তিনশত সৈন্য রেখেছিল ইসমাইল যেন প্রহরার জন্য, যখন শয়বানীর ভয়ঙ্কর অশ্ববাহিনী পুলের কাছে এসে পড়ল, তা দেখে ঐ তিনশত সৈন্য যেন আতঙ্কে পালাতে লাগল হুড়মুড় করে। চল পুলের উপর, চল! নদী পার হওয়া যায় কেবল ঐ পুলটা দিয়েই, নদীর দুই তীরই খাড়া, উঁচু শীতের সময়ের ঠান্ডা কনকনে নদীর জল পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, অন্য পথ নেই! তার মানে পুলের উপর চল। এগিয়ে চল!

শয়বানীর সব সৈন্য পুল পেরিয়ে না আসা পর্যন্ত ইস্মাইল শাহ্র লুকিয়ে থাকা সৈন্যরা তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে দিল না কিছু। শয়বানীর দল পুল থেকে বেশ দূরে চলে যাবার পরে তারা পাহাড়গুলির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আর শত্রুর উপর চালাতে লাগল তীর আর কামানের থেকে গোলাবর্ষণ। চারদিক থেকে শয়বানীকে ঘিরে ধরল তারা।

তখনই কেবল খান বুঝল যে ফাঁদে পড়েছে সে। মনে পড়ল কারাকুলবাসীদের সঙ্গে একসময় সে ঠিক এমনি কৌশলই খাটিয়েছিল। এবার আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করল বিজয় নয়, নিজের জীবনরক্ষার! পুলের দিকে ফিরবে নাকি! কিন্তু কাঠের তৈরি পুল ভেঙে গেছে ইতিমধ্যেই। পিছন দিক থেকে আসা সৈন্যদের চাপে ঘোড়া আর লোকেরা উঁচু পাড় থেকে পড়ছে নদীর মধ্যে, মৃতদেহে ভরে উঠল নদীটা। খান নিজে কয়েকজন বাছাইকরা সৈন্য নিয়ে নদীর তীর ধরে ছুটে চলল, তারপর বাঁয়ে ঘুরল, গিয়ে পড়ল গরুভেড়ার পালের শীতকাল কাটাবার একটা খোঁয়াড়ের মধ্যে। ইস্মাইল শাহ্র বাহিনী তখনই খোঁয়াড়টি ঘিরে ফেলে আক্রমণ চালাল। খানের সৈন্যরা মরণপণ লড়তে লাগল, একের পর এক মরতে লাগল তারা। ইস্মাইল দেখল যে খান দারুণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে প্রতিরোধের, তখন সেখানে কামানগুলো নিয়ে এসে বসাল সে।

এতেই কাজ হল। কামানের আওয়াজে আহত ঘোড়াগুলি আতঙ্কিত হয়ে দাপাদাপি

করতে লাগল, সৈন্যদের দলে পিষে ফেলতে লাগল। হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে শয়বানী চীৎকার করে সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু একটা পাথরের গোলা সোজা এসে খানের ঘোড়ার মাথায় সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ঘোড়া আর তার সওয়ার দু'জনেই পড়ে গেল হুড়মুড় করে।

ঘোড়ার রেকাব থেকে পাটা ছাড়িয়ে নিতে পারল না শয়বানী — সেটা চাপা পড়ল ঘোড়ার দেহের তলায়। আর একটা ঘোড়া তখনই হুড়মুড় করে পড়ল একেবারে খানের উপর। মাটিতে প্রায় পিষে যাওয়া শয়বানী হাড়পাঁজরা ভাঙা অবস্থায় জ্ঞান হারাল।

লড়াই শেষ হবার পর ইস্‌মাইলের বেগদের একজন (খানের মুখ চিনত সে) মৃত সৈন্যদের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করল খানের দেহ। খানের চারপাশে গাদাগাদি হয়ে পড়ে আছে মৃতদেহ — তার মধ্যে আছে মুল্লা আবদুরহিম, মনসুর বখশি ও আরো অনেকের দেহ।

বিজেতারা মৃত শয়বানীর দেহ থেকে মাথাটা কেটে নিয়ে বর্শায় সেটাকে বিঁধে নিয়ে গিয়ে শাহ্‌র ঘোড়ার পায়ের কাছে ফেলে দিল।

কুন্দুজ. . . আবার সমরখন্দ

১

. . . দু'সপ্তাহ হল খানজাদা বেগম তাঁর দশবছরের ছেলে খুররামকে নিয়ে মার্ভ থেকে বালহ্ হয়ে চলেছেন কুন্দুজের দিকে।

যদিও তাঁদের জন্য সাদা উটের পিঠে তৈরি করা হয়েছে সোনালী ঘুংনা ঝোলান রেশমী কাপড়ে ঢাকা চমৎকার হাওদা তবু বড় কষ্টকর উটের পিঠে এই যাত্রা। ক'দিনে তাঁরা পার হয়েছেন অনেক বালির পাহাড়, টিপি, বন-মাঠ, পার হয়েছেন নদী। তবুও কুন্দুজ পৌঁছাতে এখনও অনেক দেরি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন খানজাদা বেগম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাঁর ছেলেও। ক্লান্ত তাঁর চার দাসী, ছয়দাস আর তাঁর প্রহরায় নিযুক্ত ইস্‌মাইল শাহ্‌র একশত সৈন্যও।

ঐ ঘৃণ্য শয়বানীর এক স্ত্রীর প্রতি শাহ্ ইস্‌মাইল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দয়া দেখায়নি। মার্ভে খানের স্ত্রীদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবার সময় ইস্‌মাইলের অন্তরঙ্গ সহকারী নাজমি সোনী খানজাদা বেগমকে নিজের হারেমে নিতে চাইল। আর তাঁর একমাত্র ছেলে খুররামকে বন্দী করে রাখা হল কারণ খানের বংশধরদের বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছা ছিল না কাবুরই। ঐ বংশের মূল থেকে ছেঁটে ফেলা — এই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এমন সময় কুন্দুজ থেকে শাহ্ ইস্‌মাইলের জন্য বার্তা নিয়ে এসে পৌঁছাল বাবরের দূত।

বাবর তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শয়বানীর বিরুদ্ধে এমন গৌরবজনক জয়লাভ করার জন্য আর বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ অত্যাচারীর হারেমে গিয়ে পড়া নিজের বোনকে ছেড়ে দেবার জন্য।

শাহ্ ইস্‌মাইল শুনেছে যে বাবর শিক্ষিত শাসক। আরো শুনেছে সুন্নীমতাবলম্বী বাবর সব ধর্মকে সম্মান দেন আর তিনি শয়বানীর প্রচন্ড শত্রু। ইরানের শাহ্ শয়বানীর দলের লোকেদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে চায়, গোটা মাভেরান্‌নহর দখল করে নিতে চায় তাদের কাছ থেকে। সেই লড়াইয়ে কারুর সঙ্গে জোট বাঁধতে গেলে বাবরের চেয়ে আর ভালো লোক পাবে না সে। তাছাড়া কাবুল থেকে বাবর তাঁর সৈন্যদলকে এগিয়ে এনেছেন মাভেরান্‌নহরের কাছে কুন্দুজে, তার দলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য। বাবরেরও যে মাভেরান্‌নহরের দিকে নজর আছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে, তাছাড়া সেখানে অন্য কারুর চেয়ে বাবরের অধিকারই তো বেশি। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইস্‌মাইল চাইল বাবরের সঙ্গে জোট বাঁধতে আর তাঁকে ঋণী করতে; অর্থাৎ বাবরের সাহায্যে শয়বানীর লোকেদের হাত থেকে মাভেরান্‌নহরকে মুক্ত করা, তারপর দেখা যাবে কার অধিকার বেশি।

শাহ্‌র নিষ্ঠুরতা দয়ায় পরিণত হল। খানজাদা বেগম এমন কি তাঁর ছেলেকেও ছেড়ে দেওয়া হল। তাঁদের বাবরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল শুধুমাত্র একশত রক্ষী দিয়েই নয়, তাঁদের সঙ্গে চলল শাহ্‌র এক উজীর সম্মানিত মুহম্মদজানও।

খানজাদা বেগম অবশ্যই জানতেন না এইসব বিচারবিবেচনার কথা বা যুদ্ধজোট বাঁধার গোপন উদ্দেশ্যের কথা। কিন্তু তিনি অনুভব করছেন যেন কি একটা নতুন বিপদ এগিয়ে আসছে তাঁকে আর তাঁর ছেলেকে নিজের গহ্বরে টেনে নেবার জন্য। ভীষণ উৎকণ্ঠা হতে লাগল তাঁর।

তাঁদের প্রহরায়রত শাহ্‌র এই সৈন্যদের একটুও ভয় হচ্ছে না তাঁর। অনেকবার দেখেছেন তিনি এই ভয়ঙ্কর চেহারার লোকগুলি মেয়েদের কেমন সম্মান দেখায় — অমনি অমনি তারা পয়গম্বর মুহম্মদের একমাত্র কন্যা, পবিত্র দুই ভাই হাসান ও হুসেনের মাতা বিবি ফতিমার পূজা করে না। এদের কেউ কেউ এমন কি মনে করে যে স্বয়ং শাহ্ ইস্‌মাইল, আলি ও ফতিমার সন্তান হুসেনের বংশধর যাদের মধ্যেই কেবলমাত্র 'ছদ্মবেশী ইমামের' আবির্ভাব সম্ভব।

শাহ্‌র প্রতি আর তার সৈন্যদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা অনুভব করছেন খানজাদা বেগম। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি এক অজানা বিপদের ভয় আর উৎকণ্ঠা যাচ্ছে না কিছুতেই। গিরিখাতগুলি আর ঝোপঝাড়গুলি থেকে সে ভয় এসে যেন চেপে বসছে তাঁর মনের ওপর। সবে শীতকাল বিদায় নিয়েছে, পাহাড়ের ওপরে তখনও অনেক

বরফ জমে আছে। যখন তাঁরা খাড়াই ধরে নামছিলেন বা সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে চলছিলেন খানজাদার মনে হচ্ছিল যেন এখুনি একটা ধ্বস নেমে আসবে তাঁদের উপর, সবাইকে পিষে দেবে। ঝড়বিদ্যুতের সময়ও তিনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন।

একবার তাঁরা রাত কাটাবার জন্য থামেন আমু-দরিয়ার বামতীরে বনের প্রান্তে সুবাইতাল নামের জায়গায়। খানজাদা শুনেছিলেন হরিণ শিকারের আশায় ওঁৎ পেতে থাকা বাঘের গরগরানি — এরপর সারারাত আর দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি।

যেখানে গুরি আর কুন্দুজ নদী মিলে গিয়ে আমু-দরিয়ার দিকে বয়ে চলেছে সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে নলখাগড়ায় ভরা জলাজায়গা। সেখান হাওয়া এমন ভারী আর বিষাক্ত যে বিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সবাই বলাবলি করতে লাগল, যে শয়বানী খানের ছোট ভাই মাহ্‌মুদ সুলতান অনেক রক্ত ঝরা লড়াই অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসে কুন্দুজে এসে কি এক অদ্ভুত জ্বরে পড়ল যার ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যায় সে। সেই ভয়ঙ্কর জ্বরের কথা মনে পড়ে বারে বারে ছেলের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন খানজাদা বেগম।

একসময় আফগান প্রবাদবাক্য শুনেছিলেন তিনি 'মরতে যদি চাও, তো কুন্দুজ যাও', শুনে হেসেছিলেন ঠাট্টা ভেবে। এখন সেই প্রবাদবাক্যটি সত্য বলে মনে হতে লাগল তাঁর কাছে। নিজের চেয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছে তাঁর ছেলের জন্য — তাঁর নিজের, প্রিয় ছেলেটি, অপ্রীতিকর বৃদ্ধ শয়বানীর ঔরসে তার জন্ম, কিন্তু সে একান্ত খানজাদারই সন্তান কারণ ছেলের এই দশবছর বয়সের মধ্যে তার জন্মদাতা খান কদাচিৎ দেখেছে ছেলে খুরামকে, সামান্যই আগ্রহ দেখিয়েছে।

'আর যদি মির্জা বাবর কুন্দুজ ছেড়ে চলে গিয়ে থাকেন, পাহাড় পেরিয়ে আন্দিজান চলে গিয়ে থাকেন বা কাবুল ফিরে গিয়ে থাকেন তাহলে কি করব আমরা?' বারেবারেই উৎকণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন বেগম।

পামীর ও হিন্দুকুশ পর্বতমালায় ঘেরা কুন্দুজ উপত্যকা তাঁর কাছে একটা ভয়ঙ্কর ফাঁদ বলে মনে হতে লাগল।

একদিন দুপুরবেলায় রাস্তাটা যেখানে আমুর তীর থেকে উঠে পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে সেখানে তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়াল তাঁদের দলের চেয়ে তিনগুণ বড় যুদ্ধসাজে সজ্জিত এক বাহিনী। শীঘ্র জানা গেল — তারা হল বাবরের পাঠান লোক খবর নেবার জন্য। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন খানজাদা বেগম। সেই দলের নেতা মুহম্মদ কুকলদাশ উটবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল টিলার উপরে এক কেল্লায়। এখন উপত্যকাটি অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে হতে লাগল। পাহাড় থেকে বয়ে আসা হাওয়াটা, পাহাড়ের ঢালে ঢালে চমৎকার বনগুলি, নদীর তীর বরাবর রাস্তা সবকিছুই চমৎকার লাগল।

কুন্দুজের ভূতপূর্ব খানরা এই কেল্লা আর তার অভ্যন্তরে প্রাসাদ তৈরি করেছে স্বাস্থ্যকর জায়গায়। আর 'চমৎকার ভাবেও' ভাবলেন খানজাদা বেগম সন্তুষ্ট মনে; আর এই প্রাসাদে একটু পরে তাঁর প্রাণপ্রিয় ভাইটির সঙ্গে দেখা হবে ভেবে মন আনন্দে ভরে গেল তাঁর।

তাঁরা প্রাসাদে এসে পৌঁছানমাত্র একজন ভৃত্য তাঁকে, তাঁর ছেলেকে আর সঙ্গিনীদের নিয়ে গেল একটি ঘরে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল মির্জা বাবরকে অবিলম্বে বোনের এসে পৌঁছানর সংবাদ দেবার জন্য।

মাত্র কয়েক মিনিট কাটার পরেই বছর ত্রিশ বয়সের এক পুরুষমানুষ ছুটে এসে ঢুকলেন সেই ঘরে, মুখে সুন্দর দাড়ি আর গোঁফ। প্রথমে বেগম ভাবলেন যে সে বাবরের বেগদের একজন, তারপরে তার পিছনে আরো একজনকে দেখা গেল।

খানজাদার মনে ছিল উনিশবছর বয়সের সেই যুবকটিকে যার তখনও ভাল করে দাড়ি গোঁফ ওঠেনি: এই পুরুষের মধ্যে সেই যুবকের কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া তার পোশাকআশাকও রাজকীয় নয়: মাথায় রূপোলী-সাদা পাগড়ী — কোন অলঙ্কার নেই তাতে, গায়ে সাধারণ রেশমী চাপান, বাবর ছিলেন তাঁর বিশ্রামকক্ষে যেখানে বসে সাধারণত তিনি লিখতেন, বোন আসার খবর পেয়ে যেমন অবস্থায় ছিলেন ছুটে এসেছেন।

খানজাদা বেগমের তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, তাকিয়ে আছেন ঘরে ঢোকা লোকটির দিকে। বাবরও বিস্মিত হয়ে থেমে পড়েছেন। গলায় দলা আটকে আসছে, চীৎকার করে বললেন:

'চিনতে পারলে না আমায়?! আমি তোমার ভাই! সব দোষে দোষী তোমার ভাই, বাবর!'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ তাঁর বাবরজানেরই চোখ, তাঁর, বাবরজানেরই গলা: খানজাদা ছুটে গেলেন বাবরের দিকে। মুখ লুকালেন বাবরের বুকে। বাবরও আলিঙ্গন করলেন বোনকে, কাঁদছে বোনটি, দুঃখ আর আনন্দের এই চোখের জলের মধ্যে দিয়ে প্রথম যে কথা তিনি বললেন তা হল:

'বাবরজান. . . আমি চলে গিয়েছিলাম. . . খানের কাছে. . . তোমার কথা না শুনে. . . জানি. . . এজন্য তোমাকে অনেক কটুকথা সহ্য করতে হয়েছে. . . কিন্তু তখন অন্য পথ ছিল না আমার. . .'

'হাঁ, তা জানতাম আমি. . . বুঝেছিলাম যে আমার জীবন রক্ষার জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছিলে তুমি... তোমার কাছে চিরজীবন আমি ঋণী থাকব!'

'ঋণের কথাই যদি বলতে হয়... তো আজ তুমি সে ঋণ শোধ করে দিলে ভাই! তুমি আমায বাঁচিয়েছ, বাবরজান! নাজমি সোনির হারেমে বন্দীদশা থেকে... খোদাকে শতশত ধন্যবাদ যে আমাকে এমন একটি ভাই দিয়েছেন!'

'তোমার জন্য গর্ব হয় আমার বোনটি! কেবল একটি দুঃখ আমাদের মাতৃদেবী এমন সুখের দিন দেখতে পেলেন না!'

খানজাদা বেগম গতবছরেই শুনেছেন মাতৃদেবীর জীবনবসানের কথা। কিন্তু তাঁকে আর কখনও দেখতে পাবেন না এই অনুভূতি হঠাৎ যেন বিদ্ধ করল তাঁকে।

'হায়! কেন যে খোদা আমাদের মাতৃহারা করলেন এত শীঘ্র!' খানজাদা বাবরের কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কবে মারা যান তিনি? কেমন করে?'

'পাঁচ বছর আগে... আন্ত্রিক জ্বরে। তাঁকে সমাধি দেওয়া হয় কাবুলে বাগ-এ-নওরোজ সমাধিক্ষেত্রে।'

'পঞ্চাশ বছর বয়স হবার আগেই চলে গেলেন!... আমাদের জন্য চিন্তাভাবনা করে করেই তিনি শেষ হয়ে গেলেন, বাবরজান!'

মুহম্মদ কুকলদাশ এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে, এবার সে বলল:

'নিয়তির বিরুদ্ধে আমরা কি করতে পারি, বেগম?.. জাঁহাপনার সঙ্গে, নিজের ভাইয়ের সঙ্গে যে আপনার দেখা হল এই-তো সুখ। এতেই আপনাদের মাতৃদেবী বেহস্তে আনন্দ পাচ্ছেন... আসুন, তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা যাক।'

তিনজনে বসে পড়লেন জরির আসনে। কাসিমবেগ ভিতরে এসে কোন কথা না বলে তাঁদের কাছে বসল। শোকমিশ্রিত নিচু, কিন্তু সুরেলা কণ্ঠে কুতলুগ নিগর-খানুমের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা উচ্চারণ করল সে। প্রার্থনা শেষ হলে তারপর খানজাদা বেগমকে অভিনন্দন জানাল বাবরের কাছে এসে পৌঁছবার জন্য।

খানজাদা বেগমের ছেলে খুররাম এতক্ষণ ঘরের এক কোণায় দাসীপরিবৃত হয়ে বসে একটু বিরক্তি নিয়েই সবকিছু লক্ষ্য করছিল, খানজাদা এবার ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডাকলেন। ছেলেটি এসে মায়ের পায়ের কাছে বসল।

ফর্সা মুখ, নীল চোখ, খাটো ঘাড়, স্বল্প ভ্রূ তার পিতা শয়বানী খানের কথা মনে করিয়ে দেয়। যদিও বাবর শয়বানীকে কাছে থেকে দেখেননি তবুও সে মিল অনুভব করলেন তিনি: 'ওর মুখচোখ তো আমাদের মত নয়, না... ছেলেটি আমাদের মত হবে কি?'

খুররামকে তার পিতা যখন বালখের শাসক নিযুক্ত করে তখন তার বয়স সাতবছরও পূর্ণ হয়নি। সেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করত অবশ্য তার অভিভাবক মেহ্‌দী সুলতান, কিন্তু পদমর্যাদাসম্পন্ন ও বয়স্ক ব্যক্তিরা যে তার মত বালকের সামনে মাথা নিচু করে সম্মান দেখায় তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে খুররাম।

বাবরকে দেখিয়ে খানজাদা বেগম বললেন যে ইনি তার মামা। খুররাম এই অপরিচিত লোকটিকে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারল না, তা কিন্তু কেবল তার

সাধারণ পোশাকের জন্যই নয়। অনিচ্ছা নিয়ে সামান্য একটু ঘাড় কাত করে অভিবাদন জানাল বাবরকে। উঠল না, বাবরের কাছেও এগিয়ে গেল না কিছু বললও না।

খানজাদা বেগম ছেলের কাঁধে একটু ধাক্কা দিয়ে নিচু, কঠোর স্বরে বললেন:

'এ কি ব্যবহার! মির্জা বাবরের সামনে বসে আছিস তুই! জানবি শাহ্ ইস্‌মাইল আমাদের সবাইকে মুক্তি দিয়েছে কেবলমাত্র এঁর অনুরোধেই!'

এবার যেন চেতনা ফিরে পেল ছেলেটি। চোখ বড় করে তাকাল। সে চোখে বিস্ময় আর কৃতজ্ঞতা: বাবর দেখলেন — তার চোখগুলি বড়, বড়, জীবন্ত ঠিক তার মায়ের চোখের মতই।

বাদশাহ্‌র সামনে কিভাবে সম্মান দেখাতে হয় সে শিক্ষা খুররাম ভুলে যায়নি। বাঁ পা ভাঁজ করে সামনে আর ডান হাঁটু মাটিতে রেখে, বুকে হাত রেখে নীচু হয়ে কুর্ণিশ করে ছেলেমানুষী সরুগলায় আবেগকম্পিত স্বরে বলল:

'জাঁহাপনা, আমি... আপনার সেবা করতে চাই।'

বাবর লক্ষ্য করলেন যে খুররামের নাকটিও ঠিক খানজাদা বেগমের মতই। আর হঠাৎ ভাগিনেয়, এই অহঙ্কারী ছেলেটির প্রতি স্নেহ উথলে উঠল বাবরের মনে, যদিও সম্প্রতি নেভানো আগুনের ধোঁয়ায় কটু স্বাদ লেগে আছে সে স্নেহের সঙ্গে।

'যদি সেবা করতে চাও তো সুস্বাগতম ভাগিনা!' বলে বাবর তাকে নিজের ডানদিকে বসালেন।

বছর পঞ্চাশ বয়সের এক স্থূলকায়া মহিলা — হারেমের পরিচারিকা অনুমতি নিয়ে ভিতরে ঢুকে জানাল যে মহিম বেগম মহামান্য জাঁহাপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন।

বাবর বোনের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে মৃদু হেসে পরিচারিকাকে আদেশ দিলেন:

'বলো, মির্জা হুমায়ুনকে নিয়ে যেন আসেন।'

বাবরের যুবতী স্ত্রী মহিম বেগম আসার সংবাদে কাসিমবেগ ও মুহম্মদ কুকলদাশ বাবরের অনুমতি নিয়ে বাইরে চলে গেল।

খানজাদার জন্য নির্দিষ্ট ঘরগুলির দরজাগুলির কাছে ভিড় করেছিল বেশ কিছু লোক, মারগিলানের খাজা কালোনবেগ, কুভার তাহির, তাশখন্দের সাইদখান, সমরখন্দের মাজিদ বারলাস, ইউসুফ আন্দিজানি — সবাই দেখতে চায় খানজাদা বেগমকে, তাদের দেশের খবর শুনতে চায়। তাদের সবাইকে চলে যেতে আদেশ দিল কাসিমবেগ।

'আগে ভাইয়ের সঙ্গে প্রাণভরে কথা বলে নিন তারপর তোমাদের জন্য অনুমতি চাওয়া হবে।'

২

ঘরে ঢুকে এক যুবতী, পীচফলের রঙের পোশাক তার তন্বীদেহে চেপে বসেছে, হাতে ধরে আছে চমৎকার সাজান তিনবছরের ছেলেকে ('সিংহাসনের উত্তরাধিকারী!')। খানজাদা সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলেন বাবরের সঙ্গে ছেলেটির অত্যন্ত মিল। তাড়াতাড়ি উঠে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। মহিম বেগম মাথা-নিচু করে অভিবাদন জানালেন সবিনয়ে, আত্মমর্যাদাসহকারে ও চমৎকারভাবে। খানজাদা এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাতে রাখলেন। মহিম এক মুহূর্তের জন্য মুখের উপর ঢাকা দেওয়া সাদা রেশমী ও ওড়নাটা তুললেন তার মুখের দিকে তাকালেন খানজাদা ('আহা কী চমৎকার!') তারপর বাবরের দিকে ফিরে আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে বললেন, 'আমার শুভকামনা রইল! তোমরা পরস্পরের জন্যই যেন তৈরি! সুখী হও, বাছারা!'

ছোট হুমায়ুন মায়ের পোশাকের প্রান্ত ধরে রেখে সাগ্রহে এই অপরিচিত মহিলার আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিল। খানজাদা বেগম কোলে তুলে নিলেন তাকে — ছেলেটি কিন্তু, আশ্চর্য কথা, ভয় পেল না। আর যখন খানজাদা আদর করে তার গালে গাল ঠেকালেন তখন হাসি ফুটল ছেলেটির মুখে।

হুমায়ুনকে কোলে নিয়ে খানজাদা বেগম এগিয়ে গেলেন নিজের ছেলের কাছে, তাকে কোল থেকে নামিয়ে বললেন 'দুই ভাইয়ে এবার আলাপ করে নাও দেখি!'

তিনবছরের 'সিংহাসনের উত্তরাধিকারী' বাবরের বংশধর আর দশবছর বয়সী শয়বানীর বংশধর প্রথমে পরস্পরে দিকে তাকিয়ে রইল কোন কথা না বলে। তারপর খুররামের কোমরে ঝুলান ছোরাটি হুমায়ুনের আগ্রহ জাগাল, সেদিকে হাত বাড়াল সে। খুররাম তার হাতটি ধরে ফেলে সাবধানে একটু চাপ দিল, কিন্তু ছোরাটি হুমায়ুনকে দেবার ইচ্ছা মোটেই নেই বোঝা গেল। এক পা পিছিয়ে গেল সে।

হেসে উঠল বড়রা। বাবর ভাবলেন, 'নিজের অধিকার কেউই ছেড়ে দিতে চায় না।' খানজাদা বেগম কিন্তু কিছু ভাবছেন না, কেবল ভীষণ আনন্দ হচ্ছে তাঁর। কুন্দুজ আসার পথে যে এক অদ্ভুত ভয়ে তাঁর শরীর কাঁপছিল সেটা এখন আনন্দে পরিণত হয়েছে। এই যে দুটি শিশুকে দেখার আনন্দ, সুন্দরী মহিমের লজ্জামাখা মৃদু হাসির জবাবে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা, ভাইয়ের চিন্তার ভাগ নেওয়ার আনন্দ, যাঁকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন সেই কবে থেকেই যখন তাঁরাও এই ছেলেদুটির মতই ছোট্ট ছিলেন... ভয়ঙ্কর সর্বনাশী শীতের পরে তাঁর মনে যেন এসেছে হাসিখুশিভরা বসন্ত।

মহিমের দিকে আবার একবার তাকিয়ে দুষ্টুমিভরা চোখে বাবরকে বললেন:

'ভাগ্য আপনার প্রতি সদয় হয়েছে আলমপনা। এমন সুন্দরীর দেখা পেলেন কোথায়, কেমন করে জয় করলেন এঁকে? কোথায় আপনার দেশ, মহিম বেগম?'

'খোরাসান, মহামান্যা বেগম।'

মহিম ইঙ্গিতে অনুরোধ করতে লাগল, 'আমাকে লজ্জায় ফেলবেন না, হীরাটে প্রাচীরের উপর থেকে আমি আপনার গায়ে যে ফুল ফেলেছিলাম বললেন না সে কথা...' বাবরের অন্তর যেন আনন্দে গান গেয়ে উঠছিল কিন্তু তিনি ইচ্ছে করেই যেন কোন কাজের কথা বলছেন এমনি নীরস স্বরে বলতে লাগলেন যে বেগম সম্পর্কে হুসেন বাইকারার আত্মীয়া, কিন্তু চারবছর আগে বাদিউজজামানের সঙ্গে বেগমের পিতার মতভেদ হওয়ায় তাঁকে গজনীতে চলে আসতে হয়। বাবর মহিমের পিতা ও ভাইকে গজনী থেকে কাবুল চলে আসার আমন্ত্রণ জানান — তখনই কেবল তাঁর ও বেগমেরর আবার সাক্ষাৎ হয় কাবুলে।

তারপর হঠাৎ সুর বদলে বোনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুরগাব আর হীরাটের মাঝামাঝি একটা শহর আছে হজরতী জাম দেখেছেন আপনি?'

'দেখেছি, জানি যে সে শহরের নাম রাখা হয় কবি জামির নামে, ঠিক কিনা?'

'ঠিক। এখন বলা দরকার যে বেগমের মায়ের বংশ হল জামির আত্মীয়।' তারপর ঠাট্টার সুরে যোগ দিলেন। 'এত কথা বলছি একথা জানানর জন্য যে: আমার বেগম কাব্যের বিশেষজ্ঞ আর এমনি ভক্ত কবিদের যে মহান কবি আবদুরহমান জামি আর আলিশের নবাইয়ের সব গজলই তার কণ্ঠস্থ। তাই যখন আমি কোন গজল রচনা করি তখন উনি তাতে কেবল ভুলই খোঁজেন।'

এই ঠাট্টার উত্তরে মহিমও ঠাট্টা করে বললেন:

'চেষ্টা করতে হয়: মালিক আমার সমালোচক হবার ক্ষমতাকে একটু বাড়িয়ে বলছেন!'

এবার খানজাদা বেগম যোগ দিলেন:

'আমি কিন্তু দেখছি যে আপনার যত প্রশংসাই করুন না কেন বাবরজান, তাহলেও সবটা বলা হয় না!'

'ধন্যবাদ, বেগম!' তারপর খানিক চুপ করে থেকে বললেন মহিম 'আমি অনেক শুনেছি আপনার সাহস, আপনার আত্মত্যাগের কথা, বরাবরই দেখতে ইচ্ছা হত আপনাকে। খোদার রহমতে আজ সে ইচ্ছা পূর্ণ হল। মহামান্যা বেগম, আমি আপনাকে কল্পনা করতাম রূপকথার নায়িকার মত করে আর এখন দেখছি কল্পিত নায়িকাদের সঙ্গে আপনার তুলনা করা চলে না... আমাদের পরিবারে আর অন্তরে আপনার জন্য রাখা আছে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান।'

খানজাদা বেগম অনুভব করলেন কি অকপটভাবে উচ্চারিত হয়েছে এই কথাগুলি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর মনে পড়ল আয়ষা বেগমকে, আর ভাবলেন — আল্লাহ্ তাঁর ভাইকে যেমন সুখ দিয়েছেন তেমন তাঁকে দেননি — শয়বানী খানের হাতে পড়ে কষ্ট পেতে বাধ্য করেছেন তাকে।

হঠাৎ বাবর লক্ষ্য করলেন চৌত্রিশবছরের খানজাদা বেগমের চুলে সাদার ছোঁয়া

লেগেছে। বাবরের মনে হল মাতৃদেবী যখন স্বামীহারা হন, তখন তাঁকেও এমনি খানজাদার মতই দেখাত। এখন খানজাদা বেগমও স্বামীহারা।

আবেগমথিত স্বরে বাবর বোনকে বললেন:

'আমি চিরকালের জন্য আপনার কাছে ঋণী, বেগম!... আর শাহ্ ইস্‌মাইলের মহত্বের কথাও ভুলব না আমি যিনি আপনাকে সুস্থ, জীবিত অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছেন আমার কাছে!'

'যদি শুনতে ইচ্ছা করেন শাহ্‌র সম্বন্ধে কিছু কথা বলি আপনাকে,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল খানজাদার মুখ, 'তাজলি খানুম নামে শাহ্‌র এক স্ত্রী আছে, অপূর্ব সুন্দরী। সে আমাকে শাহ্‌র কাছে নিয়ে গেল। এর আগে তাঁর সম্বন্ধে অনেক গুজব শুনেছি... ভীষণ ভয় হচ্ছে। দেখি সিংহাসনে বসে বছর পঁচিশ বয়সের এক যুবক, মুখচোখ সুশ্রী। দাড়ি নেই, লম্বা গোঁফ। নাক লম্বা। চোখগুলি বড় বড়... আজেরবাইজান ভাষায় কথা বলছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর কথা বুঝতে পারছিলাম আমি। পয়গম্বরের কন্যা ফতিমার পূজারী তিনি... তাই মেয়েদের বিশেষ সম্মান করেন তাঁরা, সেকথা বুঝেছি আমি পথে আসতে আসতেও।'

'আগে আমাদের মধ্যেও মেয়েদের বেশ সম্মান ছিল,' বললেন বাবর, 'সমরখন্দে বিবিখানুমের নামে মাদ্রাসা আছে। তার বিপরীত দিকে আছে সরাই মুল্ক খানুমের নামে মাদ্রাসা। হীরাটে আছে প্রখ্যাত গওহরশাদ বেগম মাদ্রাসা। এই সব মহিলার নাম জড়িত আমীর তৈমুর আর বংশধরদের সঙ্গে।'

'জানি না, হয়ত আমীর তৈমুরের সময়ে মেয়েরা যথেষ্ট মর্যাদা পেত,' স্বামীর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন মহিম, 'কিন্তু এখন কেন জানি তেমন আর নেই...'

'নিয়তির বিধান!' বললেন বাবর। 'সেই সময় বিজ্ঞান ও শিল্পের সেই স্বর্ণযুগে মেয়েদের প্রতি সম্মানও বেড়ে যায়, কারণ বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রকৃত উন্নতি হতে পারে একমাত্র মেয়েদের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই: তাঁরাই অনুপ্রেরণা দেন কবি ও বিজ্ঞানীদের আর নিজেরাও তাঁদের কাজে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেন। আর অধঃপতনের সময় শিল্পী বৈজ্ঞানিক যেমন দুঃখ ভোগ করেন, মেয়েদেরও তেমনই হীন অবস্থা।'

'ঠিক কথা। এই যে মানসিক অধঃপতনের কথা বললেন আমাদের জাঁহাপনা তা' এখন সারা মাভেরান্নহরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে দেখে কষ্ট হয়,' দুঃখিত স্বরে বললেন খানজাদা বেগম। 'বিভিন্ন জাতির খানরা আর সুলতানরা দেশদখল করার চেষ্টায় তৎপর। কিন্তু সে দেশের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখার দরকারই মনে করে না... আমার মৃত স্বামী সম্বন্ধে খারাপ কথা বলা উচিত নয়, কিন্তু না বলে পারছি না... নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি মারামারিতে নিযুক্ত বিভিন্ন উপজাতিকে একত্রিত করেছিলেন তিনি, গোটা মাভেরান্নহরের অধিপতি হন তিনি, নিজের সম্মানে সমরখন্দে মাদ্রাসা নির্মাণ করেনও। জারাফশান নদীর ওপর পুল নির্মাণ করান। এই

হল তাঁর কয়েকটি ভাল কাজ। কিন্তু শিল্পী বিজ্ঞানীদের প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করতেন আর মেয়েদের এমন ঘৃণা করতেন তিনি! কি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হতেন তিনি যখন তাঁকে বলা হত যে তৈমুরের বংশধররা কোন মহিলার সম্মানে মাদ্রাসা বা স্মৃতিমন্দির তৈরি করেছে। তিনি মনে করতেন মহান উলুগবেগ বিজ্ঞান ও শিল্প চর্চায় মেতে ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, আর মেয়েদের গুণগান করে তাদের সামনে মাদ্রাসার দরজা খুলে দিয়ে নীতিবোধকে বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর আদেশে লিখিত 'শয়বানীনামা' আর 'নুসরতনামা' বইগুলি দেখেছি আমি, — সেখানে কোন মহিলার নাম উল্লেখ নেই, শাহ্ সুলতানদের মা ও স্ত্রীদের কথা বলা হয়েছে নামছাড়া কেবল 'অমুকের মেয়ে,' 'অমুকের স্ত্রী' এইভাবে। পরপুরুষের নাকি পরস্ত্রীর নাম উচ্চারণ করতে নেই, এমন কি ঐতিহাসিকেরও — এই ছিল খানের মত। যতই হোক না কেন মাদ্রাসাতে পড়াশোনা করেছেন তিনি, প্রেমনিবেদন করে কবিতা লিখতে শিখেছেন।' একথায় মৃদু হাসি ফুটল বাবরের মুখে, কিন্তু খুশির ছোঁয়া নেই তাতে। খানজাদা বলে চললেন, 'আর শয়বানীর দলের লোকদের সে জ্ঞানটুকুও নেই আছে কেবল জান্তব শক্তি। শিল্পী বিজ্ঞানীরা ঐ সব সুলতানদের রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে — কেউ খোরাসান, কেউ ইস্তামবুল, কেউ বা কাবুল... এখন কেবল আপনি ভরসা, বাবরজান। সব শিক্ষিত লোকেরাই এখন আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, ভাইটি আমার, যে আপনিই আবার মাভেরান্নহরে পুরান দিনের সৃষ্টির আবহাওয়া ফিরিয়ে আনবেন। নিজের দেশে ফিরে যাওয়া দরকার, যে কালো মেঘগুলি শিক্ষা ও শিল্পকে আড়াল করেছে, সেগুলিকে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার!'

'বিজ্ঞান... শিক্ষা... সৌন্দর্য... কাব্য... এসব কিছুই তো শুনতে ভাল, কিন্তু এর উপর নির্ভর করে নেই এই দুনিয়াটা,' ভাবলেন বাবর আর তখনি প্রতিবাদ করলেন নিজেই, 'কিন্তু এ ছাড়া শুধু ক্ষমতা থাকারই বা কি মানে হয়?'

মাভেরান্নহরে তাঁর ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা যায়। শয়বানী খানের মৃত্যুর পরে সমরখন্দ আর আন্দিজানে পাঠিয়েছেন বাবর তাঁর অনেক বিশ্বাসী লোকেদের। তিনি জানেন: ঐ সব সুলতানদের অত্যাচারে জর্জরিত হাজার হাজার লোক বাবর মাভেরান্নহরে পৌঁছানমাত্র বিদ্রোহঘোষণা করতে প্রস্তুত।

'গত সপ্তাহে আন্দিজান, থেকে ভাল খবর এসে পৌঁছেছে,' বললেন বাবর যেন নিজেকেই উত্তর দিয়ে, 'সাইদ মুহম্মদ, যিনি মায়ের বংশের দিক থেকে আমাদের আত্মীয় হন, তিনি নিজের পক্ষে বেশ কিছু সমর্থক যোগাড় করে শয়বানীর দলের সুলতানদের দূর করে দিয়েছেন। সাইদ মুহম্মদ আমাকে লিখেছেন: 'কারাতেগিন পার হয়ে শীঘ্র আন্দিজান এসে পৌঁছান, আপনার পিতৃভূমি আছে আপার অপেক্ষায়!'

'তাহলে আপনি এখন আন্দিজান যেতে চান?' নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন খানজাদা বেগম।

আগের মতই উদাসীনভাবে মাথা নাড়িয়ে বাবর জানালেন না — তাঁর ইচ্ছা বিশ্বস্ত বেগদের নেতৃত্বে আন্দিজানে সৈন্যদল পাঠান আর নিজে হীসার পেরিয়ে দ্রুত সমরখন্দ পৌঁছাবেন। কিন্তু জানেন এমনভাবে দুজায়গায় যুদ্ধ চালাবার মত সৈন্যবল তাঁর নেই। তাছাড়া শাহ্ ইস্মাইলের কথাও ভাবা দরকার, ইস্মাইল প্রস্তাব দিয়েছেন শয়বানীর সুলতানের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে (খানজাদার সঙ্গে এসে পৌঁছান দূতের উদ্দেশ্য মোটামুটি জানা ছিল বাবরের, দূত বলার আগেই তা বুঝতে পেরেছেন তিনি কোন উদ্দেশ্য না থাকলে শাহ্ ইস্মাইল তাঁর বোনকে মুক্তি দিয়ে মহৎ কাজ করত না)।

নাঃ, আন্দিজান বা বিশেষ করে সমরখন্দ একা একা যাওয়া যাবে না কিছুতেই। বাবরের কাছে খবর এসেছে যে সাহসী সেনাপতি, শয়বানীপুত্র তৈমুর সুলতান শাহ্‌র কাছে উপঢৌকন সমেত দূত পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ না করেন যেন দুই শক্তিশালী পক্ষ মিলে যায়। 'নিজেরটা কেউ ছেড়ে দেয় না।' মিল দুই পক্ষের হতে পারে তৃতীয় কোন পক্ষের বিরুদ্ধে অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে, সবচেয়ে দুর্বলের বিরুদ্ধে, হ্যাঁ, আপাতত তিনিই সবচেয়ে দুর্বল। কিন্তু যদি তিনি ততদিন ইস্মাইলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন...

মেয়েদের সামনে তিনি বলতে লাগলেন শাহ ইস্মাইলের কবিপ্রতিভার কথা।

'আমাদের দূত মির্জাখান, তাঁকে আবার শীঘ্র পাঠাব তাঁর কাছে, তিনি একবার আমায় দেখিয়েছিলেন শাহ্‌র রচিত কবিতা। অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রতিভা তাঁর, আজেরবাইজানী ভাষায় অতি চমৎকার গজল রচনা করেন। আবার বিনয় করে নিজের কথা বললেন 'আনাড়ী।'

'এ ঠিক, তিনি দক্ষ কবি। তাঁর দলের লোকরা যখন তাঁর গজল গায় আমি শুনেছি। আর আমার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন আমার ভাইকে এই বলে তিনি প্রশংসা করেন 'শাহ্ বাবর আর কবি বাবরের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা পোষণ করি'। তারপর একটি গজলের দুটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন — আমাদের জাঁহাপনার অনেক গজলই হীরাটে গাওয়া হয় — আবৃত্তি করে বললেন 'দারুণ!'

এ প্রশংসা শুনতে অবশ্যই ভাল লাগল বাবরের। লজ্জিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন:

'আচ্ছা, সেটি কোন গজল?'

ঠোঁটের কাছে আঙুল রেখে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন খানজাদা বেগম। মহিম তাঁর সাহায্য এগিয়ে এলেন।

'এইরকম নাকি তার শুরুটা?'

অন্তর মোর গোলাপের কুঁড়ি, রক্ত ঝরেছে ফুলদলেও...

'হ্যাঁ, হ্যাঁ এটাই!' বলে বয়েতের বাকীটুকু খানজাদা বেগম নিজেই অবৃত্তি করলেন:

'আমার মনে হয় এই পংক্তিগুলি তাঁর ভাল লেগেছে শুধু শুধু নয়,' বললেন বাবর, 'তিনিও অল্পবয়সেই পিতৃহারা হয়েছেন, তাড়া খেয়েছেন, অনেক কষ্ট পেয়েছেন। শুনেছি এখন শাহ্ ইসমাইল ন্যায় প্রতিষ্ঠা চাচ্ছেন...

মহিম বেগম মৃদু হেসে স্বামীকে বললেন:

'দেখছেন তো জাঁহাপনা কাঁটা ছাড়া গোলাপ হয় না।'

বাবর প্রথমে তাকালেন স্ত্রীর দিকে তারপর বোনের দিকে, কোন বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়াই উত্তর দিলেন:

'কথায় বলে 'গোলাপ ফুল পেতে গেলে তার কাঁটার যত্নও করতে হয়। শাহ্ ইসমাইল আমাদের এত উপকার করেছেন...'

উঠে দাঁড়ালেন বাবর। শাহ্‌র দূতের সঙ্গে দেখা করার জন্য নির্দিষ্ট সময় এসেছে। মহিম বেগম স্বামীর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গেলেন।

বাবর বেশ জোরে জোরে বললেন:

'মনে করবে আমার বোন — আমাদের সবার আপন মায়ের মত।'

একথার আসল অর্থ বুঝলেন মহিম, বুকের ওপর হাত রেখে বললেন:

'মনে প্রাণে তা জানব... আর জাঁহাপনা, আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ, সতর্ক থাকবেন! কখনও কখনও বিষমাখান তীরকে ফুলের কাঁটা বলে মনে হয়।'

স্ত্রীর প্রতি ভালবাসায় ভরে গেল বাবরের মনটা, কৃতজ্ঞ বোধ করলেন তিনি তাঁর প্রতি এজন্য যে তিনি বাবরের চিন্তাভাবনায় অংশ নেন, বাবর বললেন:

'চিন্তা করবেন না, আমি তা জানি!'

তারপর মনে মনে ভাবলেন 'অর্থ বা অন্য কোন কিছুর কৃপণতা না করে যে কোন উপায়েই ইস্‌মাইলের সঙ্গে সন্ধি করতে হবে। তাকে এবং তার দূতকে উপহারে ভরিয়ে দিতে হবে।'

৩

উপহারগুলি ছিল সত্যিই অতি চমৎকার; দামী মুক্তা, বাদাখশানের চুনী, দামী দামী জরির পোশাক, সোনার হাতলওয়ালা তরবারি সূক্ষ্মরুচির বিলাসদ্রব্য। পাচকরা আর পাকশালার পরিচারকরা দু'দিন দু'রাত ধরে ভোজউৎসবের জন্য রান্না করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এমন ভোজ কুন্দুজে এর আগে কেউ দেখেনি। আশীটিরও বেশি হীসারের ভেড়া জবাই করা হয়েছে, ওদিকে হাঁস, মুরগি, আর শিকারীদের শিকার করা হরিণ যে কত কাটা হয়েছে তার আর হিসাবই নেই।

বাবরের পরামর্শদাতা, মির্জা খান, অনেকবারই শাহ্ আয়োজিত ভোজসভায় অতিথি হয়েছেন, বাবরকে বললেন তিনি:

'ওদের দেশে মদ ছাড়া ভোজউৎসব হয়ই না।'

বাবরের প্রধান উজীর কাসিমবেগ মদের বিরোধী ছিল, বাবর নিজেও এ পর্যন্ত মদ কখনও ছোঁননি।

এখন তাঁর মনের অসীম আনন্দের সঙ্গে কখনও কখনও দেখা দিচ্ছে এক অদ্ভুত উৎকণ্ঠাও যেন তাঁর মন চাইছে না ঐ কঠিন খেলায় অংশ নিতে অথচ সেই খেলাকে এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তিনি ভাবলেন শাহ্ ইস্মাইলই এর কারণ। তাঁর ইচ্ছা হল সব কিছু ভুলে যেতে, এই উৎকণ্ঠাকে দূরে সরিয়ে রাখতে, অন্তত ভোজসভা চলার সময়ে। তাছাড়া অতিথিরা যখন পান করছেন তখন আমন্ত্রণকারীকেও পান করতে হয়।

প্রচুর সুগন্ধি ও কড়া মাইনব ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্য প্রাসাদে আনা হয়েছে কুন্দুজে যতটা জোগাড় করা সম্ভব।

ফুলকাটা কামিজ পরে তরুণ পানীয় পরিবেশকরা সোনার ও রূপোর পাত্রে পানীয় ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে। পানপাত্র এগিয়ে দেওয়া হল বাবরকে, তারপর তাঁর কাছে বসে থাকা শাহ্‌র দূত উজীর মুহম্মদজানকে ও মির্জাখানকে।

ভোজসভায় উপস্থিত আছেন শতখানেকেরও বেশি বেগ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা। তাদের অনেকেই, বাবর ও কাসিমবেগের অজ্ঞাতে, বাবর আয়োজিত এর আগের ভোজসভাগুলিতে মদ্যপান করেছে আর এখন তো খোলাখুলিই পাত্র হাতে তুলে ধরে জাঁহাপনার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে। পদমর্য্যাদায় যারা নিচে সেই সব বেগদের মধ্যে তাহির বসে আছে, আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পান পাত্রের দিকে যেন জীবন্ত কোন কিছু সেটা: কেমন যেন টানছে।

মির্জা খান ঝাঁকড়া ভ্রূ নাচিয়ে ফিসফিস করে দূতকে বলল:

'মহামান্য অতিথি, আপনি এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী — মির্জা বাবরের প্রাসাদে ভোজে এই প্রথম মদ্য পরিবেশন করা হয়েছে!... লক্ষ্য করুন, আমন্ত্রিতদের মধ্যে কেমন সাড়া পড়ে গেছে।'

খাড়ানাক, লালদাড়ি দূতটি চোখে অকপট ঔৎসুক্য নিয়ে তাকাল পানীয়ের দিকে, লালমুকুটের প্রতীক লাগান বিশাল উষ্ণীষটি নাড়ালেন, তারপর চেরারাঙান দাড়ি বাবরের দিকে ফিরালেন।

পানপাত্রটা হাতে তুলে নিয়েছেন বাবর, এমনভাবে ধরে আছেন সেটিকে যেন সেটা এক পাখী এখুনি ডানা ঝটপট করে উড়ে চলে যাবে বা তাঁর হাতে ঠুকরে দেবে। সবাই অপেক্ষায় আছে কি বলেন বাবর, আরম্ভ করলেন তিনি:

'আনন্দের দিনে সম্মানিত অতিথিপরিবৃত হয়ে প্রথমশ্রেণীর আঙুর দিয়ে প্রস্তুত

মদ্যপান করার প্রথা চলে আসছে আমাদের পিতা-পিতামহের কাল থেকেই। এ পর্যন্ত আমাদের জীবনে আনন্দের চেয়ে দুঃখই ছিল বেশি তাই আমরা মদ্যপান করে উৎসবপালন করিনি কখনও। কারণ তখন আমাদের দায়দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি তাই আমোদ আহ্লাদে গা ভাসিয়ে দেওয়ার সময় ছিল না। কিন্তু খোদার কৃপায় আজ আমাদের এমন আনন্দের দিন এসেছে যার কারণ হল ইরানের মহামহিম শাহ্ ইস্‌মাইলের উদারতা। আর আজকের আনন্দ আমাদের মহামান্যবর অতিথির উপস্থিতির কারণেও তাই প্রথম পাত্র পানীয় আমরা পান করব শাহ্ ইস্‌মাইলের প্রতি আমাদের অসীম শ্রদ্ধার আর তাঁর উজীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মুহম্মদজানের প্রতি বন্ধুত্বের সম্মানে!'

এই কথাগুলি দূতের হৃদয়স্পর্শ করল, সে উঠে দাঁড়িয়ে নত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল বাবরকে, চোখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার। তারপর বসে পড়ে একচুমুকে নিঃশেষ করে দিল পানীয়। বাজনদাররা বাজাতে লাগল 'সারভি নাভো' সুর। দূত পিছনে, সামান্য দূরে বসে থাকা সহকারীকে কি যেন বলল নীচুস্বরে, সে উঠে একপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। 'সারভি নাভো' বাজান যখন শেষ হয়েছে তখন দূতের সহকারী এসে উপস্থিত হল, তার হাতে ধরা সোনার থালার উপর সাদা রেশমী কাপড় চাপা দেওয়া কি একটা বস্তু।

ভোজের আগেই মুহম্মদজান বাবরের হাতে তুলে দিয়েছে শাহ্‌র চিঠি আর তার পাঠান সোনা রূপার তৈরী নানান উপহারদ্রব্য। 'এতে আবার কি আছে?' ভাবলেন বাবর, সবাই সকৌতূহলে তাকিয়ে রইল থালার দিক।

নিস্তব্ধ সভার মধ্য দিয়ে লোকটি উপহার নিয়ে বাবরের কাছে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে দাঁড়াল। মুহম্মদজান উঠে বলল:

'ইরানের বন্ধু মহামান্য সুলতান জাহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর দুনিয়ার ইমাম বাদশাহ্ ইস্‌মাইলের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন তার প্রতিদানে ইমামের পক্ষ থেকেও তাঁকে সম্মানিত করা হচ্ছে। এই ভোজসভার মালিককে বাদশাহ্‌র এই উপহার গ্রহণ করতে অনুরোধ করি!'

দূত সাদা রেশমী কাপড়টি তুলে নিল, দেখা গেল থালায় রয়েছে চুণী-মুক্তায় সাজান একটি উষ্ণীষ আর তার উপরে আছে লাল মুকুটের ছোট্ট একটি প্রতীক। চোখ বুলিয়ে গুণে নিলেন বাবর বারোটি ভাঁজ তাতে...

মদ্যপানের ফলে বাবরের মুখচোখ লাল, মাথা ঝিমঝিম করছে, কিন্তু চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি, তাঁর চোখগুলি সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করল কেমন কান খাড়া করে বসে আছে তাঁর বেগরা, উত্তেজিত হয়ে ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে। বাবর দেখলেন কাসিমবেগ আর একটু দূরে বসে থাকা শেখ-উল-ইসলাম খাজা খালিফা উষ্ণীষটি দেখে কেমন যেন আঁতকে উঠল।

থালা ধরে থাকা লোকটি বাবরের দিকে এগিয়ে ধরল উষ্ণীষটি, শাহ্‌র দূত আর একবার নত হয়ে কুর্নিশ করল।

এভাবে ইসমাইল বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছে, ইসমাইল। সে হাত বাবর যদি না তুলে নেন হাতের মধ্যে, তো... শয়বানীর দলের লোকেদের সঙ্গে সন্ধি হবে শাহ্‌র, তাহলে বাবরের সামনে বন্ধ হয়ে যাবে জন্মভূমিতে ফেরার পথ। এতদিন ধরে তিনি কামনা করেছেন জন্মভূমিতে ফেরার পথ ধরার, সে পথে বাধা হলে পাহাড়-নদী সবকিছু গিলে ফেলতে রাজী তিনি।

দূতের দিকে ফিরলেন বাবর:

'মহামহিম শাহ্‌প্রেরিত উপহার আমাদের কাছে অমূল্য।' তারপর খানিক চুপ করে থেকে এক অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করে বসলেন: 'আমাদের মহামান্য অতিথি উজীর মুহম্মদজান ইমামপন্থী, ঠিক কি না?'

'আল্লার দোয়া — ঠিক! আর হামিদউলইলো!' পবিত্র, কোরানের শপথবাক্য উচ্চারণ করল সে।

কাসিমবেগের দিকে ফিরল বাবর:

'আর আপনি, মহামান্য আমীর আল্‌ উমারো?' কাসিমবেগও সেই একই শপথবাক্য উচ্চারণ করে বলল:

'আমাদের পয়গম্বর মুহম্মদের চার সহকারী আপনার চিরসহায় থাকুন!...'

দূতের মুখ ম্লান হয়ে গেল।

'মহামহিম উজীর মুহম্মদজান!' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন বাবর, 'পবিত্র কোরানে লেখা আছে 'কুল্লি মুসলিমিন ইখবাতুন' অর্থাৎ সমস্ত মুসলমান পরস্পরকে ভাই বলে মনে করবে। ইমাম পন্থীমুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসকে সম্মান করি আমরা, আশা করি আমাদের ধর্মবিশ্বাসকেও সম্মান করবেন আপনারা!' বাবর দু'হাত ছড়িয়ে দিলেন যেন তাঁর সমস্ত বেগ ও অন্তরঙ্গদের আলিঙ্গন করলেন।

একটু নরম হল দূত, যেন সব বুঝেছে এমনি মাথা নাড়াতে লাগল।

'মহান শাহ্‌র এই উপহার আমাদের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনেরই নিদর্শন!'

আবার কাসিমবেগের দিকে ফিরলেন বাবর:

'পবিত্র আলিকে আমরা সর্বদা স্মরণ করি ঠিক কিনা? তিনি তো চারইয়ারদের* একজন?'

'ঠিক, জাঁহাপনা!'

'তার মানে পবিত্র আলি ও বিবি ফতিমার পুত্রইমামদের যদি আমরা সম্মান করি তবে আমরা এমন কোন কাজ করব না যা আমাদের মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধ, তাই তো?'

---

* চারইয়ার — প্রথম চারজন খলিফা

এতক্ষণে কাসিমবেগ বুঝল কোনদিকে কথাবার্তা নিয়ে যাচ্ছেন বাবর, আর এও বুঝল ইস্‌মাইলের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে আর বাধা দেওয়া যাবে না বাবরকে। আর কাসিমবেগ নিজেও জানে এই সন্ধি কতখানি প্রয়োজন বাবর আর তাঁর লোকজনদের পক্ষে। তাই শাহ্‌র এই উপহার নিতেই হবে আর বাবর তা নিতে চাচ্ছেন আত্মমর্যাদা না হারিয়ে, যোদ্ধার মত কূটনীতির মাধ্যমে। কাসিমবেগের মনে হল এবার বাবরকে রক্ষা করা দরকার তাদের হাত থেকে যারা এতসব কথা বুঝতে চায় না। মাথা নিচু করে অপরাধীভাবে বলল কাসিমবেগ:

'আপনি যথার্থ বলেছেন জাঁহাপনা, দাসের অপরোধ ক্ষমা করুন!'

চোখে প্রশংসার দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন বাবর কাসিমবেগের দিকে অর্থাৎ ক্ষমা করলাম। ওদিকে উষ্ণীষসমেত ভারী থালা ধরে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে লোকটি, সামান্য কাঁপছে তার হাতগুলি। চোখমুখে দৃঢ়তার ভাব নিয়ে নির্ভয়ে উষ্ণীষটি দু'হাতে ধরে তুলে নিলেন বাবর। দীর্ঘশ্বাস পড়ল বেগদের।

'মহান শাহ্ ইসমাইলের এই দান আমরা পবিত্র বলে মনে করি, এ আমাদের চোখের মনির মত! আল্লাহ্ তাঁর সহকারীর মঙ্গল করুন!' উষ্ণীষটি কপালে ছোঁয়ালেন বাবর।

মুহম্মদজানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ আমরা, জাঁহাপনা!'

ওদিকে বেগদের মধ্যে যারা সম্প্রতি এসে যোগ দিয়েছে সেইসব মোগলের মধ্যে গুঞ্জন আরম্ভ হল, আলাদা করে শোনা যাচ্ছে কিছু লোকের গলায় বিরক্তি আর ঘৃণা।

কাসিমবেগের মুখ সাদা হয়ে গেছে। মুহম্মদজান বলতে আরম্ভ করল:

'মির্জা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইরানের মহামান্য শাহ্‌র সহায়তায় আপনি আবার সমরখন্দের সিংহাসনে বসবেন, আশা করি তখন আমরা আপনার মাথায় এই পবিত্র উষ্ণীষটি দেখতে পাব!'

ভোজসভার সারা সময়ে বাবর এই কথা শোনারই প্রত্যাশায় ছিলেন।

'যদি আল্লাহ্‌র কৃপায় সে সুখের দিন আসে তবে আমরা নিশ্চয়ই পরব এ উষ্ণীষ। একথাই বলবেন শাহ্ ইসমাইলকে!'

মোগল বেগরা এবার আরো শুনিয়েই রাগ প্রকাশ করতে লাগল, তাতে আরো ভালোই হল বাবরের পক্ষে: শাহ্‌র দূত বিশ্বাস করল যে শাহ্‌র সঙ্গে দৃঢ় সন্ধি স্থাপনের জন্য বাবর এমনকি সবচেয়ে দুর্ধর্ষ বেগদেরও বিরুদ্ধে গেছেন।

ভোজসভার পরে পরস্পরের প্রতি যে আস্থার মনোভাব সৃষ্টি হল তার ফলে সন্ধিচুক্তির আলাপ-আলোচনা চালানো অনেক সহজ হল, যদিও আলোচনার বিষয়বস্তু খুব সহজ ছিল না। শয়বানীর দলের লোকদের বিরুদ্ধে জোটবাঁধার প্রস্তাব দিয়ে ইস্‌মাইল চাইছে যে তার সৈন্যদল বাবরের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলে মাভেরান্‌নহরের

দিকে যাবে। কিন্তু তা বাবরের ইচ্ছা নয়। এর আসল কারণটা তিনি যদিও শাহ্‌র কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন, কিন্তু নিজে খুব ভালো করেই জানেন। যদি তিনি নিজে প্রধান বিজয় লাভ করায় সক্ষম না হন তো পিতৃভূমি ফেরা তাঁর পক্ষে সম্মানেরও হবে না দীর্ঘস্থায়ীও হবে না। লোকে যে বলবে 'ইস্‌মাইলের বর্শার হাতলে চড়ে ফিরে এসেছে,' তা চলবে না।

বাবর দূতকে বোঝাতে লাগলেন যে মার্ভের কাছে শাহ্‌র বিজয়ই অর্ধেকের বেশি কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে, এবার শাহ্‌র সৈন্যরা বিশ্রাম নিতে পারে, শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা এবার বাবরের। তার উত্তরে দূত বলল 'শাহ্‌র সৈন্যরা নিজেরাই অত্যন্ত ইচ্ছুক সমরখন্দ যেতে।' তখন বাবর অন্যদিকে কথা ঘোরালেন। আচ্ছা, দু'দিক থেকে আলাদা আলাদাভাবে আক্রমণ করলে কেমন হয়? বাবরের সৈন্যদল রয়েছে হীসারের কাছে। আর হীসার পৌঁছতে গেলে শাহ্‌র সৈন্যদলকে কয়েকশ' ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে হবে, পাহাড়, জলাভূমি পার হতে হবে। শুধু শুধু কষ্ট করার দরকার কি? সমান পথে মার্ভ থেকে তেরমেজ শাহ্‌রিসিয়াব্‌জ হয়ে সমরখন্দের দিকে যাওয়াই কি ভাল না? আর ইতোমধ্যে বাবর পিয়ান্দজ আর বাখ্‌শ তাড়াতাড়ি করে পেরিয়ে হীসারে শয়বানীর দলের লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন, যাতে দক্ষিণদিক থেকে সমরখন্দ আসার পথ খুলে যায়?

শেষে দূতকে রাজী করাতে সক্ষম হলেন বাবর। যুদ্ধচুক্তি স্বাক্ষরিত হল যার মূলে রইল বাবরের পরিকল্পনা।

৪

হিন্দুকুশ পাহাড়ের উত্তরপশ্চিম পাদদেশে বাবরের সৈন্যদলের প্রধান অংশ পৌঁছে গেছে, তার হীসারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত, বসন্ত প্রায় বিদায় নিতে বসেছে, এমন সময় এক দিন কাসিমবেগ জানাল যে শয়বানীর দল থেকে সম্প্রতি তাঁর দলে এসে যোগ দিয়েছে যে মোগল বেগরা তাদের মধ্যে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠেছে। সেই সব বেগদের অধীনে আছে বিশহাজার সৈন্য যারা সর্বদাই লড়াই করে যেতে প্রস্তুত। এটাই তাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়, তাই যে শাসক বেশি উদারহাতে তাদের ভরিয়ে দেবেন বা যে যুদ্ধে লুঠের বেশি সুযোগ তখুনি তারা দল বদলে সেই শাসকের পক্ষে বা যুদ্ধে যোগ দিতে রাজী। বাবরের জয় হবে বুঝতে পেরেই তারা বাবরের দলে এসে যোগ দিয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে বেশ কিছু লোক আছে যারা পূর্ববর্তী মালিকদের সমর্থন করে। তারা গুজব রটাতে থাকল যে বাবর প্রতারক।

গোপন ষড়যন্ত্রের নেতা হল কামবারালি, এতদিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিল যে সে বাবরের শত্রু কারণ গতবছরে তার ছোট ভাইয়ের ফাঁসী হয় অন্য একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

থাকার জন্য। কামবারালি বেশ কিছু এমন লোক জোগাড় করেছে যারা বাবরের পতন চায়। কিন্তু অভিজাতবংশের একজন লোক চাই তাদের যাকে বাবরের জায়গায় বসান হবে। তারা নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বেছে নিল বাবরের মামা ওলাচ খানের সতেরোবছর বয়সী ছেলে সাইদ খানকে, যাকে প্রতিপালন করেন বাবর। কামবারালি তাকে নিজের জালে টানার চেষ্টা করল কিন্তু দেখা গেল সে অত্যন্ত সৎ। আর যথেষ্ট ধূর্তও — ওই ষড়যন্ত্রের প্রতি তার মনোভাব কিছু জানতে দিল না মোগল বেগদের, কথা দিল তাদের প্রস্তাব ভেবে দেখবে তারপর এই ষড়যন্ত্র পাকানর কথা জানিয়ে দিল কাসিমবেগকে।

পাহাড়ের কাছে লোকজনের থেকে দূরে যখন বাবরের সঙ্গে যাচ্ছিল কাসিমবেগ ঘোড়ায় চড়ে তখন এসব বাবরকে জানাল সে। এই খবরে প্রথমে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন বাবর।

'শয়তান বেগের দল! কতদিন আর ওরা এইভাবে আমার পিঠে ছোরা বসাবে? মনে আছে আপনার — আন্দিজানের আহমদ তনবালও মোগল! ওদের ধরে চারটুকরো করে ফেলা হোক — শকুনিতে কুরে খাক ওদের দেহ!'

ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে কাসিমবেগ পাহাড়গুলির পাদদেশে দৃষ্টি ঘোরালেন, হাজার হাজার তাঁবু পড়েছে সেখানে।

'ওরা সংখ্যায় অনেক, আলমপনা। বিশহাজার সৈন্য ওদের অধীনে।'

'সব মোগলই কি ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে?'

'সবাই নয়। সাইদ খান নিজেও তো মোগল বংশোদ্ভুত কিন্তু আপনার প্রতি বিশ্বস্ত অন্যান্য মোগলদের মধ্যেও হাজার হাজার বিশ্বস্ত লোক আছে।'

'তাদের উপরই নির্ভর করতে হবে আর কামবারালি আর ষড়যন্ত্রকারী বেগদের বন্দী করতে হবে...'

'কামবারালির প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি। বেগদের মধ্যে তার প্রচুর আত্মীয়। তারা সবাই অত্যন্ত প্রতিশোধপরায়ণ। যদি আমরা এখন দলের মধ্যে শত্রুনিধন আরম্ভ করি তো বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে এই কঠিন অভিযান কি চালাতে পারব? সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে না যায় যেন।'

কাসিমবেগ যথার্থই বলেছে। বিশহাজার সৈন্যরা দলের মধ্যে যদি অনুসন্ধান চালিয়ে শাস্তি দেওয়া আরম্ভ হয় তো এতে অনেক সময় যাবে, অভিযানে যাবার উপযুক্ত সময় পেরিয়ে যাবে আর পিতৃভূমিতে ফিরে যাবার পথও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এদিকে বাবর পিতৃভূমিতে ফিরে যাবার জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত।

যখন বাবর পক্ষে-বিপক্ষে সব যুক্তিগুলি ভাল করে ভেবে দেখলেন তখন রাগের বদলে প্রচণ্ড দুঃখ হল তাঁর।

'বিশ্বাসভঙ্গকারী। জানে কখন ঘা দিতে হয়! কামবারালির মত মোগলাই এমন

নীচ প্রতারণা করতে পারে। আবার ধর্মবোধ, নীতিবোধের কথা বলে আমার বিরুদ্ধে!'

'জাঁহাপনা, আপনি যথার্থ বলেছেন কিন্তু... প্রতারকদের সঙ্গে তেমন ব্যবহার করা উচিত নয় যেমন ন্যায় যুদ্ধে... আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য অন্য ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে।'

'কি সে ব্যবস্থা?'

'সাইদ খান আপনার প্রতি তার আনুগত্য প্রমাণ করেছে তো? ষড়যন্ত্রীকারী বেগরা (জনা-দশেক বেগ কামবারালির নেতৃত্বে) তাকে খান করতে চায়। সেই তাদের শাসক হোক। 'এই সাইদ খান — তোমাদের শাসক,' ওদের বলব আমরা। 'নিজেদের সৈন্যদের নিয়ে তোমরা আন্দিজান চলে যাও।' আন্দিজান তো ইতোমধ্যেই আমাদের পক্ষে যোগ দিয়েছে। সাইদ খান সেখানে গিয়ে আপনার প্রতিনিধি হয়ে শাসনভার নিক। এইভাবে আমরা কামবারালির হাত থেকে রেহাই পাব!'

'আর তারপর অন্যান্যরা যদি বিশ্বাসভঙ্গ করে?'

'সে সম্ভাবনা খুবই কম... কিন্তু বাকী যারা অসন্তুষ্ট তাদের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলব। বলব, আমি মির্জা বাবরের কাছে তোমাদের হয়ে ক্ষমা চেয়েছি তাই তোমাদের প্রাণ বেঁচেছে, কিন্তু দেখো — দ্বিতীয়বার তোমাদের হয়ে কথা বলব না কিন্তু... আর, আরও বেশি সন্দেহজনক লোকদের পিছনে আমার লোক লাগান থাকবে। বিপদের সম্ভাবনা বাড়তে থাকলেই আমি তাদের ধরে ফেলতে পারব...'

দীর্ঘশ্বাস পড়ল বাবরের: সাইদ খানকে এই খেলায় কজে লাগানোর পরিকল্পনা ভাল লাগল না তাঁর কিন্তু অন্য কোন উপায়ও তিনি আর খুঁজে পেলেন না।

গ্রীষ্মের শুরুতে বাবরের সৈন্যদল (সেই মোগল সৈন্যরা ছাড়া যারা শেষ পর্যন্ত সাইদ খানের সঙ্গে আন্দিজানের চলে যায়) পিয়ানজ নদী পেরিয়ে বাখ্‌শ উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছল।

শয়বানীর দল জানত, যদি বাবরের সৈন্যদল তেরমেজের দিক থেকে আসা শাহ্‌ ইস্‌মাইলের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দেয় তো তাদের জয়ের আর কোন আশাই থাকবে না। তাই উবাইদুল্লা সুলতানের নেতৃত্বে কিছু সৈন্য কারশি আর সমরখন্দে রেখে প্রধান শক্তি সংগ্রহ করল তারা হীসারে। তৈমুর সুলতান, জানিবেগ সুলতান, হামজা সুলতান ও মাহ্‌দি সুলতানের নেতৃত্বে ত্রিশহাজার সৈন্যের ঘোড়সওয়ার বাহিনী দ্রুত স্তেপভূমি অতিক্রম করে পাহাড়ে উঠতে লাগল, বাবর যাতে বাখ্‌শ পেরিয়ে আসতে না পারে তাতে বাধা দেওয়ার জন্য।

কিন্তু পাহাড় বেয়ে দ্রুত নামতে থাকা বাবরের বাহিনী শত্রুদের চেয়ে আগেই এসে পৌঁছল বাখ্‌শের তীরে, পুলি সানগিন পুল দিয়ে নদী পেরিয়ে তারা গিরিখাতের মুখে

পাহাড়ের খাঁজের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করে রইল। সুলতানদের সৈন্যদল গিরিখাতের কাছে এসে, তার মধ্যে যাবে কি যাবে না স্থির করতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাবর উপর থেকে দেখতে পেলেন সুলতানরা ঘোড়া থেকে না নেমেই অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ চালাল, তর্ক করল। তারপর তৈমুর সুলতানের পতাকা বওয়া দশহাজার সৈন্য গিরিখাদের ডানদিকে গেল। দেখে মনে হচ্ছে, বাবরের দখল করে থাকা পাহাড়ের ওপরের অংশটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলতে চায় তারা। কিন্তু এ পাহাড় তো আর সারিপুলের সমভূমি নয়। তৈমুর সুলতানের দশহাজার সৈন্যের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য মির্জা খানের নেতৃত্বে দশহাজার সৈন্য পাঠান হল। তৈমুর সুলতানের সৈন্যরা পাহাড় ঘুরে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার আগে মির্জা খান সোজাপথে সেখানে পৌঁছে গিয়ে উপরের সব উপযুক্ত জায়গাগুলি দখল করে বসে রইল। সরু সরু যে পাহাড়ী পথগুলি উপরে চলে গেছে সেগুলি দিয়ে উঠে শত্রুর দিকে এগিয়ে চলল তৈমুর সুলতানের বাহিনী, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লড়াই করে চলল তারা প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে, কিন্তু উপর থেকে নেমে আসা পাথর আর তীরবৃষ্টি বাবর বাহিনীকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা বানচাল করে দিল।

তৈমুর সুলতানের বাহিনী উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত, সঙ্কীর্ণ গিরিপথে, চারদিকে খাড়াপাহাড়ের খাঁজ, এর ফলে তাদের দ্রুতগতি বা মনের সাহস কোনটাই তেমন ছিল না। ঘোড়াগুলির জিনলাগাম পাহাড়ী পথে ওঠার উপযুক্ত ছিল না তাই খাড়া পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠবার সময় হুড়মুড় করে পড়তে লাগল আহত আর মৃত ঘোড়াগুলি, আর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল আহত ও মৃত সৈন্যরাও। জীবিত সৈন্যরাও গড়িয়ে পড়ছিল নীচে এমন অসম যুদ্ধে দিশাহারা হয়ে গেছে তারা। তাদের মধ্যে একজনকে ধরে বাবরের কাছে আনা হল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে তাদের দলের সবচেয়ে শক্তিশালী সৈন্যধ্যক্ষ উবাইদুল্লা সুলতান নেই এদের মধ্যে। আর বাকীরা বাবরের সৈন্যদলকে ঘিরে ধরার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবার পর কি করে লড়াই চালাবে বুঝতে পারছে না।

বাবর জানতেন যে নিচে যেখানে এখন শত্রুরা রয়েছে তার থেকে বেশ দূরে আছে জল। এদিকে গরম প্রচণ্ড বাড়ছে। গিরিখাতের মুখ থেকে ক্রোশদেড়েক দূরে আছে তাঁর লোকেরা, একটু বাদেই যে জলের প্রয়োজন হবে তা বোঝা যাচ্ছে।

সন্ধ্যা নামছে। সূর্য ঢলে পড়েছে। ঘোড়া থেকে নামলেন বাবর। নিচে থেকে দেখা যায় উপরে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা বাবরের হাজারখানেক ঘোড়সওয়ার সৈন্য ইচ্ছে করে দেখিয়ে দেখিয়েই ঘোড়া থেকে নামল।

তার মানে লড়াই আজকের মত স্থগিত রাখা হচ্ছে?

তাই মনে করে নিল সুলতানরা; নিচ থেকে তারা দেখল বাবর কি করলেন। কিন্তু

তারা দেখতে পেল না গিরিখাতের লুকান খাঁজগুলির আড়ালে বাবরের সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

সুলতানরা তাদের বাহিনীকে বিশ্রামের আদেশ দিল। ছড়িয়ে পড়ল সৈন্যদল। অনেক সৈন্য পিছনে রাস্তার দিকে গেল জলের জন্য।

'চলো সবাই! আরো জোরে!' চীৎকার করে আদেশ দিলেন বাবর। 'পিছু হঠে যাচ্ছে শত্রুসৈন্য! ধর ওদের, মার, আবার সারি বাঁধার আগেই ওদের মারতে আরম্ভ কর!'

গিরিখাত দিয়ে ঢেউয়ের মত বেরিয়ে আসতে লাগল বাবরের বারোহাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্য। আর তিনহাজার সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল উপর থেকে তাদের আগে আগে খোলা তলোয়ার হাতে ঘোড়া ছুটিয়েছেন বাবর...

শত্রুসৈন্য আতঙ্কিত হয়ে পালাতে আরম্ভ করল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তাদের সৈন্যদল। শত্রুসৈন্য তাকে ঘিরে ফেলবে এই ভয়ে তৈমুর সুলতান দূরের একটা গিরিপথের দিকে পালাল। যখন সামান্য অন্ধকার হয়ে গেছে তখন মুহম্মদ দুলদাই খামজা সুলতানের বাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্যকে কেটে ফেলে খামজা সুলতানকে বন্দী করল। খাজা কালোনের নেতৃত্বে প্রায় মাঝরাতে সৈন্যরা জীবন্ত বন্দী করল মাহ্‌দি সুলতানকে।

এই সুলতানরা কারকুল ও আন্দিজানের অধিবাসীদের ওপর প্রচুর অত্যাচার চালিয়েছে। তাদের মাথা কেটে ফেলতে আদেশ দিলেন বাবর।

৫

স্বচ্ছ আকাশে উড়ছে রূপালী মাকড়সার জাল, তার সূতাগুলি সাদা রেশমের চেয়েও কোমল। গাছে গাছে বেদানা আর আপেলে পাক ধরেছে; সুস্বাদু আঙুরের থোলো ঝুলে আছে। শরৎঋতু, সমরখন্দের চমৎকার শরৎঋতু!

শহরের সমস্ত প্রবেশপথ উন্মুক্ত; দশদিন হল শহরে কোন সৈন্যবাহিনীও নেই, কোন শাসকও নেই। শয়বানীর দল বাখশের তীরে পরাজিত হবার পর আবার শক্তিসংগ্রহ করার চেষ্টা করে যাতে আবার বাবরের সঙ্গে লড়াইতে নামা যায় গুজার বা কারশির কাছাকাছি। কিন্তু শোনা গেল যে শাহ্‌ ইস্‌মাইলের পাঠান ত্রিশ হাজার সৈন্য এসে যোগ দিয়েছে বাবরের সৈন্যদলের সঙ্গে। সুলতানরা তখন কারশি, বুখারা, সময়খন্দ ফেলে পালিয়ে গেল, যাবার সময় সঙ্গে করে তাড়িয়ে নিয়ে গেল গোরুভেড়ার দল আর সর্বত্র শস্য লুঠ করে নিয়ে গেল যতটা পারল। মাভেরান্‌নহরের কৃষকরা এই দীর্ঘ যুদ্ধ চলার সময়ে আরও একবার লুণ্ঠিত হয়েছে, শয়বানীর সুলতানদের আর বেগদের অত্যাচারে তারা জর্জরিত ছিল তাই তারা এর থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাবরের অপেক্ষায় ছিল।

এবার বাবর শাহ্‌র সৈন্যদলের সঙ্গে মিলে সমরখন্দের দিকে এগোলেন দক্ষিণদিক থেকে নয়, উত্তর পশ্চিম দিক থেকে, এর আগেই তিনি কারশি, বুখারা দখল করেছেন।

সমরখন্দের বিশজন প্রতিপত্তিশালী লোক দুর্গপ্রাসাদের চাবি আর দামী দামী উপহার নিয়ে শহরের বাইরে বাবরকে অভ্যর্থনা জানাল। চাররাহ্‌ প্রবেশপথের দিকে যাবার রাস্তায় দু'পাশ লোকে লোকারণ্য। আর শহরের মধ্যে সর্বত্র ঝোলান হয়েছে সুন্দর গালিচা—চারদিকে আনন্দ হৈ-হল্লা, বাড়িগুলির ছাদে, ফটকের উপরে বাজনদাররা বসে আছে: সমরখন্দে বাজনা ছাড়া উৎসব সম্ভব নাকি? সমরখন্দবাসীরা ইতোমধ্যেই হীসারে বাবরের জয় লাভ এবং সমরখন্দ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে কবিতা রচনা করে ফেলেছে। সেই সব কবিতার কিছু ছত্র রাস্তার উপর অথবা দোকান বা ফটকের উপর টাঙান সাদা কাপড়ের ওপর লেখা রয়েছে। যে পিতৃভূমি একদিন ছেড়ে যেতে হয়েছে বাবরকে অপমানিত ও গৃহহারা অবস্থায় সেই পিতৃভূমিতে যে এমন অভ্যর্থনা পাবেন তা আশা করেননি তিনি। শহরের প্রধান রাস্তা দিয়ে কোক-সরাই প্রাসাদে যাবার সময় রেগিস্তানের চত্বরে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের প্রিয় উলুগবেগের মাদ্রাসা, আনন্দ কোলাহল দেখে বাবরের শরীরে কেমন এক কাঁপুনি ধরল আর চোখে দেখা দিল জল। সেই আগের মত ছেলেমানুষীভাব নিয়ে বরাবরের মত পাশে পাশে চলতে থাকা কাসিমবেগকে বললেন:

'বিশ্বাস হচ্ছে না, এ স্বপ্ন না সত্যি?'

'সত্যি, জাঁহাপনা! সত্যি!'

বাবরের দেহরক্ষীদের পিছনে চলেছে লাল চিহ্নদেওয়া বড় বড় পাগড়ী মাথায় ইস্‌মাইল শাহের বেগরা, চলেছে বেশ জাঁক দেখিয়ে; তাদের মধ্যে আছে: আহমদবেগ সুফী অগলি, শাহ্‌রুখ বেগ আফসর, পুরান পরিচিত উজীর মুহম্মদজান ও অন্যান্যরা। মুখে তাদের ফুটে উঠেছে গর্ব, পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে: 'আমরা না সাহায্য করলে বাবরকে আর সমরখন্দ দেখতে হত না!'

শয়বানীর সুলতান বেগদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সমরখন্দবাসীর এত আনন্দ। কিন্তু যখন শাহ্‌র সৈন্য বাজনদারদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে তখন একসঙ্গে সব বাজনা থেমে গেল। জানুক যে শিয়াপন্থীদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না তারা—জানাচ্ছে বাবরকে।

শাহ্‌র সৈন্যদের নিষ্ঠুরতার কথা, তারা লোকদের বাধ্য করছে শিয়াপন্থী হতে এমন সব ভয়ঙ্কর গুজব কার্শি, বুখারার মত সমরখন্দেও ছড়িয়ে পড়েছে।

সমরখন্দের সুন্নিপন্থী জনগণ উদ্বেগ আর ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে রইল ঐ শক্তিশালী বিদেশী সৈন্যদলের দিকে। তাদের প্রতি এই উত্তাপহীন ব্যবহার বুঝতে পারছে শাহ্‌র সৈন্যরা, তাই বাবরের প্রতি যে সম্মান-শ্রদ্ধা দেখান হচ্ছে তাতে বিরক্তি লাগছে তাদের। এমনি হয়েছে কার্শিতে, বুখারাতেও আর এবার সমরখন্দে।

বাবর তাঁর দেশের লোকদের মনে আতিথ্য জাগাবার চেষ্টা করলেন, আদেশ দিলেন নকীব যেন শহরের চত্বরে এবং রাস্তাঘাটে ঘোষণা করে 'শাহ্ ইসমাইলের বীর সৈন্যরা আমাদের প্রিয় অতিথি!' শয়বানীর দলের বিরুদ্ধে জয়লাভের উপলক্ষে বাবর সমরখন্দে এক ভোজসভা আয়োজন করলেন—তাতে আমন্ত্রিত হল দেশবাসী আর বিদেশী অতিথিরাও—তিনদিন ধরে আমোদ-আহ্লাদ চলল।

দশবছর আগে যখন শয়বানী শহর দখল করে রেখেছিল তখন বাবর, তার পরিবার আর অন্যান্য লোকজনেরা এই শহরে দুর্ভিক্ষে কষ্ট পেয়েছে। আর এখন বুস্তনসরাই প্রাসাদে, প্রতিটি মহল্লায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেখানে চাখানা, দোকান ইত্যাদি আছে সব জায়গায় তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু রুটি; হাজার হাজার থালায় করে পরিবেশন করা হচ্ছে সুগন্ধি পোলাও; হাজার হাজার ভেড়া কেটে পাচকরা তৈরি করছে কাবুরদাকি কাবাব, শুরপা; আনা হয়েছে চমৎকার পানীয়ে ভরা বিশাল বিশাল কলস।

এ সব সমরখন্দবাসীদের জন্য, যারা তাঁর আপন আর বিশ্বাসী, আর এসব শাহ্র সৈন্যদের জন্যও—যারা যুদ্ধে অবিচলিত আর আশা করা যায় বন্ধুত্বেও। এবার এসেছে সুখবর পাওয়ার দিন (তাশখন্দ, সয়রাম, ওশ উজগেন বাবরের পক্ষ নিয়েছে), এসেছে শরতের ফসল আর পানীয় উপভোগের সময়! বাবরের মনে হল যেন তাঁর জীবনে এসেছে সেই সুখের দিন তাঁর সমস্ত স্বপ্ন আকাঙ্খা সফল হওয়া উচিত।

সাদা ধবধবে মসজিদের পাথরবাঁধান প্রশস্ত উঠান হাজার হাজার লোকের চলা আর কথা বলার আওয়াজে গমগম করছে। অনেক সমরখন্দবাসীই নিজের কানে শুনতে চায় কেমন করে খোৎবা পড়া হবে। আজ শুক্রবার, মুসলমানদের পক্ষে সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন আর শুক্রবারের খোৎবাও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

শহরের লোকেরা ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছে না। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে 'মির্জা বাবর শিয়াপন্থী হয়ে গেছেন, পবিত্র খলিফদের অস্বীকার করে বারো ইমামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন তিনি!' লোকেরা, যারা অনেক আশা নিয়ে বাবরকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে তারা এসবে বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু বিরোধীপক্ষের লোকেরা সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাচ্ছে শহরবাসীকে উত্তেজিত করে তুলতে। আজ সব পরিষ্কার হয়ে যাবে—নিয়ম অনুযায়ী খোৎবা পড়া হয় চার খলিফের অথবা বারো ইমামের নামে স্মরণ করে।

বিশাল মসজিদের ভিতর ও উঠান লোকে লোকারণ্য। ধাক্কাধাক্কি যাতে না হয় সেজন্য উঠানে ও দরজার কাছে সশস্ত্র প্রহরী রাখা হয়েছে। আদেশ দেওয়া হয়েছে: আর কাউকে ঢুকতে দিও না।

অবশেষে মসজিদের পিছনদিকের প্রবেশ পথ দিয়ে এসে ঢুকলেন শেখ-উল-ইসলাম খোজা খলিফা, বাবর, কাসিমবেগ, শাহ ইস্মাইলের দলের কর্তাব্যক্তিরা। এই অসংখ্য লোকের ভিড় দেখে বাবরের বুকের মধ্যে ধুকধুক করে উঠল আশঙ্কায়। এরা

কি বুঝবে, যে ঝুঁকি তিনি নিয়েছেন, তার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, যে খেলায় তিনি নেমেছেন তা সাময়িক এবং তা করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি?

'মহামান্য অতিথিদের', শাহ্‌র ত্রিশ হাজার সৈন্যের আহার যোগান খুব সহজ ব্যাপার নয় (তাছাড়া প্রতিদিন ষাটহাজার ঘোড়াকেও খাওয়াতে হয়)। প্রাচুর্যভরা শরত.ঋতু বিদায় নিতে বসেছে। খাদ্যভাণ্ডার আর অর্থভাণ্ডারও পূর্ববর্তী সুলতানরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। এখন প্রয়োজন মিতব্যয়িতা! আর মিতব্যয়িতা কি করে সম্ভব যখন শাহ্‌র সৈন্যদের সর্বপ্রকারে খুশি করা দরকার? পথ একটিই: খাওয়াও আর গুণ গাও তুমি ভাল তোমার আপনজনেরা ভাল—আর চেষ্টা কর যত তাড়াতাড়ি ঘরে পাঠিয়ে দেবার। কিন্তু আগে থেকে স্থির হওয়া শর্ত অনুযায়ী এখনও বাকী আছে শাহ্ ইসমাইলকে সর্বোচ্চ শাসক ঘোষণা করা, সেই উপলক্ষে শাহ্‌র এবং বারো ইমামের নাম স্মরণ করে খোৎবা পড়া। তারপর শাহ্ ইসমাইলের প্রতিকৃতি অঙ্কিত মুদ্রা ছাড়া, তারপরই কেবল শাহ্‌র সৈন্যরা মাভেরান্নহর ছেড়ে যাবে।

এই ত্রিশহাজার লোককে বসিয়ে খাইয়ে নিঃশেষ হবার চেয়ে তাদের ভোলানর জন্য সব শর্তগুলি তাড়াতাড়ি করে পূরণ করে তাদের হাত থেকে যত শীঘ্র রেহাই পাওয়া যায় তাই ভাল এ কথা বাবর, কাসিমবেগ ও বাবরের অন্যান্য পরামর্শদাতারা বুঝছিলেন। তাই খাজা খলিফাও আজ বাবর যেমন চান তেমনি করে খোৎবা পড়তে রাজী হয়েছেন। কিন্তু যাতে সমরখন্দের লোকরাও ক্ষিপ্ত হয়ে না ওঠে তার জন্য স্থির হল চার খলিফার উল্লেখ করা হবে কিন্তু আলাদা করে তাঁদের নাম বলা হবে না। আর বারো ইমামের নামগুলি পরিষ্কার করে উচ্চারণ করতে হবে।

সম্মানিত শেখ-উল-ইসলাম খাজা খলিফা বাবরের অত্যন্ত বিশ্বস্ত শাহরখলিফা, কোমর পর্যন্ত ঝোলা দাড়ি, প্রথমে সে বাবরের শহরবাসীর সামনে শুক্রবারের নমাজ পড়ল, তারপর হাতে লাঠি নিয়ে ধীরে ধীরে মর্মর পাথরের সিঁড়ি বেয়ে মসজিদের ভিতর চলে গেল—খোৎবা আরম্ভ করার মুহূর্ত উপস্থিত।

চারভাঁজওয়ালা পাগড়ী মাথায় বিশহাজার লোক নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে আছে। শাহ্‌র দূত উজীর মুহম্মদজান সুন্নীদের পাগড়ির বন্যা থেকে চোখ সরিয়ে খাজা খলিফার পাগড়িটা লক্ষ্য করল। কি ধূর্ত! চারটির বেশি ভাঁজ করেছে, দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বারো ভাঁজ তাতে নেই তাও দেখা যাচ্ছে। ঠিক কটা ভাঁজ গোণা যাচ্ছে না। বাবর আর কাসিমবেগের পাগড়ীও ঠিক তাই। চিন্তিত হয়ে পড়ল মুহম্মদজান: বাবর কুন্দুজে দেওয়া কথা রাখবেন না নাকি?

খাজা খালিফার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল মুহম্মদজান।

শেষে শোনা গেল শেখ-উলি-ইসলামের গলা, সামান্য কাঁপছে, উৎকণ্ঠায় ধরে আসছে যেন:

'বিসমিল্লাহু রহমানুরহিম!'

খোৎবা পড়ার সময় শেখ-উল-ইসলাম অনুভব করছে যে হাজার হাজার লোকের চোখ বিঁধে আছে তার গায়ে।

হাঁটু কাঁপছে তার, কিন্তু চেষ্টা করছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার... আল্লাহ্‌র ও পয়গম্বরের গুণকীর্তন করা হয়ে গেছে... এবার—চারইয়ারের—প্রথম চার খলিফের গুণগানের কথা। শেখ-উল-ইসলাম খাজা খলিফা এতদিন চারইয়ারকে সম্মান করতে শিখে আর শিখিয়ে আজ হঠাৎ এত লোকের বিশ্বাস ভঙ্গ করবে নাকি? তার, খাজা খলিফার সামনে সুন্নীপাগড়ী পরা বিশহাজার লোক। ছোট বয়স থেকেই খাজা খলিফা বিশ্বাস করে এসেছে যে পাগড়ীর চার ভাঁজে বাস করেন চারইয়ারের চার আত্মা লোকেদের পাগড়ীগুলো যখন নড়াচড়া করছে তখন খাজার মনে হচ্ছে যেন চারইয়ার তার কাছে দাবি করছেন সম্মান জানানোর আর ভয় দেখাচ্ছেন যদি সে সম্মান না দেখায় তো তাঁরা তাকে শাস্তি দেবে, বুদ্ধিশুদ্ধি হারাবে সে... না, না, খাজা খলিফা ভয় পায় ঐ আত্মাদের।

'অমর চারইয়ার—পবিত্র আবু বকর! পবিত্র ওমর! পবিত্র ওসমান।' যে নামগুলি উচ্চারণ করার কথা ছিল না সেই নামগুলি উচ্চারণ করতে লাগল খাজা।

হাজার হাজার লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—বাবরের মনে হল তাঁর মুখে একটা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল। শাহ্‌রুখবেগ আফসার তরবারির হাতলে হাত রেখে এগিয়ে গেল সেদিকে যেদিকে থেকে উচ্চারিত হচ্ছে তাদের কাছে ঘৃণ্য চার খলিফের নাম—যাঁরা বহুদিন আগেই মারা গেছেন। বাবর শুনেছেন যে হীরাটের মসজিদে মসজিদের লোকজনের সামনেই শেখ জয়নুদ্দিনের মাথা কেটে ফেলে তারা, ঠিক এই কারণেই যা এখানে খাজা খলিফা করছে।

শাহ্‌রুখাবেগের হাত ধরে ফেললেন, বাবর, অনুরোধ করে বললেন:

'জনাব! ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন!'

ইতিমধ্যে, খাজা খলিফা বারো ইমামের নাম আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করতে আরম্ভ করেছেন!

'পবিত্র ইমাম হাসান! পবিত্র ইমাম হুসেন! পবিত্র জয়নুদ্দিন আলি!'

পিছিয়ে গেল শাহ্‌রুখবেগ, হাত সরিয়ে নিল অস্ত্র থেকে। কিন্তু বিশহাজার ধর্মপ্রাণ সুন্নীর মধ্যে এমন কলরোল উঠল যে খাজা খলিফাকে চীৎকার করে করে নামগুলি উচ্চারণ করতে হল। এমন সময় ভীড়ের মধ্যে থেকে শোনা গেল:

'আরে! যথেষ্ট হয়েছে!'

বিশাল চেহারার একজন সৈন্য, যাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল ভিড়ের মধ্যে যদি কিছু হয় এই ভেবে, লোকটির মুখ চেপে ধরে বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

ইমামদের নাম উচ্চারণ করা শেষ হলে শেখ-উল-ইসলাম যখন গুণ গাইতে

আরম্ভ করল দুনিয়ার ইমাম, ইরানের মহামহিম শাহ্ ইসমাইল শেফেভির যিনি বারো ইমামের পবিত্র কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন,—তখন মসজিদের ভিতরে ও উঠানে উত্তেজিত কোলাহলের ঢেউ বইতে লাগল। সে গোলমাল একটু কমল খাজা খলিফা যখন মির্জা বাবরকে 'মাভেরান্নহরের শাসক' বলে ঘোষণা করল।

খোৎবার পরে কোন কোন লোক গর্ব করে বলতে লাগল: 'মির্জা বাবর মাভেরান্নহরের প্রকৃত শাসক—বাইরের লোককে নিজের সিংহাসন ছেড়ে দিলেন না!'

কিন্তু কিছু লোক আবার এমনও বলতে লাগল:

'বাবর আমাদের ধর্ম নষ্ট করলেন! চারইয়ারের ক্রোধ নেমে আসবে এবার আমাদের ওপর! জিনিসপত্রের দাম আবার বাড়বে! দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হবে।'

বাবর চাইছিলেন যত শীঘ্র সম্ভব 'প্রিয় অতিথিদের' ইরান ফিরত পাঠিয়ে দিতে। একবার তিনি শাহ্ ইসমাইলের পাঠান সেই বারোভাঁজের উষ্ণীষটি মাথায় পরে সিংহাসনেও বসলেন। আর কয়েক হাজার মুদ্রার ওপর শাহ্ ইস্‌মাইলের প্রতিকৃতিও অঙ্কিত হল। সেগুলি তিনি শাহ্‌র সৈন্যদেরই দিয়ে দিলেন।

শহরে, গ্রামে গঞ্জে প্ররোচনামূলক গুজব ক্রমশঃ বেশি করেই ছড়িয়ে পড়ছে। শোনা যাচ্ছে শীঘ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে, গগ, মাগগ্ প্রতারণার ইতিহাসে যাদের নাম পাওয়া যায় তারা এখানে আবির্ভূত হয়েছে শাহ্‌র সৈন্যদের রূপ ধরে। আর বাবর যখন শিয়াপন্থীদের পাগড়ী পরে পবিত্র কুকতাশ পাহাড়ে ওঠেন, পাহাড় ভেঙে পড়ে। আরও ভয় দেখান হচ্ছে যে, শাহ্ ইসমাইল যখন সমরখন্দে আসবে আর কুকতাশ পাহাড়ে উঠবে তখনই সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।

বাবর তাঁর ধর্মের প্রশ্নের প্রতি উদাসীনতায় (আর সরকারী কাজকর্মে স্বাধীন চিন্তাধারা প্রয়োগ করে) মুল্লা আর শেখদের নিজের বিরোধী করে তোলেন, যারা লুকিয়ে বা খোলাখুলিই খলিফা শয়বানী ও তাদের দলের লোকের পক্ষে প্রচার চালাতে লাগল। তাদের লোকরাই বাজারে বাজারে গুজব ছড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

সমরখন্দের বাজারের দিন খুব জমে উঠেছে। প্রচুর লোকজন। গমগম করছে বাজার।

পাঁচজন ইরানী সৈন্য রামধনুর রঙ ছড়ান সমরখন্দের রেশমী কাপড় কিনবে ভাবল। তারা এক দোকানে ঢুকে দোকানের স্থূলকায় মালিককে বলল চারটি পোশাক তৈরি করার মত রেশমী কাপড় কেটে দিতে।

দোকানী মাপকাঠিটা হাতে তুলে নিয়ে চোখে ব্যঙ্গ নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল:

'কোন মুদ্রা তোমাদের, দেখি?'

বিশাল লোমশ টুপি পরা লোকটি চামড়ার থলি থেকে তিন চারটি স্বর্ণমুদ্রা বার করে দূর থেকে দেখাল, ঘোরাতে লাগল দোকানীর চোখের সামনে। দোকানী দেখল, মুদ্রার এক দিকে শাহ্ ইসমাইলের প্রতিকৃতি আর অন্যদিকে শিয়া ইমামদের নাম লেখা আছে। ভয় পেয়ে হাত ঝাঁকাল সে। সে শুনেছে তার মহল্লায় মুল্লা বলছিল 'শিয়াদের মুদ্রা যে ছোঁবে চারইয়ারের ক্রোধ নামবে তার ওপর।' আর ব্যবসায়ীরা বলে 'এই মুদ্রায় আসল সোনা প্রায় নেই-ই।'

ইরানীটি হাতে রাখা নতুন মুদ্রাগুলিকে ভালো করে লক্ষ্য করে অবাক হয়ে বলল:

'কি হয়েছে? কি খুঁত আছে এতে?'

'আমাদের এখানে এ মুদ্রা চলে না। কেউ নেয় না।'

'কেন? কেন নেয় না?' প্রচণ্ড রেগে জিজ্ঞাসা করল সৈন্যটি।

'নেয় না, আর কি!'

দোকানের দরজার কাছে একজন দাঁড়িয়েছিল, সে মন্তব্য করল:

'তোমাদের মুদ্রা খারাপ!'

'খারাপ?!' ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে তরোয়াল হাতে নিয়েছে সৈন্যটি, কিন্তু যে সে কথা বলেছে সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন সৈন্যটির দিকে পাথর ছুঁড়ল আর একজন চেঁচিয়ে বলল: 'ধর্ম নষ্ট করেছ তোমরা, দূর হয়ে যাও!'

অস্ত্র হাতে তুলে নিল সৈন্যরা। ব্যবসায়ীকে হুঙ্কার দিয়ে জিজ্ঞাসা করল:

'নিবি নাকি আমাদের মুদ্রা?'

সুর বদলাল ব্যবসায়ী তাদের রাগ দেখে। মিষ্টি করে বলল:

যদি নিই তো জলে পড়ে যাব, ভেবে দেখ অতিথি। এখানে পুরান মুদ্রার চল।'

'পুরান মুদ্রা? তার মানে শয়বানী খানের মুদ্রা চাই তোর?'

ঠিক তাই। প্রথমত—সেই মুদ্রাগুলির উপর চারইয়ারের নাম লেখা। দ্বিতীয়ত—আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে কারণ তা হল শয়বানীর মুদ্রাগুলি আরও ভারী।

শয়বানী খান, বলা চলে, হীরাট থেকে তাশখন্দ পর্যন্ত তার রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলেই নতুন মুদ্রার প্রচলন করে, যাতে সোনার পরিমাণ অনেক বেশী। তাই খোরাসান আর মাভেরান্নহরের সব বাজারেই অন্যান্য মুদ্রার চেয়ে শয়বানীর মুদ্রার চাহিদা বেশি। কিন্তু ক্ষিপ্ত সৈন্যটিকে সে কথা বলার সাহস পেল না, কেবল বলল:

'শয়বানী খান আর নেই, মারা গেছে।'

আবার কে যেন পিছন দিক থেকে দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল; 'এই বিদেশী সমরখন্দ ছেড়ে চলে যা' বলে একটা মাটির ঢেলা ছুঁড়ল সৈন্যটির দিকে।

ঢেলাটা টুপির ওপর পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মুখে ধুলো পড়ল। সে সৈন্যটিও অস্ত্র হাতে নিয়ে চোখ চালিয়ে খুঁজতে লাগল কে ঢেলা ছুঁড়েছে। তাকে খুঁজে না পেয়ে আবার ব্যবসায়ীর দিকে ফিরল, বলল:

'শাহ্ ইসমাইলের মোহর নিবি কিনা?'

'নেব না—মরে গেলেও নেব না, হুজুর...'

'নিবি না?' হঠাৎ সৈন্যটি ব্যবসায়ীর কাঁধে তরোয়াল বসিয়ে প্রায় কোমর পর্যন্ত দু'ফাঁক করে দিল, আর একজন সৈন্য তার মাথাটা কেটে ফেলল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল রেশমের কাপড়গুলির উপর। ভিড় করে দাঁড়িয়ে লোকগুলি মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে গেল তারপর হাউমাউ করতে করতে দৌড় দিল, ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল।

আর এই ঘটনার পরে 'প্রিয় অতিথিরা' খোলাগুলি লুঠপাট আরম্ভ করে দিল।

৬

শীতের শেষে ত্রিশহাজার ইরানী সৈন্য মাভেরান্নহরে থেকে ইরানের উদ্দেশ্যে রওনা দিল: ইরানের প্রতিপত্তিশালী বেগদের উপহার দেওয়া হল দামী পোশাক—আশাক, দ্রুতগতি ঘোড়া, সোনা-রূপোর বাসন ও অর্থ।

তারা চলে যাবার পরে সমরখন্দে মোটামুটি শান্তি ফিরে এল। শয়বানীর সুলতানদের লুঠ ও ইরানী সৈন্যদের খাওয়ানতে কোষাগার যে শূন্য হয়ে গিয়েছিল তা আবার পূরণ হয়ে গেছে নতুন খাজনা আদায়ে বিশেষ করে নতুন এলাকাগুলি থেকে।

এবার একটু বিশ্রাম নিতে পারেন বাবর, বহুদিন ধরে যা তাঁর ইচ্ছা তেমন কোন কিছু করতে পারেন।

বসন্তকালের এক দিনে, বাদামগাছের ঝোপে যখন সাদাটে গোলাপীরঙের ফেনা দেখা দিয়েছে, বাবর তাঁর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে উলুগবেগের মানমন্দিরের দিকে যাচ্ছেন।

তাহিরের ঘোড়াটি পিঙ্গলবর্ণের, কপালে তিলক বাবরের দেহরক্ষীদের নিয়ে চলেছে সে। বাবরের দু'পাশে কাসিমবেগ ও খাজা কালোনবেগ, আজও বাবর বেছে নিয়েছেন তাঁর প্রিয় সাদা ঘোড়াটাকে, যেটিতে করে তিনি যুদ্ধে যান। তাঁদের থেকে সামান্য দূরে কালো ঘোড়ার উপর চিন্তিতমুখে বসে মওলানা ফজলুদ্দিন। এক সপ্তাহ হল তিনি হীরাট থেকে এসে পৌঁছেছেন। বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানের ভার যার ওপর সেই করণিক মুন্দারিসের ছোটখাট দেহটা সম্ভ্রান্ত বেগদের মাঝে দেখাই যাচ্ছে না।

তাঁরা অবি রহমত খাল পর্যন্ত না গিয়ে বগিময়দানের দিকে ঘুরলেন।

উলুগবেগের সময় বগিময়দানের খ্যাতি ছিল মাভেরান্নহরের সবচেয়ে সুন্দর বাগান বলে; বছর পনের আগেও দৃষ্টি আকর্ষণ করত বাগানটি, তারপর শয়বানীর আমলে দেখাশোনার অভাবে বাগানের নালাগুলিতে জল আসা বন্ধ হয়ে যায়, আর

শুকিয়ে যায় গাছগুলি। বাগানের মধ্যেও মর্মরপাথরে তৈরি দ্বিতলবিশিষ্ট প্রাসাদ, চিন্নি-খানা। যার খ্যাতি তার চীনা মাটির উপর অলঙ্করণ ও স্তম্ভগুলির জন্য, সেটির ছাদ দিয়ে এমন জল পড়েছে যে অনেক প্রতিকৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বিষণ্নমনে বাবর স্থপতিকে বললেন:

'মওলানা ফজলুদ্দিন, আমরা আপনাকে হীরাট থেকে আনিয়েছি শহরে এবং শহরের বাইরের বাগানগুলিতে নতুন নতুন প্রাসাদ নির্মাণের দায়িত্ব আপনাকে দেবার জন্য। কিন্তু এমন প্রখ্যাত পুরান প্রাসাদগুলির কি দুরবস্থা!'

'জাঁহাপনা, মির্জা উলুগবেগের মানমন্দিরে কথাও সারা দুনিয়ার লোক জানে, আর চিন্নি-খানার মত তারও একই দুরবস্থা।' দু'হাত ছড়িয়ে বললেন মওলানা ফজলুদ্দিন। 'কাল প্রথম দেখি সে অবস্থা, আজও কষ্ট হচ্ছে সে কথা মনে করে। কিন্তু অন্য কিই বা আশা করা যায়? মানমন্দির বিনা তত্ত্বাবধানে পড়ে আছে ষাটবছর হল। দেয়াল থেকে টালি আর মেঝের মর্মর পাথর উঠিয়ে নিয়ে গেছে লোকে। এমনি চলতে থাকলে সেখানে পড়ে থাকবে কেবল ধ্বংসাবশেষ।'

'তা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না! জনাব কাসিমবেগ মওলানা ফজলুদ্দিন যেন যা কিছু প্রয়োজন সব পান আর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক দেবেন। মানমন্দির আর চীনামাটির প্রাসাদ আমাদের মহান পূর্বপুরুষের উলুগবেগের স্মৃতিবহনকারী, এদের আগের সৌন্দর্য আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।'

'জাঁহাপনা, আপনার আদেশ পালিত হবে। চীনামাটির প্রাসাদ তার আগের ঔজ্জ্বল্য ফিরে পাবে। এ বিশেষ কঠিন কাজ নয়। বাগানের নালীগুলি পরিষ্কার করে জল আনা হবে সেগুলি দিয়ে, গাছ-ফুল বসান হবে।'

'নওরোজের আগেই শেষ হবে কাজ?' একটু ঠাট্টা করে বললেন বাবর, 'এবছর চীনামাটির প্রাসাদে নওরোজ উৎসব পালনের আয়োজন করলে কেমন হয় কাসিমবেগ?'

খাজা কালোনবেগ পানভোজন উৎসবের আয়োজন হতে দেখলে সর্বদাই খুশি, খুশিমনে বলল:

'মহামূল্য কথা বলেছেন জাঁহাপনা! আর যা কিছুরই অভাব থাক না কেন, স্থপতি ও বাগান পরিচারকের অভাব নেই সমরখন্দে। সবার কাজের তদারক করবেন মওলানা ফজলুদ্দিন, নওরোজের আগেই এই বাগানটি চমৎকার রূপ নেবে তখন এখানে উৎসব পালন করা যাবে...'

ফজলুদ্দিন বুকে হাত রেখে বললেন:

'চিন্নি-খানা সারিয়ে ফেলা যাবে, কিন্তু মানমন্দির নিয়ে কি করব, জাঁহাপনা?'

'মেরামত করতে হবে, মেরামত... কাসিমবেগ কবে কাজ আরম্ভ করা যাবে, কেমন করে?' জিজ্ঞাসা করলেন বাবর।

মানমন্দির নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে ভয় পাচ্ছিল কাসিমবেগ। একসময় সমরখন্দবাসীরা, অন্তত বেশ কিছু লোক উলুগবেগের রসদখানা (মানমন্দির) নিয়ে গর্ব করত। ধর্মান্ধ শেখরা তখন থেকেই মানমন্দিরের বিরুদ্ধে ছিল, তারপর এতদিন ধরে তারা বলে আসছে যে ওটি ধর্মভ্রষ্টদের জায়গা, এর ফলে ধর্মবিশ্বাসী বেশির ভাগ লোকই এ কথায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। মানমন্দির সারাইয়ের কাজ আরম্ভ করে বাবর শেখ ও মুল্লাদের আরও রাগিয়ে দেবেন আর যে অশুভ শক্তির আঘাতে উলুগবেগের মৃত্যু হয় সে আঘাত বাবরের ওপরও নেমে আসবে।

সে কাজে বাধা দেবার সিদ্ধান্ত নিল কাসিমবেগ:

'জাঁহাপনা, ঘুমন্ত সাপের লেজ মাড়ান কি ঠিক হবে?... তাছাড়া রসদখানা যদি সারিয়ে তোলাও হয় সেখানে বিজ্ঞানচর্চা চালাবার জন্য বড় বড় বিজ্ঞানীই বা আমরা কোথায় পাব। মির্জা উলুগবেগের পরে ষাট বছর কেটেছে, সে সময়কার বিজ্ঞানীদের কেউ আর বেঁচে নেই আর এখনকার বিজ্ঞানীরা অন্যান্য দেশে চলে গেছেন।'

'তাদের আমন্ত্রণ জানান যায়।' ভ্রূ কুঁচকে গেল বাবরের। তাঁর স্বভাব এমনি যে যা সিদ্ধান্ত নেবেন তার জন্য কাজ তক্ষুণি আরম্ভ করবেন। 'এই মুনশি! আমাদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানীদের পত্র লেখ!'

মুনশি তখনি জামার ভিতর থেকে কাগজ কলম বার করল। বাবর বলতে লাগলেন, লোকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখতে লাগল।

'আমাদের পূর্বপুরুষ মির্জা উলুগবেগ জ্যোর্তিবিদ্যায় যাদের শিক্ষা দিয়েছেন সেই পণ্ডিতরা হীরাট অথবা তুরস্ক অথবা তেব্রিজ যেখানেই থাকুন না কেন আমাদের পক্ষ থেকে তাঁদের সমরখন্দ আসতে আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে। আর... নকীবরাও ঘোষণা করুক... যে আমরা রসদখানা খুলতে চাই আর বিজ্ঞানীদের মধ্যে যদি কেউ মির্জা উলুগবেগের মহান কাজ চালিয়ে যেতে চায় তো সর্বরকম প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হবে: সমস্ত পথের খরচ দেওয়া হবে, বাসস্থান ও মাহিনাতেও কোন কার্পণ্য করা হবে না। মুনশি আপনাকেই দায়িত্ব দিলাম এই বার্তা জানিয়ে আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করার...'

মওলানা ফজলুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে বগি ময়দান বাগানে ভেঙে পড়া বুঁজে যাওয়া নালাগুলিকে পরিষ্কার করে সারিয়ে, শুকিয়ে যাওয়া গাছগুলি উপড়ে ফেলে, নতুন গাছ, সুন্দর ফুলগাছ বসিয়ে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। চীনামাটির প্রাসাদ মেরামত করাতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি মওলানা ফজলুদ্দিনের—ভাল পারিশ্রমিক দিলে শিল্পী, পাথর কাটাইয়ের লোক, বাগান দেখার লোক, মাটি কোপানোর লোক সবই পাওয়া যায়, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে। কিন্তু মানমন্দিরের মধ্যে কাজ করা দেখা গেল অত্যন্ত কষ্টকর। সিঁড়ির ধাপগুলি যেখানে শেষ হয়েছে তার নিচে বিরাট খাদ মুখ হাঁ করে আছে, খাদের গহ্বরে একটা বিরাট যন্ত্রের ভাঙা টুকরোটাকরা পড়ে চকচক

করছে, যার মানে বোঝার ক্ষমতা নেই অশিক্ষিত লোকের। পাথরভাঙা মিস্ত্রীরা যেই সিঁড়ির প্রান্তে পৌঁছাল এমন কাঁপতে শুরু করল তারা যেন তাদের সামনে নরক মুখ হাঁ করে রয়েছে। শেখ আর মুল্লারা বলত যে ওখানে অশুভ শক্তির বাস, যে ওই বাড়ীটিতে ঢুকবে সেই শয়তানের খপ্পরে পড়বে। 'নকশাবন্দী' শেখরাই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এ ব্যাপারে যারা উলুগবেগের পরবর্তী সময়খন্দে অনেক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়।

তা সত্ত্বেও প্রথমে ফজলুদ্দিন ভালো মাইনে দিয়ে প্রায় যাটজন মিস্ত্রী-মজুরকে কাজে লাগিয়ে মানমন্দির সারাইয়ের কাজ আরম্ভ করলেন। দুতলা ও তিনতলার দেয়াল ও ছাদের কাজ করবার জন্য কাঠের খুঁটি লাগান হল। এমন সময়ই আরম্ভ হল রসদখানাতে নকশবন্দী শেখদের নিযুক্ত ফকির দরবেশদের ভীড়। মিস্ত্রীদের সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তারা প্রচণ্ড উৎসাহে চীৎকার করতে লাগল 'আল্লাহ্ তুমি সত্যের বন্ধু!' গান গাইতে, কবিতা পড়তে লাগল, যেগুলি প্রায়ই বিশেষভাবে এ উদ্দেশ্যেই লেখা হত, সেগুলিতে বলা হতে লাগল যে চারইয়ারকে অস্বীকার করে, যারা তাঁদের দুনিয়ার সর্বোচ্চ বিচারক বলে মনে করেন না তারা খোদার ক্রোধের ফলভোগ করবে। এই সব দরবেশদের মধ্যে অবশ্যই লুকিয়ে ছিল শয়বানীর দলের লোকেরাও।

মিস্ত্রীদের মধ্যেও ছিল শয়বানীর দলের লোক। এমন একজন লোক ইঁট বওয়ার কাজ নিল। কিছুদিন বাদে সে 'অন্যমনস্কভাবে' উঁচু মইয়ের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল সবচেয়ে দক্ষ, সাহসী আর বাবরের বিশ্বস্ত টালিবসানর মিস্ত্রীকে। মিস্ত্রিটি তিন তলা থেকে পড়ল পাথরের গাদার ওপর, সঙ্গে সঙ্গেই মরে গেল।

ভীষণ আনন্দ হল দরবেশদের! দুনিয়ার সব কিছু ভুলে গিয়ে তারা চীৎকার করে বলতে লাগল 'খোদা শাস্তি দিয়েছেন ওকে! আত্মারা ওকে মেরে ফেলেছে!'

এরপর মিস্ত্রীমজুরা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। মওলানা ফজলুদ্দিন ভাবলেন অন্য লোক কাজে লাগাবেন, এমন নামকরা মিস্ত্রী অবশ্য পাবেন না, যেমনটি তিনি চান; বাজারে গেলেন তিনি বেকার লোক খুঁজবার জন্য কিন্তু দেখা গেল বেকার লোকের চেয়ে গুজব বেশি: 'রসদখানায় কাজ করে যে টাকা পেয়েছে ওরা তা নোংরা টাকা!' 'ধর্মে বিশ্বাস করে এমন লোকের পক্ষে ওখানে যাওয়া বিপজ্জনক, পবিত্র খলিফদের আত্মারা তাকে মেরে ফেলবে।' ফজলুদ্দিন মানমন্দিরে কাজের কথা বলা মাত্রই লোকে ভয়ে হুড়মুড় করে ছুটে পালাচ্ছিল তাঁর কাছ থেকে।

ওদিকে বুস্তন সরাইয়ে ভোজউৎসব চলছে।

এই যে উরগেনচ ও কারাকুল থেকে দামী দামী উপহার নিয়ে যে বেগ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা এসেছেন তাদের সম্মানে। একমাস আগে ঐ দুই শহরে বাবর তাঁর দূত পাঠিয়েছিলেন, শহরদুটি বিনাযুদ্ধে তাঁর পক্ষে যোগ দিয়েছে, এতে 'মাভেরান্নহরের সঙ্ঘবদ্ধকারী' (অন্যের মুখে শোনার পর মনে মনে তিনি নিজেকে

এ নামে ডেকে গর্ব বোধ করেন এখন) অত্যন্ত আনন্দিত। বিরাট ভোজসভা, পানীয় প্রাচুর্য যে ঐতিহ্যে আরম্ভ হয় কুন্দুজে তা' ক্রমশ ঘন ঘন আয়োজিত হচ্ছে। প্রথমে সাফল্য উপলক্ষ্যে, তারপর কোন কারণ ছাড়াই। ভোজের আয়োজন হয় একবার এ বেগের বাড়ি, একবার অন্য বেগের বাড়ি এই সব বেগরা মদ্যপানে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

কাসিমবেগ, কিন্তু আগের মতই মদ ছোঁয় না। যখন বাবর পানীয়র প্রভাবে থাকেন না, তখন কাসিমবেগ বারবার বাবরকে বলতে থাকে রাজ্যের ভিতরে বিশেষ শান্তি নেই, অনেক শত্রুই লুকিয়ে ছোরায় শাণ দিচ্ছে আর উত্তরের স্তেপভূমিতে শয়বানীর দলবল একটুও সময় নষ্ট না করে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। এ লড়াই বাঁচার লড়াই নয় মরার লড়াই...

এর উত্তরে বাবর আবৃত্তি করতেন অত্যন্ত খুশির মেজাজে রচনা করা তাঁর একটি গজলের চারটি পংক্তি:

এসেছে সময় মৃদু আলাপের, মন করে আনচান,
সুরা কবিতায় মাতাল এখন, সুধাবেশে মাতে প্রাণ।
গরম কালের চাইতে খুশির, মধুর তো কিছু নেই:
আনন্দ করো বাবর, এবার শীতের প্রতাপ ম্লান।

গজলটিতে সুরও হয়েছে, প্রায়ই ভোজসভায় গাওয়া হয় গজলটি।

কখনও কখনও বাবর আমোদ আহ্লাদে গা ভাসালেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলতেন যদিও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির থেকে অনেক দূরে তিনি তখনও:

'উজীরে আজম, আপনি শুনেছেন যে সমরখন্দের বিদ্যালয়গুলিতে আমার উদ্ভাবিত অক্ষরগুলি শেখান হচ্ছে আর তাতে আগের চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখে ফেলছে তারা? এই মুদাররিসকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না...'

মুদাররিসের মাথায় পাগড়ী, হাতে পানীয়ভরা পাত্র ধরা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল:

'জনাব উজীরে আজম, লোকেদের অজ্ঞতা আর আলস্যরোগ সারানর জন্য বাবরের অক্ষরের মত আর ওষুধ নেই! আরবী অক্ষরে কোরান লেখা আছে, আমাদের কাছে তা অত্যন্ত পবিত্র, কিন্তু আপনাকে মানতেই হবে যে ঐ অক্ষরের ওপরে নীচে একগাদা চিহ্ন সব ব্যাপারটাকে অত্যন্ত জটিল করে তোলে। বাবরের অক্ষরগুলি এইসব জটিলতামুক্ত, সহজে তা শিখে নেওয়া যায়।'

কাসিমবেগ জানত যে তিনবছর আগে কাবুলে বাবরের উদ্ভাবিত অক্ষরগুলি মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন তুর্কী অক্ষরের কথা যেগুলি আবিষ্কৃত হয় সির-দরিয়ার তীরে সিগ্‌নাকে। প্রাক্ ইসলাম যুগের কোন কিছু স্বীকার করতো না শেখরা আর যদিও বা

প্রাচীন তুর্ক লিপির খোঁজ মিলতো কোথাও তো সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলা হত। বাবর, কিন্তু খোলাখুলি বলতেন যে অক্ষরের ছাঁদের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, আর কোরান, পয়গম্বর মুহম্মদের পবিত্র কোরান তার পবিত্র বিষয়বস্তুর জন্য, যে অক্ষরে তা লেখা সে কারণে নয়। সেইজন্য তিনি আর্‌বী ও প্রাচীন অক্ষরের অনুকরণে নতুন অক্ষরের ছাঁদ আবিষ্কার করেন।

এমন ধরনের সব জটিল, সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারত না আর ভালবাসেও না কাসিমবেগ। কাজের লোক সে, উপরোক্ত আলোচনার দিন দুই বাদে বাবরের বিশ্রামকক্ষে সে নিয়ে এল মওলানা ফজলুদ্দিনকে আর বাবরের অক্ষর যে প্রচার করছিল সে মুদাররিসটাকে।

বাবর তখনই বুঝলেন তারা তিনজনই কোন কারণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, বললেন সত্যি কথা বলতে।

'জাঁহাপনা, ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে,' মুদাররিসের মুখের মলিনতা যাচ্ছে না, 'যে শিক্ষক তার বিদ্যালয়ে নতুন অক্ষর শেখাচ্ছিল তাকে মেরে ফেলেছে অশিক্ষিত লোকেরা। পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে।'

'মেরে ফেলেছে?!' মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বাবর। 'এ কি কাণ্ড!.. কাসিমবেগ একি বিদ্রোহ আরম্ভ হল! আপনি কি ঘুমিয়ে ছিলেন?'

'জাঁহাপনা, আমি বহুবার আপনাকে জানিয়েছি নকশবন্দী শেখরা লোক ক্ষেপিয়ে তুলেছে, আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছে তাদের। রসদখানাতে মিস্ত্রী যখন পড়ে মারা যায় তখন দরবেশরা দারুণ গোলমাল আরম্ভ করে দেয়। মসজিদগুলিতে মুল্লারা আমাদের নামে অপবাদ রটাচ্ছে। শহরময় গুজব ছড়িয়ে পড়ছে তারপর হাঙ্গামাও আরম্ভ হচ্ছে।'

'হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী আর গুজবরটনাকারীদের ধবরার আদেশ দেননি কেন সঙ্গে সঙ্গে?'

সে প্রশ্নের উত্তর দিল কাসিমবেগ একটু ঘুরিয়ে:

'মসজিদের মিম্বর থেকে খাজা খলিফা সে কথা বলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু লোকে চেঁচামেচি করে তাঁকে সেখান থেকে নামিয়ে দিল, 'মিথ্যা! ঐ অক্ষরগুলো ধর্মভ্রষ্টদের, খোদা তোকে শাস্তি দিন!' কেউ কেউ চীৎকার করতে লাগল যে শেখ-উল-ইসলামও ওদের গোলাম হয়েছে। এমন সময় তাহিরবেগ গিয়ে না পড়লে শেখ-উল-ইসলামকে মেরেই ফেলত হয়ত।' এবার বাবরের প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দিল কাসিমবেগ:

'জাঁহাপনা! জনাবিশ প্ররোচককে ধরেছিলাম আমরা, তারপর জানা গেল ওদের কাজে লাগিয়েছে যে মুল্লারা তাদের গায়ে হাত দেওয়া বিপজ্জনক: তারা খাজা আখরারের বংশধর।'

হ্যাঁ, এমন লোকের গায়ে হাত দেওয়া যায় না। খাজা আখরারের বংশধরদের

গায়ে হাত দেওয়া আর যা একটা ফুলকি লাগলেই জ্বলে উঠবে তেমন শুকনো কাঠের কাছে মশাল তুলে ধরা একই কথা—তা জানেন বাবর।

'সৈন্যদলের অবস্থা ভাল না, জনাব,' মায়াদয়া না করে বলে চলল কাসিমবেগ। 'বসন্তকালের খাদ্যঘাটতি। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। পুরনো মুদ্রা আর সৈন্যদের হাতে নেই, আমাদের নতুন মুদ্রা কেউ নিতে চায় না। নতুন মুদ্রা দিয়ে দাম মেটাতে চাইলে আরো বেশি দাম দিতে হয়... বেগ আর সৈন্যরা মাইনে বাড়ানোর দাবি করছে। কিন্তু এখন যদি মাইনে বাড়ানো হয় কোষ শূন্য হয়ে যাবে।'

'কি করা যায়, কাসিমবেগ?' হতাশ সুর বাবরের গলায়।

'আমার প্রস্তাব, জাঁহাপনা, অবিলম্বে সব বেগকে ডেকে সবাই একসঙ্গে চিন্তা করা যাক, তাদেরকে একটু ঝাঁকানি দিতে হবে... আর নিজেদেরও গাঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে।'

'জানি, জানি এর মানে কি। বেগরা চাইছে স্তেপে ঘুরে বেড়ান সুলতানদের একেবারে শেষ করে দিতে। আবার যুদ্ধে যাবার জন্য হাঁফিয়ে উঠেছে তারা। কেনই বা নয়? নতুন নতুন এলাকা হাতে আসবে বেগদের, সৈন্যদেরও হাতে কিছু আসবে। হাঁফিয়ে উঠেছে ওরা এখানে, ওদের তরবারি আবার রক্ত দেখতে চায়।'

'কিন্তু জাঁহাপনা যোদ্ধার স্থান যুদ্ধক্ষেত্রে... তাছাড়া আমাদের বিপক্ষ সুলতানরা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠছে... উবাইদুল্লা সুলতানের দশহাজার সৈন্য উত্তর দিকের স্তেপ থেকে বুখারার দিকে এগিয়ে চলেছে...' কাসিমবেগ বাবরের আরও কাছে এগিয়ে এল। 'আর এসব কথা সমরখন্দের শেখরা জানে, জাঁহাপনা। বাইরের আর ভিতরের বিপদ একসূত্রে বাঁধা... যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কিছুর কথা এখন ভাবার সময় নেই, এখনি যুদ্ধ যাত্রা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

উজীরের থেকে চোখ সরিয়ে ফজলুদ্দিন ও মুদারবিসের দিকে ফিরলেন বাবর:

'ভাগ্য আবার আমাদের কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। নির্মাণকার্য, শিক্ষাবিস্তার সব এখন স্থগিত রাখতে হবে, আমার অক্ষর শেখানো আপাতত বন্ধ রাখুন... রসদখানার কাজও পরে হবে... এখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কিছুর কথা চিন্তা করার সময় নেই,' বিষণ্ণস্বরে কাসিমবেগের কথা পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

ত্রিশহাজার সৈন্য নিয়ে বাবর সমরখন্দ থেকে আসছেন শুনে উবাইদুল্লা সুলতান মরুভূমিতে গিয়ে ঢুকল। বাবরের সৈন্যদল বুখারার কাছে অপেক্ষা করে রইল তাদের জন্য, মরুভূমিতে খাদ্যাভাব ঘটলেই তারা ফিরে আসবে ভেবে। কিন্তু কতদিন অপেক্ষা করা যায়, তাছাড়া বাবরের সৈন্য সংখ্যাও তো তিনগুণ বেশী, তাই বাবর ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন, মরুভূমির দিকে সৈন্যদল চালিয়ে দিলেন। উবাইদুল্লা সুলতান ঠিক এটাই চাচ্ছিল।

বাবরের সৈন্যদলের কিছু অংশ পাহাড়ে এলাকায় যুদ্ধ করতে অত্যন্তদক্ষ মরুভূমির

ভুসভুসে বালির মধ্যে তারা এগোচ্ছে ধীর গতিতে। কামানগাড়িগুলো বালিতে বসে যাচ্ছে, বিরাট একটা ক্যারাভান দলের মত করে এগোতে লাগল। এমন সময় দশহাজার মোগল সৈন্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উবাইদুল্লা সুলতানের দলের উদ্দেশ্যে চলে গেল।

মরুভূমির বালির প্রতিটি কণাকে জানে উবাইদুল্লা সুলতান, অত্যন্ত সুচিন্তিত যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করল সে, হায়রাবাদ ও কারাকুলের মাঝামাঝি কুলি মালিক সরোবরের কাছে বাবরের দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। তখন বাবর তাঁর সৈন্যদলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। বিভিন্ন জাতির লোক নিয়ে গড়ে তোলা সৈন্যদল শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার ফলে শক্তিহীন হয়ে পড়ল। পরাজয় বরণ করতে হল বাবরকে।

অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে তিনি রাজধানী সমরখন্দে ফিরে এলেন, কিন্তু সেখানেও বসে থাকলেন না, দ্রুত রওনা দিলেন হীসারের উদ্দেশ্যে, কিন্তু সেখানে মুখোমুখি হলেন নাজমি সোনি পরিচালিত ষাটহাজার সৈন্যের, যাদেরকে শাহ্ ইসমাইল পাঠিয়েছেন যেন বাবরকে সাহায্য হিসাবে, কিন্তু আসলে—বাবরের পরিবর্তে ইরানের পক্ষে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য শাসক নিয়োগ করার জন্যই পাঠান হয়েছে তাদের। শাহ্র সৈন্যরা শাহ্র মতে এত শীঘ্র সমরখন্দ ছেড়ে আসায় শাহ্ অসন্তুষ্ট। চরেরা অনেক দিনই শাহ্কে জানিয়েছে যে বাবর মাভেরান্নহরে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে চায়।

মাভেরান্নহরে ইরানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার যে পরিকল্পনা শাহ্ আর নাজমি সোনির ছিল তা গোপনই থাকে, বাবরের সঙ্গে চুক্তি তখনও যেন কার্যকরীই আছে, কিন্তু নাজমি সোনির সঙ্গে প্রথমবার দেখা হওয়ার পরেই, তার প্রায় খোলাখুলি বিরোধিতা প্রদর্শনে বাবর অনুভব করতে পারলেন তাদের ধূর্ত পরিকল্পনার কথা।

গিজদুভানে মুখোমুখি হল শয়বানীপন্থীরা শাহ্র সৈন্যদলের সঙ্গে। বাবর নাজমি সোনির সঙ্গে চললেন কিন্তু বুঝলেন বিজয়লাভের চাবিকাঠি সুলতানদের হাতে, তাই এই রক্তঝরানো খেলা থেকে নিজের সৈন্যদলকে নিয়ে হীসার চলে গেলেন।

গিজদুভানে যুদ্ধে নাজমি সোনি নিজেই মারা পড়ল। তার সৈন্যরা কিছু মারা পড়ল, কিছু বন্দী হল, আর কিছু সৈন্য হুড়মুড় করে পালাবার সময় আমুদরিয়াতে ডুবে গেল।

অজানা বিপদের সেই আশঙ্কা তাহলে সত্যিই হল! দেড়বছর আগে খানজাদা বেগমের মনে যে অদ্ভুত ভয় দেখা দিয়েছিল তারপর সাময়িকভাবে তা চলে যায়, পরাজয় ভোগের এই কঠিন দিনগুলিতে আবার সে ভয় ফিরে আসে।

বাইসুন পেরিয়ে বাবর হীসারের কারাতাগে এসে পাহাড়ের নীচের উপত্যকায় রাত কাটাবার জন্য থামলেন সাত হাজার সৈন্য, পরিবারবর্গ, গাড়িঘোড়া নিয়ে, বাবরের তাঁবুর কাছে একটি তাঁবুতে ঘুমিয়ে ছিলেন খানজাদা বেগম, তাঁর ছেলে আর এক দাসী।

মাঝরাতে খানজাদা বেগমের ঘুম ভেঙে গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজে আর কুকুরের অবিরাম চীৎকারে। 'মার্! মার্! মেরে ফেল্ রফিজিয়াপন্থীদের!' এই চীৎকার শুনে আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন তিনি।

তাঁবুর ভিতরে একটা ছোট্ট প্রদীপ জ্বলছিল।

'শত্রু আক্রমণ করেছে!'

মুহূর্তে উঠে পড়লেন খানজাদা, খুররাম ও দাসী।

জুতো পায়ে গলিয়ে নিয়ে বেগম ছেলেকে চাপান পরাতে লাগলেন, এমন সময় একটি তীর এসে তাঁবুর মোটা কাপড় ভেদ করে গেল, কিন্তু পিছনের পালকের অংশটি গর্তে আটকে গিয়ে ঝুলতে লাগল। মা ভয় পেয়ে ছেলেকে বুকে চেপে ধরলেন—ওদিকে মায়ের চেয়ে লম্বা হয়ে যাওয়া ছেলে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে তার মৃত্যু বহন করে আনছিল যে তীরটি সেদিকে।

'এই! গোলন্দাজ! খাজা কালোনবেগ। কাসিমবেগ! তাহিরবেগ! হারেম পাহারা দিন! শিশুদের জীবন বাঁচান!... গুলি চালাও! গুলি চালাও!'

বাবরের নিজের রক্ষীদের গাদাবন্দুক ছিল—তখনকার দিনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিরল অস্ত্র, দামও খুব—সেগুলি কিনেছেন বাবর শাহ্‌র সৈন্যদের কাছে।

তাদের একটিরই আওয়াজ উঠল কাছেই, তারপর একসঙ্গে বেশ কয়েকটি। খানজাদা বেশ স্বস্তি পেলেন সে আওয়াজ শুনে, ধীরে সুস্থে ছেলেকে জামাকাপড় পরানো শেষ করলেন, চাপানের উপরে ছোরা ঝোলানো কোমরবন্ধ পরাতে ভুললেন না।

তাঁবুর দেয়ালে ঝোলান ছিল দশটি তীরসমেত 'খুররাম শাহ্'র তূণীরটি। খুররাম সেটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিল আর নিল নিজের ধনুকটি।

যুদ্ধের শোরগোলে এগারবছরের ছেলেটি একটু ভয় পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে গোলমাল তার মনে জাগিয়ে তুলেছে উত্তেজনাও। ছোটবেলা থেকেই সে পেয়েছে পিতার লড়ুয়ে মনোভাব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বড় হয়ে উঠে রণক্ষেত্রে নিজের বীরত্ব দেখাতে চেয়েছে। এমন কি বাবর যখন বুখারায় যুদ্ধে রত ছিলেন সে তখন লুকিয়ে পালিয়ে এসে যোগ দেয় বাবরের দলে। বাবর তার এই মনোভাবের প্রশংসা করে লোক দিয়ে তাকে ফিরত পাঠিয়ে দেন। তার মা যে বাবরকে অত্যন্ত ভালবাসেন সে ভালবাসা সঞ্চারিত হয়েছে তার মধ্যেও। যারা তার শিক্ষাদীক্ষার ভার নিয়েছিল, বাবরের প্রতি মনেপ্রাণে অনুগত সেই সব লোকেদের কাছে সবসময় শুনেছে বাবরের বীরত্বের কথা। তাই শয়বানী খানের ছেলে দিনে দিনে আরও বেশি করে ভালবাসতে লাগল মামাকে আর ঘৃণা করতে লাগল তাঁর শত্রু শয়বানী পন্থীদের।

যারা এখন বাইরে চীৎকার করছে 'মার! মেরে ফেল!' তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে সে, তার শাহ্-তূণীরের সব কটি তীর সে তাদের দিকে ছুঁড়ে দেবে ঠিক করল। তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে বাইরে ছুটে গেল সে, বৃদ্ধা দাসী:

'আরে আরে, কোথায় চললেন জনাব!' বলে পিছন থেকে তার কোমরবন্ধ ধরে ফেলল ফিরিয়ে আনার জন্য, কিন্তু পারল না: খুররাম সাহসী ছেলে।

'ছেড়ে দাও, আমাকে! শুনছ, ছেড়ে দাও! আমি মামা মির্জা বাবরকে সাহায্য করতে চাই। ছেড়ে দাও!'

বাবরের নিজস্ব রক্ষীদল গাদাবন্দুকের গুলি আর তীর ছুঁড়ে শত্রুদের আটকেছে যে তাঁবুগুলিতে মেয়ে আর শিশুরা আছে সেদিকে এগোতে দিচ্ছে না। খানজাদা বেগমের তাঁবুর কাছে দুটি ঘোড়া নিয়ে এসে তাহির কড়াসুরে বলল:

'মহামান্যা বেগম! তরুণ শাহ্! উঠুন ঘোড়ায়! তাড়াতাড়ি!'

বাক্স প্যাঁটরার দিকে তাকালেন বেগম:

'সব ফেলে যাব নাকি?'

'বেঁচে থাকলে সব হবে! তাড়াতাড়ি উঠুন ঘোড়ায়! মালিকের তাই আদেশ!'

আকাশে পূর্ণচন্দ্র কিরণ দিচ্ছে। সে আলোয় দেখা গেল সাদা তাঁবুর কাছে মহিম বেগম ছোট্ট হুমায়ুনকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘোড়ায় বসা কাসিমবেগ হুমায়ুনকে কোলে তুলে নিয়ে চাপান জড়িয়ে নিল।

খানজাদা বেগম ঘোড়ায় বসেছেন দেখে (খুররাম সবার আগেই চড়ে বসেছে ঘোড়ায়) তাহির এবার গেল নিজের স্ত্রী আর দশবছরের ছেলেকে ঘোড়ায় উঠিয়ে দিতে।

কাসিমবেগের নেতৃত্বে সৈন্যরা মেয়ে ও শিশুদের ঘিরে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল সেই দিকে, যেদিকেই কেবল যুদ্ধ চলছিল না। বাকী তিনদিক থেকেই বন্দুকের দুমদাম, তরবারির ঝনঝন, আহতদের আর্তনাদ ঘোড়ার ডাক সবকিছু ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ক্রুদ্ধ চীৎকার:

'জঘন্য বাবর দূর হয়ে যাক!'

'নিজে শিয়া হয়েছে আবার আমাদের ধর্ম নষ্ট করতে চায়! তা চলবে না।'

'দূর করে দাও!.. মার!'

'একেবারে মূল ছেঁটে ফেল ওদের!'

খানজাদা বেগম কিছু বুঝতে না পেরে কাসিমবেগকে জিজ্ঞাসা করলেন:

'এ শত্রুরা কারা? এমন ধরনের নোংরা কথা বলছে?'

'বিদ্রোহীরা,' গোমড়া মুখে উত্তর দিল কাসিমবেগ। 'আবার মোগলরা। একবছর আগে কুন্দুজে আমাদের দলে যোগ দেয়, তারপর আবার আগের দলে ফিরে যায়... আর এরা মনে হয়েছিল থেকে গেল দলে... আর এখন... মালিককে ঘুমন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল! আল্লাহর কৃপায় তাহিরবেগের রক্ষীরা ঠিক সময়েই বিপদের গন্ধ পায়!'

'হায়! বিপদের পরে বিপদ!'

'ওদের দলে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি লোক। আর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েও ছিল... মাঝখানে চলুন বেগম! প্রথম সারিতে সৈন্যরা থাকবে!'

বিদ্রোহী এবার এই ফাঁকা দিকটাতেও এসে তাদের ঘিরে ফেলতে চাচ্ছে। খুব কাছেই বাবরের গলা শোনা গেল:

'উস্তাদ আলি! তীরন্দাজদের নিয়ে এগিয়ে যাও! ঘিরে ফেলতে দিও না!'

বন্দুকের গুলি সহজেই বিঁধছে লোহার বর্মে আর শিরস্ত্রাণে, বন্দুকের গুলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না বিদ্রোহীরা। সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও সাহসী কিছু সৈন্য একত্র করে শত্রুদের সারি ভেদ করে এগিয়ে যেতে চাইলেন সেনা হীসার দুর্গের দিকে যেখানে ষড়যন্ত্রকারী বেগরা তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। তারা নিজেরাই দুর্গ দখল করতে চাইছে—সেইজন্যই এই আক্রমণ।

গাদাবন্দুকের নলগুলো গরম হয়ে যায় তিনচারবার গুলি চালাবার পরে পরেই, সেগুলো এখন আর কাজে লাগছে না। দক্ষিণ দিকে যে দিকে মেয়ে আর শিশুর দল এগিয়ে চলছিল সে দিকে না, পূর্ব দিকে শত্রুসৈন্যের সারি ভেদ করে এগিয়ে যাবার জন্য খাজা কালোনবেগের নেতৃত্বে ছুটে চলল একহাজার সৈন্য।

ঘোড়ায় চড়ে হাতাহাতি লড়াই বড় ভয়ঙ্কর ও ক্ষণস্থায়ী।

ভীষণ ভয় হচ্ছে খুররামের, কিন্তু সে চেষ্টা করছে মনে সাহস আনার। ওঃ কি যে ইচ্ছা তার অন্তত একটা শত্রুকে তীর দিয়ে বিঁধতে, যারা তার মামা আর মার বিরুদ্ধে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

লড়াই হচ্ছে এবার ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে, এমনি একটা ছোট দল এসে পড়ল মেয়ে আর শিশুর দলের ঘিরে থাকা সৈন্যদের সামনে। তখন খুররাম জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল প্রথম সারির সৈন্যদের কাছে, ধনুক তুলে ধরে একটার পর একটা তীর ছুঁড়ে চলল সে। একমুহূর্তের জন্য খানজাদার চোখের আড়ালে চলে গেল যে। তারপর ছেলে তীর ছুঁড়ছে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সে দিকে। তিনি তার কাছে পৌঁছে গেছেন এমন সময় শত্রুর একটা তীর এসে বিঁধল ছেলেটির বুকের ডানপাশে। চীৎকার করে উঠল খুররাম, হাত থেকে তীর ধনুক পড়ে গেল, ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে লাগল সে।

'বাছা আমার!' মায়ের আর্তনাদ যুদ্ধের সব আওয়াজকে ছাপিয়ে গেল।

তাহির যখন খুররামকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিল জ্ঞান হারিয়েছে তখন ছেলেটি...

ভোর হয়ে আসছে ক্রমশ। যুদ্ধ থেমে গেছে। দুর্গের দিকে যেতে পারেননি বাবর ফিরে এসেছেন বাখ্‌শ উপত্যকার দিকে ষড়যন্ত্রকারীদের তাঁকে ধাওয়া করার মত আর শক্তি নেই।

বাবরের নিজস্ব হাকিম পরিষ্কার চেকমেনের ওপর শোয়ান খুররামের ওপর

অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চালাতে লাগল, ক্ষতস্থানে মলম লাগাল, শেষে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে। কিন্তু খুররামের জ্ঞান ফিরল না, মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে কেবল।

তীরটা তার ফুসফুস আর পেটের মধ্যে বিঁধে বিরাট ক্ষত সৃষ্টি করেছে। হাকিম তাকে জলের সঙ্গে পাহাড়ী মধু মিশিয়ে খাওয়াতে চাইল, কিন্তু দেখা গেল তা অসম্ভব অজ্ঞান ছেলেটির গলায় ঢেলে দেওয়া মধুমিশান জল হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল। তা দেখে ভয়ে খানজাদা বেগম ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছেলের চেতনাহীন দেহের ওপর, কাঁদতে কাঁদতে বললেন:

'খুররামজান! মানিক আমার! আমার খুররাম!'

হঠাৎ বড় বড় করে চোখ মেলল সে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি শূন্য, চোখের মণি এপাশ ওপাশ ঘুরে তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাবর বুঝলেন শেষ হয়ে গেল খুররাম। বোনকে জড়িয়ে ধরে একপাশে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু জোর করে ছাড়িয়ে নিলেন খানজাদা বেগম, ছেলের মৃত দেহটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলেন, তোলার চেষ্টা করছেন, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, চীৎকার করে ডাকছেন ছেলেকে:

'খুররাম, খুররামজান তুই কোথায় রে?! কই তুই, বাছা আমার? ওঠ! সাড়া দে! সাড়া দে!'

শেষে বাবর—কাঁদছেন তিনিও—ছেলেটির দেহ ছাড়িয়ে নিলেন তার মায়ের হাত থেকে আবার তাকে শুইয়ে দিলেন চেকমেনটির উপরে। কাসিমবেগ তার চোখদুটি বন্ধ করে দেবার জন্য সাবধানে হাত বোলালেন তার ভ্রূর ওপর, কিন্তু তার চোখগুলি সামান্য খোলা রয়েই গেল। তখনই কেবল খানজাদা বেগম বুঝতে পারলেন যে তাঁর ছেলে আর নেই: পাগলের মত নিজের মাথায় আঘাত করতে লাগলেন তিনি ভয়ঙ্কর চীৎকার করতে লাগলেন:

'হা কপাল! আমি তোকে রক্ষা করতে পারলাম না বাছা আমার। এর চেয়ে আমার মরা ভাল ছিল! কেন যে তোকে এখানে নিয়ে এলাম! মরণ আমার!'

বাবর বোনের শক্ত করে মুঠো পাকান হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে জোর করে তার মুখ নিজের দিকে ঘুরিয়ে বললেন:

'যদি কাউকে দোষ দিতেই হয় তো আমায় দোষ দাও!' মনের দুঃখে বললেন বাবর। 'আমিই তোমার বিপদ ডেকে এনেছি। মৃত্যুর যদি ন্যায়বোধ থাকত তো সবার আগে মরা উচিত ছিল আমার, আমিই সব দোষে দোষী। আমারই দোষেই নিষ্পাপ ছেলেটি লড়াইয়ের মাঝে গিয়ে পড়ল! আমিই তোমাদের সিপাহিকে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে এনেছি।'

কাসিমবেগ সহানুভূতি নিয়ে বাবরের কাঁধ জড়িয়ে ধরল। সে নিজেকে দোষ দিতে লাগল এই জন্য, যে গতবছর সে যখন সে কুন্দুজে জানতে পারে যে মোগল বেগদের

মধ্যে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠে তখন তার বিরুদ্ধে যথার্থ ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলে বাবরকে। আজকের এই বিদ্রোহ—পুরান ঘায়ের ফল।

'আমরা সবাই দোষী, জাঁহাপনা।' বলল শেষে কাসিমবেগ। 'দুনিয়াটা চিরকালই এমনি: সৎ ও নিরপরাধ লোক মারা পড়ে বিশ্বাসভঙ্গকারীদের হাতে।'

খানজাদা বেগম আবার চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছেলের ওপর:

'তোমাদের ঐ দুনিয়া দেখে দেখে ঘৃণা ধরে গেছে! হয়েছে! আমাকেও ছেলের সঙ্গে কবর দাও!... অন্য জগতে চলে যাব! খুররামের সঙ্গে।'

আর্চা গাছের গুঁড়ি আর ডালপালা দিয়ে তৈরি একটা তক্তার ওপর খুররামের দেহটি শুইয়ে সারাদিন বয়ে নিয়ে চলেছে সবাই পালা করে করে। সন্ধ্যার মুখোমুখি মহান পামির পর্বতমালার কাছে একটা সবুজ টিলায় কবর দেওয়া হল তাকে; ছোট্ট কবরটির উপর ফরফর করে উড়তে থাকল সাদা পতাকা, যার অর্থ—এখানে শুয়ে আছে নিরপরাধ এক শিশু।

আধমরা খানজাদা বেগমকে কোনরকমে কুন্দুজ অবধি নিয়ে এসে তারপর চিকিৎসা করা হল, তারপরেই কেবল তাঁকে কাবুলে নিয়ে যাওয়া হল।

কাবুল

১

সন্ধ্যার মুখে এক ঝাঁক লম্বাঠোঁট হাঁস উড়ে গেল হ্রদ থেকে মির্জা হুমায়ুন এতক্ষণ এই মুহূর্তের অপেক্ষা করছিল তীরের ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসে। তীর ছুঁড়ল একটি, দুটি। উপরে উঠতে উঠতে হাঁসের ঝাঁকটা থেকে একটি পাখি গতি কমিয়ে নেমে আসতে লাগল তারপর অসহায় অবস্থায় ডানা গুটিয়ে ওপারের তীরের কাছে জলের মধ্যে পড়ল।

সেখানে হালকা ঢেউয়ে দোলা খাচ্ছে বাবরের আটদাঁড়ের নৌকাটি, ওপরে তার চমৎকার চাঁদোয়া খাটান। যতক্ষণে হুমায়ুন তার শিক্ষক আর অনুচরদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে হ্রদ ঘুরে ওপারে গিয়ে পৌঁছলেন, ততক্ষণে শাহ্‌র অন্তরঙ্গরা নৌকায় উঠে হাঁসটা জল থেকে তুলে নিয়ে শাহজাদাকে দিতে চলল।

হুমায়ুন দেখলেন যে পিতা স্বয়ং হাঁসটি হাতে ধরে ভাল করে লক্ষ্য করছেন। ছেলে তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল, প্রথামত যতখানি দূরত্ব রাখা দরকার সেখান থেকেই কুর্নিশ করল।

পাখীর বুকে আটকে থাকা তীরটা টেনে বার করে আনলেন বাবর। ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন:

'তোমার তীর?' হুমায়ুন লক্ষ্য করল যে পিতা সামান্য মত্ত অবস্থায়। ইদানীং বাবর বেশি মদ্য পান করতে আরম্ভ করেছেন, এই যেমন আজই নৌকায়, চাঁদোয়ার নিচে তিনি তার ইয়ারবেগদের সঙ্গে মাইনব পান করেছেন। হুমায়ুনের মনে পড়ল যে এই হ্রদ ও তার চারপাশের জায়গাটা বাবরের বিশ্রামের জায়গা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অপরাধীভাবে চোখের পলক ফেলে বলল:

'ক্ষমা করবেন, জাঁহাপনা, আমি অসময়ে... তীর ছুঁড়েছি।'

'কিন্তু নিশানা নিখুঁত। মৃদু হাসলেন বাবর। 'নাও পাখীটা। চমৎকার!'

হুমায়ুন বাঁহাত বুকের ওপর রেখে পিতার কাছে গিয়ে ডানহাতে পাখীটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা দিয়ে দিল ভৃত্যদের একজনের হাতে।

বড় বড় চোখ, গায়ের রং চাপা, রোগা চেহারার একজন—বাবরের দলের লোক—নাম তার হিন্দুবেগ, ঘন ঘন সাদা দাঁতের সারি মেলে হাসল:

'নিখুঁত নিশানা আর হাতের জোর শাহজাদা পেয়েছেন বাদশাহ্ পিতার মতই'

খাজা কালোনবেগও তখুনি তার কথাকে সমর্থন করল একটু অস্পষ্টভাবে (মাইনবের প্রভাব): আমাদের সামনে বীর পিতার উপযুক্ত সন্তান।

খুশি হয়ে বাবর তাকালেন কাসিমবেগের দিকে যে বরাবরের মতই একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে কথা শুনছে। বয়স তার ষাটবছর পেরিয়ে যাওয়ায় প্রথম উজিরের কার্যভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করে সে নিজেই, এখন হুমায়ুনের শিক্ষার ভার তার ওপর। 'ইনি তো একসময় আমার শিক্ষার ভারও নিয়েছিলেন, লুকোবার আর কি আছে... এই অনুগত লোকটিকে ছাড়া কি যে করতাম আমি,' ভাবলেন বাবর।

'মহামান্য কাসিমবেগের প্রশংসা করি হুমায়ুনকে এমন নিখুঁত নিশানা করতে শেখানর জন্য', বললেন বাবর। 'কিন্তু শাহ্ হতে গেলে শুধুমাত্র নিখুঁত নিশানা হলেই চলবে না। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে অশ্বচালনাতেও দক্ষ হতে হবে তো?'

কাসিমবেগ ইঙ্গিত করল হুমায়ুনকে, ছেলেটির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তক্ষুনি তার ক্ষমতা দেখিয়ে দেবার অনুমতি চাইল।

'দেখা যাক!'

তেরবছর বয়সের হুমায়ুন লম্বায় প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে বাবরকে। তার মুখচোখ আর ধরনধারণও তরুণ বাবরের মতই।

কাসিমবেগের ইঙ্গিতে দু'জন লোক দুটি জিন লাগাম পরান ঘোড়া নিয়ে এসে পরস্পরের থেকে পঞ্চাশ পা দূরত্বে দাঁড়াল। হুমায়ুন দক্ষতার সঙ্গে লাফিয়ে উঠল নিজের ঘনকেশর, কপালে সাদা চিহ্ন দেওয়া ঘোড়াটির পিঠে, পিছিয়ে গেল বেশ কিছুটা তারপর জোরে ঘোড়া ছোটাল সোজা রেখায় প্রথম ঘোড়াটির দিকে, প্রথম ঘোড়াটির কাছে এসে অত্যন্ত দ্রুত লাগাম ছেড়ে দিয়ে, রেকাব থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে পাশের ঘোড়াটির জিনের পাশটা ধরে ফেলল—তারপর এক লাফে নিজের ঘোড়া

থেকে অন্য ঘোড়াটির পিঠে বসল, সেটির লাগাম ধরে তৃতীয় ঘোড়াটি ধরে থাকা অনুচরটিকে বলল 'নড়ো না', ছুটে এগিয়ে তৃতীয় ঘোড়াটির পিঠেও সেই একই ভাবে বসল।

বীর বেগের দল প্রায় সমস্বরে বলে উঠল:

'বাহবা! বাহবা!'

'অপূর্ব! এমন কখনও দেখিনি!'

'বাপ কা বেটা!'

বাবরের মনে পড়ল তাঁর ছেলেবেলার কথা, আন্দিজানের উপকণ্ঠে বাগানবাড়িতে তিনিও এমনি এক ঘোড়া থেকে অন্য ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসতেন, একবার পা ফসকে পড়ে গিয়ে পা মচকে যায়।

'হুমায়ুনকে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন খোদা! ঘোড়া চড়ায় সে আমার চেয়েও দক্ষ হয়ে উঠেছে দেখছি!'

'মির্জা হুমায়ুন সব ব্যাপারেই আপনার মত হবার চেষ্টা করে, জাঁহাপনা!' কাসিমবেগ জানাল।

বাবরও অকপট উত্তর দিলেন:

'সব ব্যাপারে আমার মত হবার হয়ত প্রয়োজন নেই!'

হুমায়ুন এবার কাছে এগিয়ে এসেছে, পিতার ম্লান হয়ে যাওয়া মুখ দেখে বিস্মিত হল:

'কেন, জাঁহাপনা! উনি আমাকে বলেছেন আপনার সব লড়াইগুলির কথাই— যেগুলিতে জয়লাভ করেছেন আর যেগুলিতে ভাগ্য আপনাকে সফল করেনি, সবগুলির কথাই। বোধহয় রুস্তাম, সোহ্‌রাব বা আলপামিশ কেউই এত শত্রুর মুখোমুখি হয়নি, আপনার মত!'

'লড়াইটাই তো আসল কথা নয় শাহ্‌জাদা, আসল হল তার ফলে যা হয়,' বললেন বাবর। তিনি ভাবছিলেন তাঁর নিজের পরাজয়গুলি আর তার ফলাফলের কথা আর সবচেয়ে দুঃখদায়ক ফল হল পিতৃভূমি মাভেরান্‌নহর চিরকালের মত হাতছাড়া হওয়া।

কিন্তু হুমায়ুনের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে তার পিতা কতবার কত রক্তঝরা লড়াইতে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, কিন্তু প্রতিবারই সেই লড়াই থেকে সুস্থ, অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছেন, তা কি প্রকৃত বীরের উপযুক্ত নয়? সম্প্রতি হুমায়ুন কাসিমবেগের কাছে সেই গল্প শুনেছে, কেমন করে শীতকালে দারুণ ঠান্ডা আর ভয়ঙ্কর তুষারঝড়ের সময় যখন কেউ সাহস করে না হীরাট আর কাবুলের মাঝের পাহাড় পার হতে, যার উপরে গ্রীষ্মকালেও বরফ জমে থাকে তখন বাবর তাঁর সৈন্যদের নিয়ে সেই পাহাড় পার হন, যা মনে হত মানুষের কাছে অকল্পনীয় যদি সে তুষারধ্বসে চাপা পড়ে আত্মহত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে না থাকে। 'বুক পর্যন্ত ডুবে

গেছে আমাদের বরফের মধ্যে' বলছিল কাসিমবেগ, ঘোড়াগুলো যেতে পারছে না, পড়ে যাচ্ছে বরফের মধ্যে। লোকেরা আগে আগে চলেছে দু'পাশে বরফ সরিয়ে দিয়ে পথ তৈরি করছে। আর যখন সৈন্যরাও ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বা পাহাড়ের ওপরে নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে তাদের, তখন সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন আমাদের মালিক। হিমঠান্ডা ফুঁসছে এদিকে, কিন্তু তাঁর লক্ষ্যই নেই যে মুখ আর হাত জমে গেছে। যাই হোক এগিয়ে চললাম আমরা, তিনি আমাদের পার করে নিয়ে গেলেন ঐ ভয়ঙ্কর পাহাড়।'

বাবরের মাথার উপর দিয়ে যে কত বিপদ পেরিয়ে গেছে সে সব কথা বলতে বলতে কাসিমবেগ হুমায়ুনকে বুঝিয়েছেন, ভাগ্য তার পিতাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে চিরকাল। সেই ছেলেমানুষী বিশ্বাস নিয়েই বড় হয়ে উঠেছে হুমায়ুন। এখনও সেই ছেলেমানুষী নিয়ে প্রশ্ন করে বসল:

'জাঁহাপনা, এ কি সত্য যে এই কাবুলে ষড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় বিশালদেহী সৈন্য দোস্ত্ আপনাকে চিনতে না পেরে তরবারির ঘা বসিয়ে দেয়?'

মৃদু হাসি ফুটল বাবরের মুখে:

'যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে... শীতকালে সেই পাহাড় পেরিয়ে কাবুলে এসে পৌঁছলাম আমি, শীতে মুখ জমে অন্যরকম দেখতে লাগছিল বোধহয় কাবুলে প্রতারণাকারীরা তরবারি নিয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল। সৈন্যদের ভুল বুঝিয়েছে ষড়যন্ত্রকারীরা, তাদের মাঝে দোস্তও ছিল দোস্ত ভাল করে জানত আমায়। চীৎকার করে তাকে বললাম 'ভেবে দেখ, দোস্ত!' তরবারি একবার তুলে ধরা হলে তাকে সংযত করা, আঘাত না করা খুবই কঠিন ব্যাপার—তরোয়াল নেমে এল আমার শিরস্ত্রাণের উপর। মনে হয় দোস্ত আমার গলা চিনতে পারে, হাত কেঁপে যায় তার, তাই আঘাত তেমন জোর হয়নি। তার হাতে আঘাত খেয়ে কেউ বেঁচে থাকেনি। সেবার আঘাত লাগে আমার মাথার পিছন দিকে।'

'আর তার কি হল?'

'ও নিজে বোধহয় ভয় পেয়ে তরবারি ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যায়, লুকিয়ে পড়ে... আমি আর তাকে ধাওয়া করিনি।'

হুমায়ুন, বেগরা অবাক হয়ে গেল সবাই এ ঘটনার বর্ণনা শুনে। বিনয় মানুষের ভূষণস্বরূপ, কিন্তু... বাবরের বর্তমান উজীর চল্লিশবছরবয়সী সুঠাম, সুন্দর চেহারার বেগ মুহম্মদ দুলদাই টলমল করতে করতে সিদ্ধান্ত নিল সত্যঘটনা প্রকাশ করে দেবার:

'যা কিছু ঘটে, তা খোদা করেন! সর্বক্ষমতাসম্পন্ন আল্লাহ্ এমনভাবে আমাদের জাঁহাপনাকে সৃষ্টি করেছেন যে তরবারি, হিম, বা তীর ওঁকে কিছুই করতে পারবে না!'

তোষামুদে উজীরের লালচে মাতাল মুখ দেখে বিরক্তিতে সরে গেল হুমায়ুন। এখন সে কেবলমাত্র তার পিতার সঙ্গেই কথা বলতে চাচ্ছে। ইদানীং পিতার প্রতি

কেমন এক আকর্ষণ অনুভব করছে সে। এদিকে বাবর রাজকার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত আদেশ-নির্দেশ নিয়ে, নিজের বিশ্রামকক্ষে বইখাতা নিয়ে আর অবসর সময়ে বিশ্বস্ত বেগদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদে মত্ত থাকেন। হুমায়ুনকে তিনি মনে করেন অর্বাচীন বালকমাত্র, তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার মত সময় আসেনি এখনও। ছেলের কিন্তু অত্যন্ত ইচ্ছা পিতার সঙ্গে আলাপ করার। ছেলেমানুষী খেলার সঙ্গীর দল, গোমড়ামুখ শিক্ষকরা সেইসঙ্গে কাসিমবেগও' ক্রমশই তার আর ভাল লাগছে না।

'আচ্ছা, পিতা শুনেছি, গতবছর সিন্ধু নদীর তীরে আপনি বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন...'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আপনার নিজস্ব মহলে আমি বাঘের ছাল দেখেছি।'

বাবর তাঁর পিছনে বেগদের দিকে ঘাড় হেলিয়ে বললেন:

'আমরা সবাই মিলে কাবু করি বাঘটাকে।'

হিন্দুবেগ হেসে সাদা দাঁতে ঝলক উঠিয়ে বলল:

'আমাদের সঙ্গে জাঁহাপনা না থাকলে আর আমাদের সাহস হত না বাঘের কাছে এগনোর।'

সপ্রশংশ চোখে হুমায়ুন পিতার দিকে তাকাল।

বাবর ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন, কিন্তু তাঁর মন পড়ে রয়েছে মাভেরান্নহরে শয়বানী আর তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজয়ের কথা ভুলতে পারছেন না কিছুতে, বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। 'হীসারও ছেড়ে আসতে হল!... এই তাহলে শক্তি! শক্তি নেই—সাফল্যও নেই... বারবার ভাগ্য আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আমার কাঁধ থেকে উড়ে চলে গিয়েছে হুমো—সুখের পাখী।' সেই সব দুঃখ ভুলে যাবার জন্য প্রায়ই আরও বেশি করে মদ্যপান করছেন তিনি, কিন্তু তাতে ভুলতে পারছেন না ব্যথাটা। ভেঙে পড়েছেন তিনি, তাই তাঁর দৃষ্টি পড়েছে ছেলের উপর: ছেলেরও দেখা যাচ্ছে বাবার জীবনের ঘটনাগুলির প্রতি গভীর আগ্রহ।

এক মুহূর্তের জন্য তিনি নিজেকে দেখতে পেলেন তরুণ ছেলের দৃষ্টিতে। তাঁর ছেলে যে সব ঘটনা নিয়ে গর্বিত সে সব ঘটনা সত্যিই ঘটেছে। বেগরা তাঁকে খুশী করার জন্য তার বীরত্বকে বলে থাকেন অপরিসীম, তাঁর প্রতি আল্লাহর দান। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে তো শাস্তিও দিয়েছেন... আসলে যত কিছু ভাল-মন্দ, জয়-পরাজয় সব কিছুই নির্ভর করে লোকের উপর—পৃথিবীর অতি সাধারণ লোকের উপর, তিনিও এই পৃথিবীর লোক, হয়ত একেবারে সাধারণ নন যেমন হুমায়ুনের নিষ্পাপ শিশুমন মনে করে।

এই প্রথম বাবর অনুভব করলেন যে কেবলমাত্র তিনিই ছেলের অবলম্বন নন, তাঁর তেরবছরের ছেলে হুমায়ুনও তাঁর অবলম্বন। জীবনকে বাবরের মনে হত কুচকুচে

কালো অন্ধকার রাত আর এখন জীবনকে ছেলের চোখ দিয়ে দেখে বাবর দেখতে শিখেছেন রাতের আকাশে কতকগুলি উজ্জ্বল বিন্দু, যা তারার কথা মনে করিয়ে দেয়।

হুমায়ুন যেন বাবার কাছে কেবল একলা রয়েছে, এমনিভাবে গলানিচু করে বলল:

'যে কবিতা সঙ্কলনটি আপনি আমায় উপহার দিয়েছেন, তার সব কবিতা আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। পরীক্ষা করতে চান তো জিজ্ঞাসা করুন...'

বাবরের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ লোকেরা। তারা এখন কি চাইছে? যত শীঘ্র সম্ভব নৌকায় ফিরে ভোজসভা চালিয়ে যেতে।

বেগদের দিকে ফিরে বাবর অপ্রত্যাশিত কঠোর স্বরে বললেন:

'আজ যথেষ্ট আনন্দ করা হয়েছে বন্ধুগণ। এবার আমি ছেলের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাব। ঘোড়া নিয়ে এস।'

ঘোড়ায় উঠে বসলেন বাবর, হুমায়ুনও খুশিমনে উঠল ঘোড়ায়। দু'জনে একসঙ্গে চললেন শহরের দিকে। তাঁদের পিছনে সামান্য দূরে কাসিমবেগ আর বাবরের অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গরা।

বাবরের চোখগুলি অন্যদিনের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল। মাছে মাঝে আবার একেবারেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এঃ, বড় কড়া পানীয় ময়নাব!

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে করতে মৃদু হেসে বাবর ছেলেকে বললেন: 'তাহলে, শাহ্জাদা... বল... বল...'

পিতার পাশেপাশে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে সেকথা সর্বশরীর দিয়ে অনুভব করছে হুমায়ুন, ব্যস্ত হয়ে একটি রুবাই পড়তে আরম্ভ করল:

কড়া কথাগুলো জ্বালা দিয়ে ভরি—এমনটা ঘটে।
নিজেরই সৃষ্ট যাতনায় মরি—এটাও তো ঘটে।
সুখ দুখ যদি শরাবে ডোবাই, তবে মাঝে মাঝে
অতি আপনকে অপমান করি—দেখো কী ঘটে।

হুমায়ুন দেখা যাচ্ছে খুব সহজ ছেলে নয়। রুবাইটাও তেমনি বেছে নিয়েছে! বলতে চায় যে ও বোঝে কেন পিতা মদ্যপান করেন, আর আজকের এই মত্ত অবস্থাও সে ক্ষমা করে দিচ্ছে।

লজ্জা পেলেন একটু বাবর, বললেন:

'সবই ঠিক... কিন্তু প্রথম বয়েতে তুমি ছন্দ গোলমাল করে ফেলেছ, শব্দের এক অংশ বাদ পড়ে গেছে... তাছাড়া সব অর্থটা তোমার বোধগম্য হয়নি, উপহাস করা হয়েছে এ রুবাইয়ে।

'বোধগম্য... হয়নি?.. কার প্রতি উপহাস?' বিস্মিত হল হুমায়ুন।

আমাদের প্রতি. . . ঐ যারা. . . ঐ যখন লোকে পরস্পরকে অপমানজনক কথা বলে, আরো বেশি আঘাত দেওয়া কথা খোঁজে... যাতে আপনজনের মনে কষ্ট দেওয়া যায়। তারপর... বিবেকের দংশন থেকে রক্ষা পেতে হবে তো... তখন মদ্যপান আরম্ভ করে সব ভোলার জন্য। অর্থাৎ আবার আপন, অন্তরঙ্গজনের মনে কষ্ট দেয়... নিজেকে ব্যঙ্গ করাও প্রয়োজন।'

আবার বিস্মিত হল হুমায়ুন।

'প্রয়োজন? কেন?'

'এই বয়সে তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়... ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কখনও আমার মনে হয়নি মদ্যপানের কথা... তুমি? তোমার ইচ্ছা হয় না মদ্যপান করে দেখতে?'

বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল হুমায়ুন। তারপর কেমন যেন বিষণ্ণ আর কঠোর দৃষ্টিতে বাবরের ফোলা ফোলা চোখের পাতাদুটির দিকে তাকিয়ে বলল:

'আমি ভালবাসি না!'

বাবরও তেরবছরবয়সে ঘৃণা করতেন মদকে। সমর্থনের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়ে বললেন:

'কি ভালবাস তুমি?'

'কি ভালবাসি?' সামান্য চিন্তা করল হুমায়ুন। 'ভালবাসি ভ্রমণ করতে, দেখতে, জানতে। আর সবচেয়ে ভালবাসি ভাল ভাল বই পড়তে, বীরদের কাহিনী, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়তে পারি...'

'আমার মতই হয়েছে', ভাবলেন বাবর ছেলের দিকে তাকিয়ে, চাবুক ধরে থাকা হাতটি লক্ষ্য করলেন ভাল করে। 'চাপা গায়ের রং... হয়ত দক্ষিণদেশে জন্ম হয়েছে বলে। ছেলেটির হাতের কব্জি কিন্তু ঠিক বাবরের মত। ছেলের হাতের কব্জিটা ধরলেন তিনি:

'দেখি হাতটা খোল।'

হুমায়ুন চাবুকটা কোমরে গুঁজে রেখে হাত মেলে ধরল। ছেলের হাতের কাছে নিজের হাতটা ধরে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগলেন... দুটি হাতেই সব বড় ছোট দাগ একইরকম। খুশিতে হেসে উঠল হুমায়ুন আর গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল বাবরের:

'আমার যত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তোর ভাগ্যে যেন তেমন না হয়!'

'আমি আপনার থেকে সবকিছুর উত্তরাধিকার নিতে চাই।'

উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালেন বাবর ছেলের দিকে:

'আমার জীবনে এমন দিক আছে যা নিয়ে নেওয়া বা উত্তরাধিকার পাওয়া কোনটাই সম্ভব নয়।'

'কোন দিক, জাঁহাপনা?'

'তিক্ত... নিষ্ঠুর... অন্যায়... আরও অনেক দিক!...'

চিন্তায় পড়ল হুমায়ুন। পিতার রচিত কবিতার মধ্যে কি এসব কথা উল্লেখ আছে? মনে হচ্ছে, আছে।

যেখানেই যাই, দুখ হাঁটে পাশে পাশে
ডানে বাঁয়ে ফিরি। ফের দেখি যন্ত্রণা
নেই কো শান্তি, উদ্বেগ শুধু গ্রাসে,
কার এত দুর্ভাগ্য, কষ্ট কত না?

এই পংক্তিগুলির মধ্যে যে জ্বলন্ত সত্য আছে তা মনে করে বাবরের বুকটা টনটন করে উঠল।

'কি চমৎকার আবৃত্তি করলি তুই, হুমায়ুন', প্রশংসা করলেন ছেলের। 'এর আগে কি বললাম তোকে বুঝেছিস তুই... আমি চাই না যে যত দুর্ভাগ্য আমার মাথায় নেমে এসেছে তা তোর ওপরও নেমে আসুক।'

'বুঝেছি, বাবা। আপনার জীবনের আনন্দময় দিকটি নিয়েই কেবল কথা বলব এবার থেকে, যা আমাকে নিশিদিন নিজের কাছে টানে, কেমন তো?'

শহরের প্রাসাদের বিরাট আলোহাওয়াভরা ঘরে বাবা-ছেলের মধ্যে কথা হল অনেকক্ষণ ধরে, ঘরের জানলাগুলি শাহী কাবুল পর্বতমালার দিকে। হুমায়ুন কলম নিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বাবরউদ্ভুত অক্ষরে বাবরের বয়েৎ লিখল:

তুর্কির নেই নিজ বর্ণমালা, হে বাবর—কী করা যাবে?
হাট্টি বাবর সিগিয়াক থেকে, নয় তোর—কী করা যাবে?

বাবরের মনে পড়ল সমরখন্দের সেই অন্ধ ধর্মবিশ্বাসীদের কথা যারা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছিল একজন শিক্ষককে যে বাবরের অক্ষর শেখাতে চেষ্টা করেছিল ছাত্রদের... অজ্ঞ, নিষ্ঠুর শক্তি যা উলুগবেগের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, সেই শক্তিগুলি ফোঁসফোঁস করে উঠেছিল ছোবল বসাবার জন্য যখন বাবর মানমন্দিরের সারাইয়ের কাজ আরম্ভ করেন। বাবরকে অভিযুক্ত করা হয় মুসলমান ধর্মত্যাগ করার অভিযোগে, সৈন্যদলের একটা বেশ বড় অংশকেও তাই বোঝান হয়েছিল এর ফলেই কিজিলকুমের যুদ্ধে তাঁর পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

তাই বাধ্য হয়ে তাঁর পরিকল্পিত সহজ অক্ষরের প্রচলন থেকে বিরত থাকতে হল...

'কোন শিক্ষক তোকে শিখিয়েছে এই অক্ষরে লিখতে?' চোখে প্রশংসা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাবর ছেলের লেখা ছত্রগুলির দিকে।

'লিপিকর মীরবাদলের কাছে শিখেছি...'

বয়েৎটি লিখেছে হুমায়ুন নির্ভুল, কিন্তু এই অক্ষরে লেখার অভ্যাস না থাকায় অক্ষরগুলি সমান হয়নি, আকারে ছোটবড় হয়ে গেছে।

'তোর এমন লিখতে ভাল লাগে, বাবা?'

'খুব। অক্ষরের নীচে চা ওপরে চিহ্ন: লিখতে বা পড়তে কষ্ট হয় না।'

'আরো বেশি করে, মন দিয়ে অভ্যাস কর, বাছা। যখন আমাকে কোন কিছু লিখবি এই অক্ষরেই লিখবি, কেমন? আমিও তোকে এই অক্ষরেই লিখব। এতে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু গোপন থাকবে।'

হুমায়ুন মনে মনে কল্পনা করে নিল কেমন করে পিতার সঙ্গে গোপনে পত্র আদানপ্রদান হবে, মনটা তার গর্বে ভরে উঠল যে পিতার মত এমন বীর একজনের কাছে তার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া ছেলেমানুষী আবেগের বশে হুমায়ুনের ইচ্ছা হল পিতাকে আরো একটু খুশি করার...

'জাঁহাপনা, আবি রবাবে কিছু বাজিয়ে শোনালে ভালো লাগবে নাকি আপনার?'

'নিশ্চয়ই, শুনতে চাই।'

মুক্তাবসান আফগানী রবাব নিয়ে আসা হল। সুর বেঁধে নিয়ে তারে হাত ছোঁয়াল হুমায়ুন। রবাবের গর্ভ থেকে উঠে আসতে লাগল অপূর্ব সুর, যেমন পাহাড়ে কোন আওয়াজের প্রতিধ্বনি হয়।

হুমায়ুন প্রথমে 'নাভো' তারপর 'সাভত' সুর বাজাল।

শেষের যে সুরটি বাজাল হুমায়ুন তা অত্যন্ত পরিচিত বাবরের কাছে: হবে না? গতবছর ঐ সুরটি বাবর নিজেই রচনা করেন, নাম দেন 'চারগোহ্ সাভতি', বাজনদাররা ঐ 'সাভত' খুব অল্পই বাজায়, কারণ এই সাভতে এমন কিছু একটা আছে যাতে সেটি ভোজসভায় বাজান চলে না। কি করে হুমায়ুন শিখে নিয়েছে 'চারগোহ্ সাভতি'? শিক্ষকরা বলে দিয়েছে নাকি পিতাকে কি করে খুশি করা যায়? এইভাবেই শাহ্‌র কাছ থেকে প্রশংসা আর পুরস্কার পাবার চেষ্টা করে?... আর তাই যদি হয়? আসল কথা হল হুমায়ুন বাজাচ্ছে মনপ্রাণ দিয়ে? যদিও সে সুরের মধ্যে যে গভীর সত্য আছে তা সে হয়ত বুঝতে পারছে না... যাতে সে প্রমাণ করে দিতে পারে নিজের কথার সত্যতা যে যোদ্ধা ও শিল্পী হিসাবে সে পিতার মত হবার চেষ্টা করবে... কিন্তু এই যে প্রচেষ্টা একি ছেলের পক্ষে উপযুক্ত নয়?

বাবর মন দিয়ে শুনছেন বাজনা আর উচ্ছ্বসিত হয়ে ভাবছেন ছেলের কথা আর সেই সঙ্গে ভাবছেন নিজের কথাও যে কেমন খারাপ হয়ে গেছেন তিনি নিজে, সবকিছুই দেখেন খারাপ চোখে, ভাবেন সবাই কোন না কোন স্বার্থসিদ্ধি করতে চাচ্ছে। হুমায়ুনের কি স্বার্থ থাকতে পারে?.. না! আর নিজের জীবনটাকেও এখন আর তাঁর কেবল অন্ধকারে ভরা বলে মনে হচ্ছে না। তিনিও তো একসময় হুমায়ুনের মত

এমনি ভাল মহৎ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তখন তাঁর জীবন বয়ে চলেছিল যেন স্বচ্ছতোয়া নদীর মত। তারপর নদীর পাড় ভেঙে পড়ে পড়ে জল ঘোলা হয়ে গেছে। কিন্তু নদীটা আজও বেঁচে আছে, কবিতা আর গানের মধ্যে দিয়ে তা ফুটে বেরোয় তার ধারাই হুমায়ুনের বুক ভরিয়ে দিক।

আজ প্রথম বাবর অনুভব করলেন তাঁর আর তাঁর ছেলের জীবনের মধ্যে কি অদ্ভুত যোগাযোগ। সমস্ত কিছুতে বাবার প্রতিমূর্তি হতে পারে না ছেলে, সব কিছুতে হবার দরকারও নেই। যদি ছেলে বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয় তো লোকে যেমন বলে, বাবার মত হয়েছে, তাহলে সময়ে তাদের, বাবা ছেলের জীবন মিলেমিশে এক হয়ে যায়, যা বাবা করতে পারেনি, ছেলে তা সম্পূর্ণ করে—বাবর এবার এই আশা করতে লাগলেন।

অর্থাৎ শিক্ষাগুরুরা, মাতৃদেবী যে চেষ্টা করছেন হুমায়ুনের মনে পিতার প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য সৃষ্টি করতে তাকে বাবরের জীবনের কেবল উজ্জ্বল দিকটিই দেখিয়ে এ ভাল কথা। তাকে তোষামুদে চাটুকার করে তুলছে না তারা—কেবল মন্দ থেকে তাকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বাবর নিজেও তো ছেলেকে দিতে চাইছেন কেবল তাঁর সদ্‌গুণগুলি এই আশায় যে ছেলে তাঁর ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না আর তাঁর মত যন্ত্রণাও পাবে না।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় বাবর কাসিমবেগকে ডেকে পাঠালেন নিজের কাছে আর প্রকৃত রাজকীয় উপহার দিলেন তাকে—পশুচামড়ার দামী পোশাক, তাতে সোনার বোতাম বসান আর পুরোদস্তুর সজ্জিত সুন্দর এক ঘোড়া। শাহজাদার অন্যান্য শিক্ষকরাও প্রচুর সোনারূপা উপহার পেল।

'আর তুই কি চাস, বাছা, বল নিজেই?' একদিন হুমায়ুনের বিশ্রামঘরে ঢুকে বললেন বাবর।

হুমায়ুন বই পড়তে অসম্ভব ভালবাসে, নিজের গ্রন্থসংগ্রহের অত্যন্ত যত্ন নেয়: একটি বিশেষ ঘর ভর্তি হয়ে গেছে তার বইতে, তা ছাড়া তার শোবার ঘরে আছে একটা বইয়ের আলমারী—চকচকে বাদাম কাঠের তৈরি। আলমারীটি খুলে হুমায়ুন দেখাল বিশেষ ধরনের খুদিয়ে কাজ করা একটি তাকে দাঁড় করান আছে বাবরের কবিতার সঙ্কলন।

'এই তাকগুলি আমি আলাদা করে রেখেছি আপনার রচনাগুলি রাখার জন্য', বলল হুমায়ুন। 'আর খোদার কাছে প্রার্থনা করি আপনাকে তিনি যেন আরও অনেক সৃষ্টি করার ক্ষমতা দেন। এই গোটা তাকটা আপনার রচনাবলী দিয়ে ভরাতে চাই আমি!'

---

* আইভান—পালঙ্ক

মজা লাগল বাবরের।

'ভাল বলেছ!... কিন্তু... তোর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমাকে সারাজীবন লিখেই যেতে হবে!...'

তারপর হুমায়ুন লজ্জা পেয়েছে দেখে উদারস্বরে বললেন:

'ঠিক আছে তাই হবে। কথায় বলে, ভালো স্বপ্ন অর্ধেকটা কাজই করে দেয়! আজই তোর জন্য নতুন বই লেখা আরম্ভ করব। দেখি দে তো তোর খাতাটা।'

হুমায়ুন চটপট আলমারী থেকে বার করে আনল শক্ত সোনালী মলাটে বাঁধান নতুন একটি খাতা, দু'হাতে করে এগিয়ে ধরল বাবরের দিকে।

খাতাটি নিয়ে বাবর আটপায়া টুলটির দিকে এগিয়ে গেলেন, তার ওপর রাখা ছিল ভাল করে কাটা একটা কলম। কেমন এক অদ্ভুত আবেগ জেগেছে বাবরের মনে যা এর আগে কখনও অনুভব করেননি তিনি: সেই আবেগের বশেই আরম্ভ করলেন:

আমার দিলের অঙ্কুর তুই, ও ছেলে...

বাবর কল্পনা করলেন একটি বিশাল গাছ, তার কাছেই একটি চারাগাছ। নাকি অন্যরকম? দুটি গাছ বড় আর ছোট—দুটি গাছকে একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে—এক অঙ্গে মিলে গেল তারা আর তাদের ফল পেল দুটি গাছেরই শ্রেষ্ঠ গুণাবলী। মানুষের সমাজে এমন ঘটনা অতি বিরল! শাসক—পিতা আর তার উত্তরাধিকারী পুত্রের মধ্যে শত্রুতা চিরন্তন। এই শত্রুতার ফলেই মহান উলুগবেগের জীবন গেছে, তারপর তাঁর হত্যাকারী তাঁর পুত্র আবদুল লতিফেরও জীবন যায়। যখন পুত্র পিতাকে ভালবাসে তাঁর প্রতি অনুগত, পিতার অসম্পূর্ণ কাজ চালিয়ে নিয়ে যায়—তা হল ভাগ্যের দান। কিন্তু তা হল ভাগ্যের দান। কিন্তু তা আর দেখা যায় কোথায়? কোন পিতাই বা পুত্রকে তেমন ভালবাসেন।

হুমায়ুনের খাতায় প্রথম বয়েৎটি লিখে ফেললেন:

কলজেতে মোর কলমের চারা, তাছাড়া বাঁচি না ওরে...
নিজের নামকে সার্থক কর, নিজ সুখ রাখ ধরে।

দুই পংক্তির মসনবী লিখেছেন বাবর—যাতে লেখা হয় মহাকাব্য, উপদেশবলী এমনকি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও। সহজ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতায় ভরে উঠতে লাগল খাতাটি:

যা ভেবেছিস তা সাধন করিস, অর্জন কর লক্ষণ
হাজারো লোকের ভালোবাসা পেয়ে ফিরিয়ে দিবি সে সখ্য।

'মসনবীতে গোটা বই একটা লিখলে কেমন হয়? লিখে ছেলের নামে উৎসর্গ করব!' খুশিমনে ভাবলেন বাবর।

'বাকীটা পরে লিখব,' হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন 'আমি তোকে একটি বই উপহার দেব যার নাম তোর নামের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হবে!'

'মুবায়ুন' বইটি বাবর লেখেন সেই বছরেই। ছেলের খাতায় প্রথম যে কয়েকটি পংক্তি আবেগমিশ্রিত শুভেচ্ছা লিখেছিলেন তিনি সেগুলি এই বইটিতেও স্থান পায়। কাবুলের শ্রেষ্ঠ লিপিকর বইটি নকল করে আর দক্ষ বই বাঁধাইকারীকে দিয়ে বইটি বাঁধাই করা হয়।

'মুবায়ুনে'র ছন্দময় পংক্তিগুলিতে আছে মুসলমান আইনকানুনের সারাংশ। ফিক্‌খাপাঠ হুমায়ুনের কাছে মনে হয বড় একঘেঁয়ে, গোলমেলে আর অত্যন্ত কঠিন আরবী ভাষায় লেখা, ঠিক যেমন একসময় মনে হত তরুণ বাবরেরও। তাই, হুমায়ুন এখন চমৎকার কবিতায় পিতার লেখা পাঠ্যবইটি পড়ে আর মাতৃভাষা তুর্কতে লেখা হওয়ার ফলে সে পাঠ আপনা হতেই মনে থেকে যায়। আর 'মুবায়ুনে'র ফলে হুমায়ুনের পিতার প্রতি ভালবাসা, প্রতিভা আর অদ্ভুত শক্তিতে বিশ্বাস বেড়ে গেল। আরো বিশ্বাস জন্মাল তাঁর কথা দিয়ে কথা রাখার ক্ষমতায়! কারণ হুমায়ুন জানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত জটিল কাজ করতে হয় তাঁকে! তা সত্ত্বেও কথা রেখেছেন, সময় করে ঠিক ছেলের জন্য গোটা একটি বই লিখেছেন! আর কি অপূর্ব কবিতাগুলি!' যত ভাবছে ততই চমৎকৃত হচ্ছে হুমায়ুন, বইটি চোখের কাছে ঠেকাচ্ছে, চুম্বন করছে যেন সেটি পবিত্র কোন কিছু জিনিস।

যখন হুমায়ুনের পনর বছর বয়স পূর্ণ হল তার আলমারীতে আর্বিভূত হল বাবরের আরও একটি বই 'মুখ্‌তাসার'। এই বইটি থেকে হুমায়ুন কবিতারচনার নিয়ম শিক্ষা করে। কবিতা রচনার আকাঙ্খা হুমায়ুনও পায় পিতার থেকে। কিন্তু পিতার কবিতার পাশে তার নিজের প্রচেষ্টার ফল এমন দীপ্তিহীন মনে হত যে হুমায়ুন সেগুলিকে লুকিয়ে রাখত, পিতাকে দেখাতে লজ্জা পেত, সে দৃঢ়ভাবে বুঝল, সে ভাল কবি হতে পারবে না। 'আর কাব্যের জগতে ছোট্ট জোনাকী পোকা হয়ে কি লাভ? তার চেয়ে কাব্যের রসগ্রাহী, বিচারক হওয়া ভাল!' একথা পিতাই একদিন তাকে বলেছিলেন সেকথা মনে রয়ে গেছে হুমায়ুনের।

এবার তার মনে জেগেছে এক অদম্য আকাঙ্খা—পিতার জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা 'অতীত' বইটি, বাবর সে বইটি তরুণবয়স থেকেই লিখেছেন বলে শুনেছে সে। তার কিছু কিছু অংশ যার যোগ আছে ফর্‌গানা, আন্দিজান ও সমরখন্দে তাঁর কাটান দিনগুলির সঙ্গে তিনি পড়ে শুনিয়েছেন হুমায়ুনের মাতৃদেবী মহিম বেগমকে। তাঁর পরিবারে ঐ বইটিকে বলা হয় 'বাবরনামা'। বহুদিন অপেক্ষা করেছে হুমায়ুন উপযুক্ত সময়ের যাতে পিতার কাছে বইটি চাওয়া যায় পড়ার জন্য।

হুমায়ুনের ষোলবছর বয়সে বাবর তাকে কাবুল থেকে দূরে পাহাড়ী এলাকা বাদাখ্‌শানের শাসক নিযুক্ত করলেন। ছেলেকে সেখানে পাঠালেন কাসিমবেগ ও অন্যান্য বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দিয়ে আর দিলেন মোট দু'হাজার সৈন্য। তিনি অবশ্যই উদ্বেগ বোধ করছিলেন ছেলের জন্য। ছেলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেলেন গিরিপথ পর্যন্ত, সমস্ত সময়টা কেবল উপদেশ দিয়েই কাটল।

হুমায়ুন ভাবল এবার আকাঙ্খিত বইটির কথা তোলা যায়।

'জাঁহাপনা বাদাখশানে আমার খুব কষ্ট হবে আপনাকে ছাড়া। আপনি যে সাহায্য আমাকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাই হবে আমার অবলম্বন। কিন্তু আপনার অনুপস্থিতিতেও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে আমার: আমি আপনার বইগুলি নিয়েছি সঙ্গে। কেবল দুঃখ সেগুলির মধ্যে নেই 'অতীত'। আপনাকে আমার অনুরোধ যদি অনুমতি দেন তো লিপিকররা আমার জন্য নকল করে দিক বইটি।'

বাবর চিরকালই ছেলের অনুরোধ রেখেছেন সানন্দে। কিন্তু এবার মাথা নাড়ালেন প্রত্যাখ্যান করে, এমন কি ভ্রূ কুঁচকে গেল তাঁর:

'বইটি তো শেষ হয়নি এখনও। সেটি—কেবলমাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ, লিপিকরকে তা দিতে পারি না আমি।'

'কবে সেটি লেখা শেষ হবে, পিতা? আমি অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে থাকব!'

চোখে ইঙ্গিত নিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন বাবর:

'বেশি ব্যস্ত হয়ো না শাহ্‌জাদা। জেনো আমার জীবনের যেদিন শেষ হবে, সেদিন ঐ বইটিও লেখা শেষ হবে।'

কেঁপে উঠল হুমায়ুন:

'এমন কথা বলছেন কেন, পিতা?'

'বাবরনামা' লেখায় সত্যিই কি যেন একটা বাধা পড়ে গেছে। শাহ্ ইসমাইলের সঙ্গে সন্ধি, বিদেশীদের নিজের পিতৃভূমিতে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর সেই পরাজয়স্বীকার—সেসব কথা লিখতে কেন, মনে করতেও কষ্ট হয়। কিন্তু... এটাই কি তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় হবে নাকি? এখানে, এই কাবুলে বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা সন্ধি করা, এর দর্শনীয় বস্তুগুলির বর্ণনা দেওয়া (তাও করেছেন তিনি, পাহাড়, নদী, গাছপালা, জীবজন্তুর বর্ণনা দিয়েছেন) এ কি বাবরের পক্ষে অতি সামান্য কাজ নয়? এখানেই কি ছোটখাট দায়দায়িত্ব নিয়ে ভাবতে ভাবতে জীবনটা শেষ হয়ে যাবে? বাবর বুঝলেন যে বইটি লিখে যেতে হবে আর শেষ করতে হবে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে। এর জন্য প্রয়োজন আরও বড় বিজয়লাভ করা যাতে শয়বানী আর তার অনুগামীদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি ধুয়ে ফেলা যায়। এবার ছেলে হুমায়ুন বড় হয়ে উঠেছে, সাহায্য করবে সে। হয়ত দৃঢ় সংঘবদ্ধ বিশাল রাষ্ট্র গড়ে তোলার যে স্বপ্ন তাঁর সফল হয়নি বিভিন্ন আত্মীয় আর বেগদের সঙ্গে নিয়ে, ছেলের সঙ্গে মিলে সে স্বপ্ন সফল করবেন?

এই চিন্তাগুলি ঘুরপাক খেতে লাগল মাথার মধ্যে। ছেলে যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্য বললেন:

'জীবনশেষের যে কথা বললাম ও নিয়ে চিন্তা করিস না। ও কথা বললাম কারণ 'অতীত' লিখতে থাকব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ইচ্ছা আছে, আগামী অধ্যায়গুলিতে তোর কিছু সুকর্মের কথাও লিখতে।'

'জাঁহাপনা, তা যদি হয় তো 'বাবরনামা' লিখুন আরো পঞ্চাশবছর এমন কি একশ'বছর ধরে!'

'ততদিন অপেক্ষা করার ধৈর্য কি তোর থাকবে?' মৃদু হাসলেন বাবর।

হুমায়ুন বেশ গুরুত্ব নিয়ে বলল:

'খোদার কসম, যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিনই অপেক্ষা করে থাকব!'

নীল মর্মরপাথরের প্রাসাদের নাম দেওয়া হয়েছে বগি দিলকুশো অর্থাৎ 'বাগান যেখানে মনের বিষাদ কেটে যায়।' খানজাদা বেগমের জন্য এই প্রাসাদটি তৈরি করিয়েছেন বাবর কাবুল নদীর তীরে।

প্রাসাদের একটি কক্ষে মওলানা ফজলুদ্দিন এমনভাবে বসে আছেন যেন এখুনি মাটিতে বসে পড়ে অভিবাদন জানাবেন আর তাঁর কাছেই তাঁর ছেলে হাঁটুতে হাত রেখে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। বয়স অল্প ছেলেটির, কিন্তু ইতোমধ্যেই দাড়িগোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে মুখে।

তাদের বিপরীত দিকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন খানজাদা বেগম, ঘননীল পোশাক পরনে, সাদা রেশমী চাদর দিয়ে মুখমাথা ঢাকা।

এক দুঃসহ নীরবতা নেমেছে। শেষে সে নীরবতা ভাঙলেন খানজাদা বেগম, ভাঙা ভাঙা গলায়, উৎকণ্ঠায় থেমে থেমে বললেন যেন নিজেকেই উত্তর দিচ্ছেন, যেন বাধা পড়ে থেমে যাওয়া কথাবার্তা আবার আরম্ভ করলেন:

'যে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল তারই সবচেয়ে ক্ষতি হল মওলানা,—কারণ সে তো আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না... যারা বেঁচে আছে তারা কাঁদছে, আর্তনাদ করছে, কষ্ট পাচ্ছে, তবুও... তবুও সান্ত্বনা পায়, মেনে নেয় দুঃখকে। এই আমাকেই দেখুন না... এখনও বেঁচে আছি...'

'বেগম এখনকার মত সময়ে বেঁচে থাকাও খুব সহজ নয়। তেইশবছর হল আন্দিজান ছেড়ে এসেছি আমি। সেই থেকে কত কষ্ট যে পেয়েছি। আমাদের সবার মাথার ওপর দিয়েই যে কত ঝড় বয়ে গেছে।'

এক মুহূর্তের জন্য সবকিছু ভুলে গেলেন খানজাদা বেগম, কল্পনায় আবার তিনি ফিরে গেলেন আন্দিজানে কাটান যৌবনের সেই দিনগুলিতে, সেই দিনগুলি কত দূরে আজ।

আজ কল্পনা করতেও কষ্ট হয় যে ফজলুদ্দিন তখন শক্তিশালী সুপুরুষ ছিলেন...

মুল্লা ফজলুদ্দিন, স্থপতি ফজলুদ্দিন, ফজলুদ্দিন... যুবক। কত ঝড় ফজলুদ্দিনের জীবনে নিয়ে এসেছে এই বছরগুলি। বলিরেখায় ভরে গেছে শুধু তার মুখই নয়, ঘাড়েও বলিরেখা পড়েছে, শুকনো শিরাওঠা হাতগুলি, দেহ ঝুঁকে পড়েছে—দেখে মনে হয় তাঁর বয়স ষাটের ওপর, কিন্তু খানজাদা বেগম ভালো করেই জানেন তিপ্পান্নবছর বয়স তাঁর। 'আর আমি নিজে?' ভাবলেন বেগম আয়নায় নিজের চেহারা মনে করে: সামনের দাঁত পড়ে গেছে, ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চুল কমে গেছে, ধূসরের ছোঁয়া লেগেছে চুলে।

জীবনের সেরা দিনগুলি—যৌবন আর নারীজীবনের বিকশিত হয়ে ওঠার দিনগুলির বৃথা অপচয় হয়েছে; ফুল ফুটে ওঠার আগেই ঝরে পড়ে—একথা মনে হয়ে আবার চোখ জলে ভরে গেল খানজাদার। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে জিজ্ঞাসা করলেন:

'মওলানা আপনার ছেলের বয়স কত?'

'একুশবছর, বেগম!'

খানজাদা ভাবলেন তাঁর মৃত ছেলে খুররামের বয়স এখন হত বাইশবছর। আবার সেই অসহ্য দুঃখে জল নেমে এল চোখ বেয়ে। কাঁদতে কাঁদতে আবার বললেন তিনি:

'দীর্ঘজীবী হোক আপনার ছেলে! আপনাকে যেন সন্তানের মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর দুঃখ ভোগ করতে না হয়... তখন আমি নিজেও মরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দিল না মরতে...'

বেগমের চোখের জল পড়া বন্ধ করার উপায় ফজলুদ্দিনের জানা নেই। চোখে প্রশ্ন নিয়ে চাইলেন ছেলের দিকে। ছেলে চোখ নামিয়ে নিল। খানজাদা যাতে নিজের দুঃখের কথা ভুলে যান সেজন্য কত কষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে সেকথা বলতে আরম্ভ করলেন:

'আপনি তো জানেন বেগম হীরাটে কেমন অশান্তি আরম্ভ হয়। শহর দখল করে শাহ্ ইস্‌মাইল প্রথমেই সুন্নিপন্থীদের ধরতে আরম্ভ করল নিষ্ঠুরভাবে। কিছুদিন যাবার পরে আবার ক্ষমতা অন্যদের হাতে চলে গেল। শয়বানীর দলের লোকরা শিয়াপন্থীদের উপর প্রতিশোধ নিতে লাগল নির্দয়ভাবে। তারপর হীরাট আবার দখল করল শাহ ইসমাইল। আবার চলল শয়বানীর সমর্থকদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া... চারদিকে রক্ত, অমানুষিকতা... কামালুদ্দিন বেবখজাদকে হীরাট থেকে তেব্রিজ নিয়ে গেছে শাহ্‌র প্রাসাদে শাহর কাছে কাজ করার জন্য। মওলানা খন্দামির এই সব গোলমাল দেখে লুকিয়ে পড়েন শহরের থেকে দূরে এক গ্রামে, শুনেছি তার পিতার বাড়িতে। আমরা সমরখন্দ থেকে হীরাট ফিরব ভাবলাম, হ্যাঁ... সেকথা এখন ভাবলে মন খারাপ লাগে। হাতে কাজ নেই কোনো। আমারও না, ছেলেরও না... ছেলে আলাউদ্দিন পাথর খোদাইয়ে দক্ষ শিল্পী। কিন্তু হীরাটে আর কার সেসবে প্রয়োজন? তাই মুহম্মদ

সুলতানের পরামর্শে আমি কাবুলে চলে আসি মির্জা বাবরের কাছে আশ্রয় চাইবার জন্য।'

সেই কঠিন দিনগুলির কথা বলে চললেন ফজলুদ্দিন, ততক্ষণে খানজাদা বেগম সুস্থির হয়েছেন একটু।

'ঠিকই করেছেন মওলানা, এখানে চলে এসে,' জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন খানজাদা। 'কয়েকটা জিনিস আপনি বিশ্বাস করে আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন সেগুলি তো আপনাকে দিতে হবে। আপনার ঐ সম্পদ নিয়ে যে কি করব বুঝতে পারছিলাম না।'

দ্রুত চোখের পলক পড়তে লাগল ফজলুদ্দিনের:

'কোন সম্পদ, মহামান্য বেগম?'

বিষণ্ণ হাসি ফুটল খানজাদার মুখে: ভুলে গেছেন, সব ভুলে গেছেন... সব ভুলে গেছেন নাকি?

'এখনই দেখতে পাবেন', বলে উঠে খানজাদা ঘরের শেষে একটি খোদাই করা দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন, তারপর একটুপরেই ফিরে এলেন। সঙ্গে তাঁর এক দাসী হাতে সাদা রেশমী কাপড়ে জড়ান কি একটা নিয়ে। বেগমের ইঙ্গিতে দাসী জিনিসটি দুহাতে ধরে ফজলুদ্দিনের দিকে এগিয়ে দিল তারপর নিচু হয়ে কুর্নিশ করতে করতে পিছু হঠতে হঠতে চলে গেল। নীরব আলাউদ্দিনও পিতার ইঙ্গিতে ঘর ছেড়ে গেল।

সাবধানে কাগজগুলি মেলে ধরলেন ফজলুদ্দিন, তাঁর পুরান কাগজগুলি, প্রান্তগুলি হলুদ হয়ে গেছে তাদের! হায় আল্লাহ্! তাঁর খসড়া, পরিকল্পনা বিশাল বাড়ির যেগুলি তিনি, তিনি আর খানজাদা বেগম একসঙ্গে আন্দিজানে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। বুকের মধ্যে কেমন এক উত্তাপ জাগল, চোখে ঝলক দিল উৎসাহ। আর খানজাদা বেগম হায় আল্লাহ! এতদিন ধরে এত দুঃখকষ্ট গেছে তাঁর ওপর দিয়ে, তা সত্ত্বেও আগলে রেখেছেন এই কাগজগুলি! তাঁকে এখন তাঁর মনে হল সেই যৌবনকালে যখন ফজলুদ্দিন খানজাদার প্রেমে পড়েছিলেন, ঠিক তেমনই সুন্দরী আকর্ষণীয়া আছেন। যেন মনে হল সেই বহুদিন আগেকার মুগ্ধতা ফিরে এসেছে, ওশে যখন তিনি বাবরের জন্য পাহাড়ের ওপর ছোট্ট বাড়িটি তৈরি করেন—তখন তিনি আর খানজাদা পাহাড়ী পথ বেয়ে নামছিলেন, পা পিছলে যায় তখন হঠাৎ খানজাদার, ফজলুদ্দিন তাঁকে ধরেন তখন।

আলোকিত মুখে মওলানা ফজলুদ্দিন খানজাদা বেগমকে বললেন:

'সেই দিনগুলিকে আপনি আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাকে! এ এক অদ্ভুত জাদু। এত বছর, এত পথ পেরিয়ে, এগুলি, আমার... আমাদের স্বপ্নগুলি আবার এখানে ফিরে এসেছে!'

যৌবনের সেই দিনগুলির কথা খানজাদার মনেও এনেছে এক বিষণ্ণ খুশির আমেজ, তাঁর গলা শোনা গেল:

'ঠিক মওলানা, এগুলি আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরেছে যত বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে। কেবল শেষবার যখন আমরা কুন্দুজ থেকে সমরখন্দ যাই... সেখানে পথে অনেক পাহাড়, নদী পার হতে হয়... আমার জিনিসপত্রের কিছু অংশ রেখে যাই কুন্দুজে। সেসবের মধ্যে একটা সিন্দুকে ছিল এই কাগজগুলি। সমরখন্দে আমি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম এগুলির জন্য, এগুলি আনতে বিশ্বস্ত লোক পাঠাব ভাবছিলাম... তারপর... আবার এল বিপদ... আবার এল বিপদ... ভালই করেছিলাম ওগুলোকে কুন্দুজে রেখে গিয়ে: আমার অন্যান্য সিন্দুকগুলি পড়ে ষড়যন্ত্রকারী মোগলদের হাতে... দেখুন সব ঠিকঠাক আছে তো?'

মুখের ওপর থেকে রেশমী চাদরটা সরিয়ে বেগম নিজেই এগিয়ে গেলেন কাগজগুলির দিকে।

'হ্যাঁ সব, সব আছে', ফজলুদ্দিন লুব্ধ, কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে রইলেন খানজাদার মুখের দিকে। তারপর অন্য কথা বললেন:

'সমরখন্দে আপনার সঙ্গে দেখা করার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু আপনার কাছে যেতে সাহস হয়নি...'

'আমিও আপনাকে ডাকব ভেবেছিলাম। কিন্তু... কাগজগুলি তো কুন্দুজে রয়ে গিয়েছিল... তাই ভাবলাম...'

ফজলুদ্দিনের মনে হল আন্দিজানে তাঁর যে প্রতিকৃতিটি এঁকেছিলেন সেটির কথা মনে করিয়ে দিতে। (হায় আল্লাহ্ সেই প্রতিকৃতিটির জন্য তাঁকে, শিল্পীকে কত কষ্টই না পেতে হয়েছে!) কাগজপত্রের মধ্যে ছবিটি নেই।

আবার কাগজগুলি উল্টে পাল্টে দেখলেন তিনি প্রতিটিকে আলাদা আলাদা করে।

খানজাদা বেগম বুঝলেন শিল্পী কি খুঁজছেন, মুখে একটু আলোর ছোঁয়া লাগল, জিজ্ঞাসা করলেন:

'আপনি এখনও ছবি আঁকেন, মওলানা?'

'মহামান্যা বেগম, অনেকদিন না আঁকলে পরে অভ্যাস চলে যায়... এখন আমি কেবল বাড়ি তৈরীর ছক নক্সা আঁকি!'

'আন্দিজানে সেবার আপনি যে ছবি আঁকেন... বাড়ির নয়... সে আলাদা করে রেখে দিয়েছি আমি', বলে খানজাদা লজ্জা পেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

ফজলুদ্দিন বুঝলেন যে খানজাদা নিজের প্রতিকৃতিটি এখানে আনতে চাননি, ফজলুদ্দিন তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে সঙ্গে করে এনেছেন। তাছাড়া যৌবনে তাঁদের মধ্যে যে ভালবাসার জন্ম হয়েছিল তা মনে করেই বা লাভ কি? দুজনেই শুধু শুধু কষ্ট পাওয়া।

'আপনি ঠিকই বলেছেন, বেগম... সেটি আপনার কাছেই থাক চিরকাল', বুকের কাছে হাত রেখে নিচু হয়ে সম্মান জানালেন মওলানা খানজাদাকে।

স্থাপত্যের কাজ, বাড়ি তৈরির নকশা ছকের কথা বলাই ভাল।

'এখন এগুলোকে কাজে লাগাতে পারি আমি', কাগজগুলিকে হাত দিয়ে সামান্য ছুঁয়ে বললেন ফজলুদ্দিন, 'আর সেই সঙ্গে যা আমি হীরাটে শিখেছি তাও। সত্যিই এগুলোকে কাজে লাগান যায়... কিন্তু বলুন তো, বেগম, কোথায় এই মাদ্রাসা, এই প্রাসাদ তৈরি করা যায়? আন্দিজান তো অনেক দূরে। তাহলে কি কাবুলে?'

খানিক চুপ করে থেকে মাথা নাড়ালেন খানজাদা বেগম:

না: কাবুলেও পারা যাবে না।

'আমার স্বপ্ন ছিল... এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন এক মাদ্রাসা তৈরি করতে যা সমরখন্দের বিবিখানুমের মাদ্রাসার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। আর ভাবতাম তার নাম দেব আপনার নামে—খানজাদা বেগমের মাদ্রাসা।'

'এমন পরিকল্পনার জন্য আজীবন আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব মওলানা। কিন্তু সেই বেগরাই দেখছি যথার্থ বলেছিল—মনে আছে? বলেছিল বিশাল নির্মাণকার্য চালাবার জন্য চাই বিশাল রাষ্ট্র। মির্জা বাবর এতদিন এ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন... কাবুল ছোট জায়গা, কাবুলের এত শক্তি বা সম্পদ কোনটাই নেই নির্মাণকার্য চালাবার মত।'

'অর্থাৎ আমাদের স্বপ্ন সফল হবার নয়।'

বাবর যে ইদানীং আফগানিস্তান, বাদাখশান আর সব চেয়ে বড় কথা উত্তর ভারতের কিছু এলাকা নিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ বিরাট রাষ্ট্র গড়ে তোলার গোপন পরিকল্পনায় নিযুক্ত আছেন সে সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন খানজাদা বেগম। দিল্লির সুলতানীশাসন ভেঙে পড়েছে; স্থানীয় রাজারা পরস্পরের মধ্যে বিবদমান; হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের মানে না, ওদিকে মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের মানে না, হিন্দুদের শত্রু হয়ে উঠেছে তারা। বাবর নিজেই এখন গেছেন সিন্ধু নদীর তীরে গোপন অভিযানে, ওদিকে চররাও লোদীরাজ্যের সম্বন্ধে অনেক খবর এনেছে।

'মওলানা আমার স্বপ্ন দেখতেও ভয় করে', স্বীকার করলেন খানজাদা বেগম। 'জানি তো যে বড় রাষ্ট্র অর্থাৎ বিশাল স্থাপত্যকার্যের প্রচেষ্টা চালায় তাঁকে কি মূল্য দিতে হয়। নিজের বহুদিনের স্বপ্নকে ভুলে যাওয়া এখন সহজ আমার পক্ষে; আমার প্রিয় ভাইয়ের জীবনে আবার বিপদ ডেকে আনতে চাই না।'

বিষণ্ণভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মওলানা ফজলুদ্দিন ঘাড় নাড়লেন, 'বুঝেছেন এ সবই সত্য, সত্য... ভাগ্য আমাদের স্বপ্নের বিরুদ্ধে। আমার বয়স হয়েছে', গলাটাও তাঁর কেঁপে উঠল যেন বৃদ্ধর মত, জীবনে কখনই আমার কপাল খুলল না। যুদ্ধ, বিগ্রহ লুঠ ধ্বংস... এমনি কি চিরকালই চলবে নাকি?! আমি একা নয় কত কবি, বিজ্ঞানী, স্থপতি

আমার থেকে অনেক বেশি প্রতিভাবান লোকেরা মাভেরান্নহর ও খোরাসান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এই যে লড়াইয়ের ঝড় উঠেছে তা এমন লোকদের কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আগে এমনি হত যে ঐ অন্ধ হাওয়া যদি আন্দিজান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তো সমরখন্দে আশ্রয় পাওয়া যেত, আর সমরখন্দ ছেড়ে যেতে হলে হীরাটে এসে রক্ষা পাওয়া যেত। কিন্তু সর্বত্র দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে ঐ অন্ধ হাওয়াটা! এখন আর সমরখন্দ বা হীরাটে কোথাও গিয়ে রক্ষা নেই! আমরা সবাই বিতাড়িত যেন স্রোতহারা নদী... হায় আল্লাহ্ কত প্রতিভা, কত জীবন্ত ঢেউ বৃথা হচ্ছে আজকের এই জীবনের মরুভূমিতে... লোকে বলে আমু-দরিয়া নাকি একসময়ে এইরকম পথ হারিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে বসেছিল, তারপর নতুন সমুদ্রের দিকে নতুন পথ খুঁজে পায় সে। আর আমরা, নতুন পথ খুঁজে পাব কি?...'

খানজাদা বেগমের সমস্ত অন্তরটা সহানুভূতিতে ভরে উঠছে স্থপতির জন্য। এই লোকটি যিনি তাঁর প্রতিভাকে কাজে লাগাবার সুযোগ পেলেন না কখনও এ তাঁর অন্তরের কথা।

'মওলানা, কেবল আপনি নন, মির্জা বাবরও নতুন সমুদ্রের পথ খুঁজছেন যেন শিল্প ও বিজ্ঞানের সেই নতুন সমুদ্রে সমস্ত প্রতিভানদী এসে মিলিত হয়।'

'জানি বেগম যে ভাগ্য মির্জা বাবরের প্রতিও নির্দয়, জানি তিনিই আমার শেষ আশা... সে কারণেই কাবুল চলে এসেছি।'

'কোথায় আপনি থাকবেন মওলানা?'

'এখনও জানি না, আপাতত উঠেছি আমার ভাগ্নে তাহিরবেগের কাছে। সেও মির্জা বাবরের সঙ্গে অভিযানে চলে গেছে।'

খানজাদা বেগম বুঝলেন স্থপতি ও তাঁর পরিবারের দেখাশোনা করার মত কেউ নেই। সেইজন্যই তাঁর পোশাক-আশাকের এমনি অবস্থা, মলিন, রোগা চেহারা, যেন দুর্ভিক্ষ থেকে এসেছেন... হয়ত সত্যিই তাই?

হঠাৎ উঠে পড়লেন খানজাদা বেগম মাফ চাইলেন এক মুহূর্তের জন্য স্থপতিকে একা রেখে যাচ্ছেন বলে, তারপরে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। চাবি নিয়ে রেশমী পর্দার আড়ালে কুলুঙ্গিতে দাঁড় করান আলমারি খুললেন।

সর্বোচ্চ পদাধিকারী সভাসদদের মতই অর্থপ্রদান করা হত শাহ্ ভগিনীকে বাবরের আদেশ অনুসারে। প্রতিমাসে প্রাসাদের কোষাধ্যক্ষ চামড়ার থলিতে করে দিয়ে যেত একহাজার দ্রাখমা। বেশ কিছু জমির অধিকারীও ছিলেন বেগম। কিন্তু কার জন্য এ অর্থ ব্যয় করবেন খানজাদা? সোনার দ্রাখমাভরা সেই চামড়ার থলি অনেকগুলি না খোলা অবস্থাতেই রয়ে গেছে আলমারীতে।

হিসাব করে দেখলেন খানজাদা মনে মনে জমিসমেত বাড়ি, ঘোড়া কিনতে আর মাস তিন-চার বোধহয় বেতন পাবেন না তিনি, পরিবারকে খাওয়াতে ফজলুদ্দিনের

কত দ্রাখ্‌মা লাগতে পারে দুটি থলি নিয়ে ভৃত্যকে ডাকলেন। ভৃত্য রূপার থালার উপর থলিদুটি রেখে নিয়ে গেল অতিথিদের কাছে...

খানজাদা বেগমের কাছ থেকে অর্থ নিতে খুব লজ্জা হচ্ছিল মওলানা ফজলুদ্দিনের। কিন্তু অন্য পথ আর আছে নাকি? নেই! তাছাড়া বেগম তাঁকে সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

'মওলানা, এই অর্থ দু'হাজার দ্রাখ্‌মা বাবরের ভাণ্ডার থেকে নেওয়া। তিনি অনুপস্থিত, তাঁর পক্ষ থেকে আমি আপনাকে আপনার উপযুক্ত বেতন দিচ্ছি। একটি থলি আপনার, অন্যটি—আপনার ছেলের। অনুগ্রহ করে, গ্রহণ করুন...'

৩

কাবুলের শরতের আকাশে অনেক উঁচুতে সারস উড়ছে...

শহরের বাইরের বাসভবনে বাবর ও মহিম বেগম আইভানে* বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, শুনছেন সারসের ডাক; উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ে চলেছে সারসের ঝাঁক—আকাশের নীলে কালো মুক্তায় জীবন্ত মালা যেন।

তাদের 'কুর-এই' 'কুর-এই' চীৎকারে বাবরের মনে হল যেন তারা ক্লান্ত: কত দূর দূরান্ত থেকে উড়ে আসছে পাখীগুলি। ওরা উড়ে গেল মাভেরান্নহরের উপর দিয়ে, হয়ত আন্দিজানের উপর দিয়েও? হয়ত তারা সমরখন্দের আশেপাশে ঠান্ডা জলের ধারেকাছে নেমেছে কোথাও বিশ্রাম নেবার জন্য?

এই সারসপাখীগুলি তাঁর প্রিয় সেই জায়গাগুলি দেখতে পেল, কিন্তু তাঁর আর দেখা হবে না। তাঁর মন তাই বলছে।

সারসের ডাকের আওয়াজ ক্রমশঃ আস্তে আস্তে হতে হতে একেবারেই মিলিয়ে গেল। পিতৃভূমির জন্য মনটা হাহাকার করে... এই হাহাকারের চেয়ে আর কি বেশি করে বুঝিয়ে দিতে পারে তার মনের অবস্থা।

মুখ অন্ধকার হয়ে গেল বাবরের হাততালি দিয়ে পরিচারককে ডেকে পানীয় আনতে আদেশ দিলেন।

স্বামীর কাছে এগিয়ে এলেন মহিম বেগম, হালকা তিরস্কারের সুরে বললেন:

'জনাব, সকালবেলায়ই' পানীয় চাই? কেন? এখুনি ছেলেমেয়েরা আসবে আপনাকে সুপ্রভাত জানাতে... ঐ যে মির্জা হিন্দোল আসছে তার শিক্ষকের সঙ্গে।'

আটবছরের হিন্দোলের মাথায় জড়ান ছোট একটি রেশমী পাগড়ী, সুন্দর কোমরবন্ধে ঝুলছে ছোট তরবারি—সিঁড়ি দিয়ে উঁচু আইভানের উপর উঠে বড়দের অনুকরণে বুকের ওপর হাত রেখে নিচু হয়ে কুর্নিশ করল। বিষণ্ণ হাসি ফুটল বাবরের মুখে। ছেলের কছে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধ জড়িয়ে নিজের কাছে জরির আসনে এনে বসালেন।

'কোমরে তরবারি ঝুলছে, তার মানে মির্জা শীঘ্রই অভিযানে যাওয়া হবে?'

ছেলেটি বড় বড় চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল মায়ের দিকে। মহিম বেগম ঘাড় নেড়ে অনুমতি দিলেন তাকে কথা বলার। হিন্দোল অস্পষ্টভাবে বলল:

'জাঁহাপনা, আমাকে আপনার সঙ্গে অভিযানে নিন।'

'কোথায় বল তো?'

'ভারতবর্ষে?' ছেলেটির চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'সেখানে আমরা কি করব।'

'আমি... বাঘ দেখতে চাই।'

'বটে?' হেসে ফেললেন বাবর। 'দেখতে? কেবল দেখতে?'

লজ্জায় ছেলেটি তার সত্যিকারের তরবারির হাতলটা চেপে ধরল।

'না, বাঘটা যখন আমায় খেতে আসবে তখন আমি তরবারি দিয়ে কেটে ফেলব বাঘটাকে।'

আদর করে ছেলের কাঁধ চাপড়ে দিলেন বাবর:

'বাহবা! তাহলে অবশ্যই আমাদের যেতে হয় ভারত অভিযানে...'

দরজার কাছে দেখা গেল পরিচারক পানীয় নিয়ে এসেছে, মহিম বেগম আড়ালে হাত নাড়িয়ে তাকে চলে যেতে বললেন, এখন জাঁহাপনা কথায় ব্যস্ত, ভুলে গেছেন পানীয়ের কথা; চুপিচুপি ফিরে গেল পরিচারকটি।

বাবর এদিকে হিন্দোলকে জিজ্ঞাসা করছেন সে অক্ষর শিখেছে নাকি, কোন কবিতা মুখস্থ আছে নাকি তার।

'কোরানের সুর জানি,' গর্বিতভাবে বলল হিন্দোল।

'হিন্দোল হুমায়ুনের মত নয়, ও ভালবাসে অন্য জিনিস,' বললেন মহিম বেগম। 'যদিও সেও যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে ভালবাসে, ভালবাসে তীর ছুঁড়তে, কিন্তু বইয়ের প্রতি তার আকর্ষণ আপাতত কম।'

'ও এখনও ছোট, তাই না?'

'জানি না, গুলবদন তো হিন্দোলের চেয়ে ছোট... কিন্তু... আজ দেখবেন... সে পড়তে ভালবাসে হুমায়ুনের চেয়েও বেশি।'

'হিন্দোল তার মামাদের মত হবে নাকি?' ভাবনায় পড়লেন বাবর। বাবর কি বলতে চাচ্ছেন বুঝলেন মহিম বেগম। মহিম বেগম হিন্দোলের মা নন, তার মা বাবরের ছোট স্ত্রী দিলদোরা বেগম, বাবরের চাচা সুলতান মাহমুদের কন্যা। তখনকার প্রথা অনুযায়ী বাবরের তিন স্ত্রী ছিল যারা কাবুলের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকত। নীরবে প্রথা মেনে নিয়েছেন মহিম বেগম, কিন্তু এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেননি তিনি। তাঁর বিশেষ চিন্তা বাবরের দ্বিতীয় স্ত্রী কাবুলের সুন্দরী গুলরুখ বেগমকে নিয়ে, যে দুটি ছেলের জন্ম দিয়েছে—মির্জা কামরোনের বয়েস এখন ষোলবছর আর মির্জা

আসকারের চোদ্দবছর। 'আমরা নিজেরাই ভাইদের মধ্যে ভবিষ্যৎ শত্রুতার সৃষ্টি করছি,' ভাবলেন হুমায়ুনের মাতৃদেবী। কিন্তু নীরব রইলেন তিনি: তাঁর ভাগ্য মন্দ, তাঁর দুই কন্যাসন্তান আর দ্বিতীয় পুত্র শিশুবয়সেই মারা যায়। তারপরে শিশুজন্ম দেবার ক্ষমতা হারান। গুলরুখ বেগমের বিশ্রী ঠাট্টাতামাসা কানে এসেছে মহিম বেগমের।

বাবর বুঝতে পারেন তাঁর প্রথমা, প্রিয়তমা স্ত্রীর মনের বেদনা। প্রথা তো মানতেই হবে, তাই বিনাদোষেই দোষী তিনি স্ত্রীর কাছে।

একবার এই বাড়িতে যখন রাত কাটান বাবর মহিম নিজেই হঠাৎ প্রস্তাব করলেন। 'এই বন্ধ্যাজীবনে হাঁফিয়ে উঠেছি!.. অন্য স্ত্রীর গর্ভে জাত আপনার সন্তানদের পালন করতে প্রস্তুত আমি! আমি জানি দিলদোরা বেগম শীঘ্রই সন্তানের জন্ম দেবে! তার ছেলে বা মেয়ে সন্তান যাই হোক না কেন আমাকে দিয়ে দিন মানুষ করার জন্য!' তখন বাবর কথা দেন মহিম যা বলছেন তাই করা হবে। তারপর যখন দিলদোরা বেগম হিন্দোলের জন্ম দিল বাবর আদেশ দিলেন তিনদিনের শিশুটিকে নিয়ে মহিম বেগমকে দিয়ে আসতে। দিলদোরা অবশ্যই কান্নাকাটি, হৈচৈ বাঁধিয়ে দিল তার একমাত্র ছেলেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে। 'এমনি প্রথা', বাবর তাকে বোঝাতে লাগলেন, 'বহুদিন আগে থেকেই শাহ্ পরিবারে ছেলের জন্ম হলে প্রথমা স্ত্রীর হাতে দেওয়া হত লালনপালন করার জন্য। মহিম বেগম বড় করে তুলছেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মির্জা হুমায়ুনকে, বাদাখশানের শাসনকার্য সে ভালই চালাচ্ছে। আল্লাহ্ করুন, হিন্দোলও যেন তেমনি হয়!'

বাবর কিন্তু লক্ষ্য করেছেন হিন্দোলের ধরনধারণ অন্যরকম। দিলদোরার ভাই-বাবার কথা মনে পড়ে যায়—সম্ভ্রান্ত লোক, কিন্তু বিজ্ঞান শিল্প থেকে অনেক দূরে তাঁরা, অশিক্ষিত ধরনের।

মহিম বেগম বুঝলেন বাবরের এই আশঙ্কা বললেন:

'হিন্দোলও আপনারই ছেলে। সেও হুমায়ুনের মতই আবেগপ্রবণ কল্পনাপ্রবণ আপনিও হিন্দোলের বয়সে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে ভালবাসতেন, খানজাদা বেগম বলেছেন আমায়।'

হেসে ফেললেন বাবর, আবার ছেলেকে বললেন:

'যদি আমি তোমায় বই উপহার দিই, তুমি তা পড়বে?'

হিন্দোল কেমন যেন অনিশ্চিতভাবে উত্তর দিল:

'পড়ব।'

মুনশিকে ডেকে বাবর আদেশ দিলেন কাবুলের গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ককে বইয়ের তালিকা দিয়ে আসতে (তালিকা প্রস্তুত করবেন মহিম বেগম), সেই বইগুলি যেন হিন্দোলের জন নকল করা হয়। তারপর তাঁর ইঙ্গিতে পরিচারক ভিতরের ঘর থেকে

একটি খেলার ধনুক আর দশটি সোনাবাঁধান তীর নিয়ে এল (তাশখন্দের প্রখ্যাত কারিগরদের তৈরি সেটি) কি খুশিই যে হল ছেলেটি!

'নাও, খেলা কর, কিন্তু বইয়ের কথাও ভুলে যেও না!' ছেলেটি চলে যাবার সময় বললেন বাবর!

হিন্দোল চলে যাবার পর এক সুশ্রী মহিলা এলেন পাঁচছরবয়সী একটি মেয়ের হাত ধরে। রবিয়া কুর্নিশ করল বাবরকে। বাবরের মাতৃদেবী কুতলুগ নিগর-খানুমের মৃত্যুর পরে রবিয়া মহিম বেগমের কাছে কাজ করতে আরম্ভ করে, মহিম বেগম গুলবদনকে নেওয়ার পরে তারও দেখাশোনা করে। তাহির আর রবিয়ার একমাত্র ছেলে সফর বড় হয়ে গেছে, মাদ্রাসাতে পড়াশোনা করছে আর তাহির এখনও বাবরের নিজস্ব রক্ষীদের অধিনায়ক।

সাজানগোছান সুন্দর বচ্চা মেয়েটির মুখচোখ তার জন্মদাত্রী মায়ের মতই। এবার দিলদোরা প্রতিবাদ তো করেইনি উল্টে খুশিই হয়েছে: নিশ্চিত হয়েছে কত যতনে বড় করে তুলেছেন মহিম বেগম হিন্দোলকে, কি মহৎ নিঃস্বার্থ তাঁর হৃদয়। হিংসুক জেদী গুলরুখ বেগমের সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। বাবরের দ্বিতীয় স্ত্রী মহিম বেগম বা দিলদোরা কাউকেই পছন্দ করে না। অন্য দুজনেও তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, ছেলেমেয়েরা তাদের সে ঐক্যকে আরও দৃঢ় করেছে। আর গুলরুখের প্রতি বাবরের নিজেরও নিরুত্তাপভাব...

নিষ্পাপ ছোট গুলবদনের আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক পারিবারিক জটিলতা, গুলবদন অদ্ভুত হাস্যকর ভাবে কুর্নিশ করল পিতাকে। বাবর আবেগে মেয়েকে তুলে নিয়ে বসালেন নিজের কোলের উপর। তাঁদের সামনে দস্তরখান পেতে পরিবেশন করা হল সুস্বাদু মাংস, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্নদ্রব্য, সোনার থালায় আঙুরের থোলো, বেদানা, এমন কি কমলালেবু পাতিলেবু যতরকম ফল হয়েছে বাফো বাগিচায় (আদিনাপুরের এই বাগিচা বাবরের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি)। বাবর মেয়েকে কমলালেবু আর বাদামের হালুয়া দেখিয়ে খেতে বললেন। মেয়েটি হেসে উত্তর দিল—খাব না। বাবরের জামার সোনাবাঁধান বোতামগুলি নিয়ে খেলতে ব্যস্ত সে।

প্রত্যেকটি বোতামের ওপর খোদাই করে কোন জীবজন্তু আঁকা আছে। একটিতে—ছোট একটি বাঘ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে, চোখদুটি তার জ্বলছে দুটি ছোট্ট চুনীর জেল্লায়। অন্য একটিতে—সুন্দর এক পাখী ঠোঁটে ধরে আছে সাদা একটি মুক্তো।

'এই বোতামগুলি ভাল লাগছে তোমার?'

ঘাড় নেড়ে মেয়ে জানাল, হ্যাঁ।

বাবর উপরের বোতামটি ধরে ছেঁড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শক্ত করে সেঁলাই করা বোতামটি, ছেঁড়া গেল না।

'কি করছেন, জাঁহাপনা?' বিস্মিত হলেন মহিম বেগম।

'ও কিছু না, স্বর্ণকারকে খবর দিলেই এমনি বোতাম করে দেবে।'

কোমরবন্ধে লাগান ছোট ছুরিটা (কলম কাটার জন্য) খুলে নিয়ে ওপরের বোতামটা কেটে নিলেন যেটিতে আঁকা আছে পাখী।

গুলবদনকে বোতামটি দিয়ে বললেন:

'হারিও না যেন। এখানে আঁকা আছে হুমো—সুখের পাখী। সুখী হও, মেয়ে!'

মেয়ে বেশ কষ্ট করে বলল:

'ধন্যবাদ হজরত... জাঁহাপনা...'

'বল—বাবা।'

মহিম বেগমের দিকে তাকাল মেয়ে অনুমতি চেয়ে।

'হ্যাঁ বল।'

তখন গুলবদন ছোট দুটি হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমো দিল।

অভিভূত হয়ে পরস্পরের দিকে চাইলেন বাবর ও মহিম।

'গুলবদন বাবাকে একটা হিকায়ৎ বল তো।'

গুলবদন আস্তে আস্তে কোল থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়াল বাবার সামনে তারপর বেশ ভারিক্কীচালে শিক্ষক মশাইয়ের মত করে বলতে আরম্ভ করল একটি উপদেশমূলক গল্প এক রাখালকে নিয়ে যে প্রতিদিন অকারণে লোকদের ভয় দেখাত এমনি চীৎকার করে 'বাঁচাও! বাঁচাও! পালে বাঘ পড়েছে!' লোকেরা যখন ছুটে আসত বাঁচাতে তখন সে মজা করে হাসত। তারপর একদিন সত্যি সত্যি পালে বাঘ পড়ল, রাখাল চীৎকার করতে লাগল সাহায্যের জন্য, কিন্তু এবার আর কেউ বিশ্বাস করল না, 'বাঘে খেয়ে গেল ভেড়ার পাল' উৎকণ্ঠিতভাবে এই কথা বলে গল্প শেষ করল গুলবদন।

'কি চমৎকার গুছিয়ে বলতে পারে!' মুগ্ধ হয়ে গেছেন বাবর, চোখ সরাচ্ছেন না মেয়ের থেকে।

'অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—একবার কোন কিছু পড়ে শোনালে বা বললে ঠিক ঠিক মনে রেখে দেবে। আবার নিজে যা দেখে তাও সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারে। এখনও কখনও ভাবি অনেক মহিলা যে জীবনের অভিজ্ঞতা যা কিছু দেখেছে লিখে রাখবে. . . ঐ আপনার অতীত বইয়ের মত করে. . . তেমন কেউ নেই। হয়ত গুলবদনই বাবার প্রথম অনুগামী হবে এ ব্যাপারে?'

'সেজন্য কত কষ্ট সহ্য করতে হবে...' হঠাৎ বাবর দেখলেন ছোট গুলবদন তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে, তার চোখে পরম বিশ্বাস আর গভীর আগ্রহ। আর কান খাড়া করে রেখেছে। থেমে গেলেন বাবর, বললেন তারপর:

'নিশ্চয়ই বেগম তুমি যখন মেয়ের মধ্যে সে প্রতিভার আঁচ পেয়েছে তখন তোমায়

ভাবতে হবে কেমন করে সে প্রতিভার বিকাশ করা যায়। যতদিনে ও বড় হয়ে উঠবে ততদিনে আমি হয়ত 'অতীতে'র প্রথম অংশ লেখা শেষ করব, তার কোন কোন অংশ হয়ত গুলবদনের জন্য নকল করতে দেওয়া যেতে পারে।'

'সেকথাই আমি আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম', হঠাৎ কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মহিম। 'এ আমার বহুদিনের স্বপ্ন যে কেবল আপনার ছেলেরাই নয় মেয়েরাও যেন প্রখ্যাতি অর্জন করে!'

অহো! নিঃস্বার্থ সহচরী মহিম! ঠিকই বলে লোকে যে জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না প্রকৃত মা সেই যে মানুষ করে তোলে ছেলেমেয়েকে। তার মত লোকের জীবনে, যার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, ছেলেমেয়ের স্থান অনেকখানি, ভাবলেন বাবর। বাবার অনুগত ছেলেমেয়ে,—এর চেয়ে বেশি সুখ আর কি হতে পারে!... আর সেও মহিমেরই প্রচেষ্টার ফল, যা বাবরের প্রতি মহিমের অপরিসীম প্রেমের প্রমাণ দেয়। বাবর তো তাঁর কাছে অপরাধী, অপরাধী গুলরুখের জন্য, অপরাধী দিলদোরার জন্য।

নিজের জায়গা থেকে উঠে বাবর মহিম বেগমের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, আর কোমল আবেগে চুমো দিলেন চোখের উপরে:

'মহিম, তুমি আমার কাছে—এ যে আমার কত সুখ। আমি শাহ্ হলেও, তোমার ক্রীতদাস আমি! আদেশ কর—তুমি যা বলবে, তাই কর আমি!'

লজ্জা পেলেন মহিম, ফিসফিস করে বললেন:

'গুলবদন, গুলবদন দেখছে!'

'হ্যাঁ, গুলবদন!' হাতে তালি দিলেন বাবর: 'এই কে আছিস, গুলবদনকে দুটি ভারতীয় তোতাপাখী উপহার এনে দে!'

সুন্দর খাঁচায় বসান রামধনু রংয়ের তোতাপাখী দুটি মেয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আরে, পাখীদুটি কথা বলে যে! তাদের মধ্যে একটি বলল 'সালাম, বেগম!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গুলবদন, চীৎকার করে বলল:

'আলেকুম—সালাম!'

শাহ্, বেগম, দাসদাসী, রোবিয়া—সবাই হেসে উঠল। গুলবদন আর একটি চুমো দিল বাবার গালে।

তারপর সবাইচলে গেলে বাবর ও মহিম বেগম উঠে ভিতরের ঘরের দিকে গেলেন।

মহলের ভিতরে সবচেয়ে বড় ঘরটি সুন্দর করে সাজানো ইরানের গালিচা আর জরিসূতো দিয়ে সেলাই করা কম্বল দিয়ে, সেখানে শাহের বসবার জন্য উঁচুতে আসন পাতা আছে। মহিমের কোমর জড়িয়ে ধরে বাবর ধীরে ধীরে অতিক্রম করে যাচ্ছেন ঘরটি আর নীচুসুরে, উত্তপ্ত আবেগে স্ত্রীকে বলছেন:

'তোমার কোমর এখনও ঠিক তেমনিই আছে যেমন তোমায় আমি প্রথম দেখি, মহিমজান!'

'যদি তা হয় তো আপনি এখনও বিশবছরের যুবকের মত রয়ে গেছেন বলেই।'

দুজনেরই উত্তপ্ত দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল পাশের ঘরের দিকে। সেখানে গত রাতে... তারা আলিঙ্গন করেছেন পরস্পরকে... এক আগুনে জ্বলেছেন দুজনে... তাঁদের অঙ্গ কখনও মিলে গেছে, আবার কখনও বা থরথর কামনায় আলাদা হয়ে গেছে যাতে আবার এক আনন্দে মিলে যেতে পারে। পৃথিবীতে ভালবাসা ছাড়া আর কোন কিছুর কথা তখন তাঁদের মনে ছিল না। আমার, আমার, মাথার চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আমার, কেবল আমার, কাউকে দেব না!' মহিম তাঁর কানে কানে বলেছিলেন রাতের বেলায়। তখনই বাবর প্রথম বলেন 'আমি—শাহ্ বাবর, কিন্তু তার সামনে ক্রীতদাস। তার ক্রীতদাস...'

মহিমের বয়স যেন মোটেই সাঁইত্রিশ বছর নয়, চোখে তাঁর যৌবনের দ্যুতি, জিজ্ঞাসা করলেন:

'অর্থাৎ আমি এখন যা চাইব তা করবেন আপনি?'

কি চাইতে পারেন তিনি? শহরের বাইরে নতুন বাগান তৈরি করতে হবে না হয় দামী কোন কিছু কেনার জন্য অর্থ?

বাবর উত্তর দিলেন:

'হ্যাঁ যা আমার ক্ষমতায় কুলায়!'

একটু ভাবলেন মহিম বেগম।

'আপনাকে আমার অনুরোধ জাঁহাপনা,' স্বরে আর চপলতা নেই এবার, 'আমাদের হুমায়ুনকে কাবুলে ফিরিয়ে আনুন।'

বাবরেরও গলার স্বর বদলাল।

'কেমন করে ফিরিয়ে আনব? একেবারে?

'সে তো দু'বছর হল উত্তর সীমান্ত রক্ষা করছে। এবার তার বদলে কাউকে কি পাঠান যায় না?'

'কে বদলি হবে?' ভালবাসার আকুলতা মিলিয়ে গেল বাবরের মনে, বুঝলেন খুব সহজ হবে না এ আলোচনা।

'অন্ততপক্ষে মির্জা কামরোনকে পাঠান। তার ষোলবছর বয়স হল। গুলবুখ বেগম গর্ব করে তার জন্য যে তার ছেলে সত্যিকারের পুরুষমানুষ হয়ে উঠেছে।'

বাবরের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, স্ত্রীদের মধ্যে এই মনকষাকষি ভাল লাগে না তাঁর। গুলবুখ মহিম ও দিলদোরার প্রতি খোলাখুলি শত্রুতা পোষণ করে আর নিজের ছেলেমেয়েদেরও মন বিষিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এ ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বিশেষ করে বাবরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যা পরিকল্পনা তার পক্ষে...

'মহিম, গুলরুখ বেগমের কথায় কান দিও না। মির্জা কামরোন এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব সামলে উঠতে পারবে না। এমন কোন কাজের ভার আমি বিশ্বাস করে দিতে পারি কেবল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হুমায়ুনকেই।'

'কিন্তু গুলরুখ বেগম তো সুখী: তার দুই ছেলেই এখানে কাবুলে মায়ের কাছে। আর আমি এক বছর হল ছেলেকে দেখিনি। আর সে পথও এত দূর—ঘোড়ায় চড়ে দু'সপ্তাহ লাগে। তার কাছেকাছেই রয়েছে রক্তপিপাসু শয়বানীপন্থীরা। যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার ওপর। সব সময় উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকি আমি, ভেবে দেখুন আমার অবস্থা।'

'বৃথা চিন্তা করছ বেগম, আমি তো বলেছি তোমায় হুমায়ুনের সঙ্গে আছে তিনহাজার বাছাই করা সৈন্য। তাছাড়া শয়বানীপন্থীরা এখন নিজেদের মধ্যে বচসাবিবাদে মত্ত, আমাদের সঙ্গে তারা শান্তিসম্পর্ক স্থাপন করেছে।... কিন্তু যদি ছেলের জন্য খুব মন কেমনকরে... তাহলে দু'তিন সপ্তাহ বাদে তাকে দেখতে পাবে।'

'কোথায়?' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মহিম, 'কাবুলে?'

'না, আদিনাপুরে।'

আদিনাপুর অবস্থিত রাজ্যের দক্ষিণে, ভারতের কাছে। মহিম শুনেছেন যে বাবর সেদিকে নিয়ে যাচ্ছেন নিজের গোটা সৈন্যদলকে। তার মানে কাবুলের পাশ কাটিয়ে নিজের তিন হাজার সৈন্য নিয়ে সোজাসুজি আদিনাপুর যেয়ে পৌঁছতে সুবিধা হবে হুমায়ুনেরও।

'আপনি হুমায়ুনকেও নিয়ে যাবেন ভারতে?'

যে অভিযানে যাবার প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন বাবর সে কথা গোপন রাখতেই চেয়েছিলেন। চারপাশে তাকালেন, কান খাড়া করে শুনলেন... না: কেউ নেই, কিন্তু কতজন লোক ইতোমধ্যেই জানে তাঁর পরিকল্পনার কথা যে নতুন খেলায় তিনি নামতে চলেছেন তার কথা... মাভেরন্নহরের আশা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি, এখন দক্ষিণদিকে নতুন ভবিষ্যৎ খুঁজতে চাচ্ছেন তিনি। দীর্ঘ দশবছর ধরে একের পর এক চর পাঠিয়েছেন সুলতানের রাজ্যে তারা যোগাযোগ স্থাপন করেছে এমন সব লোকেদের সঙ্গে যারা বাবরের সহায়তা করবে। সংখ্যায় তারা খুব সামান্য নয়। ক'বার কাবুলে এসেছেন মুসলমান শাসকদের ও হিন্দু রাজাদের দূতরা। তাদের অধিকাংশই দিল্লির সুলতান ইব্রাহিমের প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি নাকি জনগণকে নিঃস্ব করে দিয়েছেন, দেশকে টুকরো টুকরো করেছেন, ভারতের ধনসম্পত্তি তাঁর ব্যক্তিগত ধনাগারে রক্ষিত, দেশের উন্নতির প্রতি কোন লক্ষ্য নেই। ভয়ঙ্কর অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বিশাল সেই দেশটি। এমন এক ব্যক্তিত্ব, এক শক্তি প্রয়োজন যে গোটা দেশটাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। 'সেই ব্যক্তিত্ব আপনি—জাহিরুদ্দিন বাবর!' এমনি কথা বলেছে দূতরা...

'মহিম! বিশ্বাস কর, আমি সেখানে লুঠপাট করতে যাব না, আমি চাই শক্তিশালী

এক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে। এ আমার সারা জীবনের স্বপ্ন তুমি জান। আমি চাই যে মাভেরান্নহরের ও খোরাসানে যে বিজ্ঞান ও শিল্পের পতন ঘটেছে তা আবার জীবিত হয়ে উঠুক... আমার রাজ্যে, ভারতবর্ষে। পাঞ্জাবের শাসক দৌলতখান আমার কাছে নিজের ছেলে দিলাওয়ারখানকে পাঠিয়েছিলেন। রাণা সংগ্রাম সিংহের দূতও এসেছিল আমার কাছে আমাদের চুক্তি হয়েছে ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে যুক্ত অভিযানে যাবার।'

বাবর এখন আর স্বামী বা পিতা হিসেবে কথা বলছেন না—বলছেন রাজনীতিক ও শাসক হিসেবে। আপনা হতেই মহিম বেগমের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল সাধারণত যে উপাধি দিয়ে বাবরকে ডাকা হয় সে উপাধি:

'কিন্তু হজরত—শিল্প ও যুদ্ধ এই দুয়ের মধ্যে আছে এক খাদ।'

'সে খাদ আমরা পেরিয়ে যা!'

'কিন্তু কত অনাথ আর বিধবার চোখের জল পড়বে সে খাদে? যা বুঝলাম তাতে মনে হয় এ অভিযান হবে আগ্রাসী ('যেমন শয়বানীর' প্রায় বেরিয়ে পড়েছিল মহিমের মুখ দিয়ে, কিন্তু যথাসময়ে সংযত করে নিলেন) সেই দেশের হাজার হাজার মায়েরা আর স্ত্রীরা কি আপনাকে ক্ষমা করবে তাদের ছেলে আর স্বামীদের জন্য?'

'আর অহরহ অন্তর্যুদ্ধে ঐ ছেলেরা আর স্বামীরা কি এখন হাজারে হাজারে মরছে না? প্রতিবছর ইব্রাহিম লোদীর যুদ্ধ হয় পাঞ্জাবের শাসকের সঙ্গে আর সেই শাসক নিজের আত্মীয় আগলামখানকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। সুলতান আলাউদ্দিনের রাগ প্রতিবেশী রাজাদের প্রতি, আর রাজাদের আলাউদ্দিনের প্রতি রাগ... ভেঙে পড়ছে দেশটা, মাভেরান্নহরের থেকেও খারাপ অবস্থা।' এ যুক্তির বিশেষ প্রতিক্রিয়া হল না মহিম বেগমের ওপর দেখে বাবর অন্য কথা বলতে আরম্ভ করলেন: 'সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে অনেকে, আমাদের কাছে আশ্রয় নিচ্ছে, আমাদের কাছে, বুঝলে? তুমি জান, আমার আমীরদের মধ্যে প্রায় পাঁচবছর হল কাজ করছেন দিল্লি থেকে পালিয়ে আসা হিন্দুবেগ, জান তো? সেই তার কথা শোন, বেগম। সে সব সময় বলে যে তার দেশের লোক এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, হানাহানি থেকে রেহাই পেতে চায়। ইব্রাহিম লোদীর জায়গায় তারা বসাতে চায় কোন শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত শাহ্‌কে যে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে, তার মাহাত্ম্য ফিরিয়ে আনবে, শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতি করবে...'

'এমন শাসক যদি ঐ দেশেরই লোক হয় তো তার তরবারির আঘাত তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে আর লোক তাকে ক্ষমা করে, মানছি যে, অনিবার্য রক্তপাতের জন্য। কিন্তু যদি সেই আঘাত হানে বিদেশী আক্রমণকারীর তরবারি তো সে যত শিক্ষিতই হোক না কেন... শতশত বছর ধরে সে ক্ষত শুকায় না, শতশত বছর ধরে সে ক্ষমা পায় না। তাই নয় কি, হজরৎ?'

এই কথাগুলি বিঁধল বাবরের আহত স্থানে। এই পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনায়

রাতের পর রাত কেটে তাঁর নিজের সঙ্গেই তর্ক করে ভারত অভিযানে যাবেন কি যাবেন না।

হঠাৎ উঠে পড়লেন বাবর।

'ভাগ্যের তরবারি আমাদের ওপর কি কম আঘাত হেনেছে?!' বিরক্ত স্বরে বললেন বাবর। আবার তাঁর ইচ্ছা হল মদ্যপান করতে 'আইভানে বসে থাকার সময়েই পানীয় আনতে বলেছিলাম, আনছে না কেন?!'

বিরক্তভাবে হাততালি দিয়ে তিনি পরিচারককে ডাকলেন। কিন্তু কেন কে জানে ধারে কাছে কোন পরিচারক ছিল না, তখন মহিম বেগম তাড়াতাড়ি উঠলেন খোদাইকাজ করা কুলুঙ্গীর পর্দা সরিয়ে বার করে আনলেন পানীয় ভরা সোনার কলস, দুটি ছোট ছোট চীনামাটির পেয়ালা আর একটি থালায় করে কমলালেবু। সে সব সাজিয়ে দিলেন, বাবরকে বসতে আহ্বান জানালেন।

পেয়ালায় সোনালী পানীয় ঢালতে ঢালতে মৃদু হেসে মহিম বেগম বললেন:

'আমিই আপনার পানীয় পরিবেশনকারী হলাম। নিন, জাঁহাপনা! আপনার দীর্ঘ, সুখী জীবন কামনা করি!'

স্ত্রীর এগিয়ে দেওয়া সুগন্ধি পানীয় পেয়ালায় তির-তির করে কাঁপছে। বাবর অনুভব করলেন মহিম তাঁর কাছে কোন মিষ্টি কথা শোনার প্রত্যাশায় আছে কিন্তু এখন কোন মিষ্টি কথা আসছে না মন থেকে। মনের মধ্যে বইছে বিভিন্ন যুদ্ধের পরিকল্পনার ঠান্ডা ঝড়। একবার মনের চোখে ভেসে উঠছে হিরিলচি উপজাতির ডাকাতদের কথা যারা কাবুলের দিকে যাওয়া ক্যারাভান দলগুলিকে লুঠ করে, কেবলমাত্র সোজাসুজি তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে গেলেই এর একটা হেস্তনেস্ত করা যায়... আবার একবার ভাবছেন দশহাজার সৈন্যের শীতকালের আহার্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শস্যমজুত রাখা দরকার, এর জন্য অনেক ব্যবস্থা নিতে হবে... আবার কখনও তাঁর মন চলে যাচ্ছে পাঞ্জাব যেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বের আগুন ক্রমশ বেশি করে জ্বলে উঠেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে গিয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায়... তারপর আবার উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবেন তাঁর নিজের রাজ্যে কাবুলের পশ্চিমে অসংখ্য উপজাতির সঙ্গে অবিরাম লড়াইয়ের কথা... শেষে আবার মনে পড়ল গতকালের ঘটনা: নতুন আরো বেশি ভারি কামান পরীক্ষা করার সময় কি জানি কি ভুল হওয়ায় কামানের নল ফেটে পাঁচজন গোলন্দাজ মারা যায়...

অনেক কষ্টে স্ত্রীর কথার দিকে মন ঘোরালেন তিনি যেন ঠান্ডা তীরবেঁধা ঝড় পেরিয়ে এসেছেন, কেমন যেন ভাঙাভাঙা গলায় বললেন:

'দীর্ঘ শান্তির জীবন—এ স্বপ্ন আমার জীবনে কোনদিনই সফল হবে না, মহিম।'

'না, না! খোদা আমাদের সহায় হোন: এই স্বপ্ন সফল হোক!'

'সত্যি হবে... নিশ্চয়ই... হোক...'

পেয়ালাটি নিঃশেষ করে দিলেন বাবর। তারপর লেবু ছাড়িয়ে একটি কোয়া মুখে দিয়ে বললেন:

'আরো ঢেলে দাও, মহিম!'

দ্বিতীয় পেয়ালা পানীয় পান করার পর বাবরের মনে হল যে সেই ঠান্ডা হাওয়ার ঝড়টা যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, উত্তাপ এসেছে মনের ভিতর।

'জান মহিম রাজ্যের দায়দায়িত্ব, এইসব উজীর, সেনাধ্যক্ষরা, দূতরা এরা আমাকে কেমন ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে? এক এক সময় নিজেকে মনে হয় টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া এক দেশ, যেখানে চলেছে নিষ্ঠুর অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের এক দিকে আছে বেগরা, দূতরা, আমীররা, সেখানে চলেছে মৃত্যুদণ্ড, পলায়ন আর লড়াই। হাতে ক্ষমতা রাখতে গেলে মানুষকে ঠান্ডা মাথায় ভেবে কাজ করতে হবে, নির্দয় আর অন্যের দুঃখের প্রতি উদাসীন হতে হবে ক্ষমতা উপভোগ করা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, ক্রমশ বেশী করে বুঝতে পারছি যে কেমন নীরস হয়ে যাচ্ছি, কবিতা লিখতে পারি না, সেই হিম অনুভূতি দূর করে দেয় এই পানীয়।'

'আর অন্য দিকে?'

'আছে আর এক দিক... আজই যেন বুঝলাম যে আছে। সে হল—তুমি, হুমায়ুন, হিন্দোল, আর গুলবদন... তোমাদের কাছে থাকলে জীবনটা মনে হয় নির্মল আর উষ্ণ।'

'তাহলে আমাদের এ দিকটাতেই থেকে যান। আমাদের সঙ্গে আমাদের মত হয়ে থাকুন। এতে আমরা বেশি সুখী হব।'

'রাজকার্য ছেড়ে দিয়ে, অন্যের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে?'

'ছেড়ে দেবেন কেন?' একমত হলেন না মহিম। 'আপনি এখানে খুব ছোট রাজ্য সৃষ্টি করেননি, কাবুলের চারদিকে কুন্দুজ থেকে কান্দাহার, বাদাখশান থেকে সিন্ধু পর্যন্ত এলাকায় নিজেদের মধ্যে বিবদমান বিভিন্ন শক্তিকে সংঘবদ্ধ করেছেন আপনি। কাবুলে কত নতুন বাগিচা কত সরাইখানা তৈরি করিয়েছেন, কত নতুন খাল কাটিয়ে অনাবাদী জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা করেছেন... এ সব কিছুর পরে কাবুল কি আপনার প্রিয় হয়ে ওঠেনি?'

'ঠিক, ভাগ্যের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়: এখানে, আফগানিস্তানে আমাকে এখনও পরাজয় স্বীকার করতে হয়নি। আমি তোমাকে পেয়েছি কাবুলে, মহিম, কাবুলেই আমাদের সন্তানদের জন্ম হয়। এখানে যা কিছু অর্জন করেছি তা নিয়েই খুশি থাকা উচিত ছিল... কিন্তু অর্জন করেছি তো সামান্যই। এখনও পর্যন্ত হাতবাঁধা আমার। চারদিকে বশ না মানা যাযাবর উপজাতির দল। আর খুবই সামান্য, বাহুল্যহীন জীবন যাপন করি। এই পাথুরে দেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার মত অর্থসম্বল কই?... এই যেমন গজনীতে মাহমুদ গজনবীর বাঁধের

ধ্বংসাবশেষ—যদি সেটিকে সারিয়ে তুলতে পারা যায় তো যে বিশাল উপত্যকাটা এখন মরুভূমি হয়ে আছে, তা আবার সুফলা হয়ে উঠতে পারত। সে কাজ আরম্ভ করতে চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু যখন খরচ হিসাব করে দেখলাম..., আমার কোষাগারের সামান্য অর্থে তা কুলিয়ে ওঠা যাবে না, মহিম... প্রতিভাবান লোকদের আমি ধরে রাখব কি দিয়ে? কিছুই নেই, তেমন কিছুই নেই! এই তো কামালুদ্দিন বেখজাদকে শাহ্ ইস্‌মাইল তেব্রিজ নিয়ে গেছেন। অনেক বিজ্ঞানী, স্থপতি, কবি এখানে চলে আসবেন আমি আমন্ত্রণ জানালেই। কিন্তু আমি এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত কাজ খুঁজে পেলাম না এমন কি একজন স্থপতির জন্যও, সেই মওলানা ফজলুদ্দিন যিনি নিজে থেকে কাবুলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দরিদ্র আমরা এখন দার-উল-ইসলামের এক কোণায় আমরা পড়ে আছি, বুঝলে মহিম? কিন্তু আমি কি আরও বড় কিছু পাবার উপযুক্ত নই, আরও বিস্তৃত রাজ্যভোগ কি সম্ভব নয় আমার পথে?'

'আমি বুঝলাম ভারতবর্ষের দিকে আপনাকে টানছে অনেকগুলি কারণে, কিন্তু আপনি সেই দেশে যাচ্ছেন তরবারি হাতে নিয়ে। আপনারই স্বদেশবাসী খোরেজম প্রদেশের বিরুনী যেমনভাবে গিয়েছিলেন তেমনভাবে নয়: আরবী ভাষায় তাঁর লেখা 'হিন্দুস্তান' তো পড়েছেন আপনি। যেমনভাবে আপনার প্রিয় কবি খুসরু দেহলবী গিয়েছেন তেমনভাবে নয়।'

বাবর অনুভব করলেন আবার তাঁর ভিতরে উঠছে সেই হিমহাওয়ার ঝড়।

'মহিম, তুমি কি চাও না যে আমি দিল্লি অভিযানে যাই?'

তা অবশ্যই চান মহিম, কিন্তু জানেন যে সে ইচ্ছা পূরণ হবে না। তবুও একগুঁয়েভাবে বলে চললেন:

'খুসরু দেহলবীর অনেক কবিতা আপনার কণ্ঠস্থ। কবিতা রচনার নিয়মসংক্রান্ত যে বই 'মুখতাসার' আপনি লিখেছেন তাতে আপনি উদাহরণ স্বরূপ দেখিয়েছেন দেহলবীর কবিতাগুলি। আপনি নিজেও কবি। আর বিজ্ঞানীও। আমি মনেপ্রাণে চাই যে লোকের মনে থেকে যাক আপনার সম্বন্ধে কেবল ভাল কথাই। যেমন রয়ে গেছেন বিরুণী আর খুসরু দেহলবী!'

হিম হাওয়ার ঝড় ফুঁসতে লাগল।

'তাহলে! তুমি বলতে চাচ্ছ না যে আমি শাহও,' নিরুত্তাপ স্বর বাবরের। 'যেন লোকে কোন শাহ্‌কে মনে করে কেবলমাত্র তার সদ্‌গুণগুলির কথা ভেবেই! তা কখনও হয় না, বেগম! নিজের সম্বন্ধেও আমি প্রশংসা ও নিন্দা দুই-ই শুনেছি—কত সে গুণে বলা যাবে না! সে সবের মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছে আমাকে। এখন আমার আর মনে লাগে না, না প্রশংসা, না নিন্দা।

মহিমের মনে পড়ল বাবরের সম্প্রতি রচিত দুছত্রের একটি কবিতায় ঠিক এমনি

ভাবেরই প্রকাশ হয়েছে। মহিম একমত হতে পারেন না তাঁর সঙ্গে। তিনি জানেন, বাবরও সব সময় এমন ভাবেন না কিন্তু এই চিন্তাধারায় তাঁর মনের, তাঁর সত্যের একটি মাত্র অংশ আছে, এখন এই সত্যে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী এবং সেই বিশ্বাসকে টলাবার ক্ষমতা নেই এখন মহিম বেগমের। খানিক আগেই তিনি নিজের মনে মনে বলেছেন 'ও আমার! কেবল আমারই!' খানিক আগে। কিন্তু এখন তো তাঁর সামনে ক্রীতদাস বসে নেই, আছে অনমনীয় শাসক।

'মাননীয় হজরত, তাহলে আপনার কাছে কেবল একটিই অনুরোধ: হুমায়ুনকে কাবুলে রেখে যান। আপনি যখন অভিযানে যাবেন তখন কে কাবুলের শাসনভার নেবে?'

'তুমি নেবে সে ভার মহিম বেগম!'

'আমি? আমি তো নারীমাত্র! শরীয়তের আইন অনুযায়ী স্ত্রীর চেয়ে পুত্রের অধিকার বেশি। হুমায়ুন আপনার সঙ্গে চলে গেলে তার অনুপস্থিতিতে মির্জা কামরোন আর তার ভাইয়ের অধিকার আমার চেয়ে বেশি হবে।'

দ্রুত, ঠান্ডামাথায় চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলেন বাবর:

'মির্জা কামরোনকে আমি কান্দাহারের শাসক নিয়োগ করব। তার সঙ্গে যাবে মির্জা আসকার। আর এখানে তোমায় সাহায্য করবেন বৃদ্ধ কাসিমবেগ।

কি অদ্ভুত আস্থা তাঁর ওপর! আর সূক্ষ্ম বিচার! অত ক্ষমতা মহিম বেগমের হাতে থাকলে গুলরুখ বেগমের গুপ্ত চক্রান্তের অনেক ঊর্ধ্বে থাকবে সে। আর বাবরের যখন এত বিশ্বাস তাঁর ওপর তখন কি আর কথা বলা চলে তাঁর সঙ্গে?

'আপনি আমাকে এতখানি বিশ্বাস করায় আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি, হজরত। কিন্তু আপনি জানেন ক্ষমতা হাতে নিতে ভালবাসি না আমি।'

'সেই জন্যই তো তোমার হাতে ক্ষমতা দিচ্ছি আমি। উপজাতিদের ব্যাপারে যত কাজ আর আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সমস্ত কিছু করবেন কাসিমবেগ। কিন্তু তিনি কেবল আদেশ পালন করবেন—আর আদেশ দিতে হবে তোমাকে। হিন্দোল থাকবে তোমার কাছে, তার নামে তুমি আদেশ দেবে। তাহলে সবকিছু শরীয়তের নির্দেশমত হবে।'

শাসনকাজের এই ভার, এর কোন প্রয়োজনই নেই মহিম বেগমের তবুও লুকিয়ে লাভ নেই এই ভার তাঁকে দেওয়ায় খুশিই তিনি। মহিম ভাবলেন মির্জা কামরোনও খুশি হবে যে কান্দাহার শাসনের এমন দায়িত্ব দিয়েছেন তাকে পিতা, হ্যাঁ, তার স্বামী খুঁজে বার করে নিতে পারেন লোকের মনের সেই সূক্ষ্ম 'গ্রন্থি'টির কথা, যাতে তার আগ্রহ, সেই আগ্রহ যদি বাবরের হিসাব পরিকল্পনার সঙ্গে মিলে যায় তবে লোকটি চলতে থাকে বাবরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, মনপ্রাণ দিয়ে কার্যকরী করে তাঁর সব নির্দেশ।

রাজনীতিকে তাঁর মনে হয় যেন দাবার ছকের ঘুঁটিবদল। ইদানীং বেগদের আর অধীনস্থ কর্মচারীদের পরিচালনা করবার অদ্ভুত কৌশল আয়ত্ত করেছেন—তাদের অন্তরের সেই বিশেষ 'তার'টির খোঁজ জানায় সেই পরিচালনার কাজ আরও সহজ ও সুফলদায়ক হয়েছে। এখন নিজের স্ত্রীর মধ্যেও তিনি সেই 'তার'টিই খুঁজলেন—তাঁর ওপর এতখানি আস্থা তাঁকে কি নিজের চোখেই বড় করে তোলেনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিনীর চেয়ে অনেক উপরে তুলে দেয়নি?

কিন্তু আবার ছেলের জন্য উদ্বেগ বোধ করলেন মহিম বেগম:

'জাঁহাপনা, এই দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি, নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি আমি আপনাকে আর হুমায়ুনকে। এমন বিপজ্জনক অভিযানে যাচ্ছেন আপনি যে আমি... আমি ভয় পাচ্ছি। আপনি দক্ষ সেনাপতি, কিন্তু ভারতবর্ষে—অসংখ্য লোক!... অগণিত সৈন্য! সমুদ্র! রাজ্যস্থাপন করার জন্য অনেক রক্তপাত ঘটেছে মাভেরান্নহরে, আর ভারতবর্ষে...'

নীরব হয়ে গেলেন মহিম, বলতে পারলেন না যা বলতে চাচ্ছিলেন 'ভয় হয়, সে সমুদ্র গিলে ফেলবে আপনাকে।' বাবরও ভাবেন সে কথা, রাতের পর ভাবেন ঐ সমুদ্রের কথা আতঙ্ক নিয়ে।

'রক্তপাত ছাড়া যুদ্ধ সম্ভব নয়,' দৃঢ়ভাবে বললেন বাবর, 'তুমি তো জান মহিম। কি হয়েছে আজ তোমার?'

'ভয় হয়... ভয় হয় হুমায়ুনের জন্য... হুমায়ুন কাবুলে থাকুক, পায়ে পড়ি আপনার!'

হায় রে নারীজাতি! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার না বলা মনের কথা 'যদি যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যুই হয় অন্তত পুত্র জীবিত থাক!'

'হুমায়ুন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী!' বিষণ্ণমনে বললেন বাবর। 'তার থাকা উচিত সৈন্যদলের সঙ্গে... ভুলে যাচ্ছ কেন তাই হয়ে এসেছে বরাবর?'

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যদি দূর অভিযানে শাহের মৃত্যু ঘটে তো সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী সৈন্য পরিচালনার ভার নেবে। তা নাহলে সিংহাসনের জন্য 'দাবিদারের' পক্ষে যোগ দিতে পারে সৈন্যদল। সেই কথা এখন মনে করিয়ে দিলেন বাবর। স্ত্রীকে সোজাসুজি বললেন না যে 'যদি যুদ্ধে আমার জীবনবসান হয় তো হুমায়ুনকে দায়িত্ব তুলে নিতে হবে, সে কারণেই সঙ্গে নিচ্ছি!'

বুঝলেন মহিম বেগম সেকথা। আরো মন ভারী হল তাঁর। হঠাৎ ভারতবর্ষ তাঁর কাছে মনে হল এমন একটি দেশ যেখান থেকে ফেরার পথ নেই। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

'হায় আল্লাহ্! এ দুনিয়াটা এমন নিষ্ঠুর কেন?'

বাবর নীরব রইলেন।

লাহোর, পানিপত, দিল্লি

১

সৈন্যদল যত এগোচ্ছে, জঙ্গলও তত গভীর হচ্ছে।

বিরাট বিরাট অশ্বত্থগাছের শিকড়গুলি মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে গাছের নিচু ডালপালাগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আবার মাটিতে নেমে গেছে। এলোমেলা গজিয়ে ওঠা মোটা মোটা লতাগাছ গাছগুলির গুঁড়ি বেয়ে এমন উঠেছে যে মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত ঝোপের দুর্ভেদ্য দেওয়াল উঠেছে যেন। মাটিতে এত লতাপাতা গজিয়ে উঠেছে যে মাটি দেখাই যায় না।

বদ্ধ, স্যাঁতসেঁতে হাওয়া, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, মাথা ঘোরে।

হাল্কা রেশমী পোশাক বাবরের অঙ্গে—দেহের বর্মটা তাঁর ও তাঁর ঘোড়ার কাছেও দুঃসহ ভারী মনে হচ্ছে—আর ঘামে ভিজে যাচ্ছে সারা শরীর। ওপর দিকে তাকালে দেখা যায় যে উঁচু অশ্বত্থগুলির চূড়া দুলছে হাওয়ায়, কিন্তু নিচে জঙ্গলের মধ্যে সে হাওয়া এসে পৌঁছাচ্ছে না। মাথা ঘুরছে আর মনে হচ্ছে যেন কি এক অজানা শক্তি ঘোড়াটাকে এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে।

কোথায় কোন ডালপালায় বানরগুলি মাঝে মাঝে চীৎকার আর হুটোপুটি করছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে ময়ূরের তীক্ষ্ণ বিরক্তিকর ডাক।

হঠাৎ যে লোকগুলি ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে উটের পাল নিয়ে যাচ্ছিল তাদের একজন চীৎকার করে উঠল:

'কি হল ওখানে?'

'সাপে কামড়েছে!'

'ঐ যে গোখরো, গোখরো!..'

ঘোড়ার পক্ষেও কঠিন লোকের পক্ষেও কঠিন। মনে হচ্ছে যেন কাঠের ঠেলাগাড়িগুলি যার উপর কামানগুলি রাখা আছে তাদেরও কষ্ট হচ্ছে। বাবরের সামনে এসে দাঁড়াল আলিকুল, তার ঘোড়াটার সারা দেহ জলাভূমির শ্যাওলা কাদার মত কাদায় মাখামাখি: আলিকুলের চোখে উদ্বেগ।

'জাঁহাপনা! এই কাদামাটি পেরিয়ে কামানগুলোকে আর টানা যাচ্ছে না! তাছাড়া—চারপাশে জলাভূমি। সব ঠেলাগাড়িগুলি আটকে গেছে..'

খানিক পিছনে থাকা তাহিরকে ডেকে বাবর বললেন:

'বেগ পথপ্রদর্শককে ডাক দেখি!'

পথপ্রদর্শক লালকুমার আগে আগে চলেছে হাতীর পিঠে চড়ে। হাতীর পিঠে চড়েই এল বাবরের কাছে, তাহির ভাবল এতে তাড়াতাড়ি হবে। হাতীটিকে দেখে

বাবরের ঘোড়া চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু লালকুমার হাতীকে বেশ দূরে থামিয়ে তার বিশাল কানে কি যেন বলল—হাতী শুঁড় উঠিয়ে মালিককে নামতে সাহায্য করল। এরপর লালকুমার দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকাল বাবরের উদ্দেশ্যে। বাবর ফার্সীতে বললেন:

'এ পথে যাওয়া চলবে না, অন্য পথ খোঁজা দরকার।'

'মহামান্য শাহ্ আমরা এখন পাঞ্জাবে—এখানের পাঁচটি নদীতেই বান এসেছে। তাই অন্য সব পথই জলে ডুবে গেছে।'

'আমরা জানি যে পাঞ্জাবে অনেক পথ আছে, এমন পথও আছে যে গাড়ি চলতে পারে। আর এখানে গাড়িগুলি কাদায় বসে গেছে। আমরা কি পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি?'

'না, না, মহামান্য শাহ্! কোথায় গাড়ি বসে গেছে?.. অনুমতি পেলে আমার হাতী সেগুলোকে টেনে তুলবে। যেতে হবে... দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। আজও যদি চলা যায় তো কাল পরিষ্কার পথে গিয়ে পড়া যাবে। লাহোর কাছেই।'

'হাতীটাকে নিয়ে যাও, গাড়িগুলো টেনে তুলবে' আলিকুল নিচু হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল বাবরের উদ্দেশ্যে। লালকুমারের হাল্কা, শীর্ণ দেহ—কালো বিশাল হাতীর সাহায্যে দ্রুত উঠে বসল তার পিঠে তারপর হাতীর গায়ে পা দিয়ে আঘাত করে, মাঝে মাঝে বাঁকান লোহার শিকটা দিয়ে হাতীর ঘাড় ছুঁয়ে নিয়ে চালাল তাকে আলিকুলের পিছন পিছন ঠেলাগুলির দিকে।

শক্তিশালী হাতীটি শীঘ্রই বিনা পরিশ্রমে গাড়িগুলিকে কাদা থেকে টেনে তুলল।

একটি গাড়ির উপর শুয়ে গোঙাচ্ছিল সাপের কামড়ে নীল হয়ে যাওয়া লোকটি। যদি তার বেঁচে থাকার কোন আশাই নেই তবুও তার দলের লোকরা ক্ষতস্থানটি ঢেকে দিয়েছে শিকড়বাকড় দিয়ে আর বিষ যাতে তাড়াতাড়ি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য রক্তপ্রবাহ বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে পায়ে শক্ত করে দড়ির বাঁধন দিয়েছে...

আবার এগোতে লাগল কামানগুলি, ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে অতিকষ্টে এগিয়ে চলল সৈন্যরা। আবার লালকুমারের হাতী সামনে চলল।

ধীরে ধীরে অনেক সময় নিয়ে চলতে থাকল সৈন্যদল। হাওয়া ক্রমশ বন্ধ হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস নিতে আরো কষ্ট হচ্ছে।

দুপুরের পরে রবি নদীর তীরে হিন্দুবেগ নিজের একশত সৈন্য নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

হিন্দুবেগ দিল্লির অভিজাত বংশের লোক। ইব্রাহিমের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় সে কাবুল চলে গিয়ে বাবরের কাছে কাজ নেয়। তার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে কিন্তু শৌর্যে সে হার মানায় যুবকদেরও, তার প্রমাণ পেয়েছেন বাবর গতবছরে ভারত

অভিযানে এসে। বাবর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন শুধুমাত্র তার শৌর্যের কারণেই নয়—তার দেশকে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানর আর বিনা রক্তপাতে তা করার ইচ্ছা দেখেও। তুর্কী, ফার্সী খুব ভাল জানে হিন্দুবেগ, যথেষ্ট শিক্ষিতও তাই জন্যই সে হয়ে উঠেছে সেই সব বেগদের একজন যাদের সঙ্গে মনের কথা বলতে ভালবাসেন বাবর। গত অভিযানে হিন্দুবেগের মধ্যস্থতার ফলেই ঝিলম নদীর তীরে ভীরা শহর বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে বাবরের কাছে। এরপর হিন্দুবেগকে এই অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করা হয়। এবার বাবর আশা করেছিলেন ঠিক তেমনি শান্তিপূর্ণ উপায়েই লাহোর দখল করবেন। হিন্দুবেগ লাহোরের আমীরের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিল, আমীর যেন ভাব দেখিয়েছিল যে বাবরের অধীনতা স্বীকার করবে।

দূর থেকেই হিন্দুবেগকে চিনতে পারলেন বাবর, পথের থেকে সরে গিয়ে সৈন্যদের সামনে এগিয়ে যেতে দিলেন: নিরালায় হিন্দুবেগের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন।

'জাঁহাপনা, দৌলতখানের উদ্দেশ্য মন্দ,' সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করল হিন্দুবেগ, 'আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, পালিয়েছি আমি।'

'এমন পরিবর্তনের কারণ কি?' স্বরকে সংযত করার চেষ্টা করলেন বাবর। 'আমাদের কাছে সে নিজের ছেলে দিলাওয়ার খানকে পাঠিয়েছিল, তখন আমরা সবকিছু স্থির করেছিলাম... দৌলতখানের বয়সের জন্য সম্মান করতাম তাকে আমি।'

'সেসব কথা ভুলে গেছে দৌলতখান। কোমরে ঝুলিয়েছে দুটি তরোয়াল। তার কারণ, আমাকে বুঝিয়ে দিল দিলাওয়ার খান: একটা তরবারি নাকি শাণ দিচ্ছে ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে আর অন্যটি—আপনার বিরুদ্ধে!

'আর তার ছেলেও আমাদের বিরুদ্ধে নাকি?'

'না, দিলাওয়ার খানের মনটা ভাল, চুক্তির কথা তার মনে আছে, বিনাযুদ্ধে লাহোর আমাদের হাতে তুলে দিয়ে আনুগত্য প্রমাণ করতে চায়। সেই আমাকে বাঁচায় মৃত্যুর হাত থেকে, বলে তার পিতার পরিকল্পনার কথা... ওদিকে বড় ছেলে গাজীখান পিতার পক্ষে।'

'আর ওলামখান?'

'সে ইব্রাহিমকে ভয় পায়... দিল্লির সুলতানের কাছে পরাজয় স্বীকার করার পরে এখন যুদ্ধ বিগ্রহকে তার ভয়। কিন্তু যখন আপনি লাহোর পৌঁছাবেন, আমার মনে হয়, সে এসে আনুগত্য জানাবে। সবচেয়ে বড় বাধা হল গাজীখান। বেগদের মধ্যে তার প্রভাব তার বাবার চেয়েও বেশি। তাকে বশ করতে পারলে সব বেগরাই আপনার আনুগত্য স্বীকার করবে। আমার বিশ্বাস বিনাযুদ্ধেই লাহোর আপনার হাতে আসবে। কিন্তু... এমন খারাপ রাস্তা ধরে লাহোর যাবার কারণ কি?'

'পাঞ্জাবের মিত্ররা যে পথপ্রদর্শককে পাঠিয়েছে সেই আমাদের নিয়ে যাচ্ছে এ পথে।'

'কোথায় সেই পথপ্রদর্শক? দেখি তো তাকে।'

আবার ডাকা হল পথপ্রদর্শককে।

লালকুমার হাতীর পিঠে বসা অবস্থায়ই কপালে হাত ঠেকাল হিন্দুবেগকে দেখে। হিন্দুবেগ ও তার উত্তর দিল সেইভাবেই তারপর হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল:

'কোথাকার লোক তুই?'

'আগ্রার লোক, হুজুর।'

'পাঞ্জাবে কি করে এসে পড়লি?'

'কাজের সন্ধানে... পেটের ধান্দায়।''এমন একটা হাতী থাকা সত্ত্বেও সুলতান ইব্রাহিম লোদীর কাছে কাজ পেলি না?'

'ইব্রাহিম লোদী কৃপণ। সব টাকাকড়ি নিজের সিন্দুকে বন্ধ করে রেখেছে খরচ করতে চায় না। হন্যে হয়ে পড়েছি আমরা...'

'ঠিক, ঠিক কথা,' বলল হিন্দুবেগ, 'ঐ লোদীদের অত্যাচারে পালাতে হয়েছে আমাকেও। ইব্রাহিমের পিতা, সিকান্দর আমার পিতাকে অভিযুক্ত করে হুকুম না মানার জন্য, তারপর মত্ত হাতীর পায়ের তলায় ফেলে পিষে মারা হয় তাঁকে।'

পথপ্রদর্শকের মুখ দেখে মনে হয় সে হিন্দুবেগকে বিশ্বাস করেছে নিজের লোক বলে। সে জিজ্ঞাসা করল:

'আপনি ক্ষত্রিয়?'

'হ্যাঁ, আমার আসল নাম ইন্দ্র। শাহ্ বাবর আমাকে হিন্দুবেগ বলে ডাকেন। সবারই ভাল লাগে এ নাম... আমারও... তোর নাম কি?'

'লালকুমার।'

'আচ্ছা, লালকুমার, তোর কি মনে হয় কে আমাদের বাঁচাতে পারে লোদীর অত্যাচার থেকে?'

'ঈশ্বর পারেন।'

'আর মানুষের মধ্যে?'

চিন্তায় পড়ল লালকুমার।

'দৌলতখান?' সাহায্য করতে চাইল হিন্দুবেগ।

'দৌলতখান—উদার লোক... আর গাজীখানও ইব্রাহিমের চেয়ে ভাল।'

হিন্দুবেগ গলানীচু করে জিজ্ঞাসা করল:

'সত্যি করে বল দেখি বাবরের সৈন্যদলকে এ পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস কেন?'

'গাজীখানের আদেশে।'

'গাজীখান কেন দিয়েছে এমন আদেশ—যেখান দিয়ে যাওয়া যায় না সেখান দিয়ে নিয়ে যেতে?'

'ওদের পক্ষে এটাই ভাল পথ। ঠিক পথ!'

'কি ক্ষতি করেছে ওরা?'

'এই ইব্রাহিম লোদীতেই কি যথেষ্ট হয়নি আমাদের? এবার আর একজন অত্যাচারী যাচ্ছে? তাছাড়া পরদেশী?'

'গাজীখান প্রতারণা করেছে তোর সঙ্গে?'

লালকুমার হঠাৎ হাতীর মুখ ঘুরিয়ে ঝোপের কাছে গিয়ে চীৎকার করে বলল:

'এই বিদেশীরা দখলদার আর খুনী। বাশুর দুর্গে ওরা আমাদের তিনহাজার লোককে কেটে ফেলেছে! আমাদের গ্রাম-শহরগুলি লুঠ করেছে!' তারপর দৌড় দিল বনের গভীরের দিকে...

'জাঁহাপনা! ঐ লোকটিকে ধরতে আদেশ দিন। ওকে শত্রুরা পাঠিয়েছে। ও আপনাকে ভুল বুঝিয়ে এই দুর্গম পথ দিয়ে নিয়ে এসেছে...'

'ধর ওকে!' ক্ষিপ্ত চীৎকার করলেন বাবর। 'শীঘ্র! দেরী কোরো না!'

সৈন্যরা ঘোড়া ছোটাল হাতীর পিছনে। তিনজন গিয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়ালও। কিন্তু লোকটি হাতীকে লোহার শিকটা দিয়ে মারতে মারতে ঘোরাল অশ্বারোহীদের দিকে, তারপর তার কানে কানে কি যেন বলল, সবাই আতঙ্কিত হয়ে দেখল যে তিনজনের দুজনকে হাতী শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলল আর তৃতীয়জন ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বনের গভীরে উধাও হয়ে গেল।

মার ও হেটহেট চীৎকারে ক্ষিপ্ত হাতীটা দারুণ জোরে ডাক দিয়ে দারুণ শব্দে গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে দৌড়ে ঘন বনের মধ্যে চলে গেল।

'তীর ছোঁড়ো!' আদেশ দিলেন বাবর।

কিন্তু গাছপালার মধ্যে তীরছোঁড়ার সুবিধা হয় না, কয়েকটা তীর গিয়ে লাগল হাতীর গায়ে, কিন্তু তার চামড়ায় কোন ক্ষতিই করতে পারল না, এদিকে ততক্ষণে গাদাবন্দুক ছোঁড়ার জন্য চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে সলিতা জ্বালান হল ভারী ভারী অস্ত্রগুলোকে প্রস্তুত করা হল... কিন্তু লালকুমার ততক্ষণে তাদের লক্ষ্যের বাইরে চলে গেছে।

'আহত সৈন্যদের গাড়িতে তোল আর আহত ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেল!' আদেশ দিলেন বাবর। 'বদমাশটার উচিত শাস্তি পাওয়া উচিত! ঘিরে ফেলতে হবে ওকে। বন ঘিরে ফেল, জল্‌দি!'

বৃথা চেষ্টা! চারদিক ঝোপঝাড় আর জলাভূমি...'

'হিন্দুবেগ এবার আপনি আমাদের পথপ্রদর্শক হোন!'

'আপনার অনুগত ভৃত্য আপনার সেবায় নিযুক্ত, জাঁহাপনা।'

সন্ধ্যার মুখোমুখি হিন্দুবেগ সৈন্যদলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এক বিস্তীর্ণ শ্যামল উপত্যকায়। অপরিসীম ক্লান্ত বাবর আদেশ দিলেন সেখানেই ছাউনি খাটিয়ে সবাইকে বিশ্রাম করতে। খানিক বাদেই ফিরে এল লালকুমারের ব্যর্থ অনুসরণকারীরা: তাদের

পোশাক গেছে ছিঁড়েকুটে, ঘোড়াগুলির গায়ে নোংরা মাখামাখি, তারা নিজেরা কোনরকমে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে...

সকালবেলায় বাবরের ছাউনির কাছে এসে উপস্থিত হল গোটাপঞ্চাশ লোকের একটি ছোট বাহিনী—এ বাহিনী হল দৌলতখানের আর দিলওয়ারখানের; তারা লাহোর থেকে এসেছে বাবরের আনুগত্য ও অধীনতা স্বীকার করতে। রক্ষীদের আদেশ দেওয়া হল লাহোরবাসীদের শিবিরে ঢুকতে দিতে, কিন্তু বাবর নিজে দেখা করলেন কেবল দিলাওয়ারখানের সঙ্গে। নিজের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী বেগদের মাঝে বসালেন তাকে, অভিবাদন বিনিময় করলেন। তারপর সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন:

'বলুন তো আপনার পিতা যাঁকে আমি প্রায় নিজের পিতার মতই সম্মান করতাম কেন তিনি চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুতার পথ বেছে নিলেন? কেন তিনি আমাদের বিরুদ্ধে তরবারিতে শান দিচ্ছেন?'

দিলাওয়ারখানও তেমনি সোজাসুজি উত্তর দিলেন:

'পিতাকে ভুল বুঝিয়েছে আমার ভাই গাজীখান। সে বাবাকে বলে যদি এখানে বিদেশী সৈন্য আসে, তো লাহোর আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। যেমন ইব্রাহিম লোদী আমাদের শত্রু ঠিক তেমনই শাহ্ বাবরও আমাদের শত্রু বলে সে!'

'তাই বৃদ্ধ দৌলতখান আমাদের কাছে পাঠান এক প্রতারক পথপ্রদর্শককে যাতে আমরা ঘন বনের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে মরি, তাই তো?'

'তা নয়, জাঁহাপনা। এই ধূর্ত পরিকল্পনার কথা জানেন না আমার পিতা। এ হল গাজীখানের কাজ। তা নাহলে পিতা নিজে এখানে এসে উপস্থিত হতেন না... উনি ওখানে, আপনার ছাউনির প্রবেশপথে অপেক্ষা করছেন... উনি রক্তপাত চান না, বিশ্বাস করুন, উনি আশা করে আছেন লাহোরের প্রতি আর আমাদের প্রতি আপনার মাহাত্ম্যের ওপর, জাঁহাপনা।'

'সেই দয়াপ্রদর্শনের উপযুক্ত কেবল আপনি, মহামান্য দিলাওয়ার! আপনার পিতাকে... শাস্তি পেতে হবে এবং তা হবে উপযুক্ত কাজ। শত্রুকে শাস্তি দেওয়া আর বন্ধুকে সাহায্য দেওয়া উচিত এই উপদেশই তো পয়গম্বর আমাদের দিয়েছিলেন, তাই না?' রক্ষীদের অধিনায়কের দিকে ফিরে বাবর বললেন 'শুনলাম ইদানীং দৌলতখান দু' পাশে দুটি তরবারি ঝুলিয়ে ঘুরছেন। দেখি তো আমরাও দেখে মজা পাই. . . তাকে এখানে নিয়ে এস তরবারিগুলি ঝোলান অবস্থায়ই।'

দুজন বিশালদেহী রক্ষী শ্বেতশ্মশ্রু দৌলতখানের দু'হাতের কব্জি ধরে প্রায় তুলে নিয়ে এল ছাউনির মধ্যে। বৃদ্ধ আছাড়িপিছাড়ি করছে ছাড়িয়ে নেবার জন্য, কোমরে ঝোলান তরবারি দুটি দুলে দুলে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। হো হো করে হেসে উঠল বেগরা। দৌলতখান সোজাসুজি বাবরের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত স্বরে বলল:

'আমাকে বন্দি করা হয়নি, আমি নিজে এসেছি আপনার কাছে! নিজের ইচ্ছায়। আর দেখলাম আপনার বিশ্বাসঘাতকতা! আর নিষ্ঠুরতা!'

'বিশ্বাসঘাতকতার কথা কে বলছে?' গলা তুলে বললেন বাবর। 'আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করে হিন্দুবেগকে মারতে চেয়েছিলেন, সে আপনার কাছে আমার দূত হয়ে এসেছিল!... বনবাদাড় ঝোপে কাকে পাঠিয়েছে গাজীখান, কার ছেলে সে, কার নির্দেশে এ কাজ করেছে সে? আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন! আপনি চেয়েছিলেন! নির্দয়ের প্রতি আমরাও নির্দয়!...' এক মুহূর্ত থামলেন বাবর। 'এই, উজীর, এই লোকটিকে আর এর পরিবারকে ধরে নিয়ে ভীরাতে পাঠিয়ে দাও। সেখানে মিলভাত্ত দুর্গে আটকে রাখ! ওকে ছাড়াই লাহোরের চলে যাবে!'

বিভ্রান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়ে দৌলতখান: পাগুলো আর ধরে রাখতে পারল না তাকে। রক্ষীরা লাহোরের আমীরকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। দিলাওয়ারখান উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু এমন সময় যেন মাটি থেকে দু'জন রক্ষী গজিয়ে উঠল তার পিঠের কাছে...

২

শরৎ শেষ হয়েছে বহুদিন, শীতকালও বিদায় নিতে বসেছে গাছপালায় কিন্তু তখনও সবুজ রং ধরে আছে। ভারতের প্রান্তহীন সীমাহীন উপত্যকাগুলি বছরের যে কোন সময়েই অপূর্ব সুন্দর!

যমুনার তীর ধরে দিল্লির দিকে এগিয়ে চলেছেন বাবর ধীরে ধীরে, সতর্কভাবে। নিষ্পত্তিমূলক লড়াইয়ের জন্য থামলেন ইব্রাহিম লোদীর রাজধানী থেকে প্রায় ক্রোশ পনের দূরে, পানিপথে। আগ্রার দিক থেকে নিজের বিরাট সৈন্যদল (এক লক্ষ!) আর হাতীবাহিনী নিয়ে ইব্রাহিম লোদী দ্রুত এগিয়ে আসছে সেদিকে। গতবছর দিল্লির মুখে সে ওলাম খান, দিলাওয়ার খান ও অন্যান্য স্থানীয় শত্রুদের চল্লিশহাজার সৈন্যকে পরাস্ত করে। বাবরের সঙ্গে এখন বারো হাজারের বেশি সৈন্য নেই। দিল্লি সুলতানের এই বিরাট সংখ্যক সৈন্যদল কিন্তু বাবরের একজন বেগের মনেও ভয় ধরাতে পারল না। বেগরা কানাকানি করছে যে যদি পরাজয় স্বীকার করতে হয় তো বিদেশের এই সীমাহীন প্রান্তরে কেউ লুকিয়ে পড়তে পারবে না, বাঁচার কোন আশাই নেই। কিন্তু অন্য মতও ছিল। অনেকেরই বিরাট আশা ছিল বাবরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও সৈন্যচালনার প্রতিভার উপরে আর অবশ্যই আলিকুলনির্মিত কামান ও গাদাবন্দুকের ওপর: এ অস্ত্র ইব্রাহিমের নেই। তাহির যে এখন সর্বসময়ই ঘোরাফেরা করে বেগদের উপরমহলে, সে জানে যে বাবর পরিকল্পনা করেছেন কামান ও বন্দুক দিয়ে হস্তীবাহিনীর আক্রমণ ছত্রভঙ্গ করার, ভারতে হস্তীবাহিনীই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ

করে আর বাবরের তো হস্তীবাহিনী নেই।

পানিপথ ও যমুনা নদীর মাঝে একটা সুবিধাজনক জায়গা বেছে নেওয়া হল যেখান থেকে আগুনে অস্ত্র প্রয়োগ করতে সুবিধা হবে। অর্ধবৃত্তের আকারে সাজান হল গাড়ীগুলো—যতগুলো ছিল—সাতশ'টা, সবকটা একসঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হল চামড়া দিয়ে তৈরি করা দড়ি দিয়ে। গাড়িগুলির সামনে ও সেগুলির মাঝের ফাঁকগুলির সামনে রাখা হল তীর বেঁধে না এমন ঢাল।

বাবরের যথেষ্ট সময় ছিল লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হবার, যাতে পরে লড়াইকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, শত্রুর ইচ্ছাধীন হতে না হয় যেন।

গোলন্দাজরা আর বন্দুক ছোঁড়ার লোকেরা চর্চা করতে লাগল যার যার কাজ। অন্য আর এক কৌশলও প্রস্তুত করা হতে লাগল, গাড়িগুলো দাঁড় করান হয়েছিল পাহাড়ের ঢালে, যাতে তারা গড়িয়ে নেমে না আসে সেজন্য তাদের চাকার নিচে কাঠের গোঁজ বসান হল, আর বাবর টিলার ওপর থেকে সমস্ত কার্যকলাপের পরিচালনা করার সময় আদেশ দিলেন সমস্ত গোঁজগুলি একসঙ্গে সরিয়ে নেবার জন্য; তিনি চাইছিলেন যে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সমস্ত গাড়িগুলো যেন একসঙ্গে বাঁধা অবস্থায় নিচে নেমে আসে গড়িয়ে।

তাহির ঘোড়া ছুটিয়ে কামানগাড়ির সারির অন্য প্রান্তে গেল সেনানায়কের আদেশ জানাতে। পদাতিক বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী, বন্দুকধারী সৈন্যরা সবাই প্রস্তুত। আলিকুল উঠে দাঁড়িয়েছে উঁচু একটা জায়গায়, যাতে সবাই তাকে দেখতে পায়—হাত নাড়াল:

'গোঁজ তুলে নাও! গাড়ী চালাও!'

কিন্তু একসঙ্গে সমানভাবে এগোল না গাড়িগুলি: কতকগুলো কামানগাড়ি সঙ্গে সঙ্গে এগোতে পারল না, কতকগুলো নেমে গেল নিচে (কতকগুলোর চামড়ার দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে গেছে)। মোটা লোহাবাঁধান ঢালগুলোকে ফেলে দিয়ে আঁকাবাঁকাভাবে এগিয়ে চলল সারিটা।

'থাম!' নতুন আদেশ বাবরের। 'আবার চেষ্টা কর। আর আলিকুলবেগ যতক্ষণ না এমন অবস্থা হয় যে একটির দড়িও ছিঁড়বে না আর একটি ঢালও পড়ে যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করে যেতে হবে।'

ঘেমে নেয়ে যোদ্ধারা কামানগাড়িকে ঢাল বেয়ে টানতে টানতে তুলে নিয়ে বসাল আগের জায়গায়, কোন কোন সৈন্য এমন কঠিন কাজ থেকে সরে পড়তে চাইছিল, কিন্তু তাদের তত্ত্বাবধায়করা তাদের নির্দয়ভাবে বকাবকি করছিল, অলস লোকদের এমনকি মারছিলও।

'যুদ্ধকৌশল শেখার সময় সৈন্যদের জন্য মায়া কোরো না' কড়া আদেশ বাবরের, 'তা নাহলে যুদ্ধে বেঘোরে মারা পড়বে!...'

টিলার ওপর থেকে নেমে বাবর নদীর দিকে এগিয়ে গেলেন যেখানে গভীর গর্ত খুঁড়ে হাতীর জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে। বড় বড় গর্ত খুঁড়ে তার মুখে ডালপালা চাপা দেওয়া হয়েছে; কোথাও কোথাও আবার ডালপালার ওপর বালি চাপা দেওয়া হয়েছে।

তাহির হল বাবরের দেহরক্ষী, বাবরের সঙ্গে থাকার কথা তার সবসময়। ঢাকা দেওয়া গর্তগুলো দেখে ভাবল মনে মনে 'শত্রুসৈন্য যদি এখান দিয়ে সোজাসুজি আমাদের উপর এসে পড়ে তো ভাল হয়। কিন্তু যদি শিবিরের পাশ কাটিয়ে ঘুরে আসে তো...'

কিন্তু সব দিক ভেবে দেখেছেন বাবর। চররা ভাল করে ঘুরে দেখে খবর এনেছে যে ঝোপঝাড় আর জলাভূমি দুদিক থেকে পানি পথকে ঘিরে রেখেছে, সে সব পেরিয়ে আসা সম্ভব নয় বড় সৈন্যদলের পক্ষে। ডানদিকে ভরানদী যমুনা। যে উঁচু জায়গাটার উপর বাবরের সৈন্যদল রয়েছে তার বাঁদিকে—ঘন জনবসতিপূর্ণ পানিপথ শহর, শহরের রাস্তাঘাট অপ্রশস্ত। তাই সোজাসুজি সামনের দিক থেকে হুড়মুড় করে বাবরের ওপর এসে পড়া ছাড়া কোন পথ নেই শত্রুর। শত্রুসৈন্যের সংখ্যা বাবরের সৈন্যসংখ্যার চেয়ে দশগুণ বেশি, গর্তগুলি আর কামানগাড়িগুলি শত্রুর শক্তিকে কতটা দুর্বল করে দিতে পারবে তার ওপরই নির্ভর করছে সব কিছু...

কাবুলে প্রথম তাহিরের মন কেমন করত আন্দিজান আর কুভার জন্য। আর এখন কাবুলের কথা মনে করে খারাপ লাগছে। কাবুলে তার নিজের বাড়ি, সেখানে পনের বছর ধরে আছে তার রোবিয়া, তার ছেলে সফর আর তার মামা মওলানা ফজলুদ্দিন। আগে তাহির যুদ্ধের সময় মৃত্যুর কথা মনেই আনত না। এখন কিন্তু কেবল প্রার্থনা করে সে 'আল্লাহ্ এ যুদ্ধে মরতে দিও না আমাকে। এবার যদি বেঁচে ফিরি তো এ চাকরী ছেড়ে দেব। এ কাজে অনেক উপরে উঠেছি আমি। ঠিকই, কিন্তু বয়সও তো কম হল না—কতদিন বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াব? সফরও বড় হয়ে উঠেছে, এ বছর মাদ্রাসাতে পড়াশোনা শেষ করবে, মুহান্দিস হবে। তার বিয়ে দেওয়া যায় তখন, ঐ যে বলে, পরিবারে মাথা বাড়ান... ছেলের বিয়ে দেখা হবে কি আমার হে আল্লাহ্? রোবিয়াকে দেখতে পাব কি? আমাকে মরতে দিও না, খোদাতাল্লা।'

এইসব চিন্তাভাবনা, ভয়, বিষাদ সব কিছু চাপা দিতে পারে মদ। ভারতবর্ষে আঙুরের মদ কম পাওয়া যায়; বেগরা মহুয়াপাতার রস দিয়ে কাজ চালাত।

লড়াই আরম্ভ হওয়ার একদিন আগে তাহির অনেক মহুয়ার মদ খেয়েছে। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে অত্যন্ত খারাপ লাগছে শরীরটা তার। গা-হাত-পা ব্যথা করছে, মুখের ভিতরটা জ্বলছে, মাথাটা ভারী আর ভোঁভোঁ আওয়াজ উঠছে মাথার ভিতর। চেষ্টা করল আবার ঘুমিয়ে পড়ার, কিন্তু শুয়ে শুয়ে কেবল এপাশ ওপাশ করল। তখন উঠে কলসীতে অবশিষ্ট তিনচার ঢোঁক মহুয়ার রস আবার ঢেলে দিল গলায়।

এমন সময় ঢাকঢোল শিঙা বেজে উঠল। 'সারি বাঁধ, সারি বেঁধে দাঁড়াও!—চীৎকার-আদেশ শোনা গেল। গুপ্তচররা খবর নিয়ে এসেছে যে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যদল দ্রুত এগিয়ে আসছে।

নেশার ঘোরে জামাজুতো পরে নিতে অনেক সময় লাগল তাহিরের। কানকাটা মামাত এখন তাহিরের ঘোড়ার দেখা শোনা করে; পুরনো বন্ধুত্বের অধিকারে আর তাহিরের চেয়ে বয়সে বড় বলে সে প্রায়ই নানা মন্তব্য করে, এই যেমন আজ বলল:

'আরে বেগ, সাতসকালেই গলায় মদ ঢালার দরকার কি?'

'মুখ বন্ধ কর! বাদামী ঘোড়াটা নিয়ে আয় বরং... তাড়াতাড়ি কর রে, হাড় ডিগডিগে কঙ্কাল!'

এই অভিযানে মামাত সত্যিই ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। 'ঘোড়া নিয়ে ছুটোছুটি করা সহজ হবে', মনে মনে বলল তাহির।

রাতের বেলায় জিন লাগাম পরিয়েই রাখা হয় ঘোড়াগুলোকে খালি জিনটা ঢিলে দিয়ে রাখা হয়। রাতের বেলায় ঘোড়াটার বাঁধন খুলে গিয়েছিল, সেটাকে খুঁজে পেতে খানিক সময় লাগল মামাতের, তারপর তাড়াহুড়ো করে তাহিরের কাছে নিয়ে যেতে গিয়ে জিনটা ভাল করে বেঁধে দিতে ভুলে গেল। তাহিরও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—শীঘ্র বাবরের কাছে উপস্থিত হওয়া দরকার, রেকাবের দিকে না তাকিয়েই এক লাফে ঘোড়ায় উঠে বসল। জিনটা নড়তে লাগল তার দেহের নিচে, সে যদি নেশার ঘোরে না থাকত তো বুঝতে পারত যে জিনটা ভাল করে বাঁধা নেই, কিন্তু এখন সে ভাবল নেশার ঘোরে তার অমনি মনে হয়েছে। রেকাবে পা আটকে সে হঠাৎ মুখ ঘোরাল ঘোড়ার, ঘোড়াটাও রাতের বেলায় যথেষ্ট খেয়ে শক্তিসঞ্চয় করেছে—পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠল, জিনটা ঘুরে তার পেটের কাছে চলে গেল আর তাহির মাটিতে পড়ে গেল।

ছুটে এল মামাত, একহাতে লাগাম ধরে অন্য হাতে তাহিরকে উঠতে সাহায্য করতে লাগল। হেসে বলল:

'আরে তাহিরজান, বেগ হওয়ার পর থেকেই আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে সকাল বেলায়ই গলায় ঢালা। ঠিকই বলেছিলাম আমি যে অত খেও না ওই জিনিসটা!'

নরম মাটির ওপর পড়েছে তাহির ব্যথা লাগেনি। কিন্তু বড় যুদ্ধের আগে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া—অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। বিরক্তিতে গালিগালাজ করে উঠল। না বাঁধা জিনটা দেখাল মামাতকে।

হাসতে হাসতে মামাত কপালে আঘাত করে বলল:

'আরে ভুলে গেছি তাড়াহুড়োতে, গাড়োল আমি একটা!'

মহুয়ার রস মাথার ভিতরটা গুলিয়ে দিয়েছে কেমন। তার ঘোড়ার তদারককারীর হাসিতে অপমানবোধ হচ্ছে তার, যেন মনে হচ্ছে মামাত ইচ্ছে করেই এটা করেছে

যাতে সে পড়ে যায়, যাতে বেগকে নিয়ে একটু হাসাহাসি করা যায়। তাহির যদি আগের মত সাধারণ সৈন্য থাকত তাহলে হয়ত সেও এই ঘটনা নিয়ে হাসত। কিন্তু এখন সে তো বেগ, বেগ!

'তুই ইচ্ছে করেই এমনি করেছিস, কেমন?! হিংসা হচ্ছে, আমি বেগ হয়েছি বলে! আমার মরণ চেয়েছিলি, না?'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে চোখে না দেখে হাতড়ে হাতড়ে কোমরের কাছে খুঁজতে লাগল চাবুকটা। মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে চাবুকটা। সামান্য কারণেই সৈন্যকে বকামারা তখন ছিল সাধারণ ব্যাপার। বেগ তাহিরও তার ব্যতিক্রম নয়। তবু বহুদিনের পুরান বন্ধু মামাতকে সে কখনও আঘাত করেনি।

মামাত নিচু হয়ে চাবুকটা তুলে নিয়ে তাহিরকে দিয়ে বলল:

'আমার দোষ হয়ে থাকলে মারুন আমাকে, কিন্তু এমন কথা বলবেন না! এমন মূর্খ নই যে আপনার মৃত্যু চাইব!'

আবার তাহিরের মনে হল মামাত তাকে ব্যঙ্গ করছে, দেখাতে চাচ্ছে সে নিজে বেগের চেয়ে বেশি মহৎ, সৎ।

'যুদ্ধের আগে আমাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলি, আবার বলছিস আমার মরণ চাচ্ছিস না?!' চীৎকার করে বলল তাহির আর একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিল মামাতের মাথায়।

ঘুঁষির ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মামাত। কেমন মট করে উঠল তাহিরের বুড়ো আঙুলটা, প্রচণ্ড ব্যথা করে উঠল ডানহাতটা—তার মনে হল যে ব্যথাটা আঘাত করল একেবারে মাথায় গিয়ে। 'আঙুলটা ভেঙে দিল, আঙুলটা ভেঙে দিল! তরবারিটা কেমন করে ধরব এখন, উঃ উঃ, সবকিছু ওর জন্য... ওই ওটার জন্য...' বাঁহাত দিয়ে আর একবার আঘাত করে উঠতে চেষ্টা করতে থাকা মামাতকে আবার মাটিতে ফেলে দিল তাহির।

একজন বড়সড় চেহারার সৈন্য মামাতের পক্ষ নিতে এগিয়ে এল। বলল:

'এমন করবেন না, বেগ, মাফ করে দিন ওকে এবারের মত! মামাত আপনার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত! জিনটা এখনি বেঁধে দেব আমি... একটুখানি অপেক্ষা করুন... ব্যাস তৈরি। বসুন বেগ!...'

ঘোড়া চালিয়ে যেতে যেতে কেবল দেখছে তাহির আঙুলটাকে, ফুলে গেছে, একটু নড়ালেই অসম্ভব ব্যথা করছে।

'সব শেষ, আর সাফল্যের মুখ দেখতে হবে না আমাকে।' বাবরের লোকজন যেখানে সমবেত হয়েছে সেদিকে যেতে যেতে ভাবল তাহির।

তাহিরবেগের পিছন পিছন চলছে কুড়িজন সৈন্য, তাদের মধ্যে রয়েছে মামাতও, মুখ তার কাগজের মত সাদা: বেগ যতই বকুক, মারুক সে তার অধীন দাস, বেগের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেই হবে তাকে।

যমুনার বামতীরের থেকে সূর্য উঠে, ইতিমধ্যে মধ্যগগনের দিকে রওনা দিয়েছে, সেই সূর্যের আলোয় দেখা যাচ্ছে দিল্লির সুলতানের অগণন সৈন্যবাহিনীকে। মনে হচ্ছে, সমান, ঘনঘন করে সাজান সৈন্যদের সারিগুলি গোটা দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছে; কেবল সৈন্যদের সারিগুলির মাঝে মাঝে দেখা যায় যোদ্ধা হাতীগুলোকে—যে টিলার ওপর বাবর তাঁর দলবল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে হাতীগুলির বিশালত্ব বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তাদের সংখ্যা বুকে কাঁপন ধরাতে পারে। ওখানেই কোন হাতীর ওপর বসে আছেন ইব্রাহিম লোদী, সেই বিরাট জন্তুর পিঠ থেকে সে গোটা রণক্ষেত্রটা দেখতে পায়।

এগিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর শত্রু। বাবর কিন্তু ধীরস্থির। গাড়ি আর ঢালগুলি পরস্পরের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। সৈন্যদলের ডানদিকের দায়িত্ব ছেলে হুমায়ুনের ওপর, বুদ্ধিমান, নির্ভীক সে; তার সঙ্গে আছে খাজা কালোনবেগ, হিন্দুবেগ ও অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য ও অভিজ্ঞ সেনানায়করা। সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে আছে গোলন্দাজবাহিনী, বন্দুকধারী ও পদাতিক সৈন্যরা। দুই প্রান্তে আছে অশ্বারোহী সৈন্যরা, শত্রুদের ঘিরে ফেলে ঝটিকা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। সুলতান ইব্রাহিমের আছে অনেক পদাতিক সৈন্য, বড় বেশি তাদের সংখ্যা। ঘন ঘন সারি বেঁধে তারা এগোয়, সে কারণেই হঠাৎ গতিমুখ বদল করা সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। শত্রুকে ঘিরে ফেলার রণপদ্ধতি এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী—যা এককালে শয়বানীর শক্তিশালী অস্ত্র ছিল। এখন সে পদ্ধতিই কাজে লাগাতে চাচ্ছেন বাবর। তাঁর সৈন্যদলের দুই প্রান্তে আছে তাঁর দলের সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াগুলি।

বাবরের খানিক পিছনে শাহ্‌র দেহরক্ষী ও অন্য লোকজনদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে তাহির। শাহ্‌র থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই সব বেগরা যারা সৈন্যদলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য দূতের কাজ করে। বাবর আদেশ দিচ্ছেন সুনিশ্চিত ও দৃঢ়স্বরে। 'এঁর সঙ্গে কত যুদ্ধে লড়েছি আমরা, বারবার বেঁচে ফিরে এসেছি, নিজেকে আশ্বাস দিল তাহির। 'যদি এবার বাবর জীবিত থাকেন তো আমিও বেঁচে থাকব।'

এগিয়ে আসা কালোমেঘের বিরুদ্ধে কিছু না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর ব্যাপার। অনেক বেগই উৎকণ্ঠিত; বাবর ধীর সংযত কণ্ঠে মাঝে মাঝে বলছেন:

'ধৈর্য ধর... অপেক্ষা কর... এগিও না...'

ইব্রাহিম লোদী দেখল যে গাড়ির সারি আর অন্যান্য প্রতিরক্ষাব্যূহের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন বাবর, এগোচ্ছেন না। নিজের সৈন্যদের থামাল ইব্রাহিমও। নিজের সেনাপতিদের পরামর্শে নতুন করে সাজান শুরু করল সৈন্যরা সারিগুলিকে যাতে মধ্যস্থলে প্রধান আঘাত না হেনে ডানদিকে হানা যায়, ডানদিকটা দুর্বল হয়ে পড়লে তখন শহরের দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাবে টিলাটাকে।

কিন্তু যতক্ষণে এক লক্ষ সৈন্যর মধ্যে আদেশ পৌঁছল, যতক্ষণে বাছাই করা

সৈন্যদের নিয়ে একটা ছোট্ট শক্তিশালী দল তৈরি করা হল বাবরের বাহিনীর ডানদিক আক্রমণ করার জন্য আর অন্যরা ডানদিকে শহরের দিকে ঘুরল—ততক্ষণে অনেকটা সময় কেটে গেছে।

এবার বাবরও তাঁর চাল চাললেন। দু'হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ঝড়ের বেগে ছুটল ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যদলের বাঁদিকের অংশটা পেরিয়ে, বাছাই করা ছোট দলটা, হাতী, পদাতিক বাহিনী যারা মাঝখান থেকে বাঁদিকে এগোচ্ছিল, তাদের পেরিয়ে—সৈন্যদলের পিছন দিকে। ও দিকে হুমায়ুনের অশ্বারোহী বাহিনী ডানদিক থেকে এগিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল—লোদীর বাহিনীর পুনর্বিন্যাসে বাধা সৃষ্টি করার জন্য। এমন সময় ঠেলাগাড়ীগুলির মাঝে মাঝে দাঁড় করান কামানগুলি গর্জন করে উঠল—গাড়ীগুলি অবশ্য তখনও দাঁড়িয়েই রইল।

সারাজীবনের জয় আর তিক্ত পরাজয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালেন বাবর পানিপথের যুদ্ধে। এ পর্য্যন্ত বাবরের উদ্দেশ্য কেবল শত্রুসৈন্যকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরা, সে অবরোধ হয়ত বিশেষ জোরদার হবে না, কিন্তু তাদের দুই প্রান্তের সারিগুলি ভিতরদিকে ঘুরে যাবে, সব মিলিয়ে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হবে। পরিবেষ্টনকারীদের চেয়ে পরিবেষ্টিতের সংখ্যা অনেক বেশি, ঘোড়া দ্রুতগতি হলেও হাতীর মত শক্তি তাদের নেই, ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যরা একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে পরিবেষ্টন ভেদ করে যাচ্ছিল। বাবর অবশ্যই সাহায্য পাঠাচ্ছিলেন মধ্যভাগ থেকে যেখানে যেখানে তাঁর অশ্বারোহীদের সাহায্য পাঠান প্রয়োজন। এভাবে তিনি পরিকল্পনা মতই শত্রুসৈন্যের ওপর ঠেলাগাড়ির সারি যাতে হুড়মুড় করে নেমে যেতে পারে তার জন্য পথ পরিষ্কার করছিলেন। শেষে, ইব্রাহিম পাশ থেকে আর পিছন থেকে অনবরত আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে তার প্রধান শক্তি, হস্তীবাহিনীর বড় একটা অংশকে এগোল ঐ দিকে ঢাল বেয়ে যাতে শত্রুব্যূহ ভেদ করে জয়লাভ করতে পারে। আর তখনই বাবর আদেশ দিলেন ঠেলাগাড়িগুলির চাকার নিচের গোঁজ সরিয়ে নিতে।

একসঙ্গে সাতশ' গাড়ি গড়িয়ে নেমে চলল শত্রু বাহিনীর দিকে। সুলতানের হাতী ও পদাতিকবাহিনীর ওপর গুলিগোলা এসে পড়তে লাগল খুব কাছে থেকেই। গোলাগুলির আওয়াজে কানে তালা ধরছে, ঘন ধোঁয়ায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না, জ্বলন্ত গোলাগুলি ঢালবর্ম ভেদ করে যাচ্ছে, আর কি অদ্ভুত সারিবেঁধে নেমে আসছে গাড়িগুলি, ক্রমশ গতিবৃদ্ধি হচ্ছে তাদের, মনে হচ্ছে যেন কোন ভয়ঙ্কর জন্তু যা ইব্রাহিমের সৈন্যদের ভেঙে, তছনছ করে, তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করল। এমন কিছু ছিল তাদের আশার বাইরে। আহত, আতঙ্কিত হাতীগুলি দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দিল, জোরে ডাক ছাড়তে লাগল, যেন তাদের খাঁচায় বন্দী করা হয়েছে; হাতীগুলোকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করে কিছু লোক বিশৃঙ্খলা আরো বাড়িয়ে দিল,

প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি, চাপাচাপিতে ঘোড়াগুলি, লোকজন মাটিতে পড়ে দমবন্ধ হয়ে মরতে লাগল।

কামান আর বন্দুক অবিরাম ভয়ঙ্কর গোলাগুলি বর্ষণ করেই চলল। পাহাড়ের ঢালে ইতোমধ্যেই জমে উঠেছে মৃত ও গুরুতর আহত হাতীর দেহ—আর তার সঙ্গে আছে অসংখ্য সৈন্যের পিষ্ট পদদলিত দেহ। ওদিকে নীচের থেকে উঠে আসছে পদাতিকবাহিনী আর অশ্বারোহী বাহিনী, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত এগিয়ে আসছে বিশাল সৈন্যদল, থামবার মত অবস্থা নেই তাদের, আর নতুন করে বেড়ে উঠছে মৃত আর আহতের সংখ্যা।

শেষে ইব্রাহিম লোদীর বাহিনী পিছন ফিরল—আরম্ভ হল পলায়ন, অস্ত্র ফেলে দিয়ে, পড়ে যাওয়া লোকদের পিষে দিয়ে পালাতে লাগল তারা। শত্রুসৈন্যদলের পিছনে বাবরের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। পলায়নকারী সৈন্যের এই স্রোত আটকাবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। হস্তীবাহিনী সহজেই ভেদ করে গেল তাদের ব্যূহ আর তার পিছনে পিছনে ছুটে চলল বিশাল পদাতিক বাহিনীও।

বাবর টিলার ওপর থেকে এ সবকিছু দেখতে পেলেন।

'শত্রু পালিয়ে গিয়ে দিল্লি দুর্গে আশ্রয় নিতে পারে', চীৎকার করে বললেন তিনি খবরাখবর প্রেরণের জন্য নিযুক্ত বেগদের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাদেরকে একের পর এক পাঠান হয়েছে ঐখানে যেখানে যুদ্ধ চলছে, ওখান থেকে তারা ফেরেনি এখনও। বেঁচে আছে কিনা তারা কে জানে—লড়াই চলেছে মরণপণ। নিজের রক্ষীদের দিকে ঘোড়ার মুখ ফেরালেন বাবর।

'তাহিরবেগ, আমার জানা দরকার ইব্রাহিম লোদী নিজেও পালিয়েছে নাকি রণক্ষেত্রে আছে এখনও সে। যদি সে পালিয়ে থাকে তাহলে অতিরিক্তবাহিনী থেকে সৈন্য পাঠাও তাকে ধরার জন্য।'

তাহিরের চোখের সামনে এক মুহূর্তেই ভেসে উঠল রণক্ষেত্রের ছবি—ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘ: কেমন এক ভয়ের কাঁপন ধরল তার সারা দেহে যা আগে কখনও অনুভব করেনি, সে ভয়ের ভাবটাকে লুকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু গলাটা কেঁপে গেল:

'যো হুকুম, জাঁহাপনা!'

সেই মুহূর্তে এক দূত এসে পৌছাল। তার আহত পায়ের থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে রেকাব বেয়ে: ঘোড়া থেকে না নেমেই সে উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠল:

'জয় হয়েছে আমাদের, জাঁহাপনা! শত্রুরা পালাচ্ছে!'

'ইব্রাহিমও পালাচ্ছে?'

'হ্যাঁ পালিয়ে যেতে থাকা হাতীদের মধ্যে তার হাতীটাও দেখেছি। পালাচ্ছিল ইব্রাহিম!'

'দাঁড়ান তাহিরবেগ! কাসিমতাই-মির্জা।'

বড়সড় মজবুত চেহারার এক বেগ এসে দাঁড়াল সামনে, বছর চল্লিশবছর বয়স তার। তুর্কীস্তানে বেগের জন্ম আর ছেলেবেলাও কাটে সেখানে, আমীর তৈমুরের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়। পনের বছর হল বাবরের কাছে কাজ করছে সে।

'যদি ইব্রাহিম দিল্লি বা আগ্রা যে কোন দুর্গেই আশ্রয় নিতে পারে তো যুদ্ধ আবার অবশ্যম্ভাবী,' কাসিমতাইকে বললেন বাবর। 'কিন্তু আমরা বিনাযুদ্ধে দিল্লি ও আগ্রা দখল করতে চাই... কাসিমতাই মির্জা আপনাকে দেওয়া হবে অতিরিক্ত বাহিনী থেকে একহাজার সৈন্য... আরও সঙ্গে নিন বোবা চুখরা আর তার সৈন্যদের... তাহিরবেগের দল... ইব্রাহিমকে ধাওয়া করুন! দিল্লি পর্যন্ত, আর যদি সে আগ্রায় যায় তো আগ্রা পর্যন্ত ধাওয়া করুন।'

'জীবনপণ করে পালন করব আপনার আদেশ।'

'আপনি আমার আশাভরসা! আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন! শত্রু ধ্বংস করুন আর অক্ষত থাকুন!'

'আমিন!'

বিজয় আনয়নকারী যুদ্ধে প্রথম সারিতে থাকা সম্মানের ব্যাপার! আঙুলের ব্যথার কথা ভুলে গেল তাহির। নিজের দলকে নিয়ে সে কাসিমতাইয়ের বাহিনীর প্রথম সারিতে গিয়ে দাঁড়াল।

সূর্য মাথার ওপর জ্বলছে। অসহ্য গরমে কষ্ট হচ্ছে পলায়নকারী ও অনুধাবনকারী দুপক্ষেরই। পলায়নরত শত্রুবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লেও যথেষ্ট শক্তিমান তখনও।

কোথায় ইব্রাহিমের হাতী? নাকি সে হাতী ফেলে ঘোড়ায় চড়ে বসেছে?

কাসিমতাই আর তাহির দুপাশ থেকে ঘিরে ফেলল ভেঙে পড়া, বিশৃঙ্খল ভিড়ে পরিণত হওয়া শত্রু বাহিনীকে, কিছু মাহুতকে বন্দী করল। বাবরের দলে ছিল একজন ভারতীয়, তার মাধ্যমে কাসিমতাই বন্দীদের বলল: 'ওদের বল: যে দলে ইব্রাহিম লোদী ছিল সে দলটা কোথায় যদি দেখিয়ে দেয় তো ছেড়ে দেব ওদের।'

বন্দীদের একজন ক্ষিপ্ত, উত্তেজিতভাবে বলল কি যেন।

'ও বলছে যে ইব্রাহিমের হাতী যুদ্ধ চলার সময়েই মরে যায়, সুলতানও মরেছে,' অনুবাদক বুঝিয়ে দিল।

কিন্তু একথা বিশ্বাস করল না কাসিমতাই। কঠোর স্বরে বলল: 'আমাদের লোকেরা দেখেছে ইব্রাহিম পালাচ্ছে। বল যে সত্যি কথা বলুক নাহলে মাথা কাটা পড়বে!'

কিন্তু বন্দী একই কথা বলতে লাগল: ইব্রাহিম যুদ্ধে মারা পড়েছে। অন্য একজন বন্দী বলল বিশৃঙ্খল হয়ে পড়া সৈন্যদলের যে অংশটা নদীর তীর ধরে পালাচ্ছে তাদের মধ্যে থাকতে পারে ইব্রাহিম। আর একজন দেখাল জামনাকে দিয়ে পালান লোকদের দিকে।

এই বন্দী লোকগুলিকে তাদের হাতীসমেত বাবরের কাছে পাঠিয়ে দিল কাসিমতাই।

আর নিজে ঘোড়া ছোটাল নদীর তীর ধরে পালাতে থাকা শত্রুদের উদ্দেশ্যে। তাদের কাছে পৌঁছে কাসিমতাই দেখল যে তাদের মধ্যে মোটামুটি শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে, দু'পাশে চলেছে অশ্বারোহী আর হস্তীবাহিনী। এ হল রাজপুতদেরবাহিনী: যথার্থ কারণেই এদের বীর ও দক্ষ যোদ্ধা বলে বিবেচনা করা হয়। কাসিমতাই নদীর ধার বরাবর এগিয়ে গেল তাদের পাশ কাটিয়ে আর বোবোচুখরা আর তাহির গেল ডানদিক দিয়ে। রাজপুতরা দেখল যে অনুধাবনকারীদের সংখ্যা বেশি নয়, তীর ধনুক, তরবারি তুলে নিয়ে তারা আবার লড়াই আরম্ভ করল।

ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতেই তাহির ধনুক তুলে নিয়ে তীর বসিয়ে গুণটানার সময় অনুভব করল যে বুড়ো আঙুলটা নড়ান যাচ্ছে না। অনামিকা আর কড়ে আঙুল দিয়ে ধনুকের গুণ আর তীরের পালকটা ধরে টান দিল লক্ষ্যভেদ করল তীরটি: ময়লারংয়ের যে সৈন্যটি খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছিল সে ঘোড়ার উপর পড়ল মুখ গুঁজড়ে। কিন্তু আর একবার তীর ছোঁড়বার সময় পেল না তাহির: দ্রুত এগিয়ে আসছে রাজপুতরা। তাদের মধ্যে আছে বিশাল দেহী একজন, তার হাতে গদা উঁচু করে ধরা। খাপ থেকে তরোয়াল তুলে নিল তাহির শত্রুর হাতে আঘাত করার জন্য। শত্রু সে আঘাত এড়াতে পারল, গদায় গিয়ে লাগল তরোয়ালটা—তাহিরের আঙুল, তার সারা দেহ ব্যথায় টনটন করে উঠল! তাহির বুঝতেও পারল না যে তরোয়ালটা পড়ে গেছে তার হাত থেকে। রাজপুতের পাশ কাটিয়ে সরে গিয়ে কোমর থেকে ছোরাটা তুলে নেবে ভাবল, তাহির, কিন্তু গদাটা ততক্ষণে নেমে এসেছে তার ওপর! কাঁধ থেকে গলার কাছে, থুতনির কাছে প্রচণ্ড যন্ত্রণা বোধ হল, আগের ব্যথার যন্ত্রণা উপে গেল এই নতুন আঘাতে, চোখে অন্ধকার দেখল তাহির। সেও মুখ গুঁজড়ে পড়ল ঘোড়ার উপর... আবার একটা প্রচণ্ড আঘাত... বর্ম, বর্মটা বাঁচাল তাকে! তাহির ভাবল 'যতক্ষণে না পড়ে যাব, ছাড়বে না আমাকে!' কেন কে জানে প্রার্থনা করল 'জ্ঞান হারাই যেন এখুনি!'

তৃতীয়, চরম আঘাতের হাত থেকে তাকে বাঁচাল মামাত। কুঠারের এক আঘাতে ফেলে দিল সে রাজপুতকে। ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে থাকা তাহিরকে তুলে নিয়ে সে রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেল।

৩

হুমায়ুন প্রথম দিল্লি প্রবেশ করলেন; বিনাযুদ্ধে দখল করলেন লাল দেওয়ালঘেরা বিরাট দুর্গটি; ইব্রাহিম লোদীর কোষাগার খোলেন। তারপর তিনশত সৈন্য নিয়ে শহরে কি আছে দেখতে বেরোলেন।

সীমাহীন, বিশাল দেশ, বিশাল প্রান্তহীন শহর!

ছোট ছোট পাহাড় আছে দিল্লিতে, কিন্তু প্রধানত সবুজ সমতলভূমিতেই অবস্থিত। শহরটি। শহরে বাড়ি অসংখ্য, কিন্তু রাস্তাঘাটে লোকজন নেই: বিদেশী সৈন্যদের ভয়ে শহরবাসীরা দরজাবন্ধ করে বসে আছে যে যার বাড়িতে, দরজাজানলার ফাঁক ফোকর দিয়ে দেখছে কেবল।

হিন্দুদের কাছে পবিত্র যমুনা নদীর তীরে একদন লোক শবদেহের সৎকার করছে। কাঠ সাজিয়ে তার ওপর শুইয়ে দেওয়া হয় মৃতদেহকে, সুগন্ধি ঘি ঢালা হয়, দাহ করা হয় দেহটি আর ভস্ম নিক্ষেপ করা হয় নদীতে। নদী ভস্ম বয়ে নিয়ে যায় অমরত্বে... সৎকারকাজে নিযুক্ত লোকগুলি যেন পরপারের চিন্তায় মগ্ন, ইহজগতের দিকে, এমন কি যে বিদেশী সৈন্যরা তাদের শহর দখল করে নিয়েছে তাদের দিকেও মন দেবার প্রয়োজন নেই তাদের।

বাজারগুলিতে, খোলা দোকানপাটের আশেপাশে হুমায়ুন দেখতে পেলেন বাচ্চা, ছেলেরা আর মহিলারা ঘোরাফেরা করছে তাদের খালিপা, হাতে আর গলায় ঝুলছে ফুলের মালা। শ্বেত বৃদ্ধদের ও দেখতে পেলেন তিনি। তাদের হাতে ও ঝুলছে হলুদ-লাল ফুলের মালা। খালিপায়ে আর ফুলের মালা পরা। কেমন যেন অদ্ভুত।

'এ হল চাঁদনী চকের বাজার,' বলল হুমায়ুনের পাশে পাশে চলতে থাকা হিন্দুবেগ।

'আজ কোন ধর্মীয় উৎসব আছে নাকি? এত ফুল কি জন্য?' জিজ্ঞাসা করলেন হুমায়ুন।

''হ্যাঁ, আজ উৎসবের দিন। বসন্তকালীন বীজবপনের উৎসব। ভগবানের কাছে সবাই প্রার্থনা করে যেন ভাল ফসল হয়। এদেশে অনেক ধর্মীয় উৎসব প্রতিমাসেই উৎসব।'

'অদ্ভুত দেশ!' কাঁধ ঝাঁকালেন হুমায়ুন।

একটা পুরান প্রাসাদের ছাদে আর দেওয়ালে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিল ধূসরছাই রংয়ের বানরের পাল, তাদের হাত আর মুখের রং কালো আর পেটের কাছে লোমগুলি হলুদ। তাদের বাচ্চাকাচ্চাগুলি অদ্ভুত দ্রুতগতিতে ছাত থেকে লাফিয়ে যাচ্ছিল বট আর খেজুর গাছের ডালগুলিতে। একে অপরকে ধাওয়া করার সময় কখনও কখনও তারা মাটিতেও নেমে আসছিল। প্রাসাদের চারপাশে আর ভিতরেও লোকজন চলাফেরা করছে, কিন্তু তাদের কেউই বানরদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

হুমায়ুনের দলের একজন বেগের চোখ জ্বলে উঠল শিকারের লালসায়। ধুনক হাতে তুলে নিল সে।

'বানর মারা পাপ বলে মনে করে লোকে বানর মারলে মানুষের জীবনে বিপদ আসে।' অবিচলিত কণ্ঠস্বর হিন্দুবেগের।

হুমায়ুনের ডানপাশে চলতে থাকা খাজা কালোনবেগ মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল:

'গোরুও আমাদের মারা বারণ, তাই নয় কি, মহামান্য হিন্দুবেগ?'

'গোরু হিন্দুদের কাছে পবিত্র জীব', উত্তর দিল হিন্দুবেগ গোরুর পঞ্চামৃত লাগে শিবের সেবায়।'

হুমায়ুন সবাইকে শান্ত করার জন্য বললেন:

'মনে রাখতে হবে যে শাহ্ আদেশ দিয়েছেন ভারতীয় রীতিনীতিকে সম্মান প্রদর্শন করতে আর ভারতীয় জনগণের সম্মান বা মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার মত কোন আচরণ না করতে।'

খাজা কালোনবেগ বুকের ওপর হাত রেখে বলল:

'শাহজাদা, শাহ্র আদেশ হল আমাদের সবার কাছে আইন। আমি মহামান্য হিন্দুবেগের উদ্দেশ্যে কেবল একটু ঠাট্টা করতে চেয়েছিলাম।'

গাছপালার ফাঁক দিয়ে সামনে দেখা গেল এক প্রস্তরস্তম্ভ।

'কুতব মিনার,' সসম্মানে উচ্চারণ করল হিন্দুবেগ।

মিনারের কাছে এগিয়ে গেল সবাই। ঘোড়া থেকে নেমে হুমায়ুন বেগদের নিয়ে মিনারের উপরে উঠলেন। মিনারের উপর থেকে পরিষ্কার দেখা গেল সামান্য দূরে কালো একটা স্তম্ভের চারপাশে লোকে ভীড় করেছে।

'ওটা কি?'

'ওই স্তম্ভটা একটা গোটা লোহার টুকরো থেকে তৈরি। ঐতিহাসিকরা বলেন ওটি ছশো' বছরের পুরানো। যে ঐ স্তম্ভটি জড়িয়ে ধরে দুহাত মিলাতে পারবে তার অন্তরের স্বপ্ন সফল হবে।'

এতক্ষণ হুমায়ুন বেগদের মধ্যে নিজের মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু একথা শোনার পর আর তাঁর তরুণ বয়সের উপযুক্ত কৌতুহল দমন করতে পারলেন না।

'দেখা যাক্ তো!' বলে মিনারের ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে ছুটে চললেন নিচে।

স্তম্ভের কাছে লোকরা সরে গিয়ে পথ করে দিল হুমায়ুনের জন্য। 'হিন্দুবেগ দেখিয়ে দিন কেমন করে ধরতে হবে স্তম্ভটিকে।'

স্তম্ভটির উপর ও নিচের অংশগুলি কালো আর মাঝখানটা লোকের হাত আর পিঠ অনবরত ছোঁয়ার ফলে চকচক করছে।

হিন্দুবেগ স্তম্ভের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে পিছন দিকে হাত দুটিকে ঘোরাল। স্তম্ভকে বেড় দিয়ে দুহাতের আঙুলগুলি পরস্পরের সঙ্গে ছোঁয়াবার চেষ্টা যতই করুক না কেন কিছুতেই পারল না। নাঃ ছোঁয়ান যাচ্ছে না।

হেসে উঠল বেগরা।

হুমায়ুনও হেসে উঠলেন হিন্দুবেগ যা পারল না তিনি নিজে তা চেষ্টা করে দেখলেন। কিন্তু তিনিও পারলেন না। বেগরা আর তাদের সৈন্যরাও চেষ্টা করতে

লাগল। সবাই ব্যর্থ হল। শেষে সমরখন্দের একজন লোক—রোগা টিঙটিঙে চেহারা, লম্বা লম্বা হাত—পারল স্তম্ভটিকে বেড় দিয়ে ধরতে।

তার জন্য হুমায়ুনের কাছে এক মুঠো রূপোর মোহর পেল সে।

বিজেতাদের দলে এমন কিছু লোকও ছিল যারা দিল্লির রাস্তায় ঘুরছিল কিছু লাভের আশায়। যেমন ইয়ার হুসেন, একসময়ের লুঠেরা দস্যু খাইবার গিরিপথের দক্ষিণে সে পথিকদের লুঠ করত, তারপর তাকে মাফ করা হয়, এখন সে ঘুমিয়ে এমনি বড় কিছু লাভের স্বপ্নই দেখে। বহুবার শুনেছে সে হিন্দু মন্দিরগুলির ধনসম্পদের কথা, সেজন্য সে তার দলের সৈন্যদের নিয়ে গিয়ে ঢুকল দিল্লিশহরের প্রান্তে একটি মন্দিরে।

আরে সেখানে কত যে সম্পদ! কত দামী পাথর যে আছে সেখানে গোনা যায় না!

মন্দিরের হলুদ রংয়ের পাথর বাঁধানো দেওয়ালে মানুষের ছায়া নড়াচড়া করছে। বৃদ্ধ পুরোহিত কপালে দুহাত ঠেকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন শিবলিঙ্গের কাছে, চোখে তাঁর জলের রেখা। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা, বালক বালিকা যারা মন্দিরে এসেছিল পূজা দিতে তারাও মাথা নিচু করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দূর করে দাও এই কাফেরগুলিকে! মন্দিরে উপস্থিত লোকদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে দিতে ভিতরে ঢুকল ইয়ার হুসেনের লোকরা। তারপর কোথা থেকে একটা মই টেনে নিয়ে এল তারা—শিবের কপালের বিরাট চুনীপাথরটার দিকে লক্ষ্য তাদের।

ঠিক সেই সময়েই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন হুমায়ুন।

'শাহ্ বাবরের নামে আদেশ দিচ্ছি!' ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন তিনি। 'ছুঁয়ো না কেউ চুনীটা! নাম নীচে এখনি!'

মন্দিরের ভিতরের আধা অন্ধকারে হুমায়ুনকে চিনতে পারল না ইয়ার হুসেন।

'কে ওখানে চেঁচাচ্ছে? কাফেরদের পুতুলটা জন্য এত মায়া তোর?!' তারপর মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অনুচরটিকে বলল 'ছোঁরা দিয়ে খুঁড়ে নে ওটাকে!'

অনুচরটি তাই করতে গিয়েছিল, কিন্তু সে মুহূর্তে হুমায়ুনের ছোঁড়া তীর তার হাতের কব্জিতে গিয়ে বিঁধল। ছোরাটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। আর লোকটি হাত চেপে ধরে চীৎকার করতে লাগল যন্ত্রনায়, মইয়ের উপর টলমল করে উঠল সে।

খাপ থেকে তলোয়ার তুলে নিল ইযার হুসেন।

'আরে কে রে তুই?' ছুটে গেল সে হুমায়ুনের দিকে।

তখন হিন্দুবেগ তরোয়াল তুলে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

'এই বেগ সাবধান... ইয়ার হুসেন বেগ তোমার সামনে শাহজাদা হুমায়ুন।'

ইয়ার হুসেন বেগ প্রথমে চিনতে পারেনি হুমায়ুনকে তারপর যখন ভালো করে

দেখল, তখন লক্ষ্য পড়ল তাঁর চাপানটার গলার কাছে মুক্তাবসান, যেটা আগে বাবর পরতেন। পানিপথের যুদ্ধেরও আগে হুমায়ুন ইব্রাহিম হামিদ খানের বিরুদ্ধে জয় লাভ করে। তখন ছেলের শৌর্য ও সৈন্য পরিচালনের ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে এই চমৎকার চাপানটি উপহার দেন ছেলেকে। আর সব বেগের মত ইয়ার হুসেনও সেই ঘটনার সাক্ষী। এখন হুমায়ুনের পরনে সেই চাপানটি, সামান্য বড় তার গায়ে সেটি এখনও, ঝুলে আছে কাঁধের কাছে।

'শাহ্জাদা, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি, মাফ করবেন,' বলে ইয়ার হুসেন তরোয়াল হাতে নিয়ে পিছিয়ে গেল।

'তরোয়ালটা দিন!' হুমায়ুন আদেশ দিলেন।

'শাহ্জাদা, অন্যান্য বেগদের মত আমিও আপনার পিতার অনুগত ভৃত্য!'

'পবিত্র মন্দিরে খুলে ধরা তরোয়াল কলঙ্কের দাগ লেগেছে। ওটি আমি শাহ্র হাতে তুলে দেব... আর আপনাকে বলি... আপনি লুঠকরা বন্ধ করেছিলেন মাত্র কয়েকদিনের জন্য। আপনি কি শোনেননি শাহ্র কঠোর আদেশ ভারতবর্ষে বিশেষ করে হিন্দুদের পবিত্র মন্দিরগুলিতে এমন কোন কাজ না করতে? কেন আপনি এমন লোভ করলেন, বেগ? আমাদের সব সৈন্যরাই পরাজিত শত্রু ইব্রাহিম লোদীর কোষাগারের ধনসম্পদের ভাগ পাবে।'

'এই যে লোকেরা,' হাত দিয়ে দেখালেন হুমায়ুন, 'এরা আমাদের শত্রু নয়। ওরা ওদের নিজেদের দেবতার কাছে প্রার্থনা করছিল। আমরা ওদের উপর আইন প্রয়োগ করতে চাই আর আপনি লুঠপাট করছেন ওদের উপর। এমনকি ইব্রাহিম লোদীর লোকেরাও এদের দেবতার কপালের ঐ পাথরটায় হাত দেয়নি। এমন নোংরা কাজ করলেন কেবল আপনি। এ কি আমাদের সবার পক্ষেই লজ্জার কথা নয়?... ওর তরোয়াল নিয়ে নাও! ওকে আর ওর লোভী লোকজনদের বন্দী করা হোক! যাতে ওকে দেখে অন্যান্যরা শিক্ষা পায়!'

সে আদেশ পালন করা হলে হুমায়ুন হিন্দুবেগের সাহায্যে পুরোহিত আর অন্যান্য লোকদের বললেন:

'শাহানশাহ্ বাবর চান যে আপনারা যেন জানেন যে আমরা আপনাদের শত্রু নই... আপনারা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী। আমাদের আইন অনুযায়ী আপনাদের জিজিয়াকর দিতে হবে। কিন্তু যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়নি সে শান্তিতে বসবাস করুক। আমরা মনে করি সব লোকই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি। সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা ভারতবর্ষে এসেছি। ভারতবাসীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই সুন্দর দেশকে চমৎকার করে গড়ে তুলতে চাই আমরা!... আর আপনাদের মন্দিরগুলিকে সম্মান দেখাব আমরা!'

হিন্দুবেগের অনুবাদ করে দেওয়া এই কথাগুলি মন দিয়ে শুনল সবাই। শুনে

নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল তারা, নিচু হয়ে হয়ে সম্মান জানাতে লাগল। হুমায়ুন তাঁর দলবল নিয়ে চলে গেলে পুরোহিত আবার হাত জোড় করে বসলেন দেবতার সামনে: এবার কৃতজ্ঞতা জানাতে এমন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য; মন্দিরে আসা লোকদের বোঝাতে লাগলেন পুজারী যে ঐ বিদেশীর শাস্তি হল শিবের ইচ্ছায়, কেবলমাত্র তাঁরই ইচ্ছায়!

৪

ভারতবর্ষের থেকে বহুদূরে সির-দারিয়া উপত্যকায় এসেছে বসন্তকাল—সার্ভর মাস—এ সময় ফুলে ভরে ওঠে চারদিক। এদিকে যমুনাতীরে ইতোমধ্যেই নেমেছে অসহ্য গরম যেন মাভেরান্নহরের গ্রীষ্মকাল।

চড়া রোদ মাথায় নিয়ে সারাদিন বাবর ঘোড়ায় চড়ে ঘুরেছেন, সন্ধ্যার মুখে দেহটা যেন তাঁর রোদে পড়ে থাকা তামার কলসের মত তাতিয়ে উঠেছে। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি যমুনার তীরে গেলেন।

গরম আরও বেশি লাগছিল বিকালবেলায় প্রচুর পরিমাণে মাইনব খাওয়ার ফলে। কাবুলে থাকাকালীনই প্রচুর পান করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল বেগরা, এখানেও প্রায় প্রতিদিনই তারা শাহ্‌র পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ উপলক্ষে পানোৎসবের আয়োজন করে।

মাইনব ও অন্যান্য পানীয় পরপর পান করার ফলে বুকে ব্যথা হয় কেমন, বদ্ধ, গুমোট রাতে ঘুম আসতে চায় না। খুব বেশী পান করার পর কখনও সকালবেলায় কাশির সঙ্গে রক্ত উঠত তাঁর। হাকিম ইউসুফি হীরাট থেকেই তাঁর চিকিৎসক হয়ে আছেন বারবার অনুরোধ করেন পান না করতে। আর বাবর নিজেও রাতে অনিদ্রায় কষ্ট পাবার সময় প্রতিজ্ঞা করেন যে আর ছোঁবেন না পানীয়। কিন্তু দিনের বেলায় মেজাজ খারাপ হল অথবা ঠিক তার উল্টো, কোন আনন্দের ঘটনা ঘটল অমনি বাবরের মন টানে পানীয়ের দিকে। আর যেই তিনি পান করতে আরম্ভ করেন, সামান্য নেশার ভাব আসে, অমনি বেগরা বিভিন্ন অজুহাতে আরো পানীয় এগিয়ে ধরে তাঁর উদ্দেশ্যে। এমন অবস্থায় বাবর সহজেই গ্রহণ করেন সে পানীয়। এই যেমন আজই দিনের বেলায় তিনি নিজে সামান্য পান করেন তারপর বেগদের আমন্ত্রণ জানান সন্ধ্যার পানভোজন উৎসবে। 'আজ সন্ধ্যাবেলায় নদীবক্ষে ভোজ উৎসব করা যাক' কিন্তু তখনই তাঁর শরীরটা কেমন করছে, বিকালবেলায় পান করার ফলে এখনও মাথাটা ঝিমঝিম করছে...

বাবর তাঁর অন্তরঙ্গ বেগদের আর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের নিয়ে যমুনার কাছে এসে পৌঁছলেন, নদীতীরে দেখলেন সমবেত হয়েছে পুরোহিত, কিছু নারী, বৃদ্ধ ও

যুবকের একটি দল—শবদেহের সৎকার করতে। আচ্ছা, কেমন করে সৎকার করা হয়? লোকগুলির দিকে ঘোড়া চালালেন বাবর।

লোকগুলি পানিপথের যুদ্ধের সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর সব কথা শুনেছে, তাই সেই বিদেশীদের চোখের সামনে দেখে পালাতে আরম্ভ করল তারা। শবদেহটি এদিকে দাহ করার জন্য প্রস্তুত—তার কাছে রইল কেবল তিনজন মাত্র—এক যুবতী, মুখ তার গভীর শোকের চিহ্ন, বৃদ্ধ এক মহিলা ও নুয়েপড়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। উঁচু করে সাজান জ্বালানিকাঠের স্তূপের ওপর শোয়ান ছিল মৃতদেহটি, মুখে তার গভীর ক্ষতচিহ্নে রক্ত শুকিয়ে রয়েছে, সে ক্ষত দেখে বোঝা যায় তরবারির আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে। ও সে হল রাজপুত সৈন্যদের একজন, যারা বাবরের সৈন্যদলের সঙ্গে লড়াই করেছে বীরত্বের সঙ্গে। যুবতী বিধবাটির পিঠে ভেঙে পড়ছে ঘন, ঢেউখেলান চুলের রাশি, তাতে তার সৌন্দর্য আরো ফুটে উঠেছে। তার মুখের দিকে তাকালেন বাবর: বড় বড় সুন্দর চোখগুলিতে পৃথিবীর সবকিছুর প্রতি উদাসীনতা, আসন্ন মৃত্যুর ছায়া সে চোখগুলিতে।

প্রথা অনুযায়ী মৃতের স্ত্রী হয় সারাজীবন বিধবা হয়ে থাকবে, নয় স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় জীবন বিসর্জন দেবে। এই যুবতীটি দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চিতায় আগুন লাগাবেন, ঘিঢালা কাঠ মুহূর্তে জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। যুবতীটি এগিয়ে গেল সেদিকে, কিন্তু আপনা থেকেই। তার পাগুলি থেমে গেল।

বাবর হিন্দুবেগকে বললেন:

'ও কি আগুনে ঝাঁপ দেবে নাকি? একি অদ্ভুত কথা—মৃতদেহের জন্য জীবন্ত সৌন্দর্যকে মেরে ফেলবে?... ব্রাহ্মণকে আমার আদেশ জানান... বন্ধ করুক এসব... নিয়ে যাক ওকে এখান থেকে!'

দ্বিধা হল হিন্দুবেগের একটু তারপর ঘোড়া চালাল সেদিকে, চিতার কাছে এসে ব্রাহ্মণকে জানাল বাবরের আদেশ। যুবতীটি হঠাৎ ফিরল বাবরের দিকে।

'এই সেই শাহ্ দখলদার?' ভাষা না জানলেও বাবর বুঝলেন কি কথা জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি আর পরমুহূর্তে কি কথা বলে চীৎকার করে উঠল: 'তুমি এখানে এসেছ কেন?! তোমার আদেশেই তো আমার স্বামীকে মারা হয়েছে। যদি পার, ওর জীবন ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দাও ওর জীবন। তাহলেই আমিও বেঁচে থাকব!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবরের জন্য এই কথাগুলি অনুবাদ করে দিল হিন্দুবেগ। তারপর বলল:

'ওর মাথার গোলমাল হয়েছে। কিছু মনে করবেন না, হুজুর...'

'ধর, ওকে ধর ও যে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে!

চেঁচাতে চেঁচাতেই মেয়েটি চিতার কাছে ফিরে গেল: 'চলে যাও দখলদার! দূর হয়ে যাও! নিজের দেশে ফিরে যাও!' তারপর জ্বলন্ত চিতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল স্বামীর মৃতদেহ।

আগুনের লকলকে শিখা সঙ্গে সঙ্গে গ্রাস করল তার পোশাক, তার চুল। বাবর শুনতে পেলেন যন্ত্রনায় অমানুষিক চীৎকার, দেখলেন মেয়েটির আলিঙ্গনের বাঁধন কিন্তু তখনও ঢিলে হচ্ছে না, অনুভব করলেন মানুষের দেহ পোড়ার দুর্গন্ধ—বমি আসতে লাগল তাঁর—দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে সরে গেলেন সেখান থেকে।

যমুনার শান্ত জলে বাবরের জন্য অপেক্ষা করছে চমৎকার করে সাজান একটা দু'তলা জাহাজ। দিনের বেলার গরমও কমেছে খানিক। নিচে পাচকরা সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করছে আর ওপরে ভৃত্যরা উৎসবের জন্য প্রস্তুতিপর্ব শেষ করতে চলেছে।

নীরব বিষন্নমুখে তিনি উপরতলায় উঠলেন, সেখানে চাঁদোয়ার নিচে উঁচু এক বিশেষ বসবার আসন তৈরি করা হয়েছে তাঁর জন্য।

বাবরের চোখে এখনও ভাসছে বিধবা সুন্দরীর মুখ, চুল খোলা, চোখে উদাসীনতা, এখনও তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে আগুনের শিখা ঘিরে ফেলল মেয়েটিকে। ভাজা মাংসের সুগন্ধ ভেসে আসছিল উপরে। কিন্তু বাবরের মনে পড়ছে অন্য গন্ধ—কেমন যেন নেশা ধরান, বমি ওঠান গন্ধ। তিনি আদেশ দিলেন তখুনি রান্না বন্ধ করে দিতে।

'সন্ধ্যাবেলায় ভোজসভার কি হবে, হজরত?' ভোজসভার আয়োজনকারী হতবুদ্ধি হয়ে প্রশ্ন করল।

'স্থগিত রাখা হবে সবকিছু! নিচে ব্যস্ততা, ছুটোছুটি বন্ধ কর!'

খানিকবাদেই জাহাজে সব আওয়াজ থেমে গেল।

কিন্তু সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেও বাবর পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন যুবতীটির মৃত্যুপূর্বের চীৎকার:

'কেন তুমি এখানে এসেছ দখলদার? চলে যাও। নিজের দেশে ফিরে যাও!'

পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভে কি আনন্দই না হয়েছিল তাঁর! হ্যাঁ সেখানে একটা বিরাট খাদ মুখব্যদান করেছিল তাঁর জন্য—সে খাদ তিনি সাহস করে লাফ দিয়ে পার হতে পেরেছেন, তারপর বিনা যুদ্ধে, বিনারক্তপাতে দিল্লি দখল করেন। তিনি যে বিশ্বাস করেছিলেন, এবার সবকিছু ঠিকঠাক চলবে! কিন্তু তাঁর অন্তরের গভীরে যে লুকিয়ে ছিল প্রথম অভিযানে তাঁর সৈন্যদের লুঠপাটের আর হত্যাকাণ্ডের ফলে শিশু কত অনাথ হয়, কত স্ত্রী স্বামী হারায় (হায় আল্লাহ্ তারাও কি এই মেয়েটির মত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দেয়?') সেই সব স্মৃতি, সেই গোপন যন্ত্রণা, অন্তরের লুকান ব্যথা আবার জেগে উঠে বিবেকে ঘা দিচ্ছে। বিবেকের এই দংশনের সঙ্গে তুলনা করলে এই বিশাল দেশের বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতির জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে সুগঠিত করে তোলার পরিকল্পনা অর্থহীন বলে মনে হয়।

বিজেতার আত্মাভিমান তাঁর কোন দোষ স্বীকার করে না, কিন্তু বিবেক... বিবেক...

তিনি যখন অভিযানে যাবার সিদ্ধান্ত নেন তখন মহিমের দুশ্চিন্তা—উদ্বেগের কথা মনে পড়ল তাঁর। তার নারীহৃদয়, মাতৃহৃদয় অনুভব করেছিল তখন আজকের এই যন্ত্রণার কথা।

'আমার স্বামীকে মেরেছে তোমার সৈন্যরা। যদি পার তার জীবন ফিরিয়ে দাও, তাহলেই আমি বেঁচে থাকব!' বাবরের পায়ের নিচে মাটি সরে গেল। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খাদটা আসলে তিনি এখনও পার হননি। সেটা এখনও সামনে পড়ে আছে! পাঞ্জাবের জঙ্গলের সেই পথপ্রদর্শক লালকুমার যে তার হাতীতে করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় শেষ পর্যন্ত... সেও তো চীৎকার করে বলেছিল 'দখলদার! বিদেশী! তুই আমাদের হাজার হাজার ভাইকে মেরেছিস!...' এ ছাড়া অন্য কিই বা ভাবতে পারে তারা যারা দখলদারের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দখলদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিকট আত্মীয়দের হারিয়েছে? এ তোমার দেশের শহর বা গ্রাম নয় বাবর। 'নিজের দেশে ফিরে যাও!'... কোন দেশ? কোথায়? কাকে তিনি বোঝাবেন? কে বুঝবে যে তিনি এসেছিলেন এখানে সদুদ্দেশ্য নিয়েই? তাঁর সামনে এই যে খাদ এখন রয়েছে তা কি তিনি পার হতে পারবেন, আজ না হোক কাল?

তার মনে জেগে উঠল সেই পুরান দিনের অসফল লোকের নিরুপায় অনুভূতি, যা তিনি চান কোনো কিছুই তেমন ভাবে করে উঠতে পারেন না, এমন কি তিনি যখন বিজয় লাভ করেন সে বিজয়ও তাঁর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেন যে নিয়তি মাভেরান্নহরে তাঁকে জয়লাভ করতে দিল না? পাণিপথের যুদ্ধের জয়গান গাওয়া হতে থাকবে যুগ যুগ ধরে তা তিনি জানেন, অনুভব করছেন, কিন্তু আজ... আজ তিনি আর ধুয়ে ফেলতে পারছেন না দখলদারীর কলঙ্কের কালি... আজ তিনি বুঝলেন কেন গতপরশুদিন তিনি নিজের বিজয় লাভ উপলক্ষে আনন্দোচ্ছল গজল লিখতে পারেননি।

খাতায় কেবল রয়ে গেছে কাটাকুটি করা পংক্তিগুলি। গতপরশুদিনও সে আনন্দ ছিল না, আসলে মনের গভীরে লুকিয়ে ছিল তিক্ত বেদনা, আজ সেই বেদনাই প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

এই যে বেদনা—এই হল সত্য।

কলম হাতে তুলে নিলেন বাবর। নদীর ছলছলানির মত ফুটে উঠল প্রথম পংক্তিটি:

কত যে বছর, কত যে বছর, কিছুই হল না, হায়রে।

দূরে নদীর দিকে তাকালেন তিনি। ধীর নদী বয়ে চলেছে। সূর্যাস্তের লাল-গোলাপী আলো জলে পড়ে ঝলক দিচ্ছে—চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে তাতে। নদীর ঢেউয়ে রক্ত, সর্বত্র রক্ত। নিজের কাছে নিজেকে মেলে ধরলেন বাবর, লিখলেন:

কত যে বছর, কত যে বছর, কিছুই হল না হায়রে
জীবন আমার ভুলের চক্র চিরকাল নিরুপায় রে...
কালো দুঃখকে তাড়িয়ে গেলাম হিন্দুস্তানে, তখনই
কালো ছায়াসম অমোছা সে দাগ সেখানেও এসে যায় রে!

সন্ধ্যার আধাঅন্ধকারে চমৎকার চাঁদোয়া লাগান চারদাঁড়ের একটি নৌকা শাহ্‌র জাহাজের কাছে এসে লাগল। প্রহরী হাঁক দিল:

'কে যায়?'

বাবর কান পেতে রইলেন উত্তর শোনার জন্য।

'মির্জা হুমায়ুন শাহান শাহ্‌র সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাচ্ছেন,' জোর গলায় উত্তর শোনা গেল নৌকা থেকে।

বাবরের নিজের ইচ্ছে হচ্ছিল ছেলের সঙ্গে নির্জনে প্রাণখুলে কথা বলতে। পরিচারককে ডেকে বললেন:

'বল ওদের হুমায়ুন যেন এখানে আসে এখনি!'

একটু পরেই সিঁড়িতে হালকা পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। এই যে হুমায়ুন! চোখে তারুণ্যের উচ্ছাস, গোঁফের রেখাটা এখনও ঘন হয়ে ওঠেনি, কিন্তু কাঁধ আর বুকে শক্তির প্রকাশ। মনের বিষাদ বা শরীরের দুর্বলতা কিছুই এ পর্যন্ত জানেন না হুমায়ুন। 'আঠার বছর বয়সে আমিও ঠিক অমনি ছিলাম। সেই পৌরুষ কি আর টিকে আছে আজ?' এ কথা মনে করে বাবরের বুকের আর মাথার ব্যথাটা আরও বাড়ল বলে মনে হল।

পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর হুমায়ুন পিতার বিপরীতে বসলেন, কোমরবন্ধটা একটু ঢিলে করে দিলেন, তারপর মৃদু হেসে বার করে আনলেন বুকের কাছে লুকান শুক্তিবসান ছোট্ট একটি বাক্স।

'খুলে দেখুন জাঁহাপনা।'

ধীরেসুস্থে বাক্সটি খুললেন বাবর। তার ভিতরে মখমলের ওপর রাখা একটা পাথর, ঠিকভাবে বলতে গেলে দ্যুতিছড়ান একটা তারা। হীরা নাকি? আখরোটের মত বড় হীরা? এ পর্যন্ত বহু দামী পাথর দেখেছেন বাবর, কিন্তু এমন বড় হীরা দেখা কেন এমন যে হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেননি।

'কি পাথর এটি?'

'হীরা।'

নিজের রশ্মির ছটায় ভাসছে পাথরটি।

'কত ওজন।'

'প্রায় তিন তোলা।'

'এত বড় হীরা?'

'জহুরীকে ডেকে পাঠিয়ে এটি দেখিয়েছি জাঁহাপনা। আসলে এটি হল প্রখ্যাত কোহিনূর। সারা দুনিয়ায় এর চেয়ে বড় হীরা আর নেই। সিন্দুক বোঝাই করা মোহরের চেয়ে এর দাম অনেক বেশি।'

'শুনেছি বানোলার সুলতান আলাউদ্দিনের নাকি একটি অপূর্ব হীরা আছে, অন্যান্য হীরার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না সৌন্দর্যের আর দামও অনেক বেশি। লোকে বলে যে তার এত দাম যে তাতে সারা রাজ্যের একমাসের খরচ চলে যাবে।'

'আর ঐ জহুরীর মতে কোহিনুরের যা দাম তাতে দার-উল-ইসলামের গোটা রাষ্ট্রের আড়াই দিনের খরচ চলে যাবে... তাই সে বলল!' খুশিতে হেসে উঠলেন হুমায়ুন।

'কোথায় পেয়েছ এটা?'

একটু লাজুকভাবে উত্তর দিলেন হুমায়ুন:

'এটি আমি উপহার হিসাবে পেয়েছি... গোয়ালিয়রের মহারাজার পরিবারের কাছে থেকে।'

'কি কারণে?'

লাজুকভাবে বলতে আরম্ভ করলেন হুমায়ুন, কিন্তু ক্রমে: উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন বলতে বলতে:

'জাঁহাপনা, নিশ্চয়ই জানেন যে মহারাজা বিক্রমাদিত্য যাঁর বংশ একশ' বছর ধরে রাজত্ব চালাচ্ছে অপূর্ব সম্পদশালী গোয়ালিয়র রাজ্যে তিনি কিন্তু ইব্রাহিম লোদীর অধীনতা স্বীকার করেননি, বহুদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিমের কাছে ছেড়ে দিতে হয় গোয়ালিয়র রাজ্য। নিজে রাজা বিক্রমাদিত্য চলে যান শামসাবাদ, সেখানেই পরে দেহত্যাগ করেন।'

পানিপথের জয়লাভের পর বাবরের অশ্বারোহী বাহিনী হুমায়ুনের নেতৃত্বে দিল্লির বাইরে শামসাবাদ দখল করে; শামসাবাদের দুর্গে ছিলেন রাজার বিধবা স্ত্রী, পুত্র ও দুই কন্যা। রাজার বিশবছরবয়সী পুত্র হুমায়ুনকে বলে: 'ইব্রাহিম লোদী কেবল আপনাদেরই নয় আমাদেরও পরম শত্রু, সে যে ধ্বংস হয়েছে তাতে আমরাও আনন্দিত। এবার শামসাবাদ থেকে আমাদের নিজেদের জায়গা গোয়ালিয়র ফিরে যাবার অনুমতি দিন আমাদের।' হুমায়ুন যুবক মহারাজার কথা শুনলেন সসম্মানে, কিন্তু বললেন যে গোয়ালিয়রে ফিরে যাবার অনুমতি তিনি দিতে পারেন না পিতা শাহ্ বাবরের শামসাবাদ পৌঁছান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর মহারাজার দুর্গ প্রহরায় থাকবে বেগ ওয়াসের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন বাছাই করা সৈন্য... রাতের বেলায় সেই দুর্গের বাগানে ছাউনিতে ঘুমন্ত হুমায়ুনের ঘুম ভেঙে গেল বাড়ির ভিতর থেকে আসা কান্না চীৎকার চেঁচামেচির আওয়াজে। দেহরক্ষীদের নিয়ে দুর্গের মধ্যে ছুটে গিয়ে

হুমায়ুন দেখেন ওয়াইসবেগের দলের একজন সৈন্য অন্দরমহলে যাবার দরজার গোড়ায় পড়ে আছে রক্ত মাখামাখি অবস্থায় আর মহারাজার আঠার বছরবয়সী মেয়েটি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে অঙ্গের বসন গুছিয়ে নিচ্ছে। ওদিকে পাঁচজন সৈন্য তার ভাইকে ঘিরে ধরে তার হাত থেকে তরোয়াল কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে।

ঘটনাটা হল এই। পরলোকগত মহারাজের দুই কন্যার মধ্যে একজনকে মনে ধরে ওয়াইসবেগের, তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ সৈন্যগুলির সাহায্যে মেয়েটিকে নিজের ঘরে টেনে আনা। বোনকে বাঁচাতে আসে ভাইটি। যে সৈন্যটি বোনকে কোলপাঁজা করে তুলে নিতে গিয়েছিল তাকে তরোয়ালের এক ঘায়ে ফেলে দেয়।

হুমায়ুন আদেশ দিলেন তখুনি যেন ছেড়ে দেওয়া হয় রাজাকে।

'বোনের সম্মান রক্ষায় এগিয়ে আসা ভাই সম্মানের যোগ্য,' অত্যাচারী সৈন্যদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেললেন হুমায়ুন। 'তোমরা কি শোননি শাহ্ বাবর ভারতবর্ষের সম্মানযোগ্য লোকদের সম্মান দিতে বলেছেন? লম্পট ওয়াইসবেগকে তাঁর আদেশ অমান্য করার জন্য কারাগারে বন্ধ করা হবে! আর যারা এ ব্যাপারে সাহায্য করছিল তাদের দশ ঘা করে চাবুক দেওয়া হবে!'

তারপর তিনি দেখা করেন মহারাজার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে। সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাটি শিক্ষিতও, বেশ কয়েকটি ভাষা জানেন। হুমায়ুনকে ফার্সীভাষায় বললেন:

'শাহজাদা, এই বাক্সে আছে আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি। কিন্তু আমার সন্তানরা আমার কাছে পৃথিবীর সব সম্পত্তির চেয়েও মূল্যবান। আপনি আমার মেয়ের সম্মান রক্ষা করেছেন, ছেলের জীবন রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ আপনি আমার জীবন দিয়েছেন। তাই অনুগ্রহ করে এই হীরাটি গ্রহণ করুন আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ...'

গল্পের শেষ হবার মুখে হুমায়ুন পিতার দিকে তাকালেন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে। 'যদিও আমি ঠিক যথাযোগ্য কাজই করেছি' ভাবলেন তিনি। 'কিন্তু আমাদের সৈন্যের মৃত্যুর শোধ নেওয়া হয়নি, আর ওয়াইসবেগকে হয়ত অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়ে ফেলেছি? ও তো আমাদেরই বেগ।'

'হায়! এমন চমৎকার হীরার গায়েও রক্ত আর অত্যাচারের দাগ।'

'পিতা! যদি আমি কোন ভুল করে থাকি তো মাফ করবেন। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যাদের কাছে সম্মান ও মর্য্যাদা সবচেয়ে মূল্যবান হীরার চেয়েও দামী, যদিও তারা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী, মুসলমান নয়... কিন্তু...'

'না, না, তুই ঠিক কাজই করেছিস। এই দেশে আছে অনেক উদারহৃদয়, নিঃস্বার্থ লোক। আমরা এখানে আসতে চেয়েছিলাম বিনাকারণে নয়। আমাদের সামরিক খ্যাতি প্রয়োজন, কিন্তু তা ছাড়াও অসামরিক খ্যাতিও প্রয়োজন। কিছু বেগ, আমাদের লোভী বেগরা ও অত্যাচারী সৈন্যরা আমার প্রধান উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। তাদের উদ্দেশ্য

কেবল পেট ভরান, সুন্দরী নর্তকীদের নিয়ে স্ফূর্তি করা, মদ খাওয়া আর অবশ্যই ধনী হওয়া। তাদের নিষ্ঠুরতা, লোভ ভারতবাসীদের ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। এদিকে আমরা এখানে শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাচ্ছি। এই হল আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। যখন সে উদ্দেশ্য সফল হবে তখন অন্তর্যুদ্ধ শেষ হবে, শান্তি আসবে, বিজ্ঞান শিল্পের উন্নতি হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শাসকদের মধ্যে অনেকেই একথা জানেন তাই তাঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান। তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত আরও বেশি করে ভারতবাসীর বিশ্বাস ও আনুগত্য অর্জন করার।'

'বিশ্বাস অর্জন করতে হবে? আনুগত্য?' আবার জিজ্ঞাসা করলেন হুমায়ুন। 'কিন্তু শাসিত শাসককে ভালবাসে না। ওরা জিজিয়া কর দিক আর সহযোগিতা করুক। কিন্তু যারা আমাদের বিদেশী বলে মনে করে, আমাদের অধীনতা স্বীকার না করার জন্য নিজেদের গ্রাম-শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের কি করে বাধ্য করব আমরা, আমাদের বিশ্বাস করার জন্য?'

আবার বাবরের মনে পড়ল সেই যুবতী বিধবাটির কথা যে দখলদারদের, তাঁদের অভিশাপ দিতে দিতে আগুনে ঝাঁপ দেয়। আবার সেই খাদটা!

'হ্যাঁ, আমাদের আর...' সুর নরম করে বললেন বাবর, 'তাদের, যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এ দু'দলের মধ্যে মস্ত ব্যবধান... এক লাফে তাকে ডিঙিয়ে যাওযা যাবে না। তোকে বলি খুলে, কখনও কখনও আমার সন্দেহ হয় যে সে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে পারব আমরা। কিন্তু যখন নিরাশভাব কেটে যায় তখন ভাবি হ্যাঁ, আর তোমার ঐ ঘটনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে আমরা ধীরে ধীরে ধৈর্য ধরে সেই খাদের উপর সেতু নির্মাণ করতে পারি। একাজ কঠিন...' টুলের ওপর থেকে শুক্তিবসান ছোট্ট বাক্সটি হাতে তুলে নিলেন বাবর, 'কিন্তু আমার আশা হয় তা করা সম্ভব। এই যেমন তুমি গোয়ালিয়রের মহারাজার পরিবারের বিশ্বাস অর্জন করলে। মনে আছে দিল্লির এক মন্দিরে ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করার সময় তুমি অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছিলে? তোমার বুদ্ধি ও স্থৈর্যের জন্য এটি তোমার উপযুক্ত উপহার। নাও...'

'না জাঁহাপনা,' বুকে হাত রেখে বললেন হুমায়ুন, 'এই হীরাটি আপনারই জন্য উপহার নিয়ে এসেছি আমি।'

বাক্সটি আবার টুলের ওপর রেখে বাবর বললেন:

'খোদা তোকে দিয়েছেন উদার, দয়ালু মন। আর বীরত্বও। পানিপথে তুই তো প্রথম নিজের অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে ভাগ্য ফেরালি আমাদের, তোর কারণেই আমাদের সৈন্যবাহিনী উৎসাহিত হয়ে উঠল আর আমরা জয়লাভ করলাম। এই সবকিছুর জন্য তোকে এখনও উপযুক্ত উপহার দিইনি।'

'আপনি ইতিপূর্বেই আমাকে যা দিয়েছেন তাতেই আমার সারাজীবন চলে যাবে,'

পিতাকে 'মুবায়ুন' গ্রন্থটির কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বললেন হুমায়ুন। 'বহুদিনই ভেবেছি আপনার জন্য আনব উপযুক্ত উপহার।'

'তাহলে আমি তোমার কাছে এ উপহার গ্রহণ করছি। এ হীরাটি তাহলে আমার?'

'আপনার!'

'তোকে বলি আমাকে ভাগ্যের সবচেয়ে বড় দান হল তুই। পৃথিবীর সব হীরার চেয়েও মূল্যবান সে উপহার। তুই তো জানিস ক্ষমতা ও ধনসম্পত্তির জন্য কত শাহ্ তাঁদের ছেলেদের প্রতি নিষ্ঠুর ও খল ব্যবহার করেছেন। আমি চাই যে তেমন কোন কিছু যেন আমার আর আমার সন্তানদের মধ্যে না ঘটে। তুই আমার উত্তরাধিকারী। খোদার ইচ্ছায় যেন মহান চিন্তাধারা আর নিঃস্বার্থপরতা আমার থেকে তোর মধ্যে যায়, তারপর তোর থেকে পায় তোর বংশধররা... তখনই আমাদের সে উদ্দেশ্য সফল হবে, যে কারণে আমাদের ভারতবর্ষে আসা।'

'সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আপনার পুত্র সমস্ত কিছু এমন কি জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত।'

'তা আমি জানি! আর তুই বিশ্বাস কর, এই অপূর্ব হীরাটি তোরই উপযুক্ত। নে—আমি তোকে দিলাম!'

এই মুহূর্তের বিশেষ তাৎপর্যের কথা বুঝে হুমায়ুন দ্রুত উঠে, নিচু হয়ে বাক্সটি গ্রহণ করে চোখের কাছে ঠেকালেন।

'বোস,' বাবর ছেলেকে বললেন। হাততালি দিয়ে ভৃত্যকে ডেকে অপ্রত্যাশিত উৎসাহে আর যুবক বাবরের মত সুরেলা গলায় বললেন: 'হিন্দুবেগ আর খাজা খালিফাকে এখানে আসতে বল জাহাজেই কোথাও ওরা আছে' তারপর ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগলেন:

'আগ্রার প্রাসাদে সুলতান ইব্রাহিমের মাতৃদেবী আর তাঁর ছেলে—উজীর মালিকদাদ কারোনি লুকিয়ে আছেন প্রায় হাজারখানেক সৈন্য নিয়ে। শুনলাম, তারা নাকি শেষ পর্যন্ত লড়াই করার শপথ নিয়েছে।'

কুর্ণিশ করে ভিতরে এল খাজা খালিফা আর হিন্দুবেগ। তাদের বসতে বলে বাবর সেই রকমই উচ্ছ্বসিত সুরেলা গলায় বললেন:

'আপনারা আমার দূত হয়ে আগ্রা যাবেন। আমাদের উদ্দেশ্য বিনা যুদ্ধে প্রাসাদদুর্গ দখল করা। যারা প্রাসাদের ভিতরে আছে তাদের জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। সুলতান ইব্রাহিমের মাতৃদেবীকে দেব যমুনার তীরে একটি অঞ্চলের শাসনভার। ইব্রাহিমের পুত্র শিক্ষিত তরুণ, আরবী ফার্সীভাষা জানে, আমার অন্তরঙ্গদের একজন হয়ে থাকবে প্রাসাদে। শুনেছি মালিকদাদ কারোনি দক্ষ উজীর। সে আমার কাছে কাজ করবে ভারতবর্ষের জটিল সমস্যাগুলির ব্যাপারে সে আমার পরামর্শদাতা হবে। এ সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে বলুন তাঁদের। যদি তাঁরা কোন কিছু চান, বলুন আমরা

ভেবে দেখব। বুঝিয়ে দেবেন যে আক্রমণ করে দুর্গ দখল করে নেবার জন্য প্রয়োজনেরও বেশি শক্তি আছে আমাদের। কিন্তু রক্তপাত বা লোকের ক্ষতি করার চেয়ে শান্তি ও মিত্রতাই আমাদের কাছে শ্রেয়... এককথায় দুর্গ জয় করা নয়, দুর্গের ভিতরে যারা আছে তাদের বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস অর্জন করাই হল আপনাদের কাজ।'

আগ্রা

১

ইব্রাহিম লোদীর মাতৃদেবী অভিজাতবংশীয়া বাইদা পানিপথে নিহত পুত্রের শোকে আপাদমস্তক সাদা পোশাক ঢেকেছেন। কিন্তু তার মানসিক অবস্থা বা পোশাক কোনটাই হিন্দুবেগ বা খাজা খালিফার সঙ্গে আলোচনায় তার নিজের স্বার্থরক্ষায় ব্যাঘাত হয়ে দাঁড়াল না। অনেক পরিশ্রমে তাকে রাজী করান গেল আগ্রা সমর্পণে। যখন রাজোচিত অনমনীয় চেহারার বাইদা যমুনার তীরে বাবরের হাতে তুলে দিল দুর্গদ্বারের চাবি বৃদ্ধার চোখে জল দেখা দিল, কিন্তু অনমনীয় ভাব বজায় রইল।

কোথায় যে বাবর দেখেছেন অমনি উঁচু কপাল, জোড়া ভ্রূ? হঠাৎ বাবরের মনে পড়ল পানিপথের যুদ্ধ: হাজার হাজার নিহতের মাঝে খুঁজে বার করা হয় ইব্রাহিম লোদীর দেহ, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তার মাথাটা কেটে বর্শায় বিঁধিয়ে বাবরের কাছে আনা হয়। সে, যেন বেঁচে উঠে তাঁর, বিজয়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মায়ের প্রতিমূর্তিতে। এই গর্বিতা মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বাবর কেমন অদ্ভুত ভীরু, দিশাহারা বোধ করলেন, জিজ্ঞাসা করলেন সুলতানার কোন প্রার্থনা আছে কি না।

বাইদা দ্রুত চোখ মুছে নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলল:

'আমার শান্তি যেন আর ব্যাঘাত না করা হয়!'

বাবর তাঁর অন্তরঙ্গদের উদ্দেশ্যে বললেন:

'আপনাদের প্রত্যেকে যেন এই মাননীয়া মহিলাকে নিজের মায়ের মতই সম্মান করেন।'

সবাই নিচু হয়ে সে আদেশ মেনে নিল। বাইদাও মাথা নিচু করে কৃতজ্ঞতা জানালেন, কিন্তু কারুর নজরে পড়ল না যে তার জলে ভেজা চোখে এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল ঘৃণার আগুন, একটা ফুলকি দিয়েই তৎক্ষণাৎ নিভে গেল। অভিজাতবংশীয়া বাইদা এমন মা নয় যে ছেলের হত্যাকারীকে ক্ষমা করবে। ইব্রাহিম তার প্রিয় সন্তান ছিল। যখন খবর এল পানিপথের যুদ্ধে ভয়ংকর পরাজয় হয়েছে আর সুলতান নিহত, তখন তার মনে হয় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে পৃথিবীর ওপর। তখন তার প্রচণ্ড ইচ্ছা হয় ছেলেকে আর একবার দেখার, হোক সে মৃত, নিজে হাতে

তাকে সমাধিস্থ করার, সমাধির কাছে বসে কেঁদে মন হালকা করার। কিন্তু আগ্রা থেকে ঘোড়ায় চড়ে পানিপথ যেতে তিনদিন লাগে। তাই তার বিশ্বস্ত লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছায় যুদ্ধ শেষ হবার এক সপ্তাহ পরে: নিহতদের কিছু লোককে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় আর কিছু লোককে শকুনি বাজপাখীতে খেয়ে যায়। বাইদাপ্রেরিত লোকরা ইব্রাহিমের দেহ খুঁজে পেল না। তারা জানতে পারে যুদ্ধের পরে ইব্রাহিমের মাথাটা কেটে বাবরকে দেখান হয়।

ছেলের নিষ্প্রাণ দেহর উপরেও এমন অত্যাচারের কথা শুনে মায়ের দুঃখ আরও দশগুণ বেড়ে গেল। আর বাড়ল প্রতিশোধের আকাঙ্খা! 'ইব্রাহিমজান, এ দুনিয়ায় তোর কবরও রইল না, তোর মৃতদেহটাও কেড়ে নিলে আমার কাছে!' এমনিভাবে সে কাঁদে প্রতিবার নমাজের প্রার্থনার সময়। বাইদা প্রার্থনা করে 'বাবর যে আমার ছেলের মৃত্যুর কারণ হয়েছে সে আমার ছেলে মৃত্যুর সময়ে যত কষ্ট ভোগ করেছে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করুক!'

ভৃত্য, দাসদাসী, চররা বাইদাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বিভিন্ন খবরাখবর এনে দিত বাইরে থেকে; যেন বাবরের সৈন্যদলে ঘোড়ার খাবারের অভাব হওয়ায় গ্রামের মজুদ শস্য খাইয়েছে ঘোড়ার পালকে, তাতে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করে, কুড়াল-কোদাল দিয়ে বিদেশী বাহিনীর বেশ কিছু লোককে মেরে ফেলেছে। শোনা যায় গরমে কাহিল হয়ে পড়েছে বিদেশী বাহিনীর লোকেরা, গণ্ডায় গণ্ডায় মরছে তাদের লোক আর ঘোড়া। লোকে তাদের শাপ দিয়েছে কথায় কথায় মরুক মহামারীতে আর কম্পজ্বরে, শেষ হয়ে যাক; যা তাদের মন চায় তাই ঘটেছে বলে গুজব ছড়াল লোকে।

বাইদা স্থির করল তার যে পৌত্র বাহাদুর বাবরের প্রাসাদে কাজ করে তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে হয়ে এ গুজবগুলির কতটা সত্যি। বাইদা ভাবল যে শুধু শুধু তার সঙ্গে দেখা করতে ছেড়ে দেবে না বাহাদুরকে তাই দাসীর হাতে এক চিঠি দিয়ে প্রাসাদে পাঠাল, চিঠিতে লিখল যে সে অসুস্থ, এ সময়ে নিজের রোগশয্যাপাশে দেখতে চায় পৌত্রকে।

সতরবছরবয়সী বাহাদুর ফার্সী ও সংস্কৃত জানত ভালই, বাবরের প্রয়োজনীয় কিছু দলিলপত্র সে অনুবাদ করে দিত। শাহ্‌র অন্যান্য অনুবাদকও ছিল বাহাদুর ছাড়া, কাজের চাপ তার খুব বেশি না, কিন্তু নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু করার অধিকার তার ছিল না: প্রহরাধীন সে (শত্রুর ছেলেকে কেউ কিছু করে বসতে পারে), চোখে চোখে রাখা হয় তাকে (ভূতপূর্ব সুলতানের ভূতপূর্ব উত্তরাধিকারী—ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে দারুণ লোভনীয়)। এই সব কারণে বাহাদুরকে দুর্গপ্রাচীরের বাইরে বিশেষ বার হতে দেওয়া হত না।

কিন্তু উজীর মুহাম্মদ দুলদাই বাইদার চিঠি পড়ে ভাবল বাবর তো বলেছেন তাকে নিজের মার মত সম্মান করতে, তাই অনুমতি দিল তাকে বাইদার সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু তার সঙ্গে সৈন্যের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হল আর কঠোর আদেশ দিল যে আজই যেন ফিরে আসে সে।

অসুখের ভান করে বাইদা তার জন্য নির্দিষ্ট মহলের এক আধা-অন্ধকার ঘরে অভ্যর্থনা জানাল পৌত্রকে। মুখে অত্যন্ত কষ্টের ভাব ফুটিয়ে বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে রইল ছাদের দিকে। কোনরকমে বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসল বাহাদুরকে বসতে বলল নিজের সামনে।

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল পৌত্রের ঘর্মাক্ত কপালের দিকে। তারপর বলল: 'এ বছর এমন গরম পড়েছে যা আগে কখনও হয়নি।'

খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল:

'এ কথা কি সত্যি নাকি রে যে বিদেশীদের কষ্ট হচ্ছে এই গরমে? মরছে নাকি অনেক, সত্যি?'

'মরছে,' উত্তর দিল বাহাদুর।

'একথা কি সত্যি যে তাদের অনেকে বলছে যে থাকব না আমরা এখানে, ফিরে যাব আমাদের ঠাণ্ডা দেশে?'

'ওদের শাহ্ যেতে দেবে নাকি? অধিকাংশ লোকই শাহ্‌র কথা শোনে। আর বলতে বোঝাতে পারেও সে। বাকপটু। যারা সোজাসুজি বলছিল চলে যেতে চায়, তাদেরকে প্রাসাদে ডেকে কথা বলল, তারাও চুপ করে গেল।'

'তুই তোর বাবার হত্যাকারীকে... প্রশংসা করছিস?'

বাহাদুরের সতর্ক দৃষ্টি ঘুরল দরজার দিকে। বাইদা নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল:

'তোর ওপর নজর রাখে নাকি?'

'হ্যাঁ' ফিসফিস করে উত্তর দিল পৌত্র 'স্বাধীনভাবে কাবুর সঙ্গে দেখা করতে কথা বলতে পারি না। চারদিকে লোক থাকে, শোনে কথা... খারাপ কোন কিছু বললেই শাহর কানে তুলে দেবে।'

'ভয়ের কিছু নেই। এখানে আমরা দুজনই কেবল আছি... ওদের প্রাসাদের লোকেদের মধ্যে আমাদের কেউ আছে নাকি... এমন কেউ যে আগে আমাদের এখানে কাজ করেছে?'

'আছে... মহামান্য মালিক্‌দদ কারোনি... তা ছাড়া... যত বিজ্ঞানীরা রয়ে থাকতেন আমাদের গ্রন্থাগারে তাঁদের সবাইকে কাজে নেওয়া হয়েছে... শাহ্ বাবর আমাদের লোকদের মন জয় করতে চায়, হিন্দু ও ভারতবর্ষের মুসলমানদের বিশ্বাস অর্জন করতে চায়। এমনকি পিতার সব পাচকদের থেকে চারজনকে বেছে নিয়েছেন নিজের জন্য...'

'তাই নাকি?... আর ঐ পাচকদের তৈরি করা খাবার নিজে খায়?'

'শুনেছি খায়। এমন কি প্রশংসাও করে সম্মান দেখাবার জন্য...'

'ভাল কথা যে খায়!' পৌত্রের কথার মাঝেই বলে বাইদা অপ্রত্যাশিত দ্রুত বিছানা থেকে নেমে এল।

আগের মতই দুঃখে ফেটে যাচ্ছে তার বুকটা, কিন্তু সেই দুঃখের সঙ্গে মিশে থাকা প্রতিশোধ স্পৃহাটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠল তার ভয়ঙ্কর, কিন্তু পরিষ্কার লক্ষ্য আর তাতে নতুন শক্তি পেল সে। 'যদি বাবরকে... সরান যায়, তাহলে ওর লোকরাও এখান থেকে চলে যাবে... হ্যাঁ, চলে যাবে!' অন্তত একজন পাচককেও হাত করতে হবে, সেই হবে প্রতিশোধের অস্ত্র।

পৌত্রের কানের কাছে মুখ এনে বাইদা ফিসফিস করে বলল:

'তুই নিজে দেখেছিস সে পাচকদের?'

'দেখেছি।'

'তাদের মধ্যে আহমদ আছে নাকি?'

তখনও, কিন্তু বুঝতে পারেনি, 'অসুস্থ' বাইদার মাথায় কি পরিকল্পনা চলছে:

'না। পাচক আহমদ আগ্রা থেকে চলে গেছে, কেন বলুন তো?'

আবার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল দরজার দিকে। বাইদার মুখে হাসি খেলে গেল। 'নাতির আমার মন বড় দুর্বল, আর অনেকগুলো চোখ পাহারা দেয় ওকে। হঠাৎ গোপন কথা বেরিয়ে গেলে ও মরবে আর আমার পরিকল্পনাও সফল হবে না,' ভেবে বাইদা এমন বিপজ্জনক পরিকল্পনার কথা কিছু জানাল না বাহাদুরকে। রোগের যন্ত্রণায় যেন কাতরে উঠে বলল:

'কি নিষ্ঠুর দুনিয়া! যাবা এককালে আমাদের নুন খেয়েছে, শত্রুর সেবা করছে এখন। মালিক্দদ কারোনি, পাচকরা সবাই নিজেদের বিক্রি করে দিল! ওঃ কি কষ্ট, বুড়ো শরীরটার যন্ত্রণায়... কিন্তু তুই... বাছা... তুই লোক দেখান কাজ কর, আর মনে মনে পিতার অনুরক্ত থাকিস।'

'তাই তো আমি করি, ঠাকুর্মা!' ফিসফিসিয়ে বলল বাহাদুর।

বাহাদুর চলে গেলে বাইদা সব 'অসুখ' ঝেড়ে ফেলল। শুধু শুধু কাতরানোর আর প্রয়োজন নেই। তার প্রয়োজন একজন পাচকের যে হবে বিশ্বস্ত, সাহসী যে অর্থের জন্য বা প্রতিশোধস্পৃহায়ই হোক বাবরকে মারতে—বিষ দিতে রাজী হবে। চারিপাশে প্রচুর লোক আছে যারা ঐ দখলদারীদের ঘৃণা করে। বাবরের সৈন্যরা মেরেছে কারুর ভাইকে, কারুর পিতাকে, বাবরের কর্মচারীরা কাউকে সরিয়ে দিয়েছে লাভজনক পদ থেকে আবার কাউকে বা একেবারেই নিঃস্ব করে দিয়েছে... বাইদা শীঘ্রই জানতে পারল যে চারজন পাচককে বাবর নিজের কাছে নিয়েছেন, তাদের একজনের ভাই মারা যায় পানিপথের যুদ্ধে। কিন্তু নিজের তার সঙ্গে কথা বলায় বিপদ আছে, কারণ বাবরের লোকেরা নজর রাখছে তার ওপর। সুলতান ইব্রাহিমের প্রাসাদে যারা কাজ করেছে সেই সব পাচকদের মধ্যে আহমদ বাইদার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছিল। কিন্তু সে চলে

গেছে আগ্রা ছেড়ে... কোথায়? জানা গেল আতভ গেছে সে। আহ্মদকে তার কাছে আসার জন্য খবর দিয়ে লোক পাঠাল সেই শহরে।

পাচক আহ্মদ যে আগ্রাতে নিজের বাড়ি, ধনসম্পত্তি হারিয়েছে, এসে পড়ল। বিদেশীদের প্রতি ঘৃণায় জ্বলছে তার মন। যে অঞ্চলের শাসনভার দেওয়া হয়েছিল বাইদাকে সেই অঞ্চলে আহ্মদকে একটি বাড়ি দিল বাইদা, মাসিক মাহিনা নির্দিষ্ট হল তার জন্য। ধীরে ধীরে সাবধানে প্রস্তুত করতে লাগল তাকে। বাইদার উদ্দেশ্য জেনে আহ্মদ প্রথমটা ভয় পেয়ে গেল, বলল সে করে উঠতে পারবে না এমন একটা কাজ। কিন্তু বাইদা তাকে সাহস যোগাল, বলল যে ভূমিকা সে নেবে তা খুবই নিরাপদ। তাকে কেবল রাজী করাতে হবে সেই পাচককে যার ভাই পানিপথে মারা পড়ে আর 'বাকী, সবকিছু আমরা নিজেরাই করব।' আহ্মদ জানে না শাহ্‌র প্রাসাদে কি করে ঢুকবে, তাতেও বাইদা সাহায্য করল। পৌত্রের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইল সে। রেশমী কাপড়ের এক বিরাট বোঝা নিয়ে এল সে প্রাসাদে—সে উপহার বইছিল আহ্মদ। যতক্ষণে বাইদা বাবরের আতিথ্য গ্রহণ করছিল ততক্ষণে আহ্মদ সেই পাচকটিকে খুঁজে পেল। জানা গেল—তারা প্রাণের বন্ধু। আগামীকাল প্রাসাদের বাইরে তারা দুজনে দেখা করবে ঠিক করল। এক সপ্তাহ কাটার পরে আহ্মদ বাইদাকে বলল যে তার বন্ধু পাচকটিও তার ভাইকে যারা হত্যা করেছে সেই বিদেশীদের ঘৃণা করে। রাজী আছে সে...

২

প্রচণ্ড গরম পড়েছে... বর্ষাকালের এখনও প্রায় মাসখানেক দেরি।

যমুনার বাম তীরে জারাফশান বাগিচাতে কচি কচি আঙুরলতা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি এখানে লতাপাতার জঙ্গল ছিল। যমুনার দুই তীর সমান করে সুন্দর চারচামান গাছ বসান হয়। যেমন হীরাটে আর সমরখন্দে... মর্মরবাঁধান জলাশয় আর বিভিন্ন ধরনের ফোয়ারা তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছে। বাগিচার নালীগুলি দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ জলধারা। বাগিচার পথে বিছান লালচে বালি পায়ের নিচে আওয়াজ তোলে কিঁচকিঁচ করে।

জারাফশান বাগিচাতে এলেন বাবর, খাজা কালোনবেগ, হিন্দুবেগ, মালিক্‌দদ কারোনি আর জনাদশেক রক্ষীকে নিয়ে। এমন গরম পড়েছে যে বাবরের মনে হচ্ছে যে ঘোড়ার লোহার রেকাবগুলি রোদে তেতে উঠে জুতোর মধ্যে দিয়েও পাগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আর সোনার পাত দিয়ে তৈরি জিনটাকে ছোঁবার উপায় নেই যেন জ্বলন্ত কয়লা।

কিন্তু তাহলেও বাবর এই অসহ্য গরম নিয়ে কথা বলতে চান না: অনেক বেগই

সুযোগ পেলেই কাঁদুনি গাইতে থাকে যে এখানের আবহাওয়া তাদের সহ্য হচ্ছে না। আগ্রা ও তার আশেপাশে নতুন ভবন নির্মাণ, নতুন বাগিচা কোন কিছুতেই তাদের বিশেষ আগ্রহ নেই। যদিও তারা খুবই খুশি যে বাবর সতর্কভাবে একের পর এক দখল করে নিচ্ছেন সেই সব জমি, যার মালিক ছিল লোদীবংশের আত্মীয়রা বা তাদের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি, সেই জমিগুলি পাচ্ছে বাবরের দলের লোকেরা। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত অন্যান্য কতকগুলি নীতিতে খুশি নয় বেগরা। যদিও তারা বাবরের সেবা করার জন্য জমির অধিকারী হয়েছে, কিন্তু সে জমিভোগের জন্য যথেষ্ট করও তাদের জমা দিতে হচ্ছে কোষে। ওদিকে সওদাগরদের খোলাখুলি প্রশ্রয় দিতে লাগলেন বাবর, কোনো কিছুর ব্যবসায়ে যখন আয় বেশি হত তখন সেই ব্যবসায়ীকে কম শুল্ক দিতে হত। হুমায়ুন জানেন, পিতা এই নীতির কথা লিখে রেখেছেন 'মুবায়ুন' গ্রন্থে। বেগরা তা জানে না... জানলেই বা এদিক ওদিক কি হত? তাদের কষ্ট হচ্ছে কারণ যতটা ধনী হতে পারবে ভেবেছিল তারা, তেমন হতে পারছে না... ওঃ কি অসম্ভব কষ্টকর আবহাওয়া এখানে!...

লম্বা সাদা পোশাক আর মাথায় ছোট পাগড়ী পরা বৃদ্ধ স্থপতিকে দেখিয়ে বাবর খাজা কালোনবেগকে জিজ্ঞাসা করলেন:

'চিনতে পারছেন?'

'আন্দিজানের ফজলুদ্দিন?'

'হ্যাঁ, ওঁকে কাবুল থেকে আনিয়েছি। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নিজের ছেলেকে— খোদাইয়ের কাজ করে সে... মওলানা ফজলুদ্দিনই ঐ বাগিচাটা দাঁড় করিয়েছেন যেখানে এখন আমরা যাচ্ছি। সৈন্যদের কঠোর জীবন যাপনে অনভ্যস্ত এই বৃদ্ধ যে গরম সহ্য করতে পারছেন তা কি আমরাও সহ্য করতে পারব না নাকি?'

'কিন্তু জাঁহাপনা, এমন কিছু লোক আছে যারা এমন গরম মোটেই সহ্য করতে পারে না। কাল যখন মরুভূমির থেকে আগুনে ঝড় বইতে লাগল আমার তিনজন লোক একের পর এক ঘোড়া থেকে পড়ে মরে গেল।'

'খোদার ইচ্ছায় তাদের জীবন ফুরিয়েই এসেছিল আর ঐ ঝড়টা তাতে একটু সাহায্য করেছে, মাত্র... সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।' আকাশের দিকে চোখ তুললেন বাবর প্রার্থনার ভঙ্গিতে, তারপর তখনি নামিয়ে দিলেন ফজলুদ্দিন শাহ্‌র দিকে। এগিয়ে এসে কুর্ণিশ করলেন। বাবর তাঁকে বললেন: 'আপনার ক্লান্তি নেই, মওলানা... কি অনুরোধ আছে আপনার, বলুন আমি শুনতে এসেছি।'

'জাঁহাপনা, আমাদের দরকার কিছু হাতী আর হাতীকে দিয়ে কাজ করাবার মত লোক। দেহলপুর থেকে ভারী ভারী পাথর আনতে হবে, পাথরগুলি গাড়িতে তুলতে পারে কেবল হাতী।'

মালিক্‌দদ কারোনির দিকে ফিরলেন বাবর:

'যুদ্ধের কাজে লাগান হাতীদের কাজ করতে শেখান যায় নাকি বলুন তো?'

'যায়, মহামান্য হজরত। হাতী অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। ভারতবর্ষে হাতীকে যুদ্ধ ছাড়াও কাজ করতে শেখান হয়। দূরের গ্রাম থেকে হাতী আর মাহুত ধরে আনা যায়...'

'না। অন্য উপায় আছে... যুদ্ধে হাতী ব্যবহার কবতে জানি না আমরা। কিন্তু পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর অনেক হাতী এসেছে আমাদের দলে। তাদেরকেই কাজে লাগাতে হবে। মহামান্য কারোনি, আজই এ আদেশ জানিয়ে দিন এমন লোকদের যারা হাতী চালাতে পারে।'

'যো হুকুম, জাঁহাপনা!'

কারোনি তখনি শহরের দিকে রওনা দিতে উদ্যত হল, কিন্তু বাবর তাকে থামালেন:

'হ্যাঁ, আর একটা কথা... শহরে, গ্রামে সব জায়গায় লোক পাঠাবেন, তারা যেন ঘোষণা করে যে সুলতান ইব্রাহিমের ধনসম্পত্তি যে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা আমরা লাগাব নির্মাণ ও জনসাধারণের জন্য মঙ্গলকর কাজে। এই কথা যেন ঘোষণা করা হয় সর্বসমক্ষে!... আর মওলানা, আপনার কাছে এখন যথেষ্ট লোক আছে কাজ চালাবার জন্য?'

'আপাতত আছে। কিন্তু একটু অসুবিধা আছে। আপনি আদেশ দিয়েছেন মর্মর প্রাসাদ, আর বড় জলাশয়ের নির্মাণকার্য শেষ করতে এক বছরের মধ্যে। সবচেয়ে পরিশ্রমের আর দীর্ঘ সময়ের কাজ হল পাথর মসৃণ করা আর খোদাই করা।'

'সেই কাজে দক্ষ লোক যদি আরও আনা হয়?...'

'সেই অনুরোধই করতে যাচ্ছিলাম আপনাকে জাঁহাপনা। সমরখন্দে ও হীরাটে ইঁট ও টালির সাহায্যে নির্মাণকার্য চালান হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে নির্মাণকার্য চালাবার জন্য, চাই মর্মর ও অন্যান্য পাথর।'

'মওলানা, খোদাই করার জন্য মোট কতজন লোক এখন আছে আপনার?'

'কেবলমাত্র আগ্রাতেই ছশো'আশি জন, আর সিক্রি, দেহলপুর ও অন্যান্য জায়গা মিলিয়ে আছে একহাজার চারশো নব্বইজন।

'খুব কম নয়!' বাবরের মুখে ফুটল খুশির ভাব। 'যখন আমীর তৈমুর সমরখন্দে বিশাল ভবনগুলির নির্মাণকার্য চালাচ্ছিলেন তখন কাজ করেছিল বিভিন্ন দেশের থেকে আসা মাত্র দুশো লোক। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুল্লা শরাফুদ্দিন আলি ইয়াজদি মনে করেন এ একটা অসম্ভব বড় সংখ্যা এমন বিশাল দেশ ভারতবর্ষে আর এত দক্ষ লোক আছে এখানে, আমরা তাদের আমন্ত্রণ জানাব, বন্দীর মত তাড়িয়ে আনব না—ঐ পাথর খোদাইয়ের কাজে দক্ষ মিস্ত্রীদের হাজারে হাজারে নিয়ে আসব। মহামান্য কারোনি, এ খবরও ঘোষণা করে শহরে শহরে লোক পাঠান। সবাই জানুক যেসব স্থপতি আমাদের এখানে কাজ করতে চাইবে তারা এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে সর্বোচ্চ

বেতন নির্দিষ্ট ছিল তা পাবে। মুসলমান ও হিন্দু স্থপতির কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বেতন এক হবে! যাদের কাজ আমাদের মনে ধরবে তাদের রক্ষার দায় নেব আমরা! পয়গম্বর তো বলেছেন: 'এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর সব অনুগামীই সমান!'

কারোনি আগ্রা চলে গেল। আর অন্যান্য বেগরা সামান্য দূরে যমুনার জলে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলতে থাকা জাহাজটার দিকে করুণ চোখে তাকাতে লাগল বারবার। নির্মীয়মান ভবন ও বাগিচা পরিদর্শনের পর জাহাজে যাবার কথা বাবরের—সেখানে জলের বুকে গরমটা কম। কিন্তু শাহ্ তার জন্য মোটেই ব্যস্ত নন দেখা গেল। তিনি স্থপতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন প্রাসাদ আর নদীর মাঝে যে হামামটি তৈরি হবে তার গম্বুজ কেমন হবে, ভিতরের দেওয়াল, মেঝে ইত্যাদি কেমন করে।

'ভিতরে দেওয়ালে, মেঝেয় পাতা হবে পাতলা নানারঙের মর্মরপাথরের টালি যেমন আছে মাভেরান্নহরে প্রখ্যাত উলবেগের হামামে,' ধীরেসুস্থে বলতে লাগলেন ফজলুদ্দিন। 'গম্বুজটা হবে ঐ হামামের চেয়ে সামান্য বড়, দেওয়াল গাঁথা হবে মজবুত লালপাথর দিয়ে... মর্মরপাথরের—আপনি জানেন, জাঁহাপনা, একটি বিশেষ গুণ আছে: ভিতরে সেটি খুব কম উত্তাপ ছাড়ে আর বাইরে থেকে ভিতরে তাপও গ্রহণ করে না, তাই গ্রীষ্মকালে এই মর্মরপাথরের টালিগুলি খুব কাজে লাগবে।'

'মওলানা, হামাম তৈরির কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করুন, নাহলে এই রোদে শীঘ্রই আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যাব!' বলল কালোনবেগ, গরমে মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে তার।।

'যদি চান যে হামামটি আমরা শীঘ্র তৈরি করে ফেলি তো, মহামান্য বেগ, ঘোড়া থেকে নেমে আমাদের সঙ্গে হাত লাগান,' ঠাট্টা করে বললেন ফজলুদ্দিন।

এমন জবাবে খুশি হয়ে বাবর স্থপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন:

'মওলানা, আপনার নিজের কষ্ট হচ্ছে না গরমে?'

'হচ্ছে, কিন্তু—সহ্য করছি... আন্দিজানে সুন্দর সুন্দর ভবন তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলাম—হল না। আশা করেছিলাম তৈরি করব হীরাটে, সমরখন্দে... সেই বস বাড়ির নক্সাগুলি কাগজপত্রের মধ্যে পড়ে থেকে ধূলি ধূসর আর হলুদ হয়ে গিয়েছে। এখন দেখছি মাতৃভূমি থেকে দূরে, এই আগ্রায় আমার জীবনের সেসব স্বপ্ন সত্যি হওয়ারই ছিল নিয়তির বিধান। আর এ যদি আমার ভাগ্য তবে গরমও সহ্য করব... আচ্ছা, জানেন, কেন ভারতবাসী এ গরম সহ্য করতে পারে? গরমকালে এরা মাংস প্রায় খায়ই না, তেষ্টা মেটাবার জন্য ফলের রস খায়, ফল খায় বেশি করে। আমিও অভ্যাস করে নিয়েছি হালকা খাবার খাওয়ার। ভোরবেলায় উঠি বিছানা ছেড়ে, ঘণ্টাচারেক কাজ করি সকালের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, তারপর যখন গরম বাড়ে, ঘণ্টা চারেক ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম নেই। গরমটা যখন একটু কমে আবার ঘণ্টাচারেক কাজ করি।

'ঠিক, ঠিক... আর আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাই কেবল মাংস একবার কাজি, একবার কাবাব, শিককাবাব,' কালোনবেগের দিকে তাকালেন বাবর। 'আর সেই সঙ্গে পান করি বিভিন্ন ধরনের মদ্য, পানীয়, যেন এই গরমটা যথেষ্ট নয় আমাদের পক্ষে।'

খাজা কালোনবেগ অতিকষ্টে বসে আছে ঘোড়ার উপর, ঘাম শতধারায় ঝরে পড়ছে তার মুখ বেয়ে, দাড়ি বেয়ে, নেমে আসছে বুকের ওপর। আর বাবরেরও মনে হচ্ছে যেন প্রতিবার নিঃশ্বাস নিলেই বুকের ভিতর ঢুকে আসছে হাওয়ার বদলে আগুনের হল্‌কা। যাওয়া দরকার, এখুনি! ফজলুদ্দিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাবর নদীর দিকে ঘোড়া চালালেন, যেখানে নোঙর ফেলে দুলছে জাহাজটা, সেটা দেখাচ্ছে যেন মরীচিকার মতন, জোরে ঘোড়া ছোটালেন বাবর। মুখে হাওয়ার ঝলক লাগল। নিঃশ্বাস নেওয়াও সহজ মনে হল।

নদীর কাছাকাছি এসে একটি কালো বাদাখশানী ঘোড়া, যেটির ওপর বসেছিল খাজা কালোনবেগের এক অনুচর, হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। অনুচরটি লাফিয়ে নেমে পড়ে জিন ধরে, লাগাম ধরে টানাটানি করতে লাগল ঘোড়াটিকে তোলার জন্য, কিন্তু ঘোড়াটির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল ফেনা আর রক্ত, পা ছুঁড়তে লাগল সে। অনুচরটি সরে গেল ঘোড়ার পায়ের আঘাত লাগার ভয়ে।

'আরে ঘোড়ারও সর্দিগর্মি হল দেখছি!' বিষণ্ণ গলা কালোনবেগের। 'এমন ঘোড়া এখন পাওয়া দুষ্কর!'

'একটা ঘোড়ার জন্য মনখারাপ করার মানে হয় না, মহামান্য বেগ! আপনার লোকটিকে একটি ঘোড়া দেবার আদেশ দেব আমি!'

'চিরকৃতজ্ঞ রইলাম, জাঁহাপনা!' বিষণ্ণ হাসি ফুটল খাজা কালোনবেগের মুখে, 'ঘোড়াটা আসল ব্যাপার নয়, এই ঘটনার মধ্যে আমি দেখছি আমার নিজের ভবিষ্যৎ!'

তীরে পৌঁছে, ঘোড়া থেকে নামলেন বাবর, জাহাজের দিকে দেখিয়ে বললেন:

'আপাতত ঐ হল আপনাদের ভবিষ্যৎ মহামান্য বেগ মহাশয়গণ! এখন নিশ্চিন্ত বিশ্রামে ডুব দেব আমরা!'

ছোট ছোট নৌকায় করে এগিয়ে গেলেন তাঁরা জাহাজের কাছে, জাহাজে উঠলেন তারপর। বাবর খাজা কালোনবেগের সঙ্গে জাহাজের সামনের দিকে দাঁদোয়ার নিচে বসলেন একান্তে। জাহাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে চমৎকার হাওয়া গায়ে লেগে জীবনকে মনে হচ্ছে উপভোগ্য।

পরিচারকরা নিয়ে এল লেবুর আর কমলালেবুর ঠান্ডা শরবৎ। একবাটি কমলালেবুর রস একচুমুকে খেয়ে নিয়ে খাজা কালোনবেগের মনে হল 'ভারতবর্ষে থাকার কিছু কিছু ভাল দিকও আছে!' অর্থভরা দৃষ্টিতে তাকাল সে বাবরের দিকে।

'জাঁহাপনা, আগ্রাতে আপনার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে, গায়ের রঙ কালো হয়ে গেছে, মুখচোখ বসা। যদিও আপনি লুকাবার চেষ্টা করেন কত কষ্ট হচ্ছে সবদিক সামলিয়ে চলতে.. অন্য বেগরা হয়ত তা বুঝতেই পারে না, কিন্তু আমি আন্দাজ করতে পারি, বুঝি, অনুভব করি।'

'হ্যাঁ বেগ আপনি আমার সঙ্গে আছেন... প্রায় ত্রিশ বছর। কতকিছুর মধ্যে দিয়ে এসেছি, তাই না? যত দুঃখবিপদ অতিক্রম করে এসেছি তার সঙ্গে যদি তুলনা করা হয় আজকের এই গরমের কষ্ট, তাহলে তা সামান্য মনে হয় না কি?'

খাজা কালোনবেগ জামার ভিতর হতে রেশমী রুমাল বার করে চোখের ওপর অঝোর ধারায় নেমে আসা ঘাম মুছে নিল:

'আমার মনে হচ্ছে, হুজুর, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, জোয়ান বয়সে শীতগ্রীষ্মের মধ্যে পার্থক্য বুঝতাম না। আর এখন, বয়স পঞ্চাশের ওপর... বুঝছি, ভারতবর্ষে আমার বয়স একসপ্তাহে বাড়ছে একবছর। আপনার বিশ্বস্ত পুরান বেগদের মধ্যে আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন কাসিমবেগ কাভ্‌চিন; তিনিও সম্প্রতি ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন, খোদা তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন। এবার এসেছে আমার পালা। বেশিদিন আর চলবে না, সত্যি, বেশিদিন আর নেই...'

'অমন কথা বললেন না আমার প্রিয় কালোনবেগ। সব খোদার ইচ্ছা—তা ঠিক, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এখনও বেশ কিছুদিন বাঁচবেন আপনি।'

'মস্তিষ্ক দিয়ে বিচার করে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে মানুষ মাভেরান্‌নহরের মত ঠান্ডা জায়গা থেকে এসেছে সে এই জ্বালিয়ে দেওয়া সূর্যের নিচে বেঁচে থাকতে পারে অন্তত ষাট বছর বয়স পর্যন্ত।'

'কেন? খুসরু দেহলভী—তিনি তো শহরিসিয়াবজের লোক—ভারতবর্ষে তিনি বেঁচে ছিলেন বাহাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত। এবার আপনি কি বলেন?'

খুসরু দেহলভী খাজা কালোনবেগের প্রিয় কবি ছিলেন, দিল্লির মধ্য দিয়ে সৈন্যদল নিয়ে যাবার সময় বাবর ও খাজা কালোনবেগ সময় করে নিয়েছিলেন নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমাধি দেখতে যাওয়ার জন্য, যেখানে আছে খুসরু দেহলভীরও সমাধি। নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা সমাধির কাছে। কালোনবেগ তখন মনে করিয়ে দেন দেহলভীর সেই প্রখ্যাত পংক্তিটি: 'প্রতিভাবান মানুষ হিন্দুস্তান যেতে চায়—তা অকারণে নয়!'— মনে করিয়ে দিয়ে নিজেই নিজের জন্য কেমন গর্ববোধ করেছিল তখন, হাস্যকর, কিন্তু অত্যন্ত মনছোঁয়া। অবশ্য তখন এমন দুর্দান্ত গরম পড়েনি এখনকার মত।

বাবর 'অকারণ' উচ্চারণ করেননি দেহলভীর নাম—সেই পংক্তি ও তাতে ফুটে ওঠা মেজাজ কি আবার ফিরে পাবেন না বেগ।

সবই মনে পড়ল কালোনবেগের, সব বুঝল, কিন্তু লজ্জিতভাবে কাশল কেবল একটু। সেই পংক্তিগুলি বলল না। বলল:

'জাঁহাপনা, দেহলভী—মহান ব্যক্তি। আমি কোন কিছুতেই তাঁর ধারেকাছেও যাই না...'

'আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য এই নয় বেগ যে মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা—মনে আছে, আপনি বলতেন যে তাঁদের কাজ আপনি চালিয়ে যেতে চান। তা—সম্ভব ও প্রয়োজন...'

'জাঁহাপনা, বড় বড় কাজ আপনি আরম্ভ করেছেন আফগানিস্তানেও। সেখানে আমি আপনার সে সব কাজ চালিয়ে যাব। আমার অনুরোধ, গজনী যেতে অনুমতি দিন আমাকে।'

'আবার গজনী! ভুলে গেছেন আপনি গজনীতে কি প্রচণ্ড কষ্টকর জীবনযাপন করতে হয়েছে। মাহ্‌মুদ গজনবীর তৈরি ভাঙা বাঁধটা সারাতে চেয়েছিলাম আমরা—পারিনি! যখন লোক পেয়েছি অর্থে কুলায়নি। আর যখন অর্থ সংগ্রহ করেছি তো অন্য কিছুর অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এখানে সব কিছু আছে কালোনবেগ, ভারতবর্ষ হল শক্তি আর সম্পদের মহাসমুদ্র!'

'সে মহাসমুদ্র যেন... আমার মত একজন সামান্য মানুষকে, বিদেশ থেকে আসা মানুষকে... গিলে না ফেলে। এখানে আমার কোন নাম বা চিহ্নই আর থাকবে না!'

খাজা কালোনবেগ নিজের কথা বলছে, কিন্তু বাবর বুঝলেন, সেকথাগুলি সে বলছে বাবরের সঙ্গে যারাই ভারতবর্ষে এসেছে তাদের সবার কথাই মনে করে, এমনকি বাদশাহ্‌র কথাও। অন্যান্য বেগরাও প্রায়ই কানাকানি করে:

'হিন্দুদের এই জনসমুদ্রের মাঝে এক ফোঁটা জলের মতই হারিয়ে যাব আমরা, তার চেয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল যত ধনসম্পত্তি পারা যায় সঙ্গে নিয়ে।'

'আপনি চান 'নাম বা চিহ্ন রেখে একসঙ্গে দেখলাম নতুন জারাফশান বাগিচা। বেঁচে থাকলে আরও অনেক কিছু দেখতে পাব কেমন করে এই সব জায়গায় গড়ে উঠবে নতুন নতুন বাগান, প্রাসাদ, সমরখন্দে বা হীরাটে যেমন আছে তার চেয়েও সুন্দর। ওখানে অন্ধকার, পতন আরম্ভ হয়েছে ওখানে। কিন্তু সমরখন্দে আর হীরাটে যার আরম্ভ হয়েছে এখানে তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব আর প্রয়োজনও! আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা কি তা মনে রাখবে না, বেগ, আমাদের জয় গাইবে না?'

'আমীর তৈমুর কিন্তু তা করেননি। মাহমুদ গজনবীও করেননি। ভারতবর্ষ জয় করে তাঁরা যত প্রয়োজন ধনসম্পদ নিয়ে গেছেন, নিজের দেশে সঙ্গে নিয়ে গেছেন প্রয়োজনীয় লোকদের।'

'কিন্তু এখন তাঁর রাজ্য কোথায়? মাহ্‌মুদের পথ অনুসরণ করতে হবে নাকি আমাকে?'

'জাঁহাপনা, আপনি সত্যই অন্য ধরনের লোক, বিরুনী আর দেহলভীর আদর্শ

আপনাকে বেশি আকর্ষণ করে। কিন্তু... আমরা কি তরবারির সাহায্যেই ভারতবর্ষ জয় করছি না?'

নীরব রইলেন বাবর। একাগ্রমনে নদীর দিকে তাকিয়ে হাওয়ার দিকে মুখ ঘোরালেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন:

'বেগ আমরা তো লুঠ করতে আসিনি এখানে। তাছাড়া এ দেশের সব ধনসম্পত্তি, সব গুণী লোকদের নিয়ে যাবার মত গাড়িঘোড়াও নেই আমাদের!... উল্টে আমিই প্রতিভাবান স্থপতি-বিজ্ঞানীদের এখানে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি খোরাসান, মাভেরান্নহর এমনকি ইরান থেকেও। আজ আপনি দেখেছেন আন্দিজানের মওলানা ফজলুদ্দিনকে। খোদার যদি দোয়া হয় তো শীঘ্রই তেব্রিজ থেকে এসে পৌছবেন মুহানদিস সুলেমান রুমি, ফোয়ারা তৈরির ক্ষমতার জন্য যাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছে। হীরাটের ঐতিহাসিক খোন্দামিরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি... না, না বেগ, এখন আমরা এখানে আর বিদেশী নই। আর বিদেশী থাকব না আমরা। সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করতে হবে এই দেশের পিছনে। তখনি কেবল মুখব্যাদান করে থাকা খাদের ওপর সেতু গড়তে পারব আমরা...'

কোন খাদের কথা বলছেন শাহ্ বুঝল না কালোনবেগ, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করল না। সে জানে যে এই ধরনের তর্কে যুক্তিতে আর বাকচাতুর্যে বাবর সর্বদাই শ্রেষ্ঠ। খাজা কালোনবেগ ভাব দেখাল যেন এই তর্কযুদ্ধে সে পরাজয় স্বীকার করছে, তারপর আরম্ভ করল তোষামুদে সুর, যা তার ধারণায় শাসকদের কাছে সর্বদাই প্রিয়।

'হুজুর, আপনার ইচ্ছা ও মনের জোর দুই-ই বেশি। আপনার জায়গায় অন্য কেউ হলে যত দুঃখকষ্ট আপনাকে ভোগ করতে হয়েছে তার দশভাগের একভাগও সহ্য করতে পারত না। এত সব কষ্টের দিন পেরিয়ে এসেছেন আপনি, এবার এমন এক কাজ করতে চান তা কার উপযুক্ত কে জানে... সিকন্দর না জমশিদের? নাকি রুস্তমের? এতদিন আপনার কাছে কাছে কাটিয়ে আরও বিশেষভাবে নিশ্চিত হলাম যে আপনার কোন বিশেষ মহান ক্ষমতা আছে। নিজেকে আপনার পাশে মনে হয় বিরাট পাহাড়ের কাছে একটা ছোট্ট টিলা। আপনার যা আছে, আমার তা নেই। প্রত্যেকেরই ভাগ্য তার মত করেই নির্দিষ্ট।'

খাজা কালোনবেগের স্বর প্রায় স্বাভাবিক আবেগে কেঁপে গেল। চুপ করে গেল বেগ। বাবর ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলেন দেহলভীর একটি পংক্তি:

'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে, সবাই—আদমের বংশধর।'

'কিন্তু হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়... আর যদি আমি চেষ্টা করি সে বোঝা তুলতে, যা আপনি বয়ে নিয়ে চলেছেন, তো পড়ে যাব আমি... জাঁহাপনা, হুজুর, আপনি তো চান যে আমি অন্তত আরও বছর পাঁচেক বাঁচি? যেতে দিন আমায়।

গজনী চলে যাই আমি। পুরান বাঁধটা দাঁড় করাব আবার। মরুভূমিতে জীবনের সাড়া জাগাব আপনার নাম নিয়ে।'

চিন্তায় ডুবে গেলেন বাবর। কালোনবেগ বুঝল শাহ্‌র মনের কোন একটা তারে ছোঁয়া লেগেছে যাতে আর একটু টান দিলেই নিজের উদ্দেশ্য সফল করা যাবে।

'জাঁহাপনা, হুজুর, আমার অনুরোধ রাখুন। জীবনের শেষ দিনগুলির প্রার্থনায় আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাব অবিরত। এ দেহ রাখতে চাই আমি গজনীর মাটিতে, মাতৃভূমির কাছাকাছি।'

বাবর লক্ষ্য করলেন কালোনবেগের চোখ ভিজে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করলেন:

'যদি অন্যান্য বেগরাও আপনার পথ অনুসরণ করে... আমার সঙ্গে কে থাকবে?'

'বেগদের সঙ্গে কথা বলব আমি। বলব যে 'জাঁহাপনা আমাকে পাঠাচ্ছেন গজনীর বাঁধটি দাঁড় করার জন্য। আমি এমনভাবে যাব যে কেউ আমার পথ অনুসরণ করবে না, বিশ্বাস করুন।'

বাবর তখনও জানেন না যে খাজা কালোনবেগ পানভোজনের সময় বেগদের সঙ্গে বাজী রাখে যে শাহ্‌র অনুমতি নিয়ে গজনী চলে যাবে। তাই এখন সর্বরকম চেষ্টা চালাচ্ছে অনুমতি পাবার, এমন কি অবমাননা সহ্য করেও বাজী জিততে হবে, দুঃখ হচ্ছে তার যে বাবর বাধ্য করছে তাকে মাথা নিচু করতে, একবারও তো বলছেন না যে খাজা কালোনবেগ প্রভাবশালী, শৌর্যবান আমীর।

'ঠিক আছে, অনুমতি দিলাম,' বললেন বাবর, 'কিন্তু প্রথমে কাবুল যাবেন, মহিম বেগমের জন্য পত্র ও উপঢৌকন নিয়ে যাবেন... হীরাট, সমরখন্দ, তাব্রিজ ও অন্যান্য শহর থেকে আমাদের আমন্ত্রণে যে সব বিজ্ঞানী ও কারিগররা এখানে আসছেন তাদের পথের খরচ যোগাবার আদেশ দিয়েছি আমি। কিছু অর্থ আপনিও কাবুলে নিয়ে যান, সেখানেও আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু লোককে পথের খরচ দিতে হবে... কৃপণতা করার দরকার নেই, বেগ,' খাজা কালোনবেগের মুখে অসন্তোষের ছাপ দেখে বললেন বাবর। 'অর্থ আপাতত প্রচুর আছে আমাদের। যে কোন পরিশ্রমের সর্বোচ্চ মূল্য দিতেও সক্ষম। যারা শয়বানীর লোকদের নিষ্ঠুরতায়, শাহ্ ইসমাইলের সৈন্যদের স্বেচ্ছাচারীতায় কষ্ট ভোগ করেছে, যারা নিজেদের কাজ করার ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চাইছে তাদের সবাইকে আমাদের হয়ে আমন্ত্রণ জানাবেন। এখানে আসুক তারা সবার জন্যই উপযুক্ত কাজ আছে এখানে।'

'সর্বান্তকরণে পালন করব আপনার আদেশ। এমন করব যে আমি একা চলে যাবার পরিবর্তে শত শত প্রয়োজনীয় লোক এখানে এসে পৌঁছবে।'

বাবরের মনে হল খাজা কালোনবেগ আন্তরিকভাবেই বলছেন কথাগুলি। কিন্তু সে গজনীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবার পরেই আগ্রার যে বাড়িতে ধূর্ত বেগ থাকত তার

দেওয়ালে ফার্সীতে লেখা দুইছত্রের একটি কবিতা আবিষ্কৃত হল যাতে তার মনের কথা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে:

সিন্ধু দেশ নিয়ে চলে যাব, এই কসম আমার,
অভিশাপ লাগে লাগুক, হিন্দে ফিরব না আর!

দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে লেখা কবিতাটি শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়ল সেই সব বেগদের মাঝে যারা শাহ্‌কে ঘিরে থাকে ও যারা কালোনবেগের পথ অনুসরণ করতে চায়। একদিন বাবর হিন্দুবেগের কাছ থেকে জানতে পারলেন অন্যান্য বেগদের সঙ্গে কালোনবেগের বাজী ধরার কথা।

'ধূর্ত, হয়তান!' ক্রুদ্ধ বাবর বললেন। 'বাজীও জিতল, আমাকে বোকা বানাল। ঠিক আছে, দেখা যাবে, শেষ পর্যন্ত কে জেতে,' অনেকক্ষণ ধরে উত্তেজিতভাবে পায়চারী কতে লাগলেন শাহ্‌।

কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় কালোনবেগের বিরুদ্ধে? এই আদেশ দিয়ে দূত পাঠান যে খাজা কালোনবেগকে গজনীর শাসকপদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল, বাঁধ তৈরির কাজেই কেবল লাগুক সে শাসকপদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে? কিন্তু তাহলে বৃদ্ধ বেগের, হোক সে ধূর্ত, সবরকম সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে, তাকে তো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। কি করা যায়? চুপ করে থাকবেন? তাঁর আত্মাভিমান বা সুচিন্তিত বিবেচনাবোধ কোন কিছুই তাতে সায় দিচ্ছে না কারণ কালোনবেগের সহজ সরল কবিতাটি তো সেই সব বেগদের আরো উসকিয়ে দিতে পারে যারা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। আর যদি তিনি কালোনবেগকে কোন প্রকার শাস্তি দেবার চেষ্টা করেন তো বয়েৎটি আরও বেশি প্রচারলাভ করবে।

'সে বয়েৎটি এখনও দেয়ালে শোভা পাচ্ছে?' হিন্দুবেগকে জিজ্ঞাসা করলেন বাবর।

'না, মুছে ফেলেছি আমি।'

'বৃথা প্রচেষ্টা। মুছে ফেলার চেষ্টা করলে লোকে তা আরও বেশি করে মনে রাখবে।' হঠাৎ বাবরের মনে এক পরিকল্পনা খেলে গেল। 'এই কে আছে, লিপিকরকে ডাক, শীঘ্র!'

কাগজ ও কালিকলম হাতে নিয়ে তরুণ লিপিকর এসে শাহ্‌র সামনে কুর্নিশ করে নত হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

'লেখ!.. আরে ভাল হয়ে বোস!'

উবু হয়ে বসল লিপিকর, হাঁটুর উপর কাঠের ফলকটি রেখে কাগজটি হাত দিয়ে সমান করে নিয়ে কলম প্রস্তুত রেখে অপেক্ষা করে রইল।

ধন্য বাবর, ভাগ্যলক্ষ্মী সদয় তোমার:
সিন্ধু, অসীম হিন্দুস্তান তাঁর উপহার...

না: আরও পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তোলা দরকার যে ভারতবর্ষ আমাদের কাছে বিদেশ নয়, এ হল আমাদের দ্বিতীয় মাতৃভূমি।

দৃঢ়স্বরে দ্রুত উচ্চারণ করলেন বাবর:

ধন্য বাবর, ভাগ্যলক্ষ্মী সদয় তোমার:
নবগৃহ তব মহাহিন্দ, এ যে তার উপহার।
রোদ গরমের দুষমন যাক গজনিতে চলে,
তাঁরই হুকুম কমজোরিদের সেখানে যাবার

উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল হিন্দুবেগ, খাজা কালোনবেগ সত্যিই অত্যন্ত অহঙ্কারী ধরনের ছিল, বিনয়ের ধারেকাছেও যেত না, ভাবত যে অন্যদের চেয়ে সে নিজে অনেক বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

'বয়েৎটি তিনটি আলাদা পাতায় লেখ,' বললেন বাবর। 'একটি নকল যাবে খাজা কালোনবেগের কাছে, একটি হিন্দুবেগ আপনি নেবেন, কালোনবেগের বয়েৎটি বলে যারা সেই সব বেগ ও সৈন্যদের পড়তে দেবেন এটি। এই মুশায়রাতে কার জিত হয় দেখি।'

একদিন যখন বাবর শুনলেন 'গরম গরম' করে নাকেকান্না কাঁদার সময় একজন বেগকে অন্য বেগরা বলল 'গজনী চলে যেতে' 'হৃদয়হীন আর দুর্বলের যেখানে স্থান,' তখন বাবর বুঝলেন যে তাঁর লক্ষ্য নির্ভুল।

৩

পানিপথের যুদ্ধের পরে প্রায় তিনমাস তাহির উঠে দাঁড়াতে পারেনি। প্রাসাদ থেকে তার জন্য পাঠান হাকিম তার ক্ষতস্থানগুলি অনেক কষ্টে সারিয়ে তুলেছে, কিন্তু পাঁজরার হাড়ের ফাটল আর হাতের ভাঙা হাড়ে কিছু করতে পারেনি। দিনরাত্তির যন্ত্রণায় ভুগছে সে। শক্তিশালী যোদ্ধা তাহির প্রাণপণে চেষ্টা করত গোঙানি যাতে না ছড়িয়ে পড়ে আগ্রার এই ছোট্ট বাড়িটিতে, এখানে তার একান্ত অনুগত মামাত আর সে থাকে। 'বোধ হয় এখান থেকেই সোজা কবরে গিয়ে উঠব,' প্রায়ই ভাবত তাহির।

ঠিক এমনি সময়েই মওলানা ফজলুদ্দিন কাবুল থেকে এসে পৌঁছলেন তাহিরের ছেলে সফরকে নিয়ে, মাদ্রাসাতে পড়াশোনা শেষ করে এখন সে মহান্দিস হয়েছে।

নির্মাণকার্যে নিযুক্ত ভারতীয় কারিগরদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা এক প্রখ্যাত বৈদ্যকে নিয়ে এল তাহিরের কাছে। মওলানা ফজলুদ্দিন শুনেছেন যে ভাঙাহাড় জোড়া লাগাতে ওস্তাদ এই বৈদ্য আর গরিবের প্রতি তার সহানুভূতিও আছে। অর্থাৎ হৃদয়বুদ্ধি দুই-ই ভাল তার।

'আমার ভাগিনা তাহির বেগ হয়ে জন্মায়নি, হুজুর,' বৈদ্যকে বললেন স্থপতি, 'পরিশ্রমী কৃষকবংশের ছেলে সে, অন্নদাত্রী মাটিতে ঘাম ঝরিয়েছে সে কত। ও যে সৈন্যদলে যোগ দেয় তাতে আমার ইচ্ছা ছিল না। ওশে তোকে কতবার বলেছিলাম, ঠিক কিনা, তাহিরজান?'

'ওঃ কেন যে তখন আপনার কথা শুনিনি, মামা,' দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁহিরের, 'বেগ হয়ে নিজেকে একেবারে বিরাট একটা কিছু ভেবে নিয়েছি...'

মওলানা ফজলুদ্দিন ফার্সীভাষার সঙ্গে কয়েকটি উর্দু শব্দ যোগ দিয়ে আসল কথাটি বুঝিয়ে দিলেন:

'কেবল যুদ্ধ আর লড়াইয়ের চিন্তা যাদের মাথায় সেই সব বেগদের দল থেকে সরে আসবে আমার ভাগিনা। অন্য কোন সাধারণ কাজ করতে চায় সে। যেমন মামাত করছে বাগিচা নির্মাণের কাজ। যেমন আপনি মহান তাবিব... আমার অনুরোধ ওকে সারিয়ে তুলুন আপনি!'

'জানি মওলানা, যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে আপনি আসেননি আমাদের দেশে,' বললেন বৈজুবৈদ্য, 'আপনার সম্মানে আপনার ভাগিনেয়কে সারিয়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি।'

একমাস ধরে বৈজু চিকিৎসা চালালেন তাহিরের। আহত স্থানগুলিরওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে হাড়ভাঙা জায়গাটি নির্দিষ্ট করে অশেষ ধৈর্য ও দক্ষতায় চিকিৎসা করে চললেন—কি সব তরলপদার্থ মাখিয়ে, পটি বেঁধে। চিকিৎসাচলাকালীন এক ফোঁটা রক্তও পড়েনি তাহিরের। বদ্যির হাতের সাদা তালু আর ময়লারঙের রোগা রোগা আঙুলগুলির স্পর্শ অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

চিকিৎসার জন্য পরিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করলেন বৈজু। তাহিরকে বললেন:

'তুমি যে আমার হাত তোমার চোখের কাছে ঠেকিয়েছ ঐ তো হল তোমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন।'

'না, না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি আপনার কাছে ঋণী থাকব!' বলল তাহির।

'কে জানে, হয়ত, আমি এখন একটা দেনা মেটালাম।'

অনেক অনুরোধ উপরোধের পর, ফজলুদ্দিন ও তাহির যখন প্রতিজ্ঞা করল যে বৈজুর কাছে তারা যা শুনবে তা কাউকে বলবে না তখন বৈজু তাদের বললেন তাঁর ভাইয়ের কথা যে মাহুতের কাজ করে। ইব্রাহিম লোদীর আমলে ভাই আগ্রায় কোন

কাজ না পেয়ে পাঞ্জাব চলে যায়। সে শোনে যে শাহ্ বাবর আমাদের অনেক লোক মেরেছেন, শপথ নেয় যে 'ঐ বিদেশীদের আমাদের দেশে ঢুকতে দেব না কিছুতেই!' শত্রুদলের পথপ্রদর্শক হল সে আর তাদের নিয়ে গেল দুর্ভেদ্য জঙ্গলে, জলাভূমিতে।

'আচ্ছা।' তাহিরের মনে পড়ল লাল কুমারকে, 'তার হাতী তখন আমাদের দুজন সৈন্যকে আহত করে। কিন্তু সে পালায়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তার সাহস দেখে অবাক হয়েছিলাম আমি। একটা গোটা সৈন্যদল দেখেও ভয় হয়নি তার। আমরা ভেবেছিলাম, সে নিজেও জঙ্গল জলাভূমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারেনি। তার মানে পেরেছে, বেঁচে আছে সে?'

'বেঁচে আছে, কিন্তু আগ্রা আসতে ভয় পাচ্ছে... আমার ভাই যে আপনার দুই সৈন্যকে আঘাত করেছে এ অন্যায় ঠিকই, কিন্তু আমি যে তাহিরকে সারিয়ে তুললাম এতে সে অন্যায়ের কিছুটা অন্তত প্রায়শ্চিত্ত হল, তাই নাকি?'

'বৈজুমহাশয়! মাতৃভূমি রক্ষা করা—আর এমনি অসমসাহস দেখিয়ে—এ তো অন্যায় নয়ই, এ বীরত্বের পরিচয়!' ফজলুদ্দিন আর তাহির দুজনে মিলে বলে উঠল।

'ধন্যবাদ বন্ধুরা। কিন্তু বীরত্বে তো আর পেট ভরে না! নিজের দেশে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াতে হচ্ছে ভাইকে। কাজ নেই, ছেলেমেয়েদের খাওয়াবার সামর্থ্য নেই।'

'আপনার ভাই কখনও নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণ করেছে?'

'হ্যাঁ গাছের গুঁড়ি আর পাথর বইতে শিখিয়েছে সে নিজের হাতীকে।

'তাহলে আমার কাছে চলে আসুক সে, আমরা এমন যোদ্ধা হাতীগুলিকে অন্য কাজ করতে শেখাচ্ছি।'

'সে কথা শুনেছে আমার ভাই। সেও আর সবার মত খুশি যে আপনাদের শাহ্ সেই সব অর্থ ব্যয় করছেন শহরকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য যা লুকিয়ে রেখেছিলেন ইব্রাহিম লোদী। তবু ভয় হয়, বড় ভয় হয় কেউ ধরে ফেলবে ভাইকে... হুজুর,' মওলানার উদ্দেশ্যে বললেন বৈজু, 'আমরা শুনেছি যে আপনাদের শাহ্ আপনাকে মান্য করেন, এ সব নির্মাণকার্য চলেছে আপনারই নির্দেশে, আগ্রায় দেহলপুরে, সিক্রিতেও। শাহ্ বাবরের কাছে আপনি আমার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা চাইতে পারেন না কি?'

মাথা নাড়ালেন ফজলুদ্দিন:

'যদিও মির্জা বাবর কবি ও শিক্ষিত ব্যক্তি, তবুও কথায় বলে জানেন তো 'সিংহ আর বাদশাহ্র কাছে যাওয়া একই কথা?...' আপনার ভাই বরং নাম আর চেহারা একটু বদল করে ফেলুক।'

'তা করেছে। এখন তার নাম কৃষাণ। বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি রেখেছে।

'ভাল কথা। এক সপ্তাহ বাদে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন। এখানে নয়— দেহলপুরে। সেখানে এমন ব্যবস্থা করব যেন কেউ তার অতীত জানতে না পারে।'

৪

আগ্রাতে যখন বর্ষাকাল নামল তখন একদিন তাহির এল বাবরের প্রাসাদে।

অতিকষ্টে চিনলেন শাহ—তাঁর অনুগত বেগকে, দাড়িগোঁফ একেবারে সাদা হয়ে গেছে, কাঁধের ভিতরটা যেন ফাঁকা এমনিভাবে ঝুলে আছে। মুখের পুরান দাগটার পাশে, থুতনিতে, ঘাড়ে নতুন নতুন দাগ পড়েছে যেন তাপ্পির মতন।

'আল্লাহ্‌র দোয়া যে তুমি সেরে উঠেছ, বেগ,' বেশ খুশি দেখিয়ে বললেন বাবর তাহিরকে। 'তোমার মামা কাবুল থেকে এসে পৌঁছানয় ভালই হয়েছে।'

'হ্যাঁ, খোদাই ওঁকে এনে দিয়েছেন... আমার জীবন রক্ষা করেছেন তিনি।'

'কবে আবার কাজে লাগবে, বেগ?'

ডানহাতটা ভাঁজ করতে পারে না তাহির, ঘাড়টা বাঁকাতেও কষ্ট হয়: যদি বাঁদিকে বা ডানদিকে দেখার দরকার পড়ে তো সারা দেহটাকে ঘোরাতে হয়।

'আমি আর দেহরক্ষী হতে পারব না হুজুর।'

'সে কথা বলছি না... তুমি আমার অন্তরঙ্গ বেগদের মধ্যে থাকলে খুশি হব।'

'আগেও আমি বেগ হতে পারিনি... এখন আর হতে চাইও না।'

'কেন?'

কোন কিছু গোপন না করে বলে যেতে লাগল তাহির, (বাবর মন দিয়ে শুনতে লাগলেন) কেমন করে পানিপথের যুদ্ধের ঠিক আগেই গর্বিত, মত্ত অবস্থায় সে তার অনুচর মামাতকে (নিজের বন্ধুকে, হুজুর!) অমানুষিকভাবে মারে আর তারপরে যা ঘটে সেসব কথা।

'বিছানায় শুয়ে ভোগ করেছি যন্ত্রণা যতটা না ক্ষতের কারণে তার চেয়ে বেশি বিবেকের দংশনে, জাঁহাপনা আমি বেগ হবার উপযুক্ত নই... কৃষক আমি। আর যোদ্ধাও। কিন্তু এখন পঙ্গু আমি। আমাকে ঐ বাগিচায় কাজ করতে অনুমতি দিন, যেটি নির্মাণের কাজ চালাচ্ছেন আমার মামা। গাছে জল দেব, ফলগাছ বসাব। আগে কেবল চাষের কাজই না, কুভাতে বাগানের কাজ করতেও খুব ভালবাসতাম আমি...'

শুনছেন বাবর বর্ষার জলভরা মেঘের দিকে তাকিয়ে—সুন্দর... সৌন্দর্য মিলিয়ে যাবার সৌন্দর্যে সুন্দর। তাহিরের ভাল করার উদ্দেশ্য নিয়েই তাকে বেগ করেছিলেন, কিন্তু এখন বুঝলেন তাতে তাকে সুখী করতে পারেননি।

'ঠিক আছে: যা চাও তাই হবে। আমার যোদ্ধা বেগ আমার সঙ্গী আর বেগ থাকবে না, বাগিচার তদারককারী। তুমি তো বেগদের হাত থেকে রক্ষা পাবে, আর আমি... কেমন করে রক্ষা পাব তাদের হাত থেকে?'

দিশাহারা বোধ করল তাহির, কিন্তু তবুও উত্তর এসে গেল তার মুখে:

'আপনি তো... শাহ্। কৃষক আর শাহ্—এ তো আর এক হল না। বেগরা আপনার অধীন...'

'অধীন হয়ে অধীন করেও। এক মুহূর্ত আলগা দিলেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন গভীরে নামিয়ে নিয়ে যাবে যে আর উঠে আসতে হবে না সেখান থেকে। ডুবিয়ে মারবে... ইসফারাতে আমি তোমায় কি বলেছিলাম মনে আছে?'

'কবরে যাওয়া পর্যন্ত সে কথাগুলি আমার মনে থাকবে জাঁহাপনা।'

'তুমি কি বলেছিলে তখন? কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে? 'চিরজীবন আপনার সঙ্গে থাকব',—মনে আছে?'

'জাঁহাপনা, তখন আমার জোয়ান চেহারা ছিল... এখন অক্ষম আমি আপনার কোন কাজে লাগব?'

'আমার প্রাসাদে একজন লোক দরকার যে মনপ্রাণ দিয়ে তদারক করবে আমার একান্তে বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট মহলটি।'

সেই মহলে নির্জনে বসে বাবর লিখতেন। তাহির জানে বাবরের জীবনের সবচেয়ে প্রিয়, মধুর মুহূর্তগুলি কাটে সেখানেই। কিন্তু প্রাসাদের কর্মচারীদের ষড়যন্ত্র, রটনা বাঁকাচাউনির কথা মনে হল তাহিরের: শাহ্‌র প্রিয়পাত্রকে কেউ ভালো চোখে দেখে না!—তাই আবার চেষ্টা করল বাগানে মামার কাছে কাজ করার অনুমতি পাবার।

'হুজুর, অপরাধ মাফ করবেন। বাগানে কাজ করতেই আমার প্রাণ চাচ্ছে...'

'আচ্ছা, এবার আমার 'বিশ্রামমহলটি' তৈরি করার কথা বাগানে,' বললেন বাবর। 'মহল তৈরীর কাজ শেষ হলে তুমি সেটি তদারকের ভার নেবে। কেমন?'

এবার আর না বলা চলে না। তাছাড়া বাবরের কথা অমান্য করতে অভ্যস্তও নয় সে। সম্মতি ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য অবাধ্য ডানহাতটাকে কষ্টে রাখল বুকের কাছে।

দু'মাস হল আগ্রায় বর্ষা চলেছে। গরম কমেছে ঠিক, কিন্তু স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াতেও বিরক্তি লাগে।

আগ্রা ছেড়ে কোথাও যান না বাবর আর প্রতি সন্ধ্যায় বাগানের মাঝে নির্মিত বিশ্রাম মহলে চলে যান। চারটি ঘর আছে বাড়িটিতে। দু'জন ভৃত্য বাড়িটি পরিষ্কার রাখে। তাহির পানীয় ছাড়াও প্রধানত বই, নকল, কাগজ-কলম-কালি এসবের যোগান দেবার দায়িত্বে নিযুক্ত। সবচেয়ে আরামদায়ক ও কোলাহলহীন ঘরটিতে রাখা আছে একটি আটকোণা টুল, যেটির ওপর কাগজ রেখে লিখতে ভালবাসেন বাবর। পাশের ঘরে দস্তরখান-চাদর বিছিয়ে তার ওপর রাখা থাকে জলভরা কলস, জলে গোলাপজল মেশান সুগন্ধের জন্য, আর থালায় সাজান আছে পান-সুপারী।

একবার তাহির দস্তরখানের ওপর রেখেছিল গজনীর সুগন্ধী মদভরা একটি কলস। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায়ই বাবর বললেন:

'সরিয়ে নাও ওটা! ভোজউৎসবে যথেষ্ট পান করা গেছে, আর নয়!'

সেই থেকে তাহির আর কখনও বিশ্রামমহলে মদ পরিবেশন করেনি।

যদি বাবর সারারাত জেগে বসে লিখেছেন কখনও তো তাহিরও চোখ বোঁজেনি সকাল পর্যন্ত।

বাবর জানেন যে তাঁর ভূতপূর্ব বেগ জেগে বসে আছে দালানে, কখনও কখনও বেরিয়ে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করতেন তিনি।

একবার জিজ্ঞাসা করলেন:

'তাহিরবেগ তোমার মনে আছে বাদাখশানের বনে আমরা একরকম ছোট্ট গাছ দেখেছিলাম মিষ্টি গন্ধ আছে তাতে? কি নাম তার? দেখকাত আর আসমান ইয়ালাউ পাহাড়েও অনেক জন্মায় সে গাছ... হালকা-নীল রং। কোথায় যেন লিখে রেখেছিলাম নামটা... খাতাটা বোধহয় কাবুলে রয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না কিছুতেই।'

'ঘোড়া খায় নাকি সেই গাছগুলো?'

'হ্যাঁ, ভালবাসে ঘোড়া... গোছায় গোছায় জন্মায়।'

'বেতক?'

'হ্যাঁ বেতক, বাঃ দারুণ? বেতক, বেতক... আসলে—বুতাকা! হ্যাঁ—গোছা গোছা জন্মায়... 'বুতক' হল ডাল, শাখা, আর বুতাকা—বাদাখশানে ঐ গাছটির নাম হল তাই।'

কখনও বাবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন একসঙ্গে নানান কষ্টে কাটান পুরান সেই দিনগুলির বিভিন্ন ঘটনার কথা বা কোন জায়গার কথা। তাহির জানে বাবর নিজের জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে বই লিখছেন। সেই বইরচনায় নিজেকেও একজন অংশগ্রহণকারী বলে মনে হয়, ভালই লাগে তার যে শাহ্‌র বিশ্রামমহলে কাটান এই দিনগুলি তার একেবারে বৃথা যাচ্ছে না।

একদিন মাঝরাতে তার কাছে বেরিয়ে এসে বাবর বিষণ্ণস্বরে আবৃত্তি করলেন:

স্বদেশ ছেড়েই চলে যাব বলে ঠিক করি—ক্লান্ত ছিলাম।
মনে নেই কোনো শান্তি, সুদূরে রোগে পড়ি—রুগ্ণ হলাম।
স্বাধীন খেয়ালে হিন্দুস্তান জয় করি, শুধু এখন
স্বাধীনতা নেই ফেরার, বছর গেছে ঝরি,—ক্লান্ত আমি।

এই পংক্তিগুলি তাহিরের মনে এমন আলোড়ন জাগাল যে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সে।

নীরবে তারা নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে গেল। চিন্তা করতে লাগল নিজেদের স্ত্রীদের কথা: বাবরের বেশি করে মনে পড়ছে মহিমবেগমের কথা আর তাহিরের—রোবিয়ার কথা।

'কবে তাদের দেখতে পাব আমরা, হুজুর? ন'মাস কাটল আমরা তাদের ছেড়ে আগ্রায়।'

'রাস্তাঘাট এখনও বিপজ্জনক। বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। তাছাড়া পরিবার নিয়ে সুখে ডুবে থাকার সময় এখন নয়, তাহিরবেগ। রাণা সংগ্রাম সিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন...'

'যখন আমরা কাবুলে ছিলাম তখন তো তিনি আপনার সঙ্গে চুক্তিস্থাপন করেন ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে।'

'আমাদের সাহায্যে দিল্লি ও আগ্রা দখল করতে চেয়েছিলেন তিনি। বীর তিনি একথা ঠিকই। কিন্তু যথেষ্ট ধূর্তও—ভেবেছিলেন আমরা ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে তারপর এখান থেকে চলে যাব। এখন দেখছেন যে আমরা রয়ে গেলাম, নতুন নতুন নির্মাণকার্য আরম্ভ করেছি। তাই আমাদের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয় করতে লেগেছেন। চিতোরের আশপাশের অনেক অঞ্চল দখল করে নিয়েছেন। আমাদের প্রতি যারা অসন্তুষ্ট তাদের একজোট করেছেন।'

'হ্যাঁ, হুজুর, অসন্তুষ্ট অনেকেই... অসন্তোষের কারণও আছে।'

সম্প্রতি আগ্রাদুর্গে যে ঘটনা ঘটেছে সেকথা মনে করিয়ে দিতে চাইল তাহির।

আগ্রাদুর্গের পিছনে এক বিরাট ফাঁকা জমি পড়ে ছিল। বাবরের আদেশে সেখানে ফোয়ারা সমেত এক জলাশয় নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। জলাশয় অত্যন্ত গভীর করে খোঁড়ার কথা, তিনটি কূপ তিন বিভিন্ন ধাপে—এই ছিল তেব্রিজের সুলেমান রুমির পরিকল্পনা, সম্প্রতি তিনি আগ্রা এসে পৌঁছেছেন। জলাশয়টির তলদেশ থেকে সিঁড়ির ধাপ উপর পর্যন্ত উঠে যাবার কথা। এক কথায় বিরাট কাজ এদিকে বাবর আদেশ দিয়েছেন ছ'মাসের মধ্যে জলাশয় নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে। এমন সময় বর্ষাকাল এসে গেল। ভারতীয় মিস্ত্রীরা বলে যে এসময়ে মাটি খোঁড়া উচিত নয়। তাদের কথা না শুনে বাধ্য করা হয় তাদের মাটি খুঁড়তে। তিনদিন আগে জলাশয়ের এক দিক ধসে পড়ে জলাশয়ের একেবারে তলদেশে মাটি খুঁড়তে থাকা চারজন লোকের ওপর। তাদের যখন তুলে আনা হল মাটি সরিয়ে দেখা গেল—তাদের মধ্যে তিনজন মৃত। আর চতুর্থজন পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙে চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেছে। ভারতীয় মিস্ত্রীরা দাবি জানায় ঐ সরকারকে শাস্তি দিতে যে তাদের মাটি খুঁড়তে বাধ্য করেছে, যে ঐ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। কিন্তু উজীর মহম্মদ আগা দুলদাই তাদের কথা তো শোনেইনি উল্টে তাদেরকেই দোষ দেয় যথেষ্ট সাবধান না হওয়ার জন্য। এই ঘটনার পরে তিনজন ভারতীয় মিস্ত্রী পালায় কাজ ছেড়ে—হয়ত রাণা সংগ্রামের দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে তারা।

মাটি ধসে মারা পড়া সেই লোকগুলির মৃতদেহ দেখেছে তাহির। তাদের হাতের তালুর রঙ তাহিরকে মনে পড়িয়ে দেয় হাকিম বৈজুর হাতের রঙ।

বাবরের দিকে ফিরে তাহির প্রশ্ন করল:

'জাঁহাপনা, আপনি জানেন কি কেমন করে ধস নামে?'

'হ্যাঁ, মুহম্মদ দুলদাই আমাকে সেকথা বলেছেন।'

'লোকে বলছে সরকারের দোষেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে...'

'মাটি খোঁড়া মজুরদেরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আমি আদেশ দিয়েছি এখন থেকে যেন কুয়াগুলির দেওয়ালে তক্তা আর ঠেকো লাগান হয়। তাহলে কাজ আর মোটেই বিপজ্জনক হবে না।'

'মিস্ত্রীরা পালিয়েছে শুনছি।'

'নতুন সরকারকে কাজে লাগিয়েছি, অন্য মিস্ত্রীরাও কাজ করছে। আগ্রাতে কাজের লোকের কোন কমতি নেই তো!'

অর্থাৎ কাজ বন্ধ থাকবে না। আবার ধস নামতে পারে। আবার নতুন করে লোক মরতে পারে।

সম্প্রতি বাবরের রচিত একটি কবিতা তাহিরের মনে জাগায় সেই কবিতার রচয়িতার প্রতি অন্যান্য অনুভূতির সঙ্গে মিশে থাকা এক ভালবাসার জোয়ার। কিন্তু এখন যেন ভাঁটা পড়ল সেই অনুভূতিতে, কেমন যেন ব্যবধান সৃষ্টি হল তাদের মধ্যে। একই লোকের মনে নিজের আপনজনের প্রতি এমন আবেগ উত্তাপ ও অন্যের দুঃখের প্রতি এমন উদাসীনতা কি করে স্থান পায়? সেই লোকটিকে তাহির বহুদিনই ভালবাসে, ভালবেসেছে! উত্তাপ আর হিম... ভাল ও মন্দ... শক্তি ও সৌন্দর্য—কেমন করে যে তারা মিলেমিশে যায় বোঝার জো নেই।

কষ্ট হল তাহিরের।

৫

প্রাসাদের পাকশালে শাহ্‌র জন্য রান্না করে বাহ্‌লুল, সেও দেখেছে মাটি ধসে চাপা পড়া মজুরদের; পানিপথের যুদ্ধে নিহত ভাইয়ের জন্য, মরা মজুরদের জন্য, সুলতানা বাইদার জন্য, যা কিছু এই বিজয়ী শত্রুদের কারণে হয়েছে সে সব কিছুর জন্য সে ঘৃণা করে তাদের।

বাইদার বিশ্বাসী দাসীর মাধ্যমে আহমদ বিষ যোগাড় করল বাহ্‌লুলের জন্য। অন্য একজন দাসী এক সুযোগে বাবরের প্রাসাদে ঢুকে জানাল সুলতানার আদেশ যে তাড়াতাড়ি করতে হবে, নাহলে বর্ষাকাল শেষ হলেই বাদশাহ রাণা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে অভিযানে যাবেন।

সামান্য একটুখানি বিষ, দু'চিমটি মাত্র, সাদা চারভাঁজ করা কাগজে মোড়া—যেন একটি বিশেষ ধরণের মশালা মনে হচ্ছে সেই ভয়ংকর অস্ত্রটিকে যার সাহায্যে বাহ্‌লুল

কেবলমাত্র ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধই নিতে চায় না বিদেশী দখলদারী শত্রুদের মাতৃভূমি থেকে দূর করে দেওয়াও তার উদ্দেশ্য। আহ্‌মদ বাহ্‌লুলকে বুঝিয়েছে: বাবরকে যদি মেরে ফেলা যায় তো তার দলের বাকী সবাই ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাবে, তখন ইব্রাহিম লোদীর ছেলে সিংহাসনে বসবেন।

বাবরের বিশ্বস্ত কয়েকজন লোক নিযুক্ত হয়েছিল শাহ্‌কে পরিবেশিত খাদ্য ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। সেদিন সন্ধ্যায় অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে, খাদ্যপরীক্ষার জন্য নিযুক্ত লোকগুলি বর্ষার আমেজে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছে... কড়াইতে ফুটছে সুস্বাদু মাংসের একটি পদ। বাহ্‌লুল জানে বাবর এই পদটি ভালবাসেন। সাবধানে জামার ভিতর থেকে বার করে আনল সে কাগজের মোড়কটি, চারপাশে তাকাল,—কেউ নেই পাকশালে,—পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিল, মাতাল লোকগুলি গান ধরেছে তখন।

হ্যাঁ, উপযুক্ত সময়!

থালার ওপর পাতলা একটা রুটি রেখে তার ওপর ছড়িয়ে দিল খানিকটা বিষ। এমন সময় হঠাৎ জোর হাওয়ায় বাইরের দরজাটা খুলে গেল ধড়াম করে, ভয়ে বাহ্‌লুল বাকী বিষটা আগুনের মধ্যে ঢেলে দিল তাড়াতাড়ি। আবার চারপাশ দেখে নিল। কেউ নেই বুঝে আশ্বস্ত হয়ে রুটির ওপর সাজিয়ে দিল মাংসের পদটি।

খানিক বাদেই বাবরের ভৃত্য থালাটি নিয়ে গেল বাবরের ভোজনকক্ষে। সেই সঙ্গে নিয়ে গেল অন্যান্য পদও।

আহমদ বলেছিল যে এ বিষে খাবারের স্বাদে কোন হেরফের হয় না আর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় না। তাই বাহ্‌লুল ভেবেছিল যে প্রাসাদে হৈচৈ আরম্ভ হবার আগেই সে প্রাসাদের বাইরে পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিতে পারবে। কিন্তু এমন এক ঘটনা ঘটল যা ছিল তার কল্পনারও বাইরে: মাতাল খাবার পরীক্ষকদের একজন এসে তার পথ আটকাল।

'আমাদের জন্য মাংস কোথায়?' টলতে টলতে জিজ্ঞাসা করল লোকটি।

'অন্য পদ আছে, হুজুর!'

'না, ঐ পদটাই চাই আমাদের!'

'কিন্তু বেশি ছিল না ওটা, সবটাই শাহ্‌কে পরিবেশন করা হয়েছে।'

'না, আমি জানি অনেকটা ছিল। কোথায় গেল তা? হ্যাঁ?' চীৎকার করে উঠল বিশালদেহী লোকটি।

'সব মাংসটা রান্না করিনি তো...'

'কর তাহলে এখন! এক্ষুনি!'

নিরুপায় বাহ্‌লুলকে আবার কাজ আরম্ভ করতে হল: তেল গরম করে, মাংসটাকে ছোট ছোট টুকরো করতে লাগল...

রাতের আঁধার ঢেকে ফেলেছে প্রাসাদকে, জোর হাওয়া বইছে। বৃষ্টিও পড়েই চলেছে।

এমন সময় হঠাৎ রক্ষীদের ছুটোছুটি আরম্ভ হল, কে যেন চেঁচিয়ে বলল 'হাকিম ডাক, হাকিমকে ডাক'! খাদ্যপরীক্ষকরা পরস্পরকে ধাক্কাধাক্কি দিয়ে দৌড়ল সে দিকে। গোলমাল বেড়েই চলল। ভোজনকক্ষের দরজার কাছে ভিড় জমে উঠেছে। তাহির সামান্য দূরে বিশ্রামমহলে ছিল—ছুটে এল সেখান থেকে।

বমি করছেন বাবর। মুখচোখ নীল হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তাঁর, দরজার দিকে যাবার জন্য পা বাড়াতেই টলে গেলেন, তাহির তাড়াতাড়ি কাছে এসে ধরে ফেলল তাঁকে।

ইউসুফি হাকিমও এসে পড়ল এবার।

'আইভানের ওপর গদী পেতে দাও!' আদেশ দিল ইউসুফি।

'না... বাইরে!' ঘড়ঘড় করে উচ্চারণ করলেন বাবর তারপর বমির বেগে আবার তাঁর দেহটা নুয়ে পড়ল।

'জাঁহাপনা, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এখানেই ভাল!'

বাবরকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে খোলা বারান্দায় গদীর ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। হাকিম তাঁকে শুঁকতে দিল এমন একটা ওষুধ যেটা সাধারণত দেওয়া হয় প্রচুর মদ্য পানের পরে, হৃদপিণ্ডের কাজে কোন ব্যাঘাত না ঘটানর জন্য।

'মদ্যপাদ করিনি আমি... খাবারের কিছু ছিল!' বললেন বাবর, তারপর উঠে আবার ঝুঁকে পড়লেন কাঁচের গামলার ওপর, কোনক্রমে চীৎকার করে বললেন 'পাচককে ধর।'

বাবরের সঙ্গে যারা আহারে বলেছিল তাদেরও বমি ওঠা আরম্ভ হল যদিও বাবরের মত অত ভয়ংকর পরিমাণে নয়।

বাহ্‌লুলকে ধরল খাদ্যপরীক্ষকরাই, সৈন্যদের প্রয়োজন হল না। জল্লাদের ভয়ে সব কথা স্বীকার করল সে। অবিলম্বে লোক পাঠান হল আহমদ, সুলতানা বাইদা, আর তার দাসীদের ধরার জন্য।

সারারাত ধরে এমন অবস্থায় রইলেন বাবর যে প্রতিবারই যখন বমির টান উঠছে তাঁর তখন দেহটা ভেঙেচুরে যাচ্ছে যেন আর সবাই ভাবছে বাঁচাবার আর উপায় নেই। কেবল একমাত্র হাকিম ইউসুফি পাকস্থলী প্রক্ষালন করছে, ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে মুখের মধ্যে আর বারবার বলছে 'সব ঠিক হয়ে যাবে! আপনাকে সারিয়ে তুলব, জাঁহাপনা!'

দুনিয়াটা মনে হচ্ছে যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে যেন হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, আর পাকস্থলী ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। চোখে বিভিন্ন রঙের ঝলক লাগছে। সেই ঝলকের মধ্য দিয়ে কথনও দেখতে পাচ্ছেন হুমায়ুনকে, কখনও বাইদা আবার কখনও বা ধীরস্থির মহিম বেগমকে।

গোঙাচ্ছেন বাবর। মনে মনে বলছেন (তার, কিন্তু মনে হল তিনি জোরে জোরে বলছেন): কেন যে হুমায়ুনকে কাবুল পাঠালাম? সেখান থেকে সে আবার বাদাখশান যাবে... কারণ... কারণ উত্তর সীমান্তে আবার অশান্তি আরম্ভ হয়েছে... বর্ষাকাল শেষ হবার পরে গেলেই ভাল হত...' আবার সব ঘুলিয়ে গেল বাবরের মাথার মধ্যে—বাবরের সামনে দেখা দিল আমীর তৈমুর, ঘন-লাল রংয়ের পাগড়ী মাথায়, তার ওপর ভারতীয় হীরা বসান। আবার চেতনা ফিরে এল বাবরের মনে—ভাবলেন 'যদি এ বিপদ না কেটে যায় কাছে স্ত্রীপুত্র কেউ নেই, দূত যতদিনে ওখানে গিয়ে পৌঁছবে, যতদিনে তারা এসে পৌঁছাবে আগ্রায়, ততদিনে তিন মাস কেটে যাবে এদিকে আমি মারা যেতে পারি একসপ্তাহ বাদেই... না, কালই, না, আজই, এখন!'

'শক্ত হোন, জাঁহাপনা! আশা রাখুন!' বলতে লাগল তাহির।—'কতবার তো মৃত্যুর মুখে থেকে ফিরে এসেছি আমরা!'

'কিন্তু এমন... আমাদের.. কখনও হয়নি... তাই না, তাহিরজান?.. তাহিরবেগ, আমার কাছে এস!' ছেড়ে ছেড়ে নিঃশ্বাস ফেললেন বাবর।

আবার যখন বাবর—'কত আর পারা যায়!' গামলার ওপর ঝুঁকে পড়লেন আর তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল ঘন লাল রংয়ের কি সব পদার্থ, তাহির ধরে রইল তাঁকে, অবিরাম ঘেমে উঠতে থাকা ঘাড় আর মুখ মুছে দিল। বাবরের যে মাঝে মাঝে দমবন্ধ হয়ে আসছে আর অসহ্য ব্যথায় চোখ বেয়ে জল নেমে আসছে তা দেখে তাহিরের কষ্ট হচ্ছে কারণ এই কষ্টের খানিকটা ভাগ অন্তত সে নিতে পারছে না, আর বাবরের জন্য এমন দুঃখ হচ্ছে তার যে মনে হচ্ছে যেন সেও সেই বিষগ্রহণ করেছে বাবরের সঙ্গে।

বাবর যখন নির্জীব হয়ে শুয়ে চোখ বুঁজে, তখন বাবরের কাছে নিয়ে আসা হল যে আটক লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তাকে।

ইউসুফি তাকে কানে বলল 'কেবল দু'কথায় বলুন, দু'কথায় মাত্র!'

বাবরের যা প্রধানত জানা প্রয়োজন ছিল তা হল বাইদার স্বীকারোক্তি। বাইদা জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি বিদেশী শাহ্‌কে হত্যার পরিকল্পনা করেছেন, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় লোকজন খুঁজে বার করেছেন, ছেলের মৃত্যুর জন্য তিনি এমনিভাবে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে রাণা সংগ্রাম সিংহের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা সেকথা জানতে চাওয়া হলে বাইদা তার উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। বাবরের আদেশব্যতীত তাঁকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে দ্বিধা করে সে।

'উত্তর দিতে হবে... তাকে!' গলা কাঁপছে বাবরের: আত্মার খিঁচুনি ধরছে, 'আর ঐ শয়তান... পাচক! ওকে কাজে লাগালাম... বিশ্বাস করে... ওর রান্না খেয়েছি। আর সে এমনি বিশ্বাসঘাতকতা করল!' ঘেমে উঠলেন তিনি। হাকিম ইউসুফি ইঙ্গিতে তাকে চলে যেতে বলল।

'হুজুর, এই শয়তানদের খুব ভালো করে সাজা দেওয়া উচিত যাতে অন্যরা শিক্ষা পায় তা দেখে!'

'ঐ তিনজনকে... মৃত্যুদণ্ড দেবে!.. বাইদা... পরে হবে।'

'যে আজ্ঞা, হুজুর!'

দু'দিন দু'রাত বাবরের জীবন নিয়ে লড়াই চালানর পর হাকিম ইউসুফি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল:

'খোদাকে ধন্যবাদ জানাই! আমাদের জাঁহাপনা যেন আর এক জন্ম ফিরে পেলেন... এখন দুধ খাওয়া প্রয়োজন হুজুর। আর বেশি করে ঘুমোবার চেষ্টা করুন...'

চেষ্টা করেন বাবর, কিন্তু কদাচিৎ ঘুম আসে বাবরের। প্রায়ই চোখ বুঁজে শুয়ে থাকেন তিনি। প্রায়ই মনে পড়ে সেই অন্ধকার গহ্বরের কথা যার কিনারে কেটেছে তাঁর দুটি দিন। এই ভয়ংকর দুটি দিন কাটার পরে তাঁর মন ভরে গেল নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দে। জীবনের এ মুহূর্তগুলি—হোক তা একটা স্ফুলিঙ্গের মত, হোক তা মুহূর্তব্যাপী—সমস্ত ধনসম্পত্তি, খ্যাতি বা দুনিয়ার যত রাজসিংহাসনের চেয়েও উর্ধ্বে।

যন্ত্রণা ভোগ করা মনে আর দুর্বল হয়ে পড়া দেহে যেন কি একটা পরিবর্তন হয়েছে, দুনিয়াটাকে এখন অন্যচোখে দেখেন বাবর। প্রতিটি মানুষের জীবন তো মাত্র একটিই, যদি তার প্রতিটি মুহূর্তই এমনি মূল্যবান তো যারা বাবরের বয়স পর্যন্ত বাঁচেনি তাদের ক্ষতির পরিমাপ কি ভাবে করা হবে?... এই যেমন তাঁর শত্রু ইব্রাহিম লোদী তাঁর চেয়ে চার বছরের ছোট। গর্বিতা সুলতানা বাইদা কি সে কথা ভুলে যেতে পেরেছেন, বাবর তাঁকে সবার সামনে নিজের মায়ের মত বলে ঘোষণা করেছেন বলেই কি তিনি বাবরকে ক্ষমা করেছেন?.. এজয়ে যেমনি আনন্দ আছে, তেমনি বিপদও আছে। নিজেকে নতুন চোখে দেখা যায়। নিজের ক্ষমতা, অন্যের উপর নিজের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে দেখ। তা না হলে বাইদার এতদিনের বিশ্বাসী পাচককে তিনি বিশ্বাস করতে যাবেনই বা কেন। তার নিজের আচরণেই ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান, অহংকার। যদি তিনি না ভাবতেন যে এই দেশের লোকের মনের কথা তিনি বোঝেন তাহলে কি তাঁর চোখে পড়ত না বাইদার দৃষ্টিতে লুকিয়ে থাকা ঘৃণা? এখন, হ্যাঁ, এখনই তাঁর মনে পড়ছে তার চোখে ছিল হিম ক্রুরতা। মহিম বেগম যে কথা বলেছিলেন সে কথাও মনে পড়ল তাঁর যে বিদেশীর তরবারিতে হানা আঘাত শত শত বছর ধরেও ভোলে না লোকে। কি আত্মপ্রবঞ্চনা—সে কথাগুলির সত্যতা ভেবে দেখেননি কখনও! তাই বাইদার প্রতারণার শিকার হতে হল তাঁকে। আর আত্মপ্রবঞ্চনায়ও। কিন্তু যদি এমনি আঘাত শত শত বছর ধরেও শুকায় না তাহলে সারা জীবনেও কি বাবরের পক্ষে সম্ভব হবে নিজের আর এই দেশের মধ্যে সেই সেতুটা স্থাপন করা? নাকি সেও—প্রবঞ্চনা,

মরীচিকা? যে সব নির্দোষ লোক তাঁর অভিযানের ফলে দুঃখভোগ করেছে তার জন্য কি এই শাস্তি?

এ কথা মনে হওয়ায় আবার শরীর খারাপ লাগল তাঁর। ভবিষ্যৎ আগের চেয়েও অন্ধকার মনে হল।

তবুও জীবন নিজের গতিতে বয়ে চলল। যে আলোর কণাটা অন্ধকারের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল তা ক্রমশ বড় আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এখন আর বমি পায় না তাঁর। রাতে ভালো ঘুম হয়, যদিও সকালে ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে।

'দুর্বলতা কেটে যাবে!' বোঝায় তাঁকে হাকিম, 'হুজুর, আপনাকে শুয়ে থাকতে হবে আরও কিছুদিন, শক্তিসংগ্রহ করে নিতে হবে। কত দিন? এক সপ্তাহ! আমি আপনার রক্তমোক্ষণ করব। রক্তে যেন বিষ থাকে না একটুও।'

'আমি এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছি' প্রতিবাদ করলেন বাবর। 'রক্তমোক্ষণের দরকার নেই। যত শীগগিরি সম্ভব লোকদের সামনে বেগদের সামনে দেখা দেওয়া প্রয়োজন আমার। নাহলে ওদিকে হয়ত গুজব ছড়াচ্ছে যে আমার অবস্থা সঙ্গীন, দুর্বল। শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। শত্রুদের আনন্দ বাড়ছে, বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে।'

... আরোগ্যলাভের পরে বাবর কাবুলে এমন এক পত্র পাঠালেন যাতে এইসব ঘটনার এমন নিখুঁত আর সুস্থির বর্ণনা দিলেন যে পরে পত্রটি গোটাগুটি উপস্থাপনা করেন তাঁর অতীত গ্রন্থে। কিন্তু ধীরস্থিরভাবে লেখা সেই পত্রেও ফুটে উঠেছে মৃত্যুর উপস্থিতি অনুভব করা হৃদয়ের আলোড়ন। 'এর আগে এমন করে কখনও বুঝিনি, বেঁচে থাকা কি সুখের। কবিতার একটি ছত্র উদ্ধৃতি করি:

যে ছিল মৃত্যুর দ্বারে সে-ই জানে জীবনের দাম।

সেই ভয়ংকর ঘটনার কথা মনে পড়ে আজ শিহরণ লাগে।'

বাবরের অসুস্থ হয়ে পড়ার তিন দিনের দিন শাহ্‌র আদেশে এসে উপস্থিত হল সব বেগরা, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা, সমস্ত আঞ্চলিক শাসনকর্তারা। পিছনদিকের দরজা দিয়ে এসে সভায় প্রবেশ করে বাবর ধীরে ধীরে সিংহাসন উঠে বসলেন। সবাই যে যার পদমর্যাদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট জায়গায় বসলে পরে অপরাধিনী সুলতানা বাইদাকে ভিতরে আনা হল। তাঁর দু'পাশে দাঁড়াল দু'জন রক্ষী।

সাদা পোশাক পরিহিতা বৃদ্ধা তাঁর সাদামাথা উঁচু করে রেখেছেন, কিন্তু তবুও সিংহাসনের উদ্দেশ্যে মাথানীচু করে সম্মান জানালেন। সিংহাসনের সিঁড়ির সোনার ধাপগুলি আর পায়াগুলির ঔজ্জ্বল্য, দামী পাথরবসান উষ্ণীষমাথায় সিংহাসনে বসে

থাকা বাবরের মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা আর বসে যাওয়া চোখ কোন কিছুই বাইদার চোখ এড়াল না। খুশি হয়ে উঠলেন তিনি, দাঁড়ালেন সোজা হয়ে।

তাঁকে প্রশ্ন করা আরম্ভ হল। প্রথম প্রশ্ন হল তিনি আর ইতিমধ্যেই দণ্ডিত অপরাধীরা ছাড়া আর কে জড়িত এই প্রাণনাশের প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্রে।

'প্রাণনাশের প্রচেষ্টা নয়, এ হল—আমার প্রতিশোধ' ঘোষণা করলেন বাইদা 'আপনাদের শাহ্ যে রক্তপাত ঘটিয়েছেন তার প্রতিশোধ! আর বাহ্লুল, আহমেদ দাসী এরা এই প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করেছে আমাকে বীরের মত। আর বীরের মতই মৃত্যু বরণ করেছে। এবার আমার পালা। মৃত্যুকে ভয় করি না আমি। ছেলের শোকে পুড়ে ছাই হয়ে গেছি আমি। মেরে ফেল আমায়, মেরে ফেল!'

ফার্সী ভাষায় কথা বলছিলেন বাইদা। সবাই বুঝছিল সে কথা। তাই নীরব সবাই। বাবর বুঝলেন: নির্ভীক বাইদা মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছেন—তাই জন্যই প্রতিটি কথাই বলছেন যেন তীক্ষ্ণ তীর বিদ্ধ করছেন, অপেক্ষায় আছেন ক্রুদ্ধ হয়ে বাবর জল্লাদ ডেকে নিরস্ত্র মহিলার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর অস্ত্র প্রয়োগ করবেন। তাহলে... তখন জয় হবে বাইদারই, তাঁর নির্ভীকতার কথা ছড়িয়ে পড়বে লোকের মুখে মুখে, চিরকাল তা মনে রাখবে লোকে। লোকের মনে শ্রদ্ধার আসন দখল করতে চান তিনি।

শাহ্ প্রচণ্ড ক্রোধ দমন করলেন। বাইদাকে তেমনি করেই জয় করতে হবে তাঁর, যেমন করে জয় করেছেন তার দেওয়া বিষ—ধৈর্য আর দৃঢ়তা নিয়ে (কাঁটা দিয়ে উঠল বাবরের গায়ে সম্প্রতি রোগভোগের কথা মনে পড়ে, কেউ কিন্তু লক্ষ্য করে নি তা)।

নীরব রইলেন বাবর। মালিক্দদ কারোনি বলল:

'প্রতিশোধগ্রহণকারিণী বীর হবার চেষ্টা করার দরকার কি, আপনি সুলতান ইব্রাহিমের মা! শাহ্র বিশ্বাসভঙ্গ করে আপনি অত্যন্ত জঘন্য কাজ করেছেন...!'

'চুপ কর, বিশ্বাসঘাতক! নিজের উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই তাঁর বিশ্বাস অর্জন করতে হয়েছে!'

'মায়ের সম্মান নষ্ট করেছেন আপনি! আমাদের সবার সামনে চোখের জল ফেলেছেন যখন শাহ্ আপনাকে নিজের মায়ের মত বলে ঘোষণা করেন!'

'না! না! সে চোখের জল পড়েছে ঘৃণায়! যে আমার ছেলের মৃত্যুর কারণ তার মা বলে মনে করতে পারি না আমি নিজেকে!'

তখনও নীরব রইলেন বাবর। কারোনি এবার জোর গলায় বলল:

'কিন্তু শাহ্ বাবরের সৈন্যর চেয়ে আপনার সৈন্যসংখ্যা ছিল দশগুণ বেশি। যদি আপনার ছেলে জয়লাভ করত, সে—আমি তো জানি!—শত্রুদের একজনকেও জীবন্ত ছেড়ে দিত না। যুদ্ধ যুদ্ধই! যদি আপনার মনে ন্যায়বোধ থাকত তো তো আপনি এমন খলভাবে বিষ প্রয়োগ করতেন না। শাহ্ বাবর যুদ্ধ ক্ষেত্রে ন্যায়যুদ্ধ করেছেন—তরবারির বিরুদ্ধে তরবারি!'

'নারী আমি, তরবারি হাতে নিয়ে লড়াই করার ক্ষমতা আমার নেই! বিষই হল আমার অস্ত্র। এই বিদেশী শত্রুরা পানিপথের যুদ্ধে আমাদের হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে। সারা ভারতবর্ষে এরা মৃত্যুর বীজ ছড়িয়েছে। আমার মত কত মা সাদা পোশাকে জল ভরা চোখে ঘুরছে, কত বিধবা স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় মৃত্যুবরণ করছে? যে বিষ আমি দিয়েছি তার উৎপত্তি বিদেশীদের রোপণ করা মৃত্যুর বীজ থেকেই! ঐ বিষে লেগে আছে অনাথ আর বিধবাদের চোখের জল!'

গোলমাল আরম্ভ হল সভায়। একজন দাড়িওয়ালা বেগ বাবরকে কুর্নিশ করে বলল:

'হুজুর, এই পাগলী বুড়ীর কথা আর শোনা যায় না! জল্লাদ ওর জিভটা কেটে দিক!'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হোক যেমন আমার দাসীকে করা হয়েছে,' ক্ষিপ্ত বাইদা চীৎকার করে বললেন, 'তোমাদের ভয় পাই না!'

এই নিরস্ত্র নারীর মৃত্যুদণ্ড? তা ভয়ংকর বিপজ্জনক! তাঁর সন্তানদের মায়েরা সে মৃত্যুকে কি চোখে দেখবে? মহিম বেগম কি বলবে? সম্প্রতি বাবর নিজের গ্রন্থে হীরাটের অধ্যায়টি শেষ করেন—যেখানে আছে খাদিচা বেগমের মৃত্যুর কথা। ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক ছিল সে নারীও, বাইদার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু যখন শয়বানী খানের প্ররোচনায় মনসুর বখশীর অত্যাচারে তার মৃত্যু হয় তখন থেকেই লোকের মনে সে পেল সম্মানের স্থান আর আজ পর্যন্তও তার মৃত্যু শয়বানীর প্রতি ঘৃণা উদ্রেক করে লোকের মনে। বাবর নিজেও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নির্জলা সত্য লিখবেন, কিন্তু খাদিচা বেগমের কথা লেখার সময় তাঁর মনেও এই সহানুভূতির ভাব জেগেছে অত্যাচারের কবলে পড়া নারীর প্রতি।

এখন কী করবেন তিনি যাতে লোকের মনে তাঁর প্রতি ঘৃণা না জাগে?

সব বেগরা একসঙ্গে দাবি জানাতে লাগল বাইদাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য।

'পাগলা হাতীর পায়ের নিচে ফেলা হোক! পিষে ফেলুক ওকে!'

'বস্তায় পুরে ওকে উঁচু মিনার থেকে ছুঁড়ে ফেলা হোক!'

বাবরের ইঙ্গিতে সবাই চুপ করে গেল।

'এই বৃদ্ধার জন্য আছে এক শাস্তি,' ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন বাবর, 'যা হল মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর... আপনারা এখুনি শুনলেন যে ওঁর প্রাণ কাঁদছে সব সন্তানহারা মা, বিধবা আর অনাথদের জন্য, যেন উনি ঐ বিষ তৈরী করেছেন তাদের সবার চোখের জল দিয়ে। এ মিথ্যা! তাঁর ছেলে ইব্রাহিম অবিরাম যুদ্ধ চালিয়েছেন পাঞ্জাব, বাংলা, গোয়ালিয়োরের সঙ্গে। এই সব যুদ্ধে কত লোক মরেছে প্রতি বছর, বলুন তো মালিক্‌দদ?'

'গত তিন বছরে কেবলমাত্র আমাদের লোক মরেছে হাজার ষাটেক,' দ্রুত উত্তর দিলেন কারোনি।

'শুনলেন তো... আর এই বৃদ্ধার ছেলে এই সিংহাসনে,' সিংহাসনের হাতলে টোকা দিয়ে বললেন বাবর,' 'দশ বছর বসে ছিল। ভারতবর্ষে অনেক লোক যুদ্ধ আর হানাহানি চালিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। ধনসঞ্চয় করেছে সে কেবল, রাজ্যের উন্নতিকার্যে সে ধন নিয়োগ করেনি, নিয়োগ করেছে কেবল বিরাট সংখ্যক সৈন্য পোষণে যারা তার জন্য শতে শতে প্রাণ দিয়েছে। প্রাণ দিতে হয়েছে তাদের প্রায়ই সৈন্যচালনে তার অক্ষমতার জন্য। পানিপথে আমরা তা দেখেছি নিজের চোখে। সৈন্যপরিচালন দক্ষতার বিচার হয় কেবলমাত্র জয়ের মাধ্যমেই নয়, কতটা ক্ষতি হল সৈন্যদলের তা থেকেও। পানিপথে আমাদের দু'হাজার লোক মরেছে। আর সুলতান ইব্রাহিম এমনভাবে সৈন্য পরিচালনা করেন যে ত্রিশহাজার সৈন্য মৃত্যুবরণ করে আর তাও আমাদের কামান-তরবারির আঘাতে নয়, নিজেদের হাতীর পায়ের তলায় পড়েই... হয়ত সুলতান ইব্রাহিম নিজেই নিজের হাতীর পায়ের তলায় পড়ে মরেছেন—জানি না। যদি সুলতানা বাইদা এমনি ন্যায়পরায়ণা হন মৃত সৈন্যদের বিধবা আর অনাথ শিশুদের জন্য এমনি করে তাঁর মন কাঁদে, তাহলে অপ্রয়োজনে অর্ন্তযুদ্ধে যে হাজারে হাজারে লোকক্ষয় হয়েছে তা কেন তিনি হতে দিয়েছেন? কেন বাধা দেননি ছেলেকে বিনা কারণে রক্তপাত ঘটানয়?'

'আমি তো কেবল মা-ই, শাসকের উপরে কথা বলব কি করে!' বললেন বাইদা এবার আত্মরক্ষার চেষ্টায়।

'সেই হানাহানি, লড়াই বন্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা এখানে এসেছি! এই মহান দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বিশাল ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করব আমরা! সুন্দর করে গড়ে তুলব! যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি তা কাজে পরিণত করবই আমরা! আর এই খল ও বিশ্বাসভঙ্গকারী নারীর কাছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি হবে এই: এর সমস্ত ইচ্ছা বিষ দ্বেষ সবকিছু সত্ত্বেও, আবার বলছি, আমরা এখানে রয়ে যাব আর সে আর তার ছেলে ইব্রাহিম যা করতে পারেনি তা করব!'

'জ্ঞানীর মত কথা!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মালিক্দদ কারোনি।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে যে বাবরই জয়লাভ করলেন তা বুঝল সবাই।

'বিধবা ও অনাথদের জন্য এঁর মন যখন এতই কাঁদে, তখন আমরা আদেশ দেব... আবদুবরিমবেগ!'

বাঁদিকের সারি থেকে উঠে দাঁড়াল স্থূলদেহী এক বেগ।

'আজ্ঞা করুন, আলমপনা।'

'আপনার উপর দায়িত্ব দিলাম... বাইদা খানুমের সব ধনসম্পত্তি দখল করে নিয়ে যমুনার তীরে এক 'সেবাসদন' তৈরি করতে। বাইদার দাসদাসীরাই সেখানে কাজ করবে,

আর তাঁর কোষাগার থেকেই প্রতিদিন অনাথ ও বিধবাদের সাহায্যপ্রদান করা হবে। এই সাহায্য দেওয়া চলবে ততদিনই যতদিন না সুলতানার কোষাগার শূন্য হয়ে যায়।'

'যে আজ্ঞা হুজুর।'

'আর এই... বৃদ্ধা বাইদা খানুমকে মহামান্য আবদুকরিমবেগ প্রহরাধীনে রাখুন তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।'

'কি? চমকে গেল আবদুকরিমবেগ।' 'ওর মৃত্যুদণ্ড হবে না নাকি?'

'যা বলার ছিল বলেছি আমি।'

অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড হবে না? মৃত্যুর ভয়ঙ্কর, হিমশীতল স্পর্শ ঘিরে ধরবে না তাকে? বাইদার গায়ে হঠাৎ যেন জীবনের উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ল, কেঁপে উঠল তাঁর মনটা, নরম হয়ে গেল। যেন কি একটা উৎসমুখ খুলে গেল।

সুলতানা বাইদা দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললেন হুহু করে।

সিক্রী

১

মওলানা খোন্দামির, কবি শিহাব মুয়াম্মি ও মুদারিস ইব্রাহিম কানুনি বাবরের আমন্ত্রণে হীরাট থেকে আগ্রা রওনা দিয়ে প্রায় তিনমাস হল পথ চলেছেন।

তাঁরা অতিক্রম করেছেন খাইবার গিরিপথ, যার উচ্চতা মনে জাগায় ভয় আর হতাশা, প্রকৃতির এই বিশালত্বের সামনে মানুষ তো কেবলমাত্র একটি বালির দানার মতই। পার হয়েছেন তাঁরা বিশাল সিন্ধুনদ, গেছেন গহীনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে। এই প্রথম খোন্দামির এমন করে বুঝলেন কি বিশাল, প্রান্তহীন এই পৃথিবী। এই যে শেষহীন, প্রান্তহীন বিশাল এলাকা, এ এখন একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র। যেতে যেতে অনুভব করা যাচ্ছে যে একই রাজ্যের মধ্যে দিয়ে চলেছেন তাঁরা: বাল্‌হ্‌ থেকে কাবুল, কাবুল থেকে লাহোর, লাহোর থেকে দিল্লি-সর্বত্র দেখা যায় বাবরের স্বাক্ষরিত আদেশনামাগুলি। সে আদেশ পালিত হচ্ছে বিনাবাক্যব্যয়ে।

বাবর কর্তৃক আমন্ত্রিত শিল্পী, কবিরা তা অনুভব করছেন প্রতিপদে। মাভেরান্‌নহর ও খোরাসান থেকে যে মিস্ত্রী ও কারিগররা দিল্লি আসছিল তাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করছিল আঞ্চলিক শাসনকর্তারা, সীমান্তরক্ষীবাহিনীর কর্তাব্যক্তিরা, ডাক ও অতিথিশালার কর্মচারীরা। 'যেন আল্লা দূত আসছি' বলে ফেললেন একদিন কবি মুয়াম্মি আর সে কথা সত্যিই। যখন তাঁরা এমন কোন গ্রাম বা শহর অতিক্রম করেছেন যেখানে চোর ডাকাতের উপদ্রব আছে, খন্দামির ও তাঁর দলের লোকজনের সঙ্গে তখন চলেছে প্রহরীদল—প্রায় দুইশত লোক।

অতিথিশালাগুলিতেও শাহ্র ব্যক্তিগত অতিথিদের থাকতে দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে ভাল ঘরগুলিতে, ভাল খাবার পরিবেশন করা হয়েছে আর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে কিছু খাবার ও সামান্য অর্থ ছোটখাট খরচখরচার জন্য। আর যদি ঘোড়াবদলের প্রয়োজন হয়েছে তো রাস্তাপরিদর্শক ও ডাকবিভাগের কর্মচারীরা তাদের দিয়েছে মজুত রাখা ঘোড়া।

পথে খোন্দামির প্রায়ই দেখেছেন সত্যিকারের দূতরা যাচ্ছেন ভারতবর্ষে বাবরের কাছে আর চলেছে সওদাগরের দল। গতবছর বাবর সিক্রীতে রাণা সংগ্রাম সিংহের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাণিপথের যুদ্ধের চেয়েও বেশি প্রশংসাযোগ্য জয়লাভ করায় বিভিন্ন রাজা বাদশা বাবরের কাছে দূত পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কেউ—অভিনন্দন জানিয়ে, কেউ বা বশ্যতা, আনুগত্য স্বীকার করে আবার কেউ শান্তি ও সহাবস্থানের প্রস্তাব দিয়ে। খোন্দামিরের সঙ্গে লাহোরে দেখা হয় তেব্রিজের দূতের যে ইস্‌মাইলের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তার ছেলে শাহ্ তাহ্মাসপের পক্ষ থেকে নিয়ে চলেছে আশ্চর্য ধরনের উপহার। অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে সাদা উটের পিঠে সোনার হাওদায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দুই সুন্দরী তরুণীকে: শাহ্ তাহ্মাসপ্ বাবরের হারেমকে বড় করে তুলতে চান।

লাহোরের কাছে এক অতিথিশালায় খোন্দামির দেখেন সমরখন্দ ও তাশখন্দের দূতদের। এমনকি বাবরের সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু শয়বানীর অনুচররাও এখন স্বীকার করে নিয়েছে ভারতবর্ষে সৃষ্ট নতুন রাজ্যকে। বাবর নিজেও অতীতকে মুছে দিতে আগ্রহী ছিলেন: তাঁর দূতরাও ভারতবর্ষ থেকে দামী দামী উপহার নিয়ে এসে পৌঁছাল সমরখন্দ ও তাশখন্দ। সম্প্রতি সমরখন্দ থেকে কুচকিনচি-খান সাতটি উট বোঝাই করে পাঠিয়েছেন ভালোজাতের কিসমিস্, মিষ্টি খুবানী, বুখারার কড়া, সুগন্ধি পানীয় ও মাভেরান্নহরে প্রখ্যাত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আর সেইসঙ্গে দুইশত ভালোজাতের ঘোড়া। যমুনার তীরে 'হশ্‌ত্‌ বেহশ্‌ত্‌' বাগিচায় নির্মিত প্রাসাদে সমরখন্দের দূতকে অভ্যর্থনা জানান বাবর সসম্মানে 'যা কেবল সুলতান শাহ্রই উপযুক্ত'—দূতের ফিরে যাবার পথে খোন্দামিরের সঙ্গে দেখা হলে এ কথা জানায় দূত।

'মওলানা, ভারতবর্ষে আমি দেখেছি এত সোনা, এত, যা কেউ কোথাও কখনও দেখেনি। শাহ্ বাবর বসেন সোনার সিংহাসনে। সিংহাসনের সামনে বিশাল এক গালিচা পাতা। তাঁর রাজ্যের আঞ্চলিক শাসনকর্তারা বাৎসরিক যে সোনা তাঁকে দেয় তা ঐ গালিচার উপর দেওয়া হয়। আমরা নিজের চোখে দেখেছি কেমন করে গালিচাটা মোহরে ঢাকা পড়ে যায় আর গালিচার উপর গড়ে ওঠে মোহরের পাহাড়।'

খোন্দামির অনুমান করে নিলেন এমন একটি দৃশ্য উপস্থাপনা করেছেন বাবর বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই, শয়বানীর অনুচরদের সোনার প্রতি বিশেষ লোভ জেনেই। মনে মনে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন খোন্দামির:

'মহামান্য দূত কি তাঁর 'বিশেষ প্রাপ্য' পেয়েছেন?'

'শাহ্ বাবর আদেশ দিলেন দামী মণিজহরৎ বসান পোশাক উপহার দিতে: পোশাক আমাদের হল, মণিজহরৎও আমাদের হল। তারপর গালিচার উপরের সোনার একটি বিরাট অংশ আমাদের শাহ্ কুচকিনচি খানকে উপহার হিসাবে দেওয়া হল। সোনার মোহরগুলো এমন কি গুণল না পর্যন্ত...'

'চুক্তিস্থাপনও হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ। এবার পরস্পরের কাছে যাতায়াত সহজ হবে। ব্যবসাবাণিজ্য হবে। পণ্যবিনিময় হবে। ওদের থেকে আমরা নেব রেশম, মশলাপতি, বিভিন্ন সুন্দর জিনিসপত্র। আর ওদের কাছে বেচব বিভিন্ন শুকনো ও টাটকা ফল, ঘোড়া... অনেক দূরের পথ যদিও, কিন্তু সওদাগরের দল এখন আরও বেশি আসবে: শাহ্ বাবর এখন তাঁর গোটা রাজ্যে ব্যবসায়ীদের উপর থেকে অতিরিক্ত করের বোঝা প্রত্যাহার করেছেন। উজবেক, তাজিক, ভারতীয়, পারসীয় ও আরব সব সওদাগরদেরই আয় অনেক বেড়ে যাবে। সওদাগর আর কারিগররা খুব সন্তুষ্ট এই শাহ্‌র উপর। আমরাও খুব সন্তুষ্ট, খুবই সন্তুষ্ট। অবশ্য একটি নতুন আইন আমাদের মনে ধরেনি।'

'তাই নাকি? কি সেটা?'

'বাবর সারারাজ্যে মদ্যপান নিষেধ করে দিয়েছেন।

বাবর নিজে, শুনলাম, সর্বসমক্ষে শপথ নিয়েছেন পান না করার। এমন কি পানপাত্রগুলিও ভেঙে ফেলা হয়েছে। গজনী থেকে দু'মাসধরে আসছিল এক বিশেষ ধরনের পণ্য—চৌদ্দটি উট বোঝাই করে আগ্রাতে আনা হচ্ছিল উত্তমস্বাদের পানীয়। পানীয় এসে পৌঁছলে শাহ্ বাবরের আদেশে তার মধ্যে নুন ঢেলে দেওয়া হয়। ভাবতে পারেন: পানীয় বিক্রী করা ও দেশের ভিতর আনাও নিষেধ করা হয়েছে... ভোজউৎসব হয় এখন পানীয় ছাড়া... একঘেঁয়ে ব্যাপার!'

যে নতুন আইনে এমন মুষড়ে পড়েছে দূত তার খবর খোন্দামির জানেন আগে থেকেই। পথে যেতে যেতেই পড়েছেন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত বাবরের আদেশ। খোন্দামিরের মনে পড়ল: আদেশনামায় আরও বলা হয়েছে যে প্রকৃত ধর্মের জন্য, তার জয়লাভের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করতে হবে নিজের সঙ্গে, নিজের কুঅভ্যাসের সঙ্গে সংগ্রাম দিয়ে। চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কেমন করে 'আমার অনুচররা ধর্মের প্রকৃত জয়লাভের জন্য প্রবল উৎসাহে মাটিতে আছড়ে ফেলে সোনার ও রূপার পেয়ালা ও কলসগুলি যেগুলি ইতিপূর্বে দস্তরখান অলঙ্কৃত করত তাদের সংখ্যা ও ঔজ্জ্বল্যে আকাশের গায়ে তারার মত।' ছুঁড়ে ফেলে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে সেগুলি তারপর গরিব নিঃস্বদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় টুকরোগুলি, ঠিক তেমনি ভাবেই, যদি খোদাতালার ইচ্ছা হয় তো শীঘ্রই আমরা মূর্তিগুলোকেও ভেঙে ফেলব...'

তাই ঘটল: মূর্তিপূজারী রাণা সংগ্রাম সিংহকে বাবর পুরোপুরি পরাস্ত করলেন।

আর মদ্যপান নিষেধ করার ব্যাপারটা খোন্দামিরকে খুশিই করল। ঐতিহাসিক বুঝলেন যে মদ্যপান চলতেই থাকবে, কিন্তু এই আদেশের ফলে অতিরিক্ত মদ্যপানকারীদের খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। হুসেন বাইকারা আর তার বংশধরদের করুণ ইতিহাস এখনও মুছে যায়নি খোন্দামিরের মন থেকে। আর বাবর হীরাটে দ্বিতীয়বার আসার পরে ন'বছর কেটেছে খোন্দামির উৎকণ্ঠিত হয়েছেন এই দেখে যে তৈমুরের এই বংশধরটিও অতিরিক্ত পান করতে আরম্ভ করেছিলেন। তখন খোন্দামির আশংকা বোধ করেছিলেন এই ভেবে যে 'এমন বিরল প্রতিভার অধিকারী হয়ে ইনিও কি মদ্যপানে ডুবে গিয়ে আত্মবিস্মৃত হবেন?'

সে কারণেই দূতের কাছে শোনা খবর খোন্দামিরকে অত্যন্ত খুশি করল।

খোন্দামির বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে, শরীরটা তেমন ভাল যায় না।

বাবরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দীর্ঘ ক্লান্তিকর পথে পাড়ি দেবার আগে অনেক ভেবেছেন খোন্দামির। ভয় হয়েছে গরম আবহাওয়ার, রাজাবাদশাদের চিরন্তন খামখেয়ালীয়ানার... কিন্তু ইদানীং হীরাটে তিনি বিশেষ ভাল অবস্থার মধ্যে ছিলেন না আর বাবরের কাছে যেতেও এমন ইচ্ছা হচ্ছিল যে শেষ পর্যন্ত যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ভাবলেন অজানা ভবিষ্যতে কোন অবলম্বন চাই তাঁর আর বাবরই হবেন সেই অবলম্বন। বাবরের ওপর অনেক আশা নিয়ে রওনা দিলেন পথে। পথ চলতে চলতে যখন জানলেন, দেখলেন বাবরের পরিকল্পনা ও জনহিতকর কার্য্যবলীর ফলাফল, তখন হালকা হয়ে গেল তাঁর মন, অজানা ভবিষ্যতের ভয় মিলিয়ে গেল কুয়াশার মত...

আগ্রায় পৌঁছে খোন্দামির দেখলেন মর্মরপাথর সুশোভিত নতুন নতুন ভবন, নতুন নতুন বাগিচা আর সেগুলিতে সোনার রংয়ে রংকরা বসার জায়গাগুলির উপরে গাছপালার চাঁদোয়া আর বিভিন্ন রংয়ের ফুলের গাছগুলি।

সেগে যেমন জানতেন তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিপত্তিশালী মনে হতে লাগল তাঁর বাবরকে...

রোগ ভোগের ফলে অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে পড়েছেন বাবর, দেহে শক্তির কোন চিহ্নমাত্র আর নেই।

কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছেন বাবর তা বুঝলেন খোন্দামির সিক্রি পাহাড়ে তাঁর সঙ্গে বেড়াবার সময় সূর্যের আলোয় তাঁকে দেখে।

পাহাড়টি প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি, কোন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাটির নিচ থেকে এটি উঠে এসেছে সবুজ উপত্যকায়—পাহাড়টি বাবরকে মনে করিয়ে দেয় ফরগানা উপত্যকায় ওশের কাছে বুভরাতাগ পাহাড়ের কথা। কেবল সেই পাহাড়ের পাদদেশে বুভরাসাই নদী আর এই সিক্রী পাহাড়ের পাদদেশে ছলছল করছে স্বচ্ছ হ্রদ।

বেগ গর্বিতভাবেই বাবর খোন্দামিরকে দেখাচ্ছিলেন শাহ্‌র ভোজউৎসব বা অতিথিআপ্যায়নের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নির্মিত পাহাড়ের ঢালের কুঞ্জগুলির মাঝে মাঝে

চমৎকার বসার জায়গাগুলি। পাহাড় থেকে হ্রদের দিকে নেমে গেছে পাথরবাঁধানো সিঁড়ি। বাবর অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে বলে চলেছেন পরিকল্পিত নির্মাণকার্যের কথা—যার কিছু কিছু ইতোমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। খোন্দামির চুপিসারে লক্ষ্য করতে লাগলেন বাবরের মুখমণ্ডল—হনূর হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, চোখ ঘিরে বলিরেখা পড়েছে, কপালে আঁকিবুঁকি দাগ। কত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হয়ে পড়ছেন তিনি!

হ্রদের দিকে নামতে আরম্ভ করলেন তাঁরা! বাবর যেন খোন্দামিরের মনের কথা পড়তে পারলেন:

'আমার জীবনটা বড় অদ্ভুত, মওলানা। নিজের চারপাশের জীবনের যত বেশি করে উন্নতি করছি, নিজে শক্তিহীন হয়ে পড়ছি তত বেশি করেই।'

'... এবার নিজের শরীরের সম্বন্ধে একটু চিন্তা করলে ভাল হত না কি, জাঁহাপনা?'

'হ্যাঁ, চিন্তা করা প্রয়োজন। কেবল... রাজ্যের বিস্তার যত বাড়তে থাকে, রাজ্যশাসন করাও তত কঠিন হয়ে পড়ে। আগে যখন এখানে বিশাল রাজ্যস্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি তখন বুঝিনি যে এমন রাজ্য শাসন করা কতটা কষ্টকর। রাতদিন—পরিশ্রম, উৎকণ্ঠা, সংগ্রাম আর সংগ্রাম... পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু করে উঠতে পারা আমার ক্ষমতার শেষ পর্যন্ত কুলাবে কিনা জানি না।'

'কুলাবে, জাঁহাপনা। তা আমি নিশ্চয় করে জানি। এখন আপনার বয়স পঞ্চাশবছরও হয়নি, সবচেয়ে পৌরুষময় সময় মানুষের জীবনে এই বয়স।'

'ভারতবর্ষে আসার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছে এক এক বছরে যেন আমি জীবনের পাঁচবছর কখনও বা দশবছর ক্ষয় করে ফেলছি। জ্বর, অনিদ্রা...'

আজ সকালে খোন্দামির পড়েছেন বাবরের নতুন দিওয়ান (কবিতা সংকলন)—যাতে স্থান পেয়েছে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে লেখা কবিতাগুলি। বাবরের কথাগুলি শুনতে শুনতে খোন্দামিরের মনে পড়ল দেওয়ানের একটি রুবাই:

> গরম দিনের বেলা জ্বরে গা পোড়ে—কী যে কষ্ট।
> রাতে মিষ্টি ঘুম নেই, স্বপ্ন মাথা খোঁড়ে—কত কষ্ট।
> বিষাদ বেড়েই চলে, ধৈর্য যায় ক্ষয়ে—বড়ো কষ্ট।
> জানি না কী করে বাঁচি, জানি শুধু ওরে—খুবই কষ্ট মোর।

নিদ্রাহীনতার ফলে চোখ লাল হয়ে উঠেছে বাবরের, সামান্য হাওয়া লাগলেও চোখ বেয়ে জল গড়ায়।

'হয়ত উনি মদ্যপানের ইচ্ছাকে সংযত করার জন্য এখনও লড়াই করে চলেছেন নিজের সঙ্গে?' ভাবলেন খোন্দামির। এই দিওয়ানেই তো আছে এই পংক্তিগুলি:

প্রতিজ্ঞা করেছি মদ ছোঁব নাকো আর
কী যে করি, পরামর্শ নেব কাছে কার
অনুতপ্ত শরাবীরা কথা দেয় বটে,
কথা দিয়ে মোর শুধু অনুতাপ সার।

'শুনেছি, জাঁহাপনা, এমন বদ্যি আছেন যারা অনিদ্রার ঔষধ জানেন।'

'আমার চিকিৎসক হীরাটের ইউসুফি চেষ্টা করেছিলেন সারাবার। কিন্তু কিছুই হল না! 'বিশ্রাম প্রয়োজন আপনার,' বলেন তিনি। 'রাজকার্যের কথা ভুলে যান,' বলেন। 'রাতের বেলায় কবিতা লিখবেন না,' বলেন। এ সব উপদেশ মেনে চলা সম্ভব নয়!.. রাজ্যের শাসক হয়ে রাজকার্যের কথা চিন্তা করব না, তা কেমন করে সম্ভব? রাজ্যের চিন্তাভাবনা আমি ভুলতে পারি কেবল তখনই যখন কবিতা লিখি। অথবা নিজের বই লিখি। কিন্তু আগ্রাতে লেখার জন্য সময় করে নেওয়াও খুব কঠিন। আর পারছি না আমি এসব সইতে, তাই সিক্রীতে বেড়াবার সিদ্ধান্ত নিলাম। এখানে প্রশান্তি। আর কবিতাও আসে ভাল... অনেক মস্‌নবী লিখেছি... অভ্যস্ত হয়ে গেছি— নিদ্রাহীন রাতগুলিতে লিখতে।'

'এখনও অসুস্থ আর অবিরাম কাজে অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েন,' ভাবলেন খোন্দামির। 'মগজ তো বিশ্রাম পায় না একটুও, এই হল অনিদ্রার কারণ।' কিন্তু সোজাসুজি তা বলায় হাকিম ইউসুফির মত কোন কাজ হবে না। তাছাড়া বাবর কখনও নিজের কথা ভাবেননি, যে কোন কাজেই নিজের সর্বশক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছেন আর তাতেই তিনি খুশি। কাজের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার এই সুখ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হবে অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা।

'আল্লাহ্ আপনাকে মনের ও দেহের শক্তি দিন।' আন্তরিকভাবে কামনা করলেন খোন্দামির।

নিজের কথা আর বেশি বলতে ইচ্ছা হল না বাবরের। অন্য কথা আরম্ভ করলেন:

'মওলানা, কত বছর ধরে আপনি লিখেছেন। 'আমার প্রিয় বন্ধুর জীবনকাহিনী' বইটি?'

'এগারবছর জাঁহাপনা। কিন্তু বইটি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করি না... হীরাটে লেখা এগোচ্ছিল না। গত কয়েকবছর ধরে শিয়া ও সুন্নিরা হীরাট নিয়ে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি চালিয়েছে।'

'বুঝলাম... মনে আছে আপনার, যখন উনস্নিয়া মিনারের উপরে আলোচনা করছিলাম আমরা, আপনি উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হীরাটের সুদিনের সূর্য অস্ত যাবে নাকি?' আপনার আশংকা ফলে গেল সত্যিই।'

'সুদিন বিদায় নিয়েছে হীরাট থেকে। সমরখন্দও আমাদের মুখের ওপর দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে। শিয়াসুন্নি দ্বন্দ্বের ফলে মাভেরান্নহর ও ইরানের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এত বছর ধরে সেই যোগাযোগের ফলে এত উন্নতি হয়েছে, কত প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছে। অশিক্ষিত সুলতানরা মাভেরান্নহর তুলে দিয়েছে ধর্মান্ধ ও মূর্খ শেখদের হাতে।' সমরখন্দের এক জ্ঞানী ব্যাক্তি উলুগবেগের মানমন্দির যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সে কথা বলতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেললেন।' শহরের শাসকের কোন আগ্রহ নেই সে ব্যাপারে। লোকেরা মানমন্দিরের দেওয়াল থেকে ইঁট খুলে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের বাড়ি ঘর সারাবার জন্য।'

'আমরা পরদেশে প্রাসাদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করছি, আর ওরা নিজেদের দেশে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে... ভাগ্যের নিষ্ঠুর যোগ, তাই না মওলানা? মাতৃভূমি ছেড়ে এসেছি আমি, সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি নতুন মাতৃভূমি ভারতবর্ষে, কিন্তু কখনও কখনও নিজেকে মনে হয় মাতৃভূমির অকৃতজ্ঞ সন্তান বলে। আর অসুখী বলেও!'

'সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। হ্যাঁ, তাই। মানুষের ভাগ্যে যা নির্দিষ্ট আছে তার এদিক ওদিক করতে পারে না মানুষ। এও ঠিক। কিন্তু এই যে আমি, আপনার মত অনুসরণ করে ভারতবর্ষে চলে এলাম! নিজের ইচ্ছায় এসেছি। ঘটনার গতি পরিবর্তন করতে অক্ষম আমি, বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চাই আমি জট পাকিয়ে যাওয়া ঘটনাগুলিকে, খুঁজতে চাই (আমার পেশা, আমার বিজ্ঞান) ইতিহাসের প্রধান সূত্রটিকে।'

খোন্দামিরের কথাগুলি ভাল লাগল বাবরের, নিজের ঘোড়াটিকে খন্দামিরের ঘোড়ার পাশে নিয়ে এলেন, চলতে লাগলেন তাঁর পাশাপাশি।

'কি অপূর্ব বিচার আপনার, মওলানা! ঘটনার জটের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে আমাদের আকাঙ্খা আর প্রচেষ্টাগুলি। এছাড়া আরও অনেক কিছু জড়িয়ে পড়েছে সেই জটের মধ্যে। ইতিহাস সমাপ্তিহীন, পরিবর্তনশীল। এ হল আকাশের নীল গম্বুজের আবর্তন। যে শক্তি সেই আবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই হল 'প্রধান সূত্র।' তাই নয় কি?'

খোন্দামির বাধা না দিয়ে শুনতে লাগলেন বাবরের কথাগুলি। বাবর বলে চললেন:

'আর আমাদের স্থান কোথায় এর মাঝে? কোন একটি তারার স্থান?.. না, অন্যভাবে বলি... আমরা এক পাহাড়ের উপরে। পায়ের তলা থেকে যদি মাটি সরে যায় তো যতই আমরা উপরে উঠি না কেন পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নিচে নামতে থাকব। এমনি এক নিম্নগতিই মাভেরান্নহরে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে। কিন্তু যদি চাকা ঘোরে... না, যদি পাহাড়টা উপরে উঠতে আরম্ভ করে, যদি ভিতর থেকে তার শক্তি ফুটে বেরিয়ে আসতে থাকে তো নিজে আপনি যত দ্রুত উপরে উঠতে পারতেন তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত উঠে যাবেন। বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও সাহস

দেখাতে হবে আমাদের আর একটা গজিয়ে উঠতে থাকা পাহাড় খুঁজে নিয়ে পা রাখতে হবে তার ওপর। মওলানা, আমার এখন মনে হচ্ছে ভারতবর্ষ তেমনি একটি পাহাড়... তাই, হীরাট ও সমরখন্দে যা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে তা এখানে সম্পূর্ণ করার আশা রাখি আমি।'

'হ্যাঁ, ইতিহাসের গতি বদলায় মাঝে মাঝে। এমন দিন গেছে যখন মাভেরান্নহরে ও খোরাসানে শিল্প ও বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। খরেজমের বিরুনি, বুখারার আবু আলি ইব্‌ন সিনা, তুসের ফিরদৌসি, বালাসুগুনের মাহমুদ কাশগারি আর ইউসুফ খাস হাজিব—এঁরা সবাই মহান ব্যক্তি ছিলেন, আমিও আপনার সঙ্গে একমত যে তাদের কার্যাবলীতেই নিহিত রয়েছে ইতিহাসের মূল কথা। তারপর চেঙ্গিজখানের দলবল বেশ কিছু বছর ধরে বাধা দিতে থাকে ঘটনাবলী ও 'পাহাড়ের' উত্তরণে। সমরখন্দে উলুগবেগ আর হীরাটে নবাইর জামির কার্যাবলীতে ঘটনার গতি নতুন মোড় নেয়, নতুন নতুন মহান প্রতিভার জাগরণ ও আবির্ভাব হয়... আকাশের গম্বুজের আবর্তন—চমৎকার বলেছেন, জাঁহাপনা,' এতক্ষণে যেন হঠাৎ মনে পড়ল খোন্দামিরের কার সঙ্গে কথা বলছেন, 'হঠাৎ যেন শয়তানের মনে হল যে মহান ব্যক্তির সংখ্যা আমাদের মধ্যে বড় বেশি, তাই পাঠাল আমাদের কাছে শয়বানীর দলবলকে। বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য—সবকিছুর পতন আরম্ভ হল... সব প্রতিভাবান লোকেরা আপনার কাছে ভারতে চলে এলেন। আমার মনে হয় ঘটনাবলী নতুন মোড় নেবে এখানে... বিদেশে জীবনধারণ করা কষ্টকর, ঠিকই কিন্তু এই অসীম আর ভুলেভরা দুনিয়ায় আছে এক দেশ ভারতবর্ষ, যেখানে বুদ্ধি, বিজ্ঞান আর শিল্পের আছে মর্যাদা—তা জেনেও আনন্দ আর নতুন শক্তি পাওয়া যায়।' হঠাৎ মৃদু হেসে শেষ করলেন খোন্দামির। 'আর এখন আপনার আশ্রয়ে, জাঁহাপনা, 'প্রিয় বন্ধুর জীবনী' বইটি লেখা শেষ করার আশা রাখি।'

'আপনার এই সিদ্ধান্তে আনন্দিত আমি; এ জন্য যা সাহায্য প্রয়োজন তা দিতেও প্রস্তুত।'

'আপনার এই দাস হীরাটে মির আলিশের গ্রন্থালয়ে কাজ করেছে বহু বছর। আর হুসেন বাইকারার গ্রন্থালয়ে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি নিয়েও অনেক কাজ করেছে... ঐ গ্রন্থালয়গুলি—অনেক দূরে... এখন...'

খোন্দামির জানেন বাবরেরও তেমনি এক গ্রন্থালয় সংগৃহীত হয়েছে, যেখানে পঞ্চাশ জন কাজ করে, সেখানে হয়ত এমন দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যেতে পারে যা হীরাটেও নেই। পাণ্ডুলিপি ছাড়া, ঘটনার সূত্র ছাড়া আবার ঐতিহাসিক কি? কিন্তু শাহ্‌র গ্রন্থাগারে তো আর যে কোন লোকেরই প্রবেশাধিকার নেই। ইচ্ছে করেই থেমে গেলেন তিনি, কিন্তু বাবর বলে চললেন:

'অতদূর থেকে আমাদের কাছে এসেছেন আপনি, আপনার সামনেও কি কোন

দুয়ার বন্ধ থাকবে, মওলানা? আমি ইতোমধ্যেই আদেশ দিয়েছি যাতে আমার গ্রন্থাগারিক আবদুল্লা আপনাকে সাহায্য করে। আমার গ্রন্থাগারে ভারতবর্ষের অনেক গ্রন্থ আছে। আবদুল্লার অধীনে কর্মরত অনেক অনুবাদক-পণ্ডিত, যাঁরা সংস্কৃত ভালো জানেন। তাদের কাউকে নিজের কাজে লাগান...'

'আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই, আলমপনা। যদি আপনি অনুমতি দেন তো আর একটা অনুরোধ করি, অত্যন্ত দুঃসাহসী অনুরোধ, জাঁহাপনা!'

'বলুন, মওলানা, কি সে অনুরোধ?'

'আপনার মনে আছে বোধহয়, হীরাটে নিজের জীবন নিয়ে লেখা গ্রন্থের থেকে একটি অংশ পড়ে শুনিয়েছিলেন আপনি। আমি জানি বহুদিন ধরেই আপনি লিখছেন গ্রন্থটি। তখন অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম আপনার প্রতি। যদি সে গ্রন্থের কোন অংশ ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে, যা আমি পড়তে পারি... তাহলে তা থেকে আমি জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করতে পারতাম।'

খানিকক্ষণ নীরবে চলতে লাগলেন বাবর। ঘোড়ার মাথার দিকে তাকিয়ে রইলেন। খোন্দামিরের এই অনুরোধ পূরণ করার ইচ্ছা নেই। গত দু'বছর ধরে বাবর 'অতীত' গ্রন্থটি কেবল যে সম্পূর্ণ করার চেষ্টাই করছেন তা নয়... আবার নতুন করে লিখছেনও। কেন? দুটি কারণে। প্রথমত এখানে যেমন আসে তেমনি হঠাৎ আসা ঝোড়োবৃষ্টিতে ছাউনি উড়ে গিয়ে গ্রন্থটির বেশ কিছু পাতা হারিয়ে যায়, কিছু নষ্ট হয়ে যায় আর কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যায়... আর দ্বিতীয়ত, আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল: মন চাচ্ছে গ্রন্থটিকে আরও সম্পূর্ণ রূপ দিতে... আরও নগ্নভাবে তুলে ধরতে সত্যকে!

'আমি ভেবে দেখব,' শুষ্কস্বরে বললেন বাবর।

সিক্রী পাহাড়ের পাদদেশে যে বাগিচা আছে, তাতে আছে একটি ঝর্ণা, ঠান্ডা জলের ধারা বয় সেটি দিয়ে। সেই জল দিয়ে তৃষ্ণা মিটাতে ইচ্ছা হল বাবরের—আর এখানে বসে বিশ্রাম করতেও এত ভাল লাগে। কলকল করে বয়ে যাওয়া সেই জলধারা মাটির নীচে কোথা থেকে যেন উঠিয়ে নিয়ে আসছে ছোট্ট, প্রায় অদৃশ্য বালিকণা, কেবলমাত্র জলে সূর্যরশ্মি পড়লেই দেখা যায় সেগুলি।

আঙুলের ডগা থেকে জলকণা ঝেড়ে ফেলে খোন্দামির বললেন,

'কি নীরব, নিঃশব্দ চারদিক... বিশ্বাস হয় না যে দু'বছর পূর্বে এখানে, এই সিক্রীতে রক্তঝরা যুদ্ধ হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই, রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে যুদ্ধই আমার জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর, রক্তঝরা যুদ্ধ... আর যত কিছু ঘটনা ঘটেছে যুদ্ধের পূর্বে আর যুদ্ধেরও যত খুঁটিনাটি আমি লিখে রেখেছি... 'বাবরনামা'তে। সন্ধ্যাবেলায় নতুন করে লেখা পাতাগুলি পড়তে দেব আপনাকে, আপনি পড়ে আপনার মতামত জানাবেন অকপটে... আমি

আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, মহামান্য মওলানা, এই জন্য যাতে আমার কাছে কাছে একজন জ্ঞানী উপদেশদাতা থাকেন, যিনি ভাষা বোঝেন।'

'আপনি আমাকে এমন সম্মানে সম্মানিত করলেন, জাঁহাপনা, যা জীবনে এর আগে এর আগে কখনও পাইনি।'

'আমি আর আপনি দু'জনেই তো মহান মির আলিশেরের অনুসরণকারী...'

২

সিক্রী পাহাড়ের উত্তর দিকে ছায়াবিছান বাগিচার মাঝে তিনটি ঘরবিশিষ্ট একটি বাড়ি নির্দিষ্ট করা হয়েছে খোন্দামিরের জন্য, সেখানে আইভানে বসেই চোখে পড়ে হ্রদের আয়নার মত জল।

সন্ধ্যার আহারপর্বের পর খোন্দামির বাবরের পাণ্ডুলিপি পড়তে আরম্ভ করলেন। হীরাটে বাবর তাঁকে যে উদ্ধৃতিগুলি পড়ে শুনিয়েছিলেন তা তাঁর মনে যে ছাপ ফেলেছিল সেকথা এখনও মনে আছে তাঁর। তখনও খোন্দামির বিস্মিত, এমন কি সামান্য ক্ষুণ্ণও হয়েছিলেন শব্দ প্রয়োগের সারল্যে।

সেই সারল্য এই পাণ্ডুলিপিতে ফুটে উঠেছে আরও বেশি করে:

'নিজের দলের লোকদের সন্তুষ্ট করার জন্য এবং ছাউনি আরও বেশি সুরক্ষিত করে তোলার জন্য আমি আদেশ দিলাম যেখানে যেখানে ঠেলাগাড়ি দাঁড় করাবার জায়গা নেই সেখানে বিশেষ ধরনের তিনপায়া কাঠের ঠেকো সাত আট কড়ি দূরে দূরে বসাতে, গোরুর চামড়ার তৈরি শক্ত দড়ি দিয়ে সেগুলিকে মজবুত করে বাঁধতে প্রত্যেকটিকে তার পাশেরটির সঙ্গে... সাম্প্রতিকালের ঘটনার ও বাজে গুজব রটানোর ফলে আমার কিছু সৈন্যের মধ্যে ভয় ও দ্বিধা দেখা দিয়েছে। এ দিকে জ্যোতির্বিদ মুহম্মদ শরীফ, দুষ্টস্বভাবের লোক, আগামী যুদ্ধের কথা আমাকে কিছু না বলে প্রত্যেককে ভয় দেখাচ্ছে যে যুদ্ধের নক্ষত্রের অবস্থান পশ্চিমে, যেই পশ্চিমদিক থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করবে তারই পরাজয় হবে। আমরা তো ছিলাম পশ্চিমদিকে। কে জিজ্ঞাসা করতে গেছে, ঐ নিষ্কর্মা বাচালটাকে? আরও বেশি করে মন ভেঙে দিয়েছে আমার সৈন্যদের। কিন্তু আমি ওর কথা শুনেও যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য যা করা দরকারি তা করে গেছি ঠিকই...'

এমনি সহজ, সুন্দর বর্ণনা দিয়ে গেছেন বাবর সে সব ঘটনার যা নিজের চোখে দেখেছেন, যার ফল ভোগ করেছেন। কোন কোন অংশে বর্ণনা আকর্ষণকর হলেও তাতে নেই শব্দপ্রয়োগের সেই অলঙ্করণ বা সূক্ষ্মতা যাতে খোন্দামির পাঠক হিসাবে শিশুকাল থেকেই, অভ্যস্ত গ্রন্থটিতে প্রায়ই বাবরের কথা বলার ধরনও খুঁজে পাচ্ছেন খোন্দামির।

কিন্তু এ কি ভাল কথা? বাদশাহ্‌র জীবন নিয়ে এমনিভাবে কি লেখা চলে?

খোন্দামিরকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন ও বড় করে তুলেছেন তাঁর পিতা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিরখন্দ। তিনি বারবার বলতেন, ইতিহাস লেখা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের জন্য, জীবনের তিক্ত ও কর্কশ সত্যের কথা খুব ভালো করেই জানা আছে তাঁদের, তাই জন্য গ্রন্থ লেখা হয় পরিচ্ছন্ন, মধুর ভাষায়। শাসকদের মন ভরাবার জন্য মহিমান্বিত ভাষায়, ফোলানফাঁপান কাব্যিক উপমা ও বিশেষণের প্রয়োগে ঘটনাবলীর বর্ণনা করা হয়।

বাবরের লিখিত গ্রন্থটি যেমন আকৃষ্ট করছে তেমনি চিন্তায়ও ফেলেছে খোন্দামিরকে।

এই যেমন এই জায়গাটা... হুমায়ুনের পত্রের উত্তরে নিজের উত্তরটি তুলে ধরেছেন বাবর:

'সহজ ভাষায় লেখ। তুমি সূক্ষ্মভাষায় লেখার চেষ্টা করেছ তার ফলে কয়েক জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম। চেষ্টাকৃত সৌন্দর্য বাদ দিয়ে যদি তুমি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে লেখ তো তাহলে তোমার পক্ষেও কাজ সহজ হবে আর যে তোমার পত্র পড়বে তারও কষ্ট কমবে।'

সচেতনমনে, সুচিন্তিতভাবে অলঙ্কৃত মধুর ভাষা বর্জন করেছেন এই আশ্চর্য শাহ্, যার প্রতি খোন্দামির এক সময় অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিলেন। আর এখনও বাবরের সেই উদ্দেশ্য যেন কেটে বসল তাঁর বুকে।

পড়া স্থগিত রেখে বারবার বেরিয়ে আসেন রাতের নিস্তব্ধ বাগানে, হ্রদে চাঁদের ছায়া খোঁজেন—কিন্তু মনের দরজার কাছে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাবর।

দশবছরেরও বেশি হল খোন্দামির লিখছেন 'হাবিব উনসিয়ার', তাঁর প্রধান গ্রন্থটি—'প্রিয়বন্ধুর জীবন কাহিনী'। লিখছেন সেই পদ্ধতিতে যেমন এতদিন পর্যন্ত প্রয়োজন বলে জানতেন: সূক্ষ্ম মধুর ভাষায় আর সে ভাষায় 'অধম আমিত্ব' কে মিলিয়ে দিয়ে। সেই লেখার ধরনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তিনি, খাপ খাইয়ে নিয়েছেন নিজেকে। নিজের 'আমিত্ব'কে তুলে ধরা—এ হল অত্যন্ত হীন ব্যবহার।

বাবর নিজেকে তুলে ধরতে সঙ্কোচ করেননি। তা ছাড়া, লিখেছেন নিজের অসাফল্যের কথা, নীচ উদ্দেশ্যের কথা, খোদা তাঁকে দোয়া করুন!... আর কেমনি করে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল তা বলতে গিয়ে বাবর লিখেছেন, 'শৌচাগারে প্রচুর বমি করেছি'।

'হায় আল্লাহ্ কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়, ভাবলেন ঐতিহাসিক। অমার্জিত, কিন্তু আকর্ষণ করে... নির্জলা সত্য তুলে ধরার সাহসে, এই শিক্ষিত, মহাজ্ঞানী শাহ্ বাবর পাঠককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন। আমি লিখি—যেমন আর সবাই লেখে, সেখানে পুনরাবৃত্তি অনিবার্য তাই সে বর্ণনা একঘেঁয়ে হয়ে পড়ে, কিন্তু এখানে পুনরাবৃত্তি নেই, এ এক বিশেষ ধরনে লেখা। আর লেখকও বিশেষ ধরনের!'

বাড়ির ভিতর ফিরে এলেন খোন্দামির। আবার পড়তে লাগলেন পাণ্ডুলিপি—কয়েকবার পড়লেন। না: স্বীকার করলেন তিনি কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থই ঘটনার এমন নিখুঁত ও নির্ভুল ছবি তুলে ধরতে পারেনি। আর বাবর যে এমন নির্ভয়ে সমালোচনা করেছেন নিজেকে, এমন খোলাখুলি লিখেছেন নিজের দুঃখকষ্টের, ভুলভ্রান্তির কথা—তা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল খোন্দামিরকে, মুগ্ধ করল তাঁকে বিশ্বাস আর অকপটতায়।

খোন্দামির আবার খুঁজে বার করলেন তাঁকে বিস্মিত করে দেওয়া পংক্তিগুলি: 'আগে এমন করে কখনও বুঝিনি বেঁচে থাকা কি সুখের।' এমন একটি গদ্যপংক্তি যে কবিতায়ও বলা যায় তা তখনি দেখিয়ে দিয়েছেন বাবর: 'মরণের দুয়ার থেকে যেই ফিরে এসেছে, সেই বোঝে জীবনের মূল্য।'

'বাবরনামা' পড়তে পড়তে খোন্দামির চোখের সামনে দেখলেন তাঁরই মত একজন মরণশীল মানুষকে যাঁকে ক্রমশ আরও ভাল করে বুঝতে পারছেন, যিনি আরও প্রিয় হয়ে উঠছেন ক্রমশ তাঁর কাছে।

রাজাবাদশাহ্‌রা, কিন্তু সাধারণের সঙ্গে নিজের মিল দেখতে ভালোবাসেন না। প্রথমে খোন্দামির ভেবেছিলেন এই হল বাবরের এমন ভাষা বেছে নেবার কারণ। ফোলানো ফাঁপানো ভাষা ব্যবহার করে শক্তিক্ষয় করার দরকার কি শাহ্ বাবরের? নিজে তিনি শাহ্, তাই সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে সমাজে প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করতে পারেন তিনি।

এই কথা ভেবে বাবরের এমন আশ্চর্য সরল ভাষা ব্যবহারের কারণ খুঁজে পেয়ে আশ্বস্ত হলেন খোন্দামির। তারপর তিনি ভাষার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে ঘটনাবলীর অদ্ভুত নিখুঁত ও অকপট বর্ণনার মধ্যে ডুবে গেলেন।

বারবার সে লেখাগুলি পড়লেন খোন্দামির সারা রাত ও পরের দিন ধরে...

বাবরকে হঠাৎ প্রয়োজনে আগ্রা চলে যেতে হয়েছিল, দু'দিন বাদে ভোরবেলায় সিক্রী ফিরে এলেন, দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম এড়াবার জন্য রাতের বেলায় পথে বেরিয়েছিলেন তিনি।

আরও রোগা দেখাচ্ছে শাহ্‌কে, ঝর্ণার কলকল আওয়াজের মধ্যে খোন্দামিরকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন:

'আমি ছিলাম না বলে একঘেয়ে লেগেছে নাকি আপনার, মওলানা?' মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন খুশিখুশি ভাব।

'আমি তো সব সময়টাই আপনার সঙ্গে কথা বলেছি, অনর্গল।'

'এখনও শেষ হয়নি পড়া?'

'প্রথমে এক রাতের মধ্যে সবটা পড়ে ফেলি, তারপর বারবার পড়ি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এখন এটি ছাড়া অন্য কিছুর কথা আর চিন্তাই করতে পারছি না।'

'মওলানা আমাকে রেখেঢেকে বলার দরকার নেই। সত্যিকথা বলুন।'

'সত্যিকথা? বলি তাহলে! আপনি মেরে ফেলেছেন আমাকে।'

খোন্দামির, কিন্তু ঠাট্টা করেননি। চোখে বিষাদের ছায়া।

'কেমন করে... আমি মারতে পারি... আপনাকে?'

'সহজ ভঙ্গিতে! আপনি নিজের সহজ, স্বচ্ছ ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন আমায় ফোলান, ফাঁপান, সূক্ষ্মভাষার অপ্রয়োজনীয়তার কথা।'

স্বস্তির হাসি ফুটল বাবরের মুখে:

'এই কথা!.. আপনি যদি আমার অবস্থায় পড়তেন। সূক্ষ্ম সুন্দর বাক্য ভেবে লেখার সময় ছিল না, আর তা লেখা ক্ষমতায়ও কুলাবে না আমার।'

'সময় না হয়ে ভালই হয়েছে... অপ্রয়োজনীয় কাজে,' খোন্দামির পাত্তা দিলেন না (নাকি বুঝলেন না) বাবরের ঠাট্টা। 'আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, জাঁহাপনা,—এমন চমৎকার গ্রন্থ এর আগে তুর্কী ভাষায় লিখিত হয়নি।'

'কিন্তু এখনও শেষ করা হয়নি এটি। তাছাড়া কয়েকটি অধ্যায় হারিয়েও গেছে।'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়গুলি আবার নতুন করে লিখবেন আপনি, কিন্তু... কিন্তু... আমি গ্রন্থটির কথা ভেবেছি অনেক, এমন অপূর্ব গ্রন্থ ফারসি বা তুর্কী কোন ভাষাতেই লেখা হয়নি... অনেক চিন্তা করে দেখলাম, জাঁহাপনা। যদি মির আলিশের লিখিত 'খামসা' এ পর্যন্ত তুর্কীভাষায় লিখিত কাব্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়, তো 'বাবরনামা' আমার কাছে, গদ্যের ভাষায় ইতিহাস লেখা লোকের কাছে.. আমার মনে এদুটি গ্রন্থ পাশাপাশি স্থান পেয়েছে।'

'আপনি আমার গ্রন্থটির গুরুত্ব একটু বেশি বাড়িয়ে বলছেন, মওলানা, আপনার উদার বিচারের জন্য ধন্যবাদ...' তাচ্ছিলের ভাব দেখালেন বাবর 'কিন্তু আমাকে তো 'বাবরনামা'তে অনেক কিছু নতুন করে লিখতে হবে এতে কি ভুলত্রুটি হয়েছে আমার তা বলুন।'

ভাবনায় পড়লেন খোন্দামির। তারপর ভাবলেন ছোট বড় দোষত্রুটির কথাই গোপন করবেন না।

'হুজুর, আমি কেবলমাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠার কথাই বলব... আপনি হীরাট, হুসেন বাইকারা ও তাঁর আমীরদের সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি লিখেছেন: সেখানে তারিখ ও নামের কিছু ভুল আছে।'

'আপনার সাহায্য প্রয়োজন, মওলানা।'

'আমি একটি কাগজে লিখে রেখেছি আমার মতামত, ঘরে রয়ে গেছে। যখন আপনাকে পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেব সেই সঙ্গে সেই কাগজটিও পাবেন।'

'কৃতজ্ঞ রইলাম।'

'যদি অনুমতি দেন, জাঁহাপনা, তো বলি আমি অন্যরকম মনে করি।'

'বলুন, মওলানা।'

'আমরা ঐতিহাসিকরা খুব ভাল করেই জানি,' বলতে আরম্ভ করলেন খোন্দামির, 'এ পর্যন্ত কোন রাজ্যেরই, বিশেষ করে বিশাল রাজ্যের, বিনা রক্তপাতে জন্ম হয়নি। আর মানুষ নিজেও বিনা রক্তপাতে জন্মলাভ করে না... আফগানিস্তানে এক বিশাল রাজ্য সৃষ্টি করেছেন আপনি, দিল্লির সিংহাসন জয় করেছেন আপনি। তার জন্য যুদ্ধে অবশ্যই রক্তপাত করতে হয়েছে। সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বিশেষ শত্রুভাবাপন্ন জাতিগুলিকে নিধন করতে আদেশ দিয়েছেন আপনি। সে সমস্ত কথা আপনি লিখেছেন 'বাবরনামা'তে। আরও লিখেছেন উত্তর ভারতে বাউর দুর্গে কেমন করে আপনার সৈন্যরা তিন হাজার লোককে কেটে ফেলে। কেমন করে পানিপথের যুদ্ধে কয়েকশত বন্দীকে ধ্বংস করে তারা কামানের গোলায়... সত্যানুসরণ মহান উদ্দেশ্য, ঠিকই জাঁহাপনা। তা আমি বুঝেছি। কিন্তু আপনার বংশধররা যখন এই গ্রন্থটি পড়বে তখন এই ধরনের খুঁটিনাটি বর্ণনা কি তাদের মনে গভীর ছাপ ফেলবে না? নিজের যশের জন্য কি আপনার ভাবা উচিত নয়?... গ্রন্থের এই অংশগুলি কি বাদ দেওয়া যায় না?'

বাবরের গলার ভিতরটা শুকিয়ে জ্বালা করতে লাগল। উত্তর দেবার জন্য ব্যস্ততা না দেখিয়ে ঝর্ণার কাছে গিয়ে বসে দু'হাতে আঁজলা ভরে তুলে নিলেন স্বচ্ছ জল। পরিষ্কার, ঠান্ডা জল খেয়ে স্বাভাবিক হলেন।

'বুঝি, মওলানা, এ কথা বলছেন যিনি তিনি আমার জন্য চিন্তা করেন। এ সব কথা লিখতে যন্ত্রণা আমিও কম বোধ করিনি... একসময় স্বপ্ন দেখতাম দুনিয়া কাঁপিয়ে দেওয়া আমীর তৈমুরকে। তিনি যেন আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন: রক্তপাত ছাড়া আবার যুদ্ধ কি। এ কথা ঠিকই... আর এখন আমি কষ্ট পাচ্ছি অনিদ্রায়... এই সমস্ত খুঁটিনাটি কথা লিখে রেখেছি মন হালকা করার জন্য। আমার বংশধররা যেন সব ঘটনা ঠিক যেমন যেমন ঘটেছে তেমনিভাবে জানে। তারা যেন আমাদের দেবদূত বলে ভাবে না। অন্যে আমাদের যে ক্ষতি করেছে তাতে আমরা যে কষ্ট পেয়েছি তা যেমন তাদের জানা উচিত তেমনি জানা উচিত আমরা যা ক্ষতি করেছি অন্যের, কি কষ্ট দিয়েছি অন্যকে।'

এই দুই ধরনের যন্ত্রণার কথা ফুটে উঠেছে বাবরের কতকগুলি কবিতাতে তা জানেন খোন্দামির: তিনি যেন মানসচক্ষে দেখলেন যে বাবর কেবল রাজকার্যের চাপেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন না, তাঁর মনের ভিতর অহরহ লড়াই চলছে লড়াই শাহ, শাসক ও কবি, শিল্পীর মধ্যে। শাহ্ বাবর সারা জীবন ধরে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন দৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের, কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল করতে গিয়ে এমন কতকগুলি কাজ না করে পারেননি যা কবি বাবরের পক্ষে মনে করাও যন্ত্রণাদায়ক। আলিশের নবাই ও হুসেন বাইকারার মধ্যে যা ঘটেছে—তা ঝড় তুলেছে বাবরের মনে—একজন লোকের একই মনে।

'জাঁহাপনা, আমি যা বলেছি তার চেয়ে আপনার কথারই যুক্তি বেশি। আর সত্যিই, জীবনের অভিজ্ঞতার তিক্ত ফল অন্যের কাছে শিক্ষামূলক হতে পারে। যাই হোক, প্রধান কথাটি ভুলে গেলে চলবে না আমাদের... মনে আছে শেষবার আপনি যখন হীরাটে এসেছিলেন, কিসের সঙ্গে আপনি তুলনা করেছিলেন নিজের জীবনকে? এই ঝর্ণাটি আপনাকে কোন কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে না?'

'হ্যাঁ মনে আছে। আমি আপনাকে বলেছিলাম আমার জীবনটা পাহাড় ধ্বসে চাপা পড়া ঝর্ণাধারার মত।'

'ঠিক তাই, জাঁহাপনা। আপনার কি মনে হচ্ছে না, মাভেরান্নহরে চাপা পড়া ঝর্ণাধারাটি ভারতবর্ষে আবার মুক্তি পেয়েছে?'

'অত্যন্ত চমৎকারভাবে বললেন আপনি। যদি আমার ভিতরে ঝর্ণার উৎস থেকেই থাকে তো তা হল আমার কাব্যরচনা, আমার সৃষ্টি... প্রতিবাদ করবেন না যদি আমি বলি যে সিংহাসন মানুষকে এই নশ্বর জগতে বিস্মৃতির সাগরে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে না, এ আমি বুঝেছি বহুদিনই। মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়া ভাগ্যে নেই আমার। কিন্তু আমার কবিতা তুর্কীভাষায় লেখা আমার গ্রন্থগুলি ফিরে যাক সেখানে... মওলানা আপনি যদি জানতেন আন্দিজান, সমরখন্দ, তাশখন্দের জন্য কি মন কেমন করে আমার। সেখানেই তো আমি বড় হয়েছি, মানুষ হয়েছি।'

হঠাৎ চোখ ভিজে উঠল বাবরের, মুখ নামিয়ে নিলেন তিনি।

'জাঁহাপনা, আপনি নিজেই তো বলেছেন ভারতবর্ষ আপনার দ্বিতীয় মাতৃভূমি হয়ে উঠেছে। আপনার গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষেরও জয়গান গাইবে।'

'গত ক'বছর ধরে ভারতবর্ষকেই জীবন উৎসর্গ করেছি আমি সেকথা ঠিকই। কেবল শাহ্‌র নিষ্ঠুর দায়দায়িত্ব পালন করা দিনেদিনে ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে আমার কাছে।'

'আজ আপনার ভিতরে কবিমনটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, জাঁহাপনা। কিন্তু... আপনি যদি শাসকের জীবন অতিবাহিত না করতেন তো তাহলে আপনি বোধহয় 'বাবরনামা'ও লিখতেন না। তাছাড়া এখানে আপনি এসেছেন শাহ্, সেনাপতিরূপে, তাই নয় কি?'

খোন্দামিরের অত্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছিল বাবরের অন্তরের কবি ও শাহ্‌র মিলন ঘটিয়ে দিতে।

'চলুন, মওলানা, পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে নেব এখন,' মৃদু হাসলেন বাবর, চোখে ক্লান্তি কিন্তু সব বুঝেছেন এমনি ভাব, 'কবি ও ঐতিহাসিক বাবর চাচ্ছে লেখা শেষ করতে, যাতে যুদ্ধপ্রিয় শাহ্ বাবর আবার নতুন কোন ধস ফেলে ঝর্ণাধারার উৎস চাপা দিয়ে না দেয়।'

আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম আরম্ভ হয়েছে। বাবর তাঁর 'বিশ্রামমহলে' বসে থাকেন সব সময় 'বাবরনামা' নিয়ে আর সমানেই কষ্ট পাচ্ছেন প্রচণ্ড তেষ্টায়। গরম চা, ঠাণ্ডা ফলের রস অনবরত পান করছেন কিন্তু তেষ্টা মিটছে না কিছুতেই।

একদিন সোনার থালায় করে কয়েক থোলো টাটকা সমরখন্দের সাদা আঙুর নিয়ে এল তাহির। বিস্মিত হলেন বাবর:

'কোথা থেকে এল?'

'হশ্‌ত্ বেহশ্‌ত্' বাগিচা থেকে, জাঁহাপনা! মনে আছে আপনি নিজে হাতে বসিয়েছিলেন সমরখন্দ থেকে আনা গাছের কাটা ডাল?'

সদ্য ধোয়া আঙুরের থোলোর ওপর জলের ফোঁটা চিকচিক করছে। 'যেন ভোরের শিশির' ভাবলেন বাবর, তারপর একটা থোলো তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে নিতে লাগলেন তিনি। মনে হতে লাগল যেন সির-দারিয়ার তীরে সমরখন্দ আর আন্দিজানে কাটান ছেলেবেলার দিনগুলিতে ফিরে গেছেন তিনি। 'হে আল্লাহ্, কৃতজ্ঞ আমি—প্রচণ্ড তেষ্টাও মিটছে আর দেহমনেও খুশি হয়ে উঠছে।'

'ভাবতে পারা যায়!' খুশি হয়ে বললেন বাবর। 'যমুনার তীরে ফলেছে সমরখন্দের সাদা বীজহীন আঙুর! এ দেখান উচিত মহিম বেগমকে! তাহিরবেগ, নাও তো থালাটা ওঁর কাছে যাওয়া যাক।'

গত বছর শরৎকালে শেষ পর্যন্ত মহিম বেগম কাবুল থেকে আগ্রা এসে পৌঁছেছেন। যেখানে 'বিশ্রাম মহল' অবস্থিত সেই জারাফশান বাগিচাতেই নির্মিত প্রাসাদে বাস করছেন তিনি।

তাহিরকে সঙ্গে নিয়ে খুশি মনে সেই প্রাসাদের দিকে চললেন বাবর। বৃষ্টি সবে থেমেছে, কিন্তু আকাশে মেঘের দল তখনও বিদায় নেয়নি। তাহিরের হাতে ধরা থালার দিকে তাকালেন বাবর: আঙুরগুলি সোনালী দেখাচ্ছে, যেন হালকাআলোর রশ্মি সেগুলি মেঘের পাহাড় ভেদ করে এসে পড়েছে সমরখন্দ থেকে।

মহিম বেগম আইভানে ছোট্ট টুলের সামনে বসে চিঠি লিখছিলেন। বাবরকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন।

'মহিম, আমাদের আঙুর তুমিও চেখে দেখ, সমরখন্দের মত কি না?'

কিন্তু মহিমের এখন কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না। তাহিরের হাত থেকে থালাটি নিয়ে তিনি রাখলেন টুলের ওপর।

তাহির বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মহিম বেগমের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, কথা বলতে পারছেন না তিনি। উদ্বিগ্ন হলেন বাবর:

'কি হয়েছে, মহিম? তুমি কাঁদছ?'

'নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে...'

চল্লিশের ওপর বয়স হয়েছে মহিমের, মুখচোখ ফোলা ফোলা, আগের সৌন্দর্য আর নেই, দেহটা ভারী হয়ে গেছে। কাবুলের শুকনো পাহাড়ী হাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, যমুনার তীরে বাতাসে দমবন্ধ করা আর্দ্রতায় খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর। ভারতবর্ষে প্রচণ্ড গরমের কথা শুনেছেন এর আগে সেজন্যই তিনবছর ধরে বিভিন্ন কারণে আসতে চাননি। কিন্তু ইদানীং বাবর বিশেষ অনুরোধ করায় এসেছেন।

'যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন আমারও কষ্ট হয়,' মহিমকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন বাবর। 'ভেবো না, অভ্যাস হয়ে যাবে!... কথা রাখ, আঙুর খাও!'

মহিম বেগমের একটুও ইচ্ছা করছিল না আঙুর নিয়ে মাথা ঘামাতে কিন্তু বাবরকে খুশি করার জন্য দুটি আঙুর ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দিলেন, বললেন:

'চমৎকার পেকেছে। অপূর্ব স্বাদ।'

'তুমি চিঠি লিখছিলে?'

'হ্যাঁ, হুমায়ুনকে... জাঁহাপনা, আমার কষ্ট হচ্ছে আবহাওয়ার কারণে নয়, ছেলের জন্য মন কেমন করে!'

যেন এক উৎসমুখ খুলে গেল তাঁর—সামান্য হাঁপিয়ে দ্রুত বলতে লাগলেন:

'হুমায়ুনের জন্য বড় অধীর হয়ে পড়েছি। আপনি যেন ইচ্ছা করেই ছেলেকে আমার থেকে দূরে পাঠিয়ে দেন! আমি যখন কাবুলে ছিলাম, তখন সে সারাক্ষণ ছিল যমুনার আর গঙ্গার তীরে। আর এখন আমি আগ্রায়, হুমায়ুন চলে গেল বাদাখ্শান। সেখানে শৃঙ্খলা স্থাপন করে ফিরে আসার পরই আপনি তাকে আবার দূর সম্বলের শাসনকর্তা করে পাঠালেন। যেখানে বিপদ, সেখানেই হুমায়ুন। দূর অঞ্চলে কোথাও কোন গোলমাল দেখা দিলেই সেখানে হুমায়ুনকে পাঠান! আর আমি সর্বদা তার জন্য চিন্তায় মরি, বুকে রক্ত ঝরে!'

'এত চিন্তা কর কেন, মহিম?.. আর সাহসী হুমায়ুন নিজেই সম্বলে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল...'

'আপনি চিন্তা করেন না কারণ আপনার সন্তান অনেকগুলি! কিন্তু আমার তো আছে ঐ একটিই! তিনটিকে কবর দিয়েছি, তিনটিকে, এমনি মা আমি! আছে কেবল হুমায়ুন!'

কাঁদতে লাগলেন মহিম।

এই চোখের জলে আর তিরস্কারে কেবলমাত্র মায়ের উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তাই অনুভব করলেন না বাবর, আরও অনুভব করলেন এত বছরেও কেটে না যাওয়া তাঁর ওপর অভিমান: কেবল তিনিই এমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন স্বামীকে, ওদিকে ওঁর আরও দুই স্ত্রীর প্রয়োজন হল।

এমন সময় ঘরের মধ্যে ছুটে এল হালকা ফুলকাটা পোশাকপরা আটবছরের গুলবদন, পিতাকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে অভিবাদন জানাল, ছটফট করে বেড়াতে লাগল ঘরময়, কিন্তু যেই দেখল যে মহিম বেগম কাঁদছেন উদ্বেগে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাবর হয়ত মনে করিয়ে দিতেন গুলবদন ও হিন্দোলও তাঁর সন্তান। কিন্তু চুপ করে রইলেন। ওদিকে মহিম বেগম নিজের দুঃখের ফিরিস্তি দিয়েই চললেন:

'হুমায়ুনের মত মির্জা কামরোনও আপনার আর এক ছেলে! সে লাহোরে তার মায়ের কাছে কাছে থাকে! কেন আমার হুমায়ুনই কেবল সব বিপদের মুখে এগিয়ে যাবে?'

প্রায় রেগে উঠলেন বাবর।

'তার কারণ সে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, আমার জায়গায় সে বসবে, মহিম! বিপদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষা পাকা! ওর বয়সে আমার আরও কঠোর দিন গেছে!'

'কিন্তু আমি তো মা! উৎকণ্ঠা আর বিষাদে মরে যাচ্ছি আমি... আর আমার মনের দিকে দেখবার দরকারই বা কি আপনার! আপনার আরও দুই স্ত্রী আছে—যাদের বয়স অল্প।'

ঘরে মাঝখানে গুলবদন দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। এমন ধরনের কথাবার্তা এই প্রথম শুনছে সে। বাবার গোমড়ামুখ একপাশে ফেরান। মা কাঁদছেন। তাঁদের পরস্পরের প্রতি স্নেহময় ব্যবহারই সে দেখেছে কেবল এর আগে। কাবুল থেকে আগ্রা আসার পথে গোটা সময়টাই ছোট্ট গুলবদন অনুভব করেছে মায়ের উদ্বেগ, স্বামীর সঙ্গে দেখা হবার আনন্দ কল্পনা করেছেন তিনি। আর বাবা যে কি খুশি হয়েছেন মহিম বেগম এসে পৌঁছানয়। জালোলি হ্রদের তীরে তিনি তাদের সঙ্গে মিলিত হন, মহিম যে ঘোড়ায় বসেছিলেন সেটির লাগাম ধরেন আর নিজে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে চলেন। গুলবদন, ছোট্ট, কৌতুহলী, গুলবদন তারপর অনেকবার শুনেছে লোককে বলতে: মুসলমান শাসকদের মধ্যে আর কেউ এ পর্যন্ত এমন সম্মান দেখায়নি স্ত্রীকে।

এখন ছোট্ট গুলবদন কিছুই বুঝতে পারছে না তাঁদের হল কি। খারাপ কিছু একটা ঘটেছে তা বোঝা যাচ্ছে।

বাবর মেয়ের মুখচোখের ভাব দেখে টুলের কাছে এগিয়ে এসে থালা থেকে একটি আঙুরের গোছা নিয়ে মেয়ের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন 'নে বেটী, খা। বাগানে খেলা কর গিয়ে'।

মুখেচোখে উৎকণ্ঠার ভাব নিয়েই গুলবদন চলে গেল। নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়লেন বাবর।

'হ্যাঁ, মহিম, তোমার কাছে অপরাধী আমি। শরীয়তের আইন অনুযায়ী প্রতি মুসলমান তিনবার বিবাহ করতে পারে... কিন্তু এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আর

আমি বড় অস্থির, জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় কাটিয়েছি অভিযানে, যুদ্ধে, তিনবার বিবাহ করা খুবই অন্যায় হয়েছে আমার! আমার কোন স্ত্রীই সুখী হয়নি, কিন্তু আমি তোমাদের সুখী করতে চেয়েছিলাম... আজ তোমার দিকে তাকিয়ে দেখি, স্ত্রীদের মধ্যে মন কষাকষি, তাদের গর্ভে জাত সন্তানদের মধ্যে শত্রুতা... আশা করেছিলাম, আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই চলে আসা এই বিপদ দুঃখ তোমার আমার সুখ নষ্ট করবে না, মহিম... কিন্তু হায় মহিম, আমার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী মহিম সেই কষ্টেই চোখের জল ফেলছে!... তোমার কষ্ট দেখে আমার দুঃসাহসী প্রাণটা ভেঙে যাচ্ছে!'

বাবরের অসুস্থ হলদেটে মুখের দিকে তাকালেন মহিম আর যেন এই প্রথম লক্ষ্য করলেন সেই অসুস্থ হলদেটে ভাব। দ্রুত চোখের জল মুছে নিলেন।

'জাঁহাপনা, রাগ করবেন না। আমি দুর্বল নারীমাত্র, আর আপনি শাহ্। আপনাকে ছাড়া আর কার কাছে জানাব দুঃখের কথা? আপনি যে আমার দুঃখ বুঝেছেন, এতেই আমার সুখ...'

'হ্যাঁ, আমি শাহ্ সেই হল সব দুঃখের কারণ, মহিম। আমার যত ভুল, অন্যায় সবই সেই কারণে। আমার সিংহাসন পাবার আকাঙ্ক্ষা, সিংহাসন ধরে রাখার প্রচেষ্টার কারণে। যৌবনে দাখকাত পাহাড়ে নগ্নপায়ে হেঁটে দেখেছি, শৃঙ্খলমুক্ত হবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এমন কোন ত্রাণকর্তাকে খুঁজে পাইনি যে আমাকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবে। এ বোঝা অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। একটাই কেবল আশা এখন: হয়ত হুমায়ুন আমায় রেহাই দেবে এ বোঝা থেকে।'

হঠাৎ মহিম বেগম বুঝলেন বাবরের মনের কথা। কিন্তু বিশ্বাস হল না।

'মহিম, চিঠি লেখ। আর আমার নাম করে লেখ যে হুমায়ুন যত শীঘ্র সম্ভব আগ্রা ফিরে আসুক। আমি বেঁচে থাকতেই ও বসবে... বসবে সিংহাসনে। লেখ, লেখ আমি স্বাক্ষর দেব।'

'জাঁহাপনা। আপনি তো জানেন সিংহাসনের প্রতি কোন লোভ নেই হুমায়ুনের!.. আমি কেবল চেয়েছিলাম ও আমাদের কাছে কাছে থাক।'

'লেখ, ফিরে আসুক... সিংহাসনে বসার জন্য! হ্যাঁ সেই জন্যই... কিন্তু আপাতত আমার সিদ্ধান্ত যেন গোপন থাকে। আপাতত তুমি ছাড়া আর কেউ যেন কিছু না জানে, মহিম বেগম।'

মহিম বেগম এবার বুঝলেন বাবর সত্যিই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জিজ্ঞাসা করলেন:

'আর আপনি?.. কাবুলে ফিরে যেতে চান?'

'শীঘ্রই আমাকে চোখ বুঁজতে হবে, বুঝতে পারছি। তখন আমার দেহটা কাবুলে নিয়ে গিয়ে শেষ কাজ কোরো... আর জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাব আমি আগ্রাতে... বেশি দিন আর বাঁচব না। লিখতে ইচ্ছে হয়—অনেক। রাজকার্যে নিযুক্ত থাকায়

লেখার সময় হয় না। এবার লেখার সময় পাব... সিংহাসন, প্রাসাদ কিছুরই প্রয়োজন নেই আমার। এখানে, এই বাগিচার মাঝে 'বিশ্রামমহল'ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। দাসদাসী, সভাসদ কাউকেই প্রয়োজন নেই আমার, কেবল তাহিরকে পেলেই চলে যাবে আমার... আমার সিদ্ধান্তের কথা খুলে লেখ দেখি হুমায়ুনকে।'

'মাফ করবেন, হুজুর, এমন কথা আমার মাথাতেও আসেনি... এ অসম্ভব, অবিশ্বাস্য! যে ছেলে পিতাকে এত সম্মান করে, ভালবাসে তাকে এমন কথা লিখতে পারব না আমি যে পিতা সিংহাসনে দাবি ত্যাগ করছেন।'

বাবর উঠে দৃঢ়স্বরে বললেন:

'তাহলে আমি নিজে লিখব।'

বাইরে বেরিয়ে এসে গুলবদনকে দেখতে পেলেন বাবর। সতর্কদৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল মেয়ে, যেন আন্দাজ করে নিল কয়েকটি কঠিন মুহূর্ত কাটল বাবরের জীবনে। মৃদু হেসে বাবর হাত নাড়ালেন মেয়ের উদ্দেশ্যে।

২

সম্বলে হুমায়ুনের কাছে যখন পৌঁছাল পিতার চিঠি তখন হুমায়ুন প্রচণ্ড রোগে শয্যাগত। চিঠি পড়ে বাবরের গোপন সিদ্ধান্তের কথা জেনে হুমায়ুন নিজের লোকদের বললেন:

'আগ্রায় পৌঁছে দাও আমাকে!'

দিল্লিতে তাঁর জ্বর আরও বাড়ল, অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়াল তাঁর অবস্থা। হিন্দুবেগ তখনি লোক পাঠাল আগ্রায় তারপর দিল্লির শ্রেষ্ঠ হাকিমদের ডেকে পাঠাল। এখানেই রোগের চিকিৎসা করা দরকার।

কিন্তু কোন ওষুধেই কিছু হচ্ছে না। রোগ নির্ণয় করতেও অক্ষম হাকিমরা। কালাজ্বর গোছের কি এক অসুখ, কিন্তু সেটা ঠিক কোন রোগ... আর কেমন করেই বা চিকিৎসা হবে তার? দিনেরাতে আগুনের মত জ্বলছে হুমায়ুনের শরীর, কালো হয়ে গেছে তাঁর দেহ কয়লার মত।

মহিম বেগম আগ্রা থেকে এসে পৌঁছলেন। নিজে ঘোড়া চালিয়ে ছুটে এসেছেন, গাড়ীতে বেশি সময় লাগত। দু'দিন দু'রাত বিশ্রাম প্রায় না নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছেন।

তিনি ভাবলেন নদীপথে রোগীকে নিয়ে যাওয়াই ভাল—ঝাঁকানি লাগবে না আর গরমও কম লাগবে। তাই জাহাজে করে হুমায়ুন আগ্রা এসে পৌঁছালেন।

আটজন দাস ঢাকা পালকিতে করে হুমায়ুনকে বয়ে নিয়ে এল জারাফশান বাগিচায়। অচেতন শোয়া ছেলেকে দেখে বাবরের বুকের মধ্যে কি একটা তার যেন

ছিঁড়ে গেল, দাসদের কাঁধে দুলতে থাকা পালকিটা মৃত লোককে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে মনে হল।

মাঝে মাঝে ভুল বকছে হুমায়ুন। একদিন সারারাত এমনি জ্বরের ঘোরে কাটার পর ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় সামান্য চোখ মেলল সে। মাথার ওপর ঝুঁকে পড়া পিতার মুখ চিনত পারল। ওঠার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, মাথাটা পিছনে হেলে পড়ল আবার।

'আমরা... কাজে নিযুক্ত... আপনাকে ছাড়া... না, না...' আবার তাঁর চোখের সামনে কি সব ছায়া ভেসে বেড়াতে লাগল। চীৎকার করে বললেন হুমায়ুন: 'সোজা এগিয়ে চল... মার ওদের! পালাল... দাঁড়াও!...'

তারপর যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে এমনিভাবে ছটফট করল বিছানায়, পাশ ফিরল তারপর আবার জ্ঞান হারাল।

প্রাসাদের হাকিমরাও এ রোগের কোন ওষুধ খুঁজে পেলেন না। অবিরাম চোখের জল ফেলে চলেছেন মহিম বেগম। বাবরের কষ্টও অবর্ণনীয়। তাঁর মনে হতে লাগল, তিনিই সবসময় ছেলেকে বিপদের মুখে, আগুন আর বন্যার মুখে এগিয়ে দিয়ে তার এই ভয়ংকর রোগের কারণ হলেন। সবাইয়ের অভ্যাস হয়ে গেছে যে কোন দুঃসময়ে বাবরের ওপর নির্ভর করা, কিন্তু এবার তিনিও অসহায়। এবার তাঁর নিজেরই প্রয়োজন সাহায্যের, উপদেশের।

সেই সাহায্য অপ্রত্যাশিতভাবে এল বৃদ্ধ শেখ উল ইসলামের কাছ থেকে।

'জাঁহাপনা, আশা রাখুন, খোদাতালা হুমায়ুনকে আরোগ্যদান করবেন। কিন্তু যখন শ্রেষ্ঠ হাকিমরাও কিছু করতে পারেননি, গোপন কথা বলার ভাবে বললেন 'তার মানে হল আল্লাহ্ আপনাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছে, কোন কিছু অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু উৎসর্গ করতে হবে আপনাকে।'

'অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু?' মহিম বেগম তো ইতোমধ্যেই বলির ব্যবস্থা করেছেন— অনেক ভেড়া কেটে মাংস গরিব দুঃখীদের মাঝে বিলি করা হয়েছে। দানধ্যান সর্বদাই খুশি করে খোদাকে। আর কোন মূল্যবান বস্তুর কথা বলছেন তবে শেখ-উল-ইসলাম?

'জাঁহাপনা, সেই বড় হীরাটি উৎসর্গ করতে হবে।'

'কোনটি?.. কোহিনূর?'

শেখ-উল-ইসলাম সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। বিস্মিত হলেন বাবর: সে হীরার কথা বলতে পারলেন কি করে শেখ-উল-ইসলাম যখন জানেন যে মন মন সোনার সমান দাম সেটির।

'কাকে দেব হীরাটি... আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করে কাকে দেব সেটি?'

আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করা বস্তুগুলি গ্রহণ করে থাকে সাধারণ মোল্লা ইমামরা, তাদের প্রধান হল শেখ-উল-ইসলাম!.. কিন্তু বাবরের প্রশ্নের মধ্যে এমন

কিছু ছিল যে শেখ-উল-ইসলাম 'আমাকে' বলতে সাহস পেলেন না, ইতস্তত করে বললেন:

'আল্লাহ্‌র নামে হীরাটি রেখে আসা যায়... ইমাম মূর্তিজা আলির সমাধিতে।'

দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান হীরা, যা হল ভাবী শাহ্‌ হুমায়ুনের কোষাগারে প্রধান সম্পদ তা কিনা রাখা হবে কোন এক শেখের সমাধিতে? সেই সমাধি থেকে হীরাটি নিশ্চই পৌঁছাবে এই লোভী বৃদ্ধের হাতে। যুবক হুমায়ুনের হীরাটি দখল করতে চায়, বৃদ্ধ জানে এ সময় ছেলের জীবন রক্ষার জন্য বাবর ও মহিম বেগম সব কিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

বাবর জানেন শেখ-উল-ইসলাম তাঁকে ভালো চোখ দেখেন না মূর্তিপূজারী ভারতীয়দের প্রতি তাঁর নরম মনোভাবের জন্য। যদি হুমায়ুনের কিছু হয় তো শেখ-উল-ইসলাম ও অন্যান্য মোল্লারা বলে বেড়াবে যে শাহ্‌র লোভের কারণেই আল্লাহ্‌ তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

'সোজাসুজি বলুন তো দেখি: কোনটা বেশি দামী আমার জীবন বা কোহিনূর?'

'জাঁহাপনা! হাজারটা এমনি হীরার দাম আপনার কড়ে আঙুলের সমান নয়!'

'ঠিক আছে, তাহলে,' যাতে সবাই শুনতে পায় সে জন্য গলা উঁচিয়ে বললেন বাবর 'তাই যদি হয় তাহলে কোহিনূরের চেয়ে দামী কোন কিছুই উৎসর্গ করব আমি। আর সেই বস্তু গ্রহণ করুন আল্লাহ্‌ সোজাসুজি আমার কাছ থেকে।'

ভয়ে বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে রইল বাবরের দিকে, বাবর ধীরে ধীরে অচেতন হুমায়ুনের মাথার কাছে এগিয়ে গেলেন।

'আমার প্রাণাধিক পুত্র, হুমায়ুন! খোদার কাছে আমার মিনতি,' বলতে লাগলেন বাবব প্রার্থনার সুরে, 'তিনি তোর শরীর থেকে এই দুরন্ত রোগ নিয়ে আমার শরীরে ঢুকিয়ে দিন।'

মেয়েরা, হাকিমের, ইমামের, বেগের দল যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, স্তব্ধ হয়ে গেল। হুমায়ুনের শয্যা তিনবার পাক দিয়ে ঘুরে বাবর বলতে লাগলেন 'হে খোদা! আমি, শাহ্‌ জাহিরুদ্দিন বাবর, নিজের জীবন দিয়ে দিলাম আমার পুত্রকে। এ দান গ্রহণ করুন, আল্লাহ্‌! আজরাইল এসে আমার প্রাণটা নিয়ে যাক আর হুমায়ুন আরোগ্যলাভ করুক!'

মহিম বেগমের কান্না বন্ধ হয়ে গেছে, চোখে আতঙ্ক আর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন স্বামীর দিকে। বৃদ্ধ শেখ-উল-ইসলামের চোখগুলি নিবদ্ধ বাবরের ওপর যেন হুমায়ুন এখনি রোগশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে আর বাবর নির্জীব হয়ে পড়ে যাবেন সেই যোগশয্যার উপর।

কিন্তু তেমন জাদু কিছু ঘটল না। জ্ঞানহারা হুমায়ুন শুয়ে শুয়ে কি একটা বলল বিড়বিড় করে, তারপর আবার নীরব হয়ে গেল।

বাবর মাথা নামিয়ে চলে গেলেন সে ঘর ছেড়ে।

৩

রোগের সঙ্গে লড়াই করে শেষে হুমায়ুন সেরে উঠলেন ও এক সপ্তাহ পরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পরের দিন বিশ্রামমহলে গেলেন পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

পিতার মুখ দেখলেন হুমায়ুন—রোগা হয়ে গেছে, চোখগুলি বড় বড় ঝুঁকে পড়েছেন এ বয়সেই।

ছেলের দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললেন 'অনিদ্রায় ভুগছি, তোমার শরীর কেমন?'

'আপনিই তো আমার জীবনরক্ষা করেছেন, জাঁহাপনা। চেতনা ফিরে পাবার পর থেকেই খোদার কাছে প্রার্থনা করছি যেন আমার জন্য আপনার জীবন নিয়ে না নেন তিনি।'

'চিন্তা করিস না রে, বাবা, ও কেবল উৎসর্গদানের প্রতীক মাত্র। তা না করলে নিজেকে, নিজের বিবেককে আশ্বস্ত করতে পারছিলাম না কিছুতেই... তাছাড়া তোমার মায়ের সামনেও অপরাধ স্খালন করার প্রয়োজন ছিল।'

'মোল্লারা বলছে যে, যে মৃত্যু আমার ওপর নেমে এসেছিল তা নেমে আসবে এবার আপনার ওপর।'

'ওদের কথায় তুই বিশ্বাস করিস নাকি? আমরা সবাই মরণশীল, যার যার নির্দিষ্ট সময়েই প্রত্যেকেই এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু সেই দুঃসহ মুহূর্তে আমি দেখলাম তোমার রোগকে ওরা তোমার আর আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। শেখ-উল-ইসলাম আমাকে কাবু করতে চায়। তুই সেরে উঠলি, আর যদি ওর কথা শুনে আমি কোহিনুর হীরা দিয়ে দিতাম তো ও আর মোল্লারা জাঁক করে বলে বেড়াত তারাই হুমায়ুনকে সারিয়ে তুলেছে, শাহ্‌র চেয়ে তাদেরই ক্ষমতা বেশি... আমি তাই ওদের চুপ করাবার জন্য ঐ নিজেকে উৎসর্গ করার কৌশল নিলাম...শক্তিশালী ও নমনীয় হতে হবে রে। মনে রাখিস, বাবা: মোল্লা, শেখরা সবসময়ই আমাদের উপরে উঠতে চায়। কিন্তু খোদার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের জন্য বেশি মধ্যস্থতাকারীর কোনই প্রয়োজন নেই। মুল্লা, শেখদের কথা শুনবি কিন্তু কাজ করবি নিজের বুদ্ধি অনুসারে। মহান উলুগবেগের ছেলে আবদুল লতিফ তাদের কথা শুনে কি করেছিল, মনে রাখিস।'

'মনে আছে জাঁহাপনা... এমনভাবে আপনি বলছেন যেন ইতোমধ্যে আমাকে সিংহাসনে বসিয়েছেন, যেমন লিখেছিলেন চিঠিতে। বিশ্বাস করুন, সম্বলে যে আমি আপনার হয়ে, পিতা, আপনার হয়ে শাসনকার্য চালাচ্ছি সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট... শুনলাম, আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে সেখানে। আপনার অনুমতি পেলে দু'দিন বাদে আবার সেখানে রওনা দিই আমি।'

ছেলে যাতে তাঁর কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শোনে সেজন্য খানিকক্ষণ নীরব রইলেন বাবর।

'শোন হুমায়ুন, আমার উদ্দেশ্য ছেলেখেলা নয় মোটেই। শীঘ্রই শাসনভার তোমায় তুলে নিতে হবে নিজের হাতে। বাইদা যখন আমাকে হত্যার চেষ্টা করে সেই তখন থেকেই এই দু'বছর হল অসুস্থ আমি। যে শক্তিটুকু বাকী আছে আমার তা রাজকার্যে ব্যয় না করে অন্য উদ্দেশ্যে লাগাতে চাই... যাও সম্বল, এখন যেতে পার, কিন্তু যেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবে সেখানে অমনি হিন্দুবেগকে নিজের জায়গায় বসিয়ে ফিরে এস।'

হুমায়ুন বুঝলেন পিতার এই আদেশ পালন করতে হবে বিনাবাক্যব্যয়ে।

বর্ষাকাল বিদায় নিয়েছে। আকাশে মেঘের ভিড়ও আর নেই। নিদ্রাহীন রাতে বাবর বাইরে বেরিয়ে আসেন আকাশের তারা দেখবার জন্য। রাতের বেলায় প্রায় জ্বর উঠতে থাকে বাবরের, সে সময় যদি আকাশের দিকে দেখেন তো মনে হয় যেন গোটা আকাশটা দুলছে আর তারাগুলো যেন এক ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে ঘুরছে।

দিনের বেলায় নির্দিষ্ট সময়ে আগের মতই তিনি দেখা করেন বেগদের সঙ্গে, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে আর আগের চেয়ে আরো বেশি ঘন ঘন দেখা করেন শেখ-উল-ইসলামের সঙ্গে। এরা সবাই তাঁর সঙ্গে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে সতর্কভাবে কথা বলেন, বাবর বোঝেন: যে রোগীর মৃত্যু হবেই জানা আছে তার সঙ্গে এমনি ব্যবহারই করা হয়, কারণ তারা সবাই খোদায় অত্যন্ত বিশ্বাসী আর তাদের বিশ্বাস জাদু ঘটবেই। তাদের কোন সন্দেহই নেই যে খোদা তাঁকে দান করা উৎসর্গ গ্রহণ করেছেন বাবরের কাছ থেকে। হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেছেন এবার মৃত্যুর তরবারি নেমে আসবে বাবরের কাঁধে যে কোন মুহূর্তে...

যে সব লোকেরা তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে তাদের মিষ্টি হাসি বা সম্মান প্রদর্শন সহ্য করা খুব সহজ কথা নয়। বাবর চেষ্টা করেন মহিম বেগমের কাছে বা 'বিশ্রাম মহলে' বেশিটা সময় কাটাতে।

গায়ে কোথাও কোন ফোঁড়া নেই বা ভিতরে কোন আবও নেই। বুকের ভিতরটা, কিন্তু জ্বলছে যেন।

হাকিমদের নিরুপায়ভাব, নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালায় তারা, শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে শাহ্‌র রক্ত খারাপ হয়ে গেছে, বিষ নষ্ট করেছে তাঁর রক্তকে। রক্ত নির্দোষ করার ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে, বেশি করে খেতে হবে বেদানার রস।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একেবারে রুগ্ন, নির্জীব হয়ে পড়তে লাগলেন বাবর।

সম্বল থেকে ফিরে এসে হুমায়ুন দেখলেন, প্রশস্ত ধবধবে সাদা চাদর বিছান শয্যায় শুয়ে আছেন পিতা। মুখে হলদেটে-নীলভাব, চেহারা এমন রোগা যে যারা আগের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বাবরকে দেখেছে তারাই অবাক হবে এখন তাঁকে দেখে।

হুমায়ুন পিতার শয্যার একপাশে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর হাতের শুষ্ক চামড়ার ওপর মুখ রাখল।

মাথার কাছে খানজাদা বেগম বসে বাবরের মুখের ওপর পাখীর পালকের চামর দোলাচ্ছেন আস্তে আস্তে। বাবরের পায়ের কাছে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন মহিম বেগম।

'পিতা, কি হয়েছে আপনার?' অভিভূত হুমায়ুন বললেন, 'এ... আপনি উৎসর্গ করেছেন... নিজেকে আমার জন্য।'

মহিম বেগম একটাও কথা বার করতে পারলেন না, কাঁদতে লাগলেন চুপি চুপি।

অতি কষ্টে কথা আরম্ভ করলেন বাবর, হাঁফিয়ে, ধীরে ধীরে কিন্তু স্পষ্ট করে, ভেবে ভেবে বললেন:

'বাছা আমার, এতে তোর কোন হাত নেই... আমার রোগ... বাসা বেঁধেছে আমার রক্তে।'

'পিতা, অনুমতি দিন... আপনার রোগ সারাবার জন্য যা প্রয়োজন সব করব আমি!'

'পুরোপুরি সেরে উঠতে... আব পারব না বোধহয়... কিন্তু আমাকে একটু স্বস্তি দিতে পারিস তুই...'

'কেমন করে? বলুন কেবল!...' লাফিয়ে উঠলেন হুমায়ুন।

'প্রধান উজীরকে... আর যাকে দরকার ডাক... তাদের সামনে তোকে আমি করে যাব... আমার রাজ্যের অধিকারী!'

'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার জীবনের এক মুহূর্তও আমার কাছে বেশি দামী...'

'বাধা দিস না,' ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন বাবর।

খানজাদা বেগম ভাইয়ের বিছানাটা ঠিকঠাক করে দিলেন। মাথার নীচে আর একটা বালিশ দিতে বললেন বাবর, আধবসা হয়ে কথা বলতে সুবিধা হবে।

এবার বাবর উজীর ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত।

পরের গোটা দিনটা শাহ্ হুমায়ুন, মহিম বেগম ও খানদাজা বেগম বাবরের শয্যাপাশে কাটালেন।

জাঁহাপনা, আপনার কাছে হুমায়ুনের ঋণ শোধ হবার নয়,' বললেন মহিম বেগম সামান্য সময়ের জন্য যে যন্ত্রণাটা কমেছে আর বাবর আপনজনদের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন তা বুঝে।

'সে ঋণ শোধ করুক সে নিজের... সন্তানদের কাছে,' থেমে থেমে বললেন বাবর। 'তৈমুরের বংশধরদের... অধিকাংশই... শেষ হয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে শত্রুতায়... ভাই ভাইকে মেরেছে... বিশ্বাসঘাতকতা আর নীচতার কবলে পড়েছে

সবাই... আমাদের মধ্যে যাঁরা ভালও ছিলেনও তাঁরা নিজেদের মহত্ত্বের বলি হয়েছেন। এই যে খানজাদা বেগম... সমরখন্দে আমাকে রক্ষা করার জন্য... নিজে বেছে নিলেন বন্দীজীবন। ইনিই আমাকে শিখিয়েছেন... আত্মত্যাগ করতে। তুমিও, হুমায়ুন, শেখাবে... নিজের ভাইদের এবং ভাবী সন্তানদের আত্মত্যাগী, মহৎ হতে।'

শয্যার কাছে টাঙান সাদা রেশমী চিকের ওপাশে তাকালেন বাবর মাথা ঘুরিয়ে। এখনই কেবল লক্ষ্য করলেন হুমায়ুন যে সেখানে আর একজন লোক বসে আছে।

'তাহিরবেগ, আমার বইটি এখানে নিয়ে এস,' বললেন বাবর।

চিকের আড়াল থেকে বেরিয়ে তাহির দেয়ালের কুলুঙ্গি থেকে তুলে নিল চামড়ার মলাট দেওয়া সদ্যবাঁধাই করা একটি বই।

'মনে আছে, কাবুলের কাছে পাহাড়ে, তুই আমার কাছে চেয়েছিলি আমার জীবন নিয়ে লেখা বই... এই নে, সেই বই... মনে করে নে, শেষ করেছি লেখা... যেমন পেরেছি।'

তখন পিতা যে কথাগুলি বলেছিলেন, এখন তা মনে পড়ল হুমায়ুনের 'যখন সে বই লেখা শেষ করব তখন শেষ হবে আমার জীবনও।' দু'হাতে করে বইটি নিয়ে হুমায়ুন কপালে ঠেকালেন, মলাটের উপর চুম্বন করলেন। এমন সময় তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল, বাবর লক্ষ্য করলেন একটা বড় ফোঁটা পড়ল বইটির সোনাবাঁধান মলাটে।

'তোকে আমার অনুরোধ, মনে রাখিস... এটি যেন পড়ে তোর বংশধররাও... আমার ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন করে না কেউ। আমি যত ভালো কাজ করেছি... তা আরও বৃদ্ধি কোর। বইটি নকল করতে দিবি তারপর পাঠাতে বলবি সমরখন্দ... তাশখন্দ... আন্দিজানে... আমাদের প্রথম মাতৃভূমির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন কোরো না... কে জানে, হয়ত এই বইটি একদিন মাভেরান্নহর আর ভারতবর্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবে...'

এই বইটিকে রেখে যাচ্ছেন বাবর মৃত্যুপূর্বের অন্তিম নির্দেশ হিসাবে! আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না খানজাদা বেগম:

'বাবরজান, আমি তোমার বড় বোন... তোমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় আমি। যদি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতেই হয় তো আমারই প্রথম যাওয়া উচিত! তোমার যাওয়ার কথা নয়, জাঁহাপনা!.. বাবরজান, ভাইটি আমার! তা হবে না! না!'

খানজাদা বেগম তাঁকে বাবরজান বলে ডাকলেন, আর এক মুহূর্তে বাবর যেন ফিরে গেলেন সেই বহু দূর শৈশবে, এক মুহূর্তের জন্য। 'হুজুর' 'জাঁহাপনা' এই সম্মানের সম্ভাষণে তাঁকে ডাকে বেগরা, দাসদাসী প্রিয় সন্তান, এমন কি প্রিয়তমা স্ত্রীও—এখন তা অসহ্য মনে হল তাঁর।

'হুমায়ুন কতদিন তুই আমাকে বাবা বলে ডাকিসনি।'

হুমায়ুন সত্যিই ভুলে গেছেন যেন কবেই এই সাধারণ ডাকটি।

'পিতা!' বললেন তিনি। বলেই বুঝলেন পিতা তা শুনতে চাননি: 'বাবা! বাবা গো!'

'বিদায় বাবা...'

মেয়েরা কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

আপনজনদের কাছে বিদায় নেওয়ার ঠিক সেই দুঃসহ মুহূর্তে মওলানা ইউসুফি এসে প্রবেশ করলেন।

ঘামে ভিজে গেছে বাবরের দেহ, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর, ঘড়ঘড় করছে বুক।

'জাঁহাপনা, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন!' দৃঢ়স্বরে বললেন হাকিম, তারপর সাদা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বাবরের ঘাড় ও মুখের ঘাম মুছে দিতে লাগলেন। খানজাদা ও মহিমকে ইঙ্গিতে বললেন চলে যেতে।

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা। বাবর তার মুখের কাছে ঝোঁকা হুমায়ুনের কানে কানে বললেন: 'তুইও যা... বাবা... তোর তো এখন অ-নে-ক কাজ।'

কোন কথা না বলে বাবাকে আলিঙ্গন করে তাঁর রোগা আঙুরগুলিকে চুম্বন করে বেরিয়ে গেলেন হুমায়ুন।

ঘণ্টাদুই বাদে বাবর তাহিরকে বললেন ফজলুদ্দিনকে ডেকে পাঠাতে।

স্থপতি এসে প্রবেশ করলেন, চেষ্টা করছেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাবরের মুখের দিকে না তাকাতে।

'হজরত, আমার বিশ্বাস আপনার কৃত কাজ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে বহু শতাব্দী ধরে!..'

'আমাকেও এখন ডাকুন... মওলানা বলে... সিংহাসনে এখন বসিয়েছি হুমায়ুনকে...'

'কিন্তু কাব্যের সিংহাসনের অধিকারী আপনি এখনও, হজরত। হীরাটে আলিশের নবাইকে আমরা ডাকতাম 'হজরত আলিশের' বলে। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সমবেত করায়, তুর্কী ভাষায় কাব্যসৃষ্টিতে আপনি তাঁর কাজই আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমাদের ভাষাকে আপনি ফারসি আর আরবীর সঙ্গে সমান উচ্চতায় দাঁড় করিয়েছেন, যা করা ছিল মির আলিশেরের স্বপ্ন।'

'ধন্যবাদ... এমন কথা বলার জন্য, মওলানা। আপনি... দিল্লী আর আগ্রাতে নির্মাণ করেছেন... চমৎকার সব প্রাসাদ... অপূর্ব সব বাগিচা... আর কিছুদিন যদি আমায় বাঁচিয়ে রাখতেন খোদা তো আমি চাইতাম, যে আপনি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন... সমরখন্দে বিবিখানুমের মাদ্রাসা—কি অপূর্ব, সুন্দর। আমার বোনও উপযুক্ত... তেমনি সম্মান পাবার... যে তার নামে মাদ্রাসা নির্মাণ করার...'

মওলানা ফজলুদ্দিন দেখলেন যে বাবর কথা বলছেন শেষ শক্তি দিয়ে। তাই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, দ্রুত, আবেগের বশে:

'চমৎকার চমৎকার প্রাসাদ ভবনের নামে মেয়েদের নাম বাঁচিয়ে রাখার প্রথা আমাদের মধ্যে বহুদিন থেকেই প্রচলিত।..'

'মওলানা... আমার বোন খানজাদা বেগম... আপনি জানেন... সেই দুর্দিনে... আপনারা নিজেদের সুখ খুঁজে নিতে পারেননি...' আবার আগের চিন্তায় ফিরে যাচ্ছেন বাবর, 'অত ভাল মেয়ে... যদি মাদ্রাসা... আপনি মনে করেন... নির্মাণ করা হবে... তো নাম দেবেন 'খানজাদা বেগমের মাদ্রাসা'...

'আপনি আমার আকাঙ্খা ঠিক বুঝে ফেলেছেন', সরলভাবে বললেন ফজলুদ্দিন, 'যদি সেই আকাঙ্খা সফল করে উঠতে না পারি এ জীবনে তো এ দুনিয়া ছেড়ে যাবার সময় সে দায়িত্ব দিয়ে যাব আমি আমার বংশধরদের হাতে। তারা আর ভারতের স্থপতিরা মিলে যেন নির্মাণ করে সেই স্মৃতিমন্দির।'

ঘামে ভিজে গেছে বাবরের দেহ, সাদা রেশমের জামাটা গায়ে লেপ্‌টে গেছে।

'মামা' উদ্বিগ্ন তাহির বলল, 'তাবিব বলেছেন ওঁকে বেশি কথা না বলতে উত্তেজিত না করতে...'

ঘাড় নেড়ে ফজলুদ্দিন বাবরের হাতটা ঠেকালেন নিজের কপালে। বাবর আঙুলগুলি নাড়িয়ে স্থপতিকে কাছে ডাকলেন, আস্তে করে বললেন:

'আপনার কাছে... আর একটা অনুরোধ, মওলানা। কাবুলের আছে একটা বাগিচা... আপনার... পাহাড়ের ওপর... আমার চিরবিশ্রাম... সেখানেই হোক... বেশি জাঁক জমকের দরকার নেই কিন্তু, সেখান থেকে... নিচের চমৎকার উপত্যকাটা দেখা যায়।'

চোখের জলে দমবন্ধ হয়ে এল ফজলুদ্দিনের। একটা কথাও বেরোল না মুখ দিয়ে। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

বাবরের পোশাকটা বদলে দিল তাহির। ধীর মনে বাবরের দেখা শোনা করে সে। ওষুধ কি তেষ্টা পেলে জল দিতে হবে, কিংবা পালকের চামর দুলিয়ে হাওয়া দিতে হবে যাতে রুগীর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট না হয়—সবকিছু করে তাহির, কাউকে এগোতে দেয় না তাঁর শয্যার কাছে।

আজ রাতে ঘরের মধ্যে বাবরের দম আটকে আসতে লাগল, ভীষণ কষ্ট হতে লাগল; ভৃত্যকে ডাকল তাহির; রুগীকে শয্যাসমেত বাইরে নিয়ে আসা হল।

বাইরে এমন চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া, যা হয় কেবল আন্দিজানে বসন্তকালে। অন্ধকার বিস্তৃত আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। ঘূর্ণিঝড়ে তারাগুলি ঘুরছে তো ঘুরছেই ধাক্কা খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। ভয় হল সেদিকে তাকিয়ে থাকতে। চোখ বন্ধ করে বাবর তাহিরকে ডাকলেন:

'রক্ত জমে যাচ্ছে...'

আস্তে করে কাঁধ, হাত ও পায়ের পেশিগুলো একটু মালিশ করে দিল তাহির। একটু আরাম পেলেন বাবর, আবার সাহস করে চোখ মেলে ওপর দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ, এবার তারাগুলি নিজের নিজের জায়গায় আছে, কুচকুচে কালো আকাশের পটভূমিতে নিশ্চিতভাবে জ্যোতিবিকীরণ করছে। বাবর খুঁজতে লাগলেন সপ্তর্ষি তারা, নিশ্চল ধ্রুবতারা ও পূর্ব দিক থেকে উজ্জ্বল ছায়াপথটিকে।

তাহিরও তাকাল ঠিক সেই তারাগুলির দিকেই।

'দেখুন, আমাদের কুভাতেও ছায়াপথ ঠিক এমনিভাবেই দেখা দিত।'

মনে মনে বাবর পৌঁছে গেলেন আন্দিজানে। শৈশবে।

ছোট্ট জাহিরুদ্দিন কোথা থেকে যেন শুনেছিল ছায়াপথ হল একটা হীরার সাপ, যেটি আকাশে হাওয়া লেগে ক্রমশই উপরে উঠতে থাকে, হীরার লেজটি নাড়ায় সে খুশিতে কিন্তু দূরে উড়ে চলে যেতে পারে না কারণ ধ্রুবতারার সঙ্গে অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা সে। ছেলেবেলার সেই গল্পটি আবার মন জুড়ে বসল। আর আগ্রার উপরের আকাশ ও তারাগুলি যে অনেক অনেক দিন আগে জীবনের শুরুতে আন্দিজানের মতই—এই হল তাঁর শেষ সান্ত্বনা। ছেলেবেলায় ফিরে যাওয়ার সেই আনন্দময় মুহূর্তটি আরও খানিকক্ষণ ধরে রাখতে চাইলেন তিনি, কিন্তু প্রবল আক্ষেপে দুর্বল দেহটা তাঁর কেঁপে উঠল, আর তারাভরা আকাশটা আবার ঘুরপাক খেতে লাগল ঘূর্ণিঝড়ে, সেই ঘূর্ণিঝড় নেমে এল তাঁর ওপরেও, উড়িয়ে নিয়ে গেল যেন তাঁকে কত দূরে, গভীর অতল অন্ধকারে...

উপসংহার

জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে মওলানা ফজলুদ্দিন কাবুলে সেই সমাধির নির্মাণকার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হন যার কথা বাবর তাঁকে বলেন মৃত্যুর পূর্বে, কিন্তু খানজাদা বেগমের সম্মানে মাদ্রাসা নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে... প্রস্তরে অপূর্ব এক রমনীর স্মৃতি চিরজীবী করে রাখার যে স্বপ্ন তাঁর ছিল, হয়ত শতখানেকেরও বেশি বছর পরে ভারতের মহান স্থপতিরা তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ করে অন্য এক রমণী মুমতাজবেগমের স্মৃতির নির্মিত আগ্রায় বিখ্যাত তাজমহল নির্মাণের মাধ্যমে...।

কাবুলে মামার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে তাহির হুমায়ুনের আদেশ অনুযায়ী 'বাবরনামা'র নকল করা নমুনাগুলি নিয়ে আসে সমরখন্দ, তাশখন্দ ও আন্দিজানে, সেখানের উপযুক্ত লোকেদের হাতে পৌঁছে দেয় সেগুলো। তাহির আর রোবিয়া তাদের জীবনের শেষদিনগুলি কাটায় কুভাতে। তাদের ছেলে সফর মওলানা ফজলুদ্দিনের ছেলেদের সঙ্গে আগ্রাতেই রয়ে গেছে, সেখানকার মেয়েদেরই বিয়ে করেছে তারা, তাদের উদ্দেশ্যে বংশধরেরা ভারতীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে।

বাবরের মৃত্যুর এগারবছর পরে হুমায়ুন সুন্দরী হামিদাবানু বেগমকে বিয়ে করেন, তার গর্ভে তাঁর যে ছেলের জন্ম হয়, তার নাম রাখলেন জালালুদ্দিন আকবর। মহিম ইতোমধ্যে আর জীবিত নেই—কলেরা টেনে নিয়েছে তাকে মৃত্যুমুখে। খানজাদা বেগম তখনও বেঁচে, দু'বছরবয়সী আকবরের শিক্ষাদীক্ষার ভার পড়ল তাঁর ওপর। প্রায়ই আকবরকে চুমো দিয়ে আদর করে তিনি বলতেন: 'আকবর—একেবারে হুবহু দাদু! আমার ভাই বাবরজান দু'বছর বয়সে ঠিক এমনটিই ছিল! কেবল মুখচোখ নয়, হাত-পা সব ঠিক তেমনি!'

কেবল মুখচোখের সাদৃশ্যই নয়, দাদুর বহুমুখী প্রতিভা আর দুর্লভ মানবিক গুণগুলিরও উত্তরাধিকারী সে।

আকবর, তাঁর পিতা হুমায়ুন, আর মাতা হামিদা বেগমের জীবন ও নিয়তি,

সেইসঙ্গে তাঁর প্রাণপ্রিয়া পত্নী ভারতীয় রমনী যোধাবাঈ আর সেই সময়কার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের জীবনকাহিনী ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন লেখক তাঁর পরবর্তী উপন্যাসে, যেটি নিয়ে তিনি গত কয়েকবছর ধরে ব্যস্ত আছেন।

বাবরের মৃত্যুর পরে তাঁর ভাগ্যে কি ঘটে সে সম্বন্ধে দু'চারটি কথা এখানে বলব। কারণ অস্থিরমতি ভাগ্যদেবী তাঁর জীবন জাহাজকে নিয়ে ইতিহাসের বড় বড় ঢেউয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করতে থাকে, তা তাঁর মৃত্যুর পরেও থামে না।

যেমন ধরা যাক, এই তথ্যটি যে পৃথিবীর বহু দেশেই বাবর কেবলমাত্র ভারতে প্রখ্যাত মোগলবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই পরিচিত, তাঁর সৃজনপ্রতিভার কথা বহুদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল অনেকের কাছেই।

গত দুই শতাব্দী ধরে যে তাঁর বংশ 'প্রখ্যাত মোগলবংশ' বলে অভিহিত হয়ে আসছে এও ভাগ্যের আর এক খেলা। কারণ বাবর তাঁর স্মৃতিকথায় বা তাঁর বংশধরেরা নিজেদের সরকারী নথিপত্রে বা সেই যুগের কোন ঐতিহাসিকই তাঁদের রচনায় সেই রাজ্যকে মোগলরাজ্য বলে অভিহিত করেননি। বাবর ও তাঁর বংশধরেরা নিজেদের তুর্কী বলে অভিহিত করতেন কারণ তাঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন তুর্কীভাষী বারলাস উপজাতির অন্তর্ভুক্ত, যারা এখনও হাজারে হাজারে ছড়িয়ে আছে মধ্য এশিয়াতে।

তুর্কীভাষায় লেখা বাবরের কবিতা ও বিশেষ করে তাঁর স্মৃতিকথার যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল উজবেক সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টিতে সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁর ভাষা সজীব কথ্যভাষায় এত কাছাকাছি আর সারল্যে আর বোধগম্যতায় সেই সময়ের প্রচলিত সাহিত্য থেকে এত এগিয়ে গেছে যে বর্তমানে উজবেকিস্তানের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সপ্তমশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত 'বাবরনামার' উদ্ধৃতিগুলি বিশেষ আয়াস ছাড়াই বুঝতে পারে।

ইরান, আফগানিস্তানের মত প্রতিবেশী দেশগুলি বাবরের রচনাবলীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিচিত ছিল সেই কারণে বাবরকে সেই দেশগুলিতে মোগল বলে মনে করা হত না। কিন্তু পশ্চিমের সেই দেশগুলিতে যেখানে বাবরের রচনাপ্রতিভা বহুদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল সেখানে 'প্রখ্যাত মোগল' হিসাবেই পরিচিত অর্জন করেন। এই অভিধা বিশেষভাবে দৃঢ়মূল হয় ভারতে ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের শাসনকালে, যাদের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় (বিশেষভাবে বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে) বাবর ও আকবরের সৃষ্ট শক্তিশালী সার্বভৌম রাজ্যের অতীত মহিমা।

যে নামেই তারা পরিচিত হোক না কেন, আসল কথা হল যে এই রাষ্ট্র তিনশতাব্দী ধরে কেবল তার অস্তিত্বই বজায় রাখেনি ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক প্রভাবও বিস্তার করে।

বাবরের বংধররা আজ আর বেঁচে নেই—শেষ কয়েকজনকে (বৃদ্ধ দ্বিতীয় বাহাদুরশাহ্‌র দুই পুত্র ও শিশু পৌত্র) ১৮৬২ সালে ঔপনিবেশিক সৈন্যদলের অফিসার হাডসন নির্দয়ভাবে হত্যা করেন।

কিন্তু বাবরের লেখা অমর কবিতা ও স্মৃতিকথাগুলি জীবনস্পন্দনে পূর্ণ। উজবেকিস্তানে বিবাহউৎসবে আজও গাওয়া হয় তাঁর রচিত গজলগুলি। তাশখন্দের কবিদের উদ্দেশ্যে নামাঙ্কিত উদ্যানে স্থাপিত হয়েছে বাবরের আবক্ষ মূর্তি।

'বাবরনামা' তুর্কী ভাষা থেকে ফারসীতে দুবার অনূদিত হয় এমনকি আকবরের সময়েই। এরপরে বইটি অনূদিত হয় হিন্দী, ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী ও অন্যান্য ভাষায়, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রসগ্রাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্বাভাবিক কারণেই বাবরের রচনাবলীর বিশেষ আদর তাঁর জন্মভূমিতে। এখানে তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে কয়েকটি স্কুল ও রাস্তা। উজবেক চিরায়ত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক, যিনি আমাদের সাহিত্যিক ভাষা সৃষ্টিতে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁর রচনাবলী উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষও তাঁর রচনাবলীকে নিজের সাংস্কৃতিক সম্পদ বলে গণ্য করে। ভারতের মহান সন্তান শ্রী জওহরলাল নেহরু বাবরের স্মৃতিকথা পড়ে বলেন বাবর হলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও নবজন্মের যুগের শাসকদের প্রতিনিধি। প্রখ্যাত ভারতীয় লেখক মুলক রাজ আনন্দ বলেন:

'এটি হল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বইগুলির অন্যতম। ভারতের চিত্রশিল্পী বইটিকে সুন্দর চিত্রকলায় অঙ্কিত করেছেন এই কারণেই যে এ হল আমাদের যুগ্মসম্পদ।'

সাড়ে চার শতাব্দী আগে পৃথিবীর থেকে বিদায় নেওয়া প্রতিভাবান আর অদ্ভুত ভাগ্যের অধিকারী সেই ব্যক্তির এই হল দ্বিতীয় জন্ম।

কাদিরভ ১৯৬৩-১৯৮৩

উপসংহার

শাহ্ ও কবি

বহুদিন এই বইটির অপেক্ষায় ছিলাম আমি। কবে এটি লেখা হবে, কে লিখবেন তা না জেনেই অপেক্ষা করছিলাম। মহান কবি জাহিরুদ্দিন বাবর, যাঁর পাঁচশতবর্ষ পূর্তি আমরা পালন করেছি ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, তাঁকে চিরকালই আমার রহস্যেভরা চরিত্র বলে মনে হয়েছে। যে প্রশ্নের উত্তর হয় না বলে মনে হয়েছিল সেই উত্তরের অপেক্ষাতেই ছিলাম।

একজন মানুষের মধ্যে কি করে সহাবস্থান করতে পারে মহান ভাবধর্মী কবি ও মহান শাসক—শাহ্ যিনি ভারতবর্ষ জয় করেন, ভারতবর্ষের মহারাজাদের বিভিন্ন রাজ্য ঐক্যবদ্ধ করে বিরাট মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন আগ্রাকে কেন্দ্র করে এবং সে রাজ্য এমন শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় যে তিন শতাব্দী টিকে থাকে, অবশেষে ইংরাজদের হানা আঘাতে সে রাজ্য ভেঙে পড়ে।

কবি ও শাহ্—এই বিষয় নিয়ে মানুষ ভেবেছে অনেক দিনই। সর্বযুগের, সর্বজাতির কবিদের মন্দভাগ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে নাকি! বিশ্বসাহিত্যের অনেক অপূর্ব গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেই সব কবি ও শিল্পীদের নাটকীয়তাভরা জীবনকাহিনী নিয়ে, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন শাসকদের দ্বারা।

সাহায্য-সমর্থন লাভ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত এমন দুইজন কবির কথাই কেবল মনে আসছে—যোহান উলফগ্যাং গ্যেটে ও আলিশের নবাই—বাবরের সমসাময়িক, তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু বড়। কিন্তু শেষপর্যন্ত অন্ধবিশ্বাসী মুসলমানদের চাপে পড়ে নবাইর প্রিয় সুহৃদ সুলতান হুসেন বাইকারা তাঁকে বিতাড়িত করেন তাঁর প্রিয় শহর হীরাট থেকে।

জুলিয়াস সিজার একবার তাঁর সামনে কবিতা পাঠ করতে থাকা এক কবিকে

বলেন: 'যে লোক পড়ে তার কাছে তোমার কবিতা বড় বেশি গানের মত মনে হবে আর যে লোক গান গায় তার কাছে নীরস গদ্যপাঠের মত মনে হবে,' মনের ভাব কবিতার আকারে প্রকাশ হতে দেখলে বিরক্তি বিরক্তি লাগত তাঁর।

মহাশক্তিশালী জুলিয়াস সিজার কবি ক্যাটুলাসকে যে নির্যাতন পীড়ন করেছিলেন সে কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়নি এখনও। সিজার ও তাঁর প্রিয়পাত্রদের নিয়ে যে প্রখ্যাত শ্লেষাত্মক কবিতাগুলি লিখেছেন ক্যাটুলাস, সম্রাটের সঙ্গে ভোজে আমন্ত্রিত হবার পরে অজানা রোগে যুবক কবির রহস্যজনক মৃত্যু—এ সমস্ত লেখকের আকর্ষণ ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর ওপর তাঁদেরও কাজে লাগতে পারে।

সীজারের মত বাবরও স্মৃতিকথা লিখে রেখেছেন রাজনীতিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। আর ক্যাটুলাসের মত বাবর রেখে গেছেন এমন এক কাব্যগ্রন্থ যা হৃদয় স্পর্শ করে। রাজনীতিক এবং শিল্পীর চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে বহু পুস্তক লিখিত হয়েছে। এই দুই চিন্তাধারা যে একব্যক্তির মধ্যে থাকতে পারে না—তা স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করা হয়: সেই জন্যই তো গ্রিবয়েদভ লিখছেন দস্তয়েভস্কিকে যে তাঁর মতে 'প্রকৃত শিল্পীকে হতে হবে বংশপরিচয়হীন,' আর হাইনে বলেছেন 'যখন রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রাধান্য লাভ করে সেই সময়ে খাঁটি সাহিত্য-রচনার আবির্ভাব অতি বিরল ঘটনা।'

বাবরের জীবন—এ যুক্তি খণ্ডনও করে আবার তেমনি তা এ যুক্তির জীবন্ত প্রমাণও। নিজের অন্তরকে দুভাগে ভাগ করতে বাবরকে যে কি যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, সেই দ্বিখণ্ডন যে পরে কত দুঃখ কষ্ট বেদনার কারণ হল সেই সম্বন্ধেই এই উপন্যাস 'বাবর'। উপন্যাসটি পড়তে একঘেয়ে লাগে না কখনও। বাবরের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর নাটকীয়তা লেখককে যুগিয়েছে উপন্যাসের অতি চমৎকার উপকরণ আর সেই উপকরণকে অতি দক্ষ কৌশলের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন পিরিমকুল কাদিরভ।

খন্দামির ও তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিকদের গ্রন্থগুলি ছাড়াও কাদিরভ এই উপন্যাসের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন প্রধানত বাবররচিত গ্রন্থ দুখানি থেকেই। বিশেষ করে 'বাবরনামা' বাবরের আত্মজীবনী থেকে।

তাতে আছে তৈমুরের সাম্রাজ্যর সিংহাসন দখলের জন্য রক্তাক্ত যুদ্ধ, যে সাম্রাজ্যকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বাবর, এই সব যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁর জয়-পরাজয়, লুঠপাট, অত্যাচার, শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মুণ্ড দিয়ে তৈরি মিনার, এ সব কিছুরই... নিজের জীবনের কথা লিখতে গিয়ে বাবর কারুর প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করেননি না শত্রুর প্রতি, না বন্ধুর প্রতি, না নিজের প্রতি। সত্য, তা সে যত অসুন্দরই হোক না কেন, সেই সত্যের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন বাবর গোটা আত্মজীবনীর মধ্যে, এ আত্মজীবনী ভরে আছে সে যুগের নিষ্ঠুরতার বর্ণনার, যাতে তিনি নিজেও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছেন।

'এই ঘটনাপঞ্জীতে,' লিখেছেন বাবর, 'আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যেন আমার লেখা প্রতিটি কথা সত্য হয় আর প্রতিটি ঘটনা যেমন যেমন ভাবে ঘটেছে ঠিক তেমনিভাবেই যেন বর্ণিত হয়। সেইজন্যই আমি আমার আত্মীয় ও ভাইবর্গের সম্বন্ধে ভাল ও মন্দ দুই-ই লিখেছি যা সবারই জানা, লিখেছি আপনপর সবারই দোষঘাটতির কথা, যা সত্যি সত্যিই দেখেছি। পাঠক আমাকে, মাফ করবেন আর শ্রোতারা আমার প্রতি কঠোর হবেন!'

'বাবরনামা'তে বর্ণিত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার কোন প্রয়োজন নেই, সে সম্বন্ধে পাঠক জানতে পারবেন কাদিরভের উপন্যাস থেকেই। কেবল এটুকুই বলব যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি বাবরের আগ্রহ থাকার ফলে নিজের ঘটনাপঞ্জীতে বর্ণনা দিয়েছেন সেই সব দেশের কথা যেখানে তিনি গিয়েছেন ও যে সব দেশ জয় করেছেন তিনি, বর্ণনা করেছেন সেই সব অঞ্চলে প্রচলিত আচারপদ্ধতি, পোশাক-আশাক, প্রকৃতি-জীবজন্তু পাখী, তাদের ধরনধারণ। তাঁর কতকগুলি দৃশ্যের বর্ণনা পড়ে মনে হয় যেন শিল্পীর চোখে দেখা সে দৃশ্য:

'যখন আমরা আব-ই-ইস্তাদা থেকে এক কুরুখ (ক্রোশ) দূরে ছিলাম তখন এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখি: আকাশ আর জলের মাঝে গোধূলির মেঘের মত কি এক উজ্জ্বল লাল বস্তু মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এমনি চলতে লাগল ততক্ষণই যতক্ষণে না আমরা নদীর কাছে পৌঁছলাম কাছে থেকে দেখে বুঝলাম যে এ হল বুনো হাঁসের দল: দশ হাজার নাকি বিশ হাজার, অনেক অনেক বুনো হাঁস। অনেক বুনো হাঁস দলবেঁধে ওড়ার সময় যখন পাখা নাড়ায় তখন তাদের লাল পালকগুলো কখনও দেখা যায় আবার কখনও ঢাকা পড়ে যায়।'

'বাবরনামা' কাদিরভকে দিয়েছে বাবরের জীবন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য, তবুও জীবনের কঠোর দিকগুলি ও নিজের অনুভূতির সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করে চলা বাবরের চরিত্র এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলা যেত না যদি বাবর তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি রেখে না যেতেন আমাদের জন্য। বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে, বিশেষ করে প্রাচ্যদেশগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে শাসক কবিতা রচনা করছেন চলতি প্রথা অনুযায়ী। কিন্তু সে সব কি ধরনের কবিতা! সেই শাসকের মৃত্যুর পরই তাঁর রচিত কবিতাগুলি জনগণের হাসির কারণ হয়ে পড়ত।

বাবর এর ব্যতিক্রম! মানবতার অনুভূতিতে ভরা তাঁর কবিতাগুলি। রাতের বেলায় তাঁর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে যে ভাবনা সেটাই ধরা যাক না কেন:

কোথা সুখ? কোথা মান, ক্ষমতা ও খ্যাতি? নেই!
কোথা দোস্ত? ডাইনে বাঁয়ে নেই কোনো ব্যথী। নেই!

সবই ছিল জল্লাদ, তুমি সব করেছ ছেদন,
লোকের সঙ্গে দেখা হলে পিছে শুনি যে রোদন।
কেন তুমি উচ্চে তুলে ধরেছ আমায়?
তুলেছ যখন, কেন মিশালে ধূলায়?
বুঝি না এ শাস্তির কী যে হয় মানে:
বাড়ি তুলে ফের ভাঙা তুলেছ যেখানে।

ভোরবেলায় সূর্য ওঠে, সূর্য কবিকে সান্ত্বনা দেয়:

পৃথিবীর অশ্রুজলে ভরি না সাগর,
হীন দুনিয়ার লাগি হই না কাতর।
গালি দিয়ে কোনো লাভ নাই, দুনিয়াকে
দেব নাকো মুঠো ভর ছাই, দুনিয়াকে।
সামান্য দুনিয়ায় সুখ অনুভব:
চোখ মেলা, চোখ বোঁজা এটুকুই সব!

বাবরের কবিতায় প্রকাশিত তাঁর মানবতাবোধই কাদিরভের কাছে হয়ে উঠেছে বাবরের মূর্তি ফুটিয়ে তোলায় যেন 'ধ্রুবতারা'। একথা অনুভব করা যায় উপন্যাসের প্রতিটি পাতায়, এমনকি তখনও যখন লেখক বর্ণনা করছেন বাবরের মানবতাবোধবিরোধী কাজকর্মগুলির কথা; ঠিক এই কারণেই 'বাবর' উপন্যাসটি পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে।

পাঠক যাতে বাবরের কবিতা উপভোগ করতে পারেন সেজন্য এই উপসংহারে বাবরের কাব্যের আরও কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করব:

বাঞ্ছিত লক্ষ্য তুমি করো হে অর্জন,
অথবা স্বপ্ন কোনো ক'রো না দর্শন।
এ দু'য়ের কোনোটাই না হলে সাধন
উড়ে চলে যাও কোথা পাখির মতন!

এই চারটি ছত্র যেন বাবরের গোটা জীবনের কথাই বলে সংক্ষেপে যা নিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন জয়-পরাজয়, উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে। বাবরের জীবনের সংগ্রামের কথাগুলি পড়তে পড়তে উপন্যাসের পাঠকের বারবার মনে পড়বে এই রুবাইয়াতে জীবন সম্পর্কে বাবরের মনোভাব।

তবুও প্রেমের কবিতাগুলিই হল তার শ্রেষ্ঠ কবিতা:

তোমায় ছেড়ে একটা দিনও কাটানো সহজ নয়,
কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলও ঘটানো, সহজ নয়।
মেজাজ তোমার খেয়ালি বড়োই, আমিও পাগলাটে,
মানী মরদকে হঠাৎ গোলাম খাটানো, সহজ নয়।
কান্না আমায় কী দেবে বলো ঘুমিয়ে যখন সুখ?
অঘোর সে ঘুম লাঠি মেরে তবু টুটানো, সহজ নয়।
লাখো দুষমন খতম করাটা কঠিন নয় বাবর,
হও নটবর, প্রেমহীন দিন কাটানো সহজ নয়।

শাসক ও যোদ্ধা যাঁকে জীবনের অধিকাংশ দিনই কাটাতে হয়েছে যুদ্ধে-অভিযানে, তাই আপনজনেদের সঙ্গে বিচ্ছেদে ভুগেছেন তিনি সর্বদা।

বিরহে আমার মৃত্যু ঘটবে জানি যখন
দুঃখ না জেনে চলুক না দিন আমরণ।
জাহান্নমের আগুন তো বিরহাগ্নির কাছে
তুচ্ছ একটী ফুলকির চেয়ে নয় ভীষণ।

জীবন এবং সৃষ্টি এই দুয়ের মধ্যে নিজেকে বিভক্ত করতে পারেননি বাবর। বাবরের রচিত গ্রন্থগুলি সামনে রেখে পিরিমুকুল কাদিরভ প্রবেশ করতে পেরেছেন বাবরের জীবনের মধ্যে। বাবরের চারপাশের লোকদের, তাঁর আত্মীয়পরিজন, শত্রুমিত্র সবার নাটকীয় জীবনকাহিনীর মধ্যে দৃষ্টি চালিয়েছেন, বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বাবরের চরিত্রের মতই সেসব চরিত্রও পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্যে ভরা, প্রতিটি চরিত্রে আছে সে যুগের ছাপ। 'বাবর' উপন্যাসে 'একপেশে' চরিত্র নেই মোটেই।

উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই ঐতিহাসিক। একমাত্র ব্যতিক্রম তাহির কৃষক, যে বাবরের দেহরক্ষীদলে যোগ দেয়, যে বাবরকে কখনও ছেড়ে যায়নি, যখন তিনি ক্ষমতার শীর্ষে উঠেন তখনও না, পরাজয় বিপদেও না। এমন একটি চরিত্র লেখকের প্রয়োজন ছিল অন্য কারুর চোখ দিয়ে উপন্যাসের নায়ককে দেখার জন্য, তার উপলব্ধির মধ্য দিয়েই পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে নায়কের প্রতিমূর্তি। কিন্তু এছাড়াও তাহিরের চরিত্র প্রয়োজন এই কারণে যে তার জীবনের নাটকীয় গতিবিধির মধ্যে দিয়েই দেখান হয়েছে যে সে যুগের রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহ সাধারণ জনগণের জীবনকে কেমন করে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল।

'তিনটি মুল', 'কালো আঁখি' প্রভৃতি তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাসগুলিতে ও বড়গল্প 'উত্তরাধিকারে' লেখক কাদিরভ নিজের জনগণের জীবনধারা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, সাধারণ জনগণের চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলায় হাত পাকিয়েছেন। এর ফলেই তিনি বাবর উপন্যাসে তাহিরের চরিত্রটিকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে চরিত্রটি উপন্যাসে বাবরের পরে প্রায় দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে উজ্জ্বলতায়। তাহির আর তার রোবিয়া, জনগণের ভাগ্যের সঙ্গে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে থাকা তাদের ভাগ্য মহান উজবেক কবির সম্বন্ধে এই উপন্যাসে এনে দিয়েছে যেন মহাকাব্যের সুর। এও উপন্যাসটির সাফল্যের আর একটি দিক।

ভারতবর্ষের পাঠকদের মনে ধরবে এই উপন্যাসটি আশা করি, কারণ জওহরলাল নেহরুও বাবরের স্মৃতিকথা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।